কিশোর কর্নেল সমগ্র

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কিশোর কর্নেল সমগ্র ৪

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

KISHORE COLONEL SAMAGRA (Vol - IV)
A Collection of Bengali Detective Stories for Juvenile
by Syed Mustafa Siraj
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330, 2219 7920, Fax : (91-033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 160.00

ISBN : 978-81-295-0803-4

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১০, মাঘ ১৪১৬

প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

দাম : ১৬০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণগ্রন্থন : অনুপম ঘোষ, পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেখকের অন্যান্য বই

শঙ্খগড়ের ভ্যাম্পায়ার রহস্য
কর্নেল সমগ্র (১-১২)
কিশোর কর্নেল সমগ্র (১ম, ২য়, ৩য়)
নেপথ্যে আততায়ী
দেবী আথেনার প্রত্নরহস্য
লালুবাবু অন্তর্ধান রহস্য
কর্নেলের একদিন
নিষিদ্ধ অরণ্য, নিষিদ্ধ প্রেম
উপন্যাস সমগ্র (১ম, ২য়, ৩য়)
থ্রিলার সপ্তক
থ্রিলার পঞ্চক
স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান
রূপবতী
বেদবতী
হাওয়া সাপ
জনপদ জনপথ
গোপন সত্য
অলীক মানুষ
বসন্ততৃষ্ণা
রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র
স্বপ্নের মতো
আনন্দমেলা
নিশিলতা
মায়ামৃদঙ্গ
কাগজে রক্তের দাগ
খরোষ্ঠী লিপিতে রক্ত
সমুদ্রে মৃত্যুর ঘ্রাণ
রোড সাহেব ও পুনর্বাসন
জিরো জিরো নাইন
শ্রেষ্ঠ গল্প
ডমরুডিহির ভূত
সন্ধ্যানীড়ে অন্ধকার
ছায়ার আড়ালে
কুয়াশার রঙ নীল
নাগমিথুন
তৃণভূমি
প্রেতাত্মা ও ভালুক রহস্য

ছোটদের জন্যে

কঙ্কগড়ের কঙ্কাল
কোকোদ্বীপের বিভীষিকা
কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস
রহস্য রোমাঞ্চ
সবুজ বনের ভয়ঙ্কর
হাড্রিম রহস্য
কালো মানুষ নীল চোখ
নিঝুম রাতের আতঙ্ক
টোরা দ্বীপের ভয়ঙ্কর
বনের আসর
মাকাসিকোর ছায়ামানুষ
কালো বাকসের রহস্য
ভয়ভূতুড়ে

এতে আছে

ব্যাকরণ রহস্য/৯

আজব বলের রহস্য/৫৮

পোড়ো খনির প্রেতিনী/৮৯

নীলপুরের নীলারহস্য/১১২

হায়েনার গুহা/১৩০

হিটাইট ফলক রহস্য/১৬৪

ঠাকুরদার সিন্দুক রহস্য/২১৮

রায়বাড়ির প্রতিমা রহস্য/২৫২

কালিকাপুরের ভূত রহস্য/৩০১

ব্যাকরণ রহস্য

"ছাগলে কী না বলে, পাগলে কী না খায়!" বাঁকা মুখে কথাটি বলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার, আমাদের প্রিয় হালদারমশাই একটিপ নস্যি নিলেন।

হাসি চেপে বললুম, "একটু ভুল হল হালদারমশাই!"

গোয়েন্দা-ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে চার্জ করলেন, "কী ভুল? যতসব পাগল-ছাগলের কারবার!"

"সে-বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত।"

"তা হলে?"

"কথাটা উলটে গেছে। ওটা হবে, পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়।"

গোয়েন্দামশাই এবার তাঁর অনবদ্য 'ফ্যাঁচ্' শব্দটি বের করলেন। অর্থাৎ হাসলেন। "তাই বটে। তবে আমার রাগ হচ্ছিল, বুঝলেন? ভদ্রলোকের মাথার গণ্ডগোল আছে। খামোকা কর্নেল-স্যারের মূল্যবান সময়ের অপচয় করে তো গেলেনই, উপরন্তু আমারও ক্ষতি করলেন।" বলে নিজের কাঁচা-পাকা চুল খামচে ধরলেন। মুখে আঁকুপাঁকু ভাব।

আমার বৃদ্ধ বন্ধু প্রকৃতিবিদ কর্নেল নীলাদ্রি সরকার প্রকাণ্ড একটা বইয়ের পাতা খুলে মনোযোগী ছাত্রের মতো কী সব নোট করছিলেন। দাঁতে কামড়ে-ধরা চুরুট। সেটি নিবে গেছে বলেই আমার ধারণা। তবে ওঁর সাদা সান্তাক্লজ সদৃশ দাড়িতে একটু ছাই আটকে আছে এবং সকালের রোদ্দুরের ছটায় চওড়া টাক ঝকমক করছে। মুখ না তুলেই বললেন, "হালদারমশাই যা বলতে এসেছিলেন, আশা করি সেটা ভুলে গেছেন।"

বিমর্ষ মুখে হালদারমশাই শুধু বললেন, "হঃ!"

"মাথার ভেতর পাগল আর ছাগল যুদ্ধ করছে," বলে কর্নেল এবার মুখ তুলে মিটিমিটি হাসলেন। "তবে জয়ন্ত যা বলল, ঠিক নয়। হালদারমশাই ঠিকই বলেছেন, ছাগলে কী না বলে, পাগলে কী না খায়।"

অবাক হয়ে বললুম, "কী বলছেন! কথাটা একটা বাংলা প্রবচন। তাকে উলটে দিচ্ছেন আপনি?"

কর্নেল আমাকে পাত্তা না দিয়ে বললেন, "আসলে হালদারমশাইয়ের বলতে আসা কথাটা এক্ষেত্রে পাগলেই খেয়ে ফেলেছে।"

বই বন্ধ করে রেখে প্রকৃতিবিদ উঠে দাঁড়ালেন। সাদা দাড়ি থেকে ছাইয়ের টুকরোটি খসে পড়ল। আমাদের কাছে এসে বসলেন। তারপর নিবে-যাওয়া চুরুটটি লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে নিলেন এবং একরাশ ধোঁয়ার ভেতর ফের বললেন, "ছাগলে কী না খায়, এটা একেবারে বাজে কথা। ছাগলের যা খাদ্য, তাই ছাগল খায়। কিন্তু সেই ছাগল যখন মানুষের ভাষায় আবোল-তাবোল বলে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন..."

কর্নেলের কথার ওপর বললুম, "আপনি ভদ্রলোকের কথা বিশ্বাস করেছেন দেখছি।"

"হুঁউ, করেছি।"

হতভম্ব হয়ে বললুম, "কী আশ্চর্য! ছাগল শুধু ব্যা করে শুনেছি।"

"ব্যা-করণ রহস্য ডার্লিং! ব্যাকরণ রহস্যও বলতে পারো।"

"কী বলছেন! ওঁর হাবভাব কথাবার্তা শুনেও ওঁকে বদ্ধ পাগল মনে হল না আপনার?"

কর্নেল হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে চোখ বুজলেন। আপনমনে বলতে থাকলেন, "ছাগলটা কালো। কালো যা কিছু, মানুষের কাছে তাই অশুভ। কারণ কালো রং অন্ধকারের প্রতীক। অন্ধকারে মানুষ নিজেকে অসহায় মনে করে। তা ছাড়া কালোর সঙ্গে মৃত্যুর সম্পর্ক আছে ধরে নিয়েই যেন কালো শোকবস্ত্র পরার প্রথা...হুঁ, বিজ্ঞানীরাও এই কুসংস্কার থেকে মুক্ত নন। 'ব্ল্যাক হোল' কথাটিতে সেটা স্পষ্ট। নক্ষত্রের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত এই টার্ম। ...যাই হোক, কালো ছাগলটা আবার কিনা একটা পোড়োবাড়ির ভাঙা দেউড়ির মাথায় চড়ে ঘাস-পাতা খায় এবং অদ্ভুত একটা কথা বলে নিপাত্তা হয়ে যায়!"

হালদারমশাই কান দুটো খাড়া করে ওঁর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন। তাঁকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে। বিরক্ত হয়ে বললুম, "আপনি ওই ভদ্রলোকের চেয়ে আরও পাগল!"

"উঁহু, পাগল নয় ডার্লিং, ছাগল," কর্নেল চোখ খুলে বললেন। এবার মুখটা গম্ভীর। "মুরারিবাবু, মুরারিমোহন ধাড়া স্পষ্ট শুনেছেন ছাগলটা তাঁকে কিছু বলছে। একদিন নয়, তি-ন দিন," বলে কর্নেল তিনটে আঙুল দেখালেন।

অমনি হালদারমশাই সশব্দে শ্বাস ছেড়ে বলে উঠলেন, "মনে পড়েছে! মনে পড়েছে!"

জিজ্ঞেস করলুম, "কী হালদারমশাই?"

হালদারমশাই ছটফটিয়ে বললেন, "ওই যে কর্নেল-স্যার তিনখান ফিঙার দ্যাখাইলেন, লগে-লগে কথাখান আইয়া পড়ল।"

কর্নেল বললেন, "ত্রিশূল?"

প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভীষণ হকচকিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। আমিও একটু অবাক। বললুম, "থট-রিডিং, নাকি অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছেন?"

ধুরন্ধর প্রকৃতিবিদ বললেন, "তোমার এই একটা অদ্ভুত স্বভাব জয়ন্ত! তুমি কাগজের খবর লেখো, কিন্তু খবর পড়ো না। ময়রা নাকি সন্দেশ খায় না। যাই হোক, হালদারমশাই, জয়ন্তদের 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকায় আজ যে ভয়ঙ্কর ত্রিশূলের খবর বেরিয়েছে, তার সঙ্গে একটু আগে মুরারিবাবুর আবির্ভাবের সম্পর্ক আছে। না, থট-রিডিং নয়, নিছক অঙ্ক। খবরটার ডেটলাইন হল রূপগঞ্জ। আর মুরারিবাবুর বাড়িও রূপগঞ্জে।"

হালদারমশাই বললেন, "কিন্তু ভদ্রলোক তো ত্রিশূলের ব্যাপারটা বললেন না?"

আমিও বললুম, "শুধু ছাগল-টাগল নিয়েই বকবক করে গেলেন।"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "বেশি উত্তেজনা অনেক প্রাসঙ্গিক কথা ভুলিয়ে দেয়। তা ছাড়া ভদ্রলোক পাগল না হলেও একটু ছিটগ্রস্ত, তাতে সন্দেহ নেই। তবে...হ্যাঁ, উনি ফিরে আসছেন। সিঁড়িতে ভীষণ পায়ের শব্দ আর লিন্ডাদের কুকুরটা আবার চেঁচাচ্ছে! যে কারণেই হোক, কুকুরটা ওঁকে পছন্দ করছে না।" বলে হাঁক ছাড়লেন, "ষষ্ঠী, দরজা খুলে দে।"

কলিং বেল বাজল। বাজল বলা ঠিক হচ্ছে না, বাজতে লাগল। বিরক্তিকর! গ্রামগঞ্জের মানুষ বলে নয়, ছিটগ্রস্ত—তাও বিশ্বাস করি না, বদ্ধ পাগল! কলিং বেল একবার বাজানোই তো যথেষ্ট। যেন কারা তাড়া করেছে কাউকে এবং সে মরিয়া হয়ে কলিং বেলের বোতাম টিপে চলেছে। ষষ্ঠীচরণ ছোট্ট ওয়েটিং-রুমের ভেতর বাঁকা মুখে বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে দেখতে পেলুম। বাইরের লোক এলে ওখানেই বসিয়ে রেখে সে কর্নেল-'বাবামশাই'কে খবর দেয়। আমরা যে বিশাল ঘরটাতে রসে আছি, এটা ড্রইংরুম, তবে জাদুঘর বা প্রত্নশালা-পাঠাগার-গবেষণাগার এসবের একটা বিচিত্র জগাখিচুড়ি।

হ্যাঁ, তিনিই বটে। হুড়মুড় করে পরদা ফুঁড়ে ঢুকেই হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, "আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি।"

কর্নেল বললেন, "ত্রিশূল?"

ভদ্রলোক বললেন, "ত্রিশূল।" তারপর অদ্ভুত খ্যাঁক শব্দে কষ্টকর হাসি হাসলেন। এমন বিদঘুটে হাসি মানুষের মুখে কখনও শুনিনি।

হালদারমশাইয়ের 'ফ্যাঁচ-টা হাসিই বটে। এই 'খ্যাঁক'-টা দাঁত খিঁচুনি।

কর্নেল বললেন, "আপনি বসুন মুরারিবাবু।"

"বসব না। ট্রেন ফেল হয়ে যাবে। তবে আপনি স্যার, সত্যিই অন্তর্যামী। নকুলদার কথা বর্ণে-বর্ণে মিলে গেল এতক্ষণে। নকুলদার চেনাজানা ছিলেন বঙ্কুবাবু...বঙ্কুবিহারী ধাড়া স্যার...সম্পর্কে আমার জ্যাঠামশাই হন। ব্রিটিশ আমলে অমন ডাকসাইটে দারোগা আর দুটি ছিল না। তাঁর কাছে নকুলদা আপনার সাঙ্ঘাতিক-সাঙ্ঘাতিক গল্প শুনেছিল। ...তবে স্যার, কালো ছাগলটারও একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেল। ছাগলটার তিনটে শিং। তার, তিরিশ ফুট উঁচু দেউড়ির মাথায় ওঠে কী করে? ...আর স্যার...হ্যাঁ, মনে পড়েছে! কাছেই শিবমন্দিরটা। তার মাথায় ত্রিশূল। ...সেও তিন, এও তিন...তিন তিরিক্কে নয়...নয়-নয়ে একাশি...। ...কালো ছাগলটা স্পষ্ট বলেছে 'একাশি', বুঝুন স্যার! এক প্লাস আশি, একাশি। এক বাদ দিলে রইল আশি। আশির শূন্য বাদ দিন। রইল আট। এবার ওই বাদ দেওয়া এক-কে আটের সঙ্গে যোগ করুন, আবার নয় পাচ্ছেন। তিন তিরিক্কে নয়। ছাগলের তিনটে শিং আর মন্দিরের মাথায় তিনটে শিং। গুণ করলে নয় পাচ্ছেন না কি?...আমি আসি স্যার! ট্রেন ফেল হবে," বলে মুরারিবাবু ঘুরেই পা বাড়ালেন।

কর্নেল বললেন, "ত্রিশূলটা, মুরারিবাবু!"

"ও, হ্যাঁ! ত্রিশূলটার কথা বলা হল না। মাথার ঠিক নেই স্যার!" মুরারিবাবু নিজের মাথায় গাঁট্টা মেরে একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেন। "কালো ছাগলটা পরপর তিনদিন আমাকে বলেছে, একাশি। চারদিনের দিন রাত্তিরে দেখি, সেই দেউড়ির নীচে ঘাসের ওপর নকুলদা মরে পড়ে আছে। পিঠে তিনটে ক্ষত। রক্ত শুকিয়ে গেছে। চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করলুম। তারপর স্যার আশ্চর্য ঘটনা...মন্দিরের ত্রিশূলে রক্ত...কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! পুলিশ এল। কিন্তু কিছুই হল না। ...চলি স্যার! ট্রেন ফেল হবে।"

হালদারমশাই সোজা টানটান হয়ে বসে কথা শুনছিলেন। অভ্যাসমতো বলে উঠলেন, "রহস্য! প্রচুর রহস্য!"

কর্নেল বললেন, "মুরারিবাবু! পুলিশকে কালো ছাগলটার কথা বলেছেন কি?"

মুরারিবাবু ততক্ষণে ওয়েটিং-রুমটাতে ঢুকে গেছেন। সেখান থেকেই জবাব দিলেন, "বলেছি। দারোগাবাবু বললেন, মেন্টাল হসপিটালে ভর্তি হোন। ...শুনে বেজায় রাগ হল বলেই আপনার কাছে...নাঃ, ট্রেন ফেল হবে।"

মুরারিবাবু সশব্দে বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। সিঁড়িতে তেমনি জুতোর শব্দ এবং কুকুরের চেঁচানি শোনা যাচ্ছিল। কর্নেল হাঁকলেন, "ষষ্ঠী, দরজা বন্ধ করে দে।"

হালদারমশাই নড়েচড়ে বসে আবার একটিপ নস্যি নিলেন। তারপর গম্ভীর মুখে বললেন, "তখন শুধু ছাগল ছিল। এবার এল মার্ডার। কাগজে ছাগল-টাগলের কথা লেখেনি। তবে ত্রিশূলে রক্তের দাগ আর ডেডবডির পিঠে তিনটে ক্ষতচিহ্নের কথা লিখেছে। মন্দিরে পুজো বন্ধ ছিল। আবার ঘটা করে ঢাকঢোল পুজোআচ্ছা পাঁঠাবলির কথা লিখেছে। রীতিমতো রহস্য।"

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, "ব্যা-করণ কিংবা ব্যাকরণ রহস্য।"

আমি অবাক হয়ে বললুম, "বারবার এ-কথাটা বলার কারণ কী?"

"তুমি কি ব্যাকরণ পড়োনি ডার্লিং?"

"স্কুলে পড়েছি। কিন্তু এখানে ব্যাকরণ আসছে কী সূত্রে?"

"সন্ধি, জয়ন্ত, সন্ধি! এক এবং আশি এই দুটো শব্দ সন্ধি করলে একাশি হয়।"

ষষ্ঠী ট্রে'তে কফি আর স্ন্যাকস্ রেখে গেল। কর্নেল তার উদ্দেশে বললেন, "শিগগির ছাদে যা তো ষষ্ঠী! কাকের ঝগড়া শুনতে পাচ্ছি! ফের কোনো ক্যাকটাসের ভেতর কার ঠোঁট থেকে মরা ইঁদুর পড়ে গেছে হয়তো।"

ষষ্ঠী ছাদের সিঁড়ির দিকে ছুটল। এই ঘরের কোণা থেকে এঁকেবেঁকে সিঁড়িটা ছাদে কর্নেলের শূন্যোদ্যানে উঠে গেছে। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "রূপগঞ্জের ওদিকে এক জাতের অর্কিড দেখেছিলুম। এনে বাঁচাতে পারিনি। 'রেনবো অর্কিড' নাম দিয়েছিলুম। রামধনুর মতো সাতরঙা ফুল ফোটে। মোট তিনটে পাপড়ি। মাই গুডনেস!" কর্নেল নড়ে বসলেন। "আবার সেই তিন...তিন তিরিক্কে নয়...নয়-নয়ে একাশি। কালো ছাগলের ব্যা-করণ!"

হেসে ফেললুম, "মুরারিবাবু এ-ঘরে এক খাবলা পাগলামি রেখে গেছেন। আপনার মাথায় সেটা ঢুকে পড়েছে।"

হালদারমশাইকে প্রচণ্ড উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। কফির পেয়ালায় পুনঃ পুনঃ ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে দ্রুত গিলে ফেলার চেষ্টা করছিলেন। বললেন, "ছাগলেরও তিনটে শিং! বোকা বানিয়ে চলে গেল। পাগল না সেয়ানা পাগল। ...অরে ফলো করুম। কর্নেল-স্যারের লগে ফাইজলামি?"

কর্নেল বললেন, "তার আগে একটু ব্যাকরণচর্চা করে নিন, হালদারমশাই!"

"ক্যান?" হালদারমশাইয়ের চোখ দুটো গোলাকার দেখাল।

"ছাগল কোন লিঙ্গ জানেন তো?"

আমি ঝটপট বললুম, "স্ত্রীলিঙ্গ। পুংলিঙ্গে পাঁঠা।"

কর্নেল চোখ পাকিয়ে বললেন, "তোমাদের কাগজের লোকেদের নিয়ে এই এক জ্বালা। সুকুমার রায়ের হাঁসজারু! ব্যাকরণ মানো না। ছাগল পুংলিঙ্গ এবং তার দাড়িও থাকে।" বলে হালদারমশাইয়ের দিকে ঘুরলেন। এবার মুখে অমায়িক ভাব। "হালদারমশাই, কথাটা মনে রাখবেন। ছাগল পুংলিঙ্গ। কাজেই তার দাড়ি থাকে। রূপগঞ্জে শিবমন্দিরে যে চারঠেঙে জীবগুলো বলি দেওয়া হচ্ছে, সেগুলোর দাড়ি আছে, এটা ইমপর্ট্যান্ট।"

"হঃ!" কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার রূপগঞ্জের মুরারিমোহন ধাড়ার দ্বিগুণ জোরে বেরিয়ে গেলেন।

চুপচাপ কফি খাওয়ার পর বললুম, "আপনার কথাটাও সুকুমার রায়ের সেই বদ্যিবুড়োর পদ্যটার মতো হল, যে নাকি হাত দিয়ে ভাত মেখে খেত এবং খিদে পেত বলেই খেত। আশ্চর্য! দাড়িওলা ছাগলকেই তো লোকে পাঁঠা বলে এবং শুধু পাঁঠাই বলি হয়।"

"অবশ্যই!" কর্নেল দাড়ি নেড়ে সায় দিলেন। "ছাগলি বলিদান শাস্ত্রমতে চালু নয়।"

"তা হলে কথাটা ইমপর্ট্যান্ট বলার কারণ কী?"

"একাশির হ্যাপা। সন্ধিবিচ্ছেদ করা কতকটা ধড় আর মুণ্ডু আলাদা হওয়ার মতো। বলিদান হলেই প্রব্লেম!" কর্নেল ঘনঘন দাড়িতে হাত বুলোতে শুরু করলেন। "হুঁ, ফের সুকুমার রায় এসে যাচ্ছেন। 'গোঁফচুরি' পদ্যটা। 'গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা।' এক্ষেত্রে দাড়ি দিয়ে চেনার একটা ব্যাপার আছে। সব দাড়ি একরকম নয়, ডার্লিং! আমার মনে হচ্ছে, ছাগলটার দাড়ি তাকে বাঁচাতে পারত—কিন্তু তার তিনটে শিং নিয়েই সমস্যা।"

কর্নেল হঠাৎ উঠে পায়চারি শুরু করলেন এবং রূপগঞ্জের ওই ছিটগ্রস্ত ভদ্রলোকের মতো এলেবেলে কথাবার্তা বিড়বিড় করে বলতে থাকলেন। "...বলির জন্তুর কোনো খুঁত থাকা শাস্ত্রসিদ্ধ নয়। কিন্তু তিনটে শিং থাকাটা কি খুঁত? ও-তল্লাটে শাস্ত্রজ্ঞ বামুন আছেন অনেক। শিবমন্দিরের ছড়াছড়ি...ধ্বংসস্তূপ...জঙ্গল...ঢিবি...শৈবযুগে এক রাজাও ছিলেন দেখলুম। শিবসিংহ!"

অমনি লেখাপড়ার টেবিলের সেই প্রকাণ্ড বইটার দিকে চোখ গেল। বাদামি চামড়ায় বাঁধানো পুস্তকখানিতে সোনালি হরফে লেখা আছে, 'Ancient Kingdoms of Bengal, Vol. I'.

একটু হেসে বললুম, "তাহলে এখানেও শিং এসে যাচ্ছে। একটা পপুলার বাংলা গান শুনেছি, 'শিং নেই তবু নাম তার সিংহ/ডিম নেই তবু অশ্বডিম্ব...' তাতে 'ভ্যাবাচাকা' কথাটাও ছিল মনে পড়ছে।"

কর্নেল আমার দিকে ঘুরে বললেন, "রেনবো অর্কিড, ডার্লিং! তুমি তো আকাশে রামধনু দেখেছ। পৃথিবীতে রামধনু... শ'য়ে-শ'য়ে রামধনু দেখতে হলে রূপগঞ্জে চলো। গেঁয়ো যোগী ভিক্ষে পায় না বলে একটা কথা আছে। রূপগঞ্জের লোকেরা রেনবো অর্কিডের কদর বোঝে না। চোখ জ্বলে যায়, জয়ন্ত। কী অসাধারণ সৌন্দর্য এই এপ্রিলে!"

"তার মানে, আপনি যাচ্ছেন এবং আমাকেও তাতাচ্ছেন!"

কর্নেল টেলিফোনের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, "রূপগঞ্জ নামটা যাঁর মাথা থেকে বেরিয়েছিল, তিনি নিঃসন্দেহে সৌন্দর্যরসিক। শুধু কি রেনবো অর্কিডের ফুল? প্রজাপতিও। আর সেই প্রজাপতির ডানায় রামধনুর সাতরঙা সৌন্দর্য! দুঃখের কথা, ডার্লিং! রেনবো অর্কিড এনে বাঁচাতে পারিনি। তার চেয়ে আরও দুঃখ প্রজাপতিগুলো এত চালাক যে, একটাও নেটে আটকাতে পারিনি।"

ফোনে হাত বাড়াতে গিয়ে ডাইনে দরজার দিকে প্রায় ঝাঁপ দিলেন কর্নেল। কী একটা জিনিস তুলে নিলেন মেঝের কার্পেট থেকে।

একটা ছোট্ট গোল কালচে রঙের খয়াটে চাকতি।

বললুম, "কী ওটা?"

কর্নেল টেবিলের ড্রয়ার থেকে আতস কাচ বের করে দেখতে দেখতে বললেন, "প্রাচীন যুগের মুদ্রা অথবা সিল। পরিষ্কার করলে বোঝা যাবে। মনে হচ্ছে, মুরারিবাবুর হাতেই এটা ছিল। দেখাতে এনেছিলেন। ট্রেন ফেলের ভয়ে তাড়াহুড়োয় হাত থেকে পড়ে গেছে। কার্পেটে পড়ার জন্যই শব্দ হয়নি। তবে...ওই! আবার উনি আসছেন। জয়ন্ত, দরজা খুলে দাও, প্লিজ!"

ফের নীচের দোতলায় কুকুরের চ্যাঁচামেচি, বিচ্ছিরি জুতোর শব্দ। ভদ্রলোক ছিটগ্রস্ত নন, বদ্ধ পাগলই। বাইরের দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে দেখলুম, কলিং বেলের দিকে ওঠানো হাত সটান নেমে গেল এবং সেই বিদঘুটে খ্যাঁক হেসে আমাকে ঠেলে ঢুকে পড়লেন। আগের মতো হাঁসফাঁস করে বললেন, "আবার ভুল! আসলে মাথার ঠিক নেই। ওদিকে ট্রেনের সময় হয়ে গেছে...কোথায় যে জিনিসটা হারিয়ে ফেললুম, কে জানে...হাতেই ছিল..."

"চাকতি?" কর্নেল জিনিসটা দেখালেন।

মুরারিবাবুর মুখে স্বস্তি ফুটে উঠল। "পেয়েছেন? বাঁচলুম তা হলে। যাই, ট্রেন ফেল হবে," বলে ঘুরে পা বাড়ালেন।

কর্নেল বললেন, "মুরারিবাবু, এটা কোথায় পেয়েছেন?"

মুরারিবাবু না ঘুরে জবাব দিলেন, "নকুলদার হাতের মুঠোয়। পুলিশকে বলিনি। ...ট্রেন ফেল হবে।"

তারপর অদৃশ্য হলেন। ফের সিঁড়িতে শব্দ, কুকুরের চ্যাঁচানি। দরজা বন্ধ করে ড্রইং-রুমে ফিরে দেখি কর্নেল একটা শিশিতে ছোট্ট বুরুশ চুবিয়ে চাকতিটাতে খুব ঘষাঘষি করছেন। সোফায় বসে ওঁর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ করতে থাকলুম। একটু পরে ষষ্ঠী শূন্যোদ্যান থেকে নেমে একগাল হেসে ঘোষণা করল, "না বাবামশাই! মরা ইঁদুর নয়, খামোকা ঝগড়া। আপনাকে বলি না কাকেরা বড্ড ঝগড়াটে।"

'বাবামশাই' কান করছেন না দেখে সে আমার উদ্দেশে বলল, "বুঝলেন দাদাবাবু? যার ওপরটা কালো, তার ভেতরটাও কালো। কালো বেড়াল, কালো কুকুর...আপনারা কালো ছাগলের কথা বলছিলেন, কানে আসছিল। বড্ড গণ্ডগুলে স্বভাব, দাদাবাবু! দোতলার মেমসায়েব একটা কালো কুকুর পুষেছেন। খালি চ্যাঁচায়। ওই সিঙ্গিবাবুদের একটা কালো ময়না আছে। আমাকে দেখলেই ইংরিজিতে গাল দেয়..."

কর্নেল মুখ তুলে তার দিকে চোখ কটমটিয়ে তাকাতেই ষষ্ঠী কেটে পড়ল।

দেখলুম, খয়াটে চাকতিটা মোটামুটি সাফ হয়েছে। "সোনা না পিতল?" জিজ্ঞেস করলুম।

কর্নেল চাকতিটাতে চোখ রেখে বললেন, "তুমি সাংবাদিক হলে কী করে জানি না। আজকাল খাঁটি সাংবাদিক হতে হলে 'জ্যাক অব অল ট্রেড' হওয়া দরকার। কিন্তু হোপলেস জয়ন্ত। সোনা বা পিতল অন্তত চেনা উচিত। এটা ব্রোঞ্জ! হ্যাঁ, পুরোনো সোনা অনেক সময় একটুখানি তামাটে দেখায়। কিন্তু এত বেশি তামাটে নয়।" বলে উঠে গেলেন। বইয়ের ঝাঁক থেকে আবার একটা বিশাল বই নিয়ে এলেন।

গতিক বুঝে বললুম, "চলি। আজ মুখ্যমন্ত্রীর প্রেস কনফারেন্স। একটু তৈরি হয়ে যাওয়া দরকার।"

কর্নেল হাসলেন। "মোটা বই দেখে ভয় পাওয়ার কারণ নেই, ডার্লিং! মাথার সাইজ মোটা হলেই যেমন বিদ্যাসাগর হওয়া যায় না, মোটা বই মাত্রই তেমনি বিদ্যার সাগর নয়। মোটা মানুষ হলেই তাকে স্বাস্থ্যবান বলা যাবে? বরং মজার ব্যাপারটা দ্যাখো জয়ন্ত! বোকাদেরই আমরা মাথামোটা বলি। অথচ মোটা যা কিছু, তার প্রতি আমাদের ভয়-ভক্তি প্রচুর...এই বইটার সাইজ মোটা। প্রচুর বাক্য ছাপা আছে। কিন্তু আমার দেখার বিষয় হল এর ফোটোগ্রাফগুলো। এক মিনিট! চাকতিটার সঙ্গে মিলিয়ে নিই।"

বুঝলুম, বইটা প্রাচীন মুদ্রা এবং সিল সম্পর্কে কোনো পণ্ডিতের গবেষণার ফলাফল। ধৈর্য, নিষ্ঠা আর হাতে সময় না থাকলে এমন জিনিস তৈরি করা যায় না। কিন্তু তার চেয়ে বড় ঘটনা হল, রূপগঞ্জের ব্যা-করণ রহস্য যা ব্যাকরণ রহস্য—কর্নেল যাই বলুন, ভীষণ জট পাকিয়ে গেল যে!

কর্নেল বই বন্ধ করে রেখে চাকতিটাকে আবার আতসকাচে পরীক্ষা করতে থাকলেন। তারপর নিভন্ত চুরুটটি জ্বেলে বললেন, "হালদারমশাইয়ের ভাষায় বলতে গেলে প্রচুর রহস্য, প্রচুর।"

"জিনিসটা কী?"

"পুরোনো মুদ্রা। কিন্তু আশ্চর্য, এতে একটা তিন-শিংওয়ালা ছাগলের মূর্তি খোদাই করা আছে!"

"বলেন কী!" বলে কর্নেলের কাছে গিয়ে চাকতিটা দেখলুম। আবছা একটা ছাগল জাতীয় প্রাণীর মূর্তি দেখা যাচ্ছে। মাথায় ত্রিশূলের মতো তিনটে শিং, কী সব দুর্বোধ্য লিপিও খোদাই করা রয়েছে।

কর্নেল বললেন, "এও আশ্চর্য, বিস্তর প্রাণী দেবদেবী হিসেবে বা দেবদেবীর বাহন হিসেবে মানুষের পুজো পেয়েছে। কিন্তু ছাগল? সে তো বলির প্রাণী।"

কর্নেল চোখ বুজে দাড়িতে হাত বুলোতে থাকলেন। বললুম, "সে যাই হোক, আমার ভাবনা হচ্ছে হালদারমশাই মুরারিবাবুকে মিস করেছেন। তবে মিস করুন বা নাই করুন, রূপগঞ্জে উনি যাবেনই এবং এও ঠিক, গণ্ডগোলে পড়বেন। ওঁর যা স্বভাব। রহস্যের গন্ধ পেলেই হল। আসলে পুলিশের চাকরি থেকে রিটায়ার করে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন, কিন্তু মক্কেল জোটে না। কাজেই যেচে মক্কেল জোটাতে ছাড়েন না। পকেট থেকে ট্রেন-ভাড়া দিয়েও যাওয়া চাই।"

"জয়ন্ত, আমরাও ট্রেনে যাব।" কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। "গত এপ্রিলে গাড়ি নিয়ে গিয়ে বড্ড ঝামেলায় পড়েছিলুম। জায়গায়-জায়গায় রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। ট্রেনই ভালো। শুধু একটাই অসুবিধে। পরের ট্রেনে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে যাবে। প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে ইরিগেশন বাংলো। চড়াই রাস্তা বলে সাইকেল-রিকশা মেলে না—সে তুমি যত টাকাই ভাড়া দাও না কেন। একটা ভরসা ঘোড়াগাড়ি। কিন্তু রাতবিরেতে ঘোড়াগাড়ি পাওয়ার চান্স কম। ...হুঁ, ডি ই ভদ্রলোককে বললে জিপের ব্যবস্থা হতে পারে। তাঁকে টেলিফোনে পাওয়া সমস্যা। তবে কলকাতা হেডকোয়ার্টার থেকে বাংলো বুক করার অসুবিধে নেই। দেখা যাক।"

উনি টেলিফোনের দিকে উঠে গেলেন। বললুম, "হালদারমশাইয়ের মতো তাড়াহুড়ো না করলেই কি নয়? আগামীকাল সকালের ট্রেনে গেলে ক্ষতি কী?"

কর্নেল মুখটা যথেষ্ট গম্ভীর করে বললেন, "ক্ষতি মুরারিবাবুরই হওয়ার চান্স বেশি। ভদ্রলোক একেবারে ছিটগ্রস্ত। আমার খুব ভয় হচ্ছে জয়ন্ত..." কথা শেষ না করে কর্নেল ফোন তুলে ডায়াল করতে থাকলেন।

দুই

ট্রেন, না ছ্যাকরা গাড়ি! স্টেশনেও থামছে, আবার যেখানে স্টেশন নেই, সেখানেও থামছে। আর যখনই থামছে, নড়তেই চায় না। চাকাগুলোর শব্দে বড় অনিচ্ছা বিরক্তির প্রকাশ। আমাদের দু'জনের জন্য রিজার্ভ-করা ক্যুপে-তে কর্নেল এক উটকো যাত্রী ঢুকিয়েছিলেন। বর্ধমান স্টেশনে সন্ধ্যা নাগাদ এঁর হন্তদন্ত আবির্ভাব। যাবেন রূপগঞ্জে। নাদুসনুদুস বেঁটে গড়নের লোক। এক হাতে ফোলিও ব্যাগ, অন্য হাতে খবরের কাগজে জড়ানো চৌকো বোঁচকা, পরে দেখলুম সেটা একটা বিছানা। ট্রেনে কোথাও নাকি পা রাখবার জায়গা নেই। কাকুতি-মিনতি করে কর্নেলকে গলিয়ে জল করে ফেলেছিলেন প্রায়, আমি প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়েছিলুম। তারপর একটি কার্ড আমাকে ধরিয়ে দিলে আমার আপত্তিও গলে জল হল। অর্থাৎ না করতে পারলুম না। কার্ডে ছাপানো আছে, ডঃ টি. সি. সিংহ। তারপর আমার জানা-অজানা দিশি-বিদিশি ডিগ্রির লেজুড়, এই ট্রেনটার মতোই লম্বাটে। কিন্তু আর যা সব লেখা আছে, তাতে বোঝা যায় ইনি মস্ত বিদ্যাবাগীশ পণ্ডিত। প্রত্নবিদ্যা, নৃবিদ্যা, ভাষাবিদ্যা থেকে শুরু করে এমন বিদ্যা নেই, যা এঁর অজানা। তার প্রমাণও পাচ্ছিলুম হাড়ে-হাড়ে। কান ভোঁভোঁ করছিল। কর্নেল কিন্তু বিরক্ত হওয়া দূরের কথা, মনোযোগী ছাত্রের মতো শুনছেন আর সায় দিচ্ছেন। শুধু সায় দিচ্ছেন বলা ভুল হল, প্রশ্নও করছেন। বার্থে চিত হয়ে শুয়ে পড়েছিলুম। ওদিকের বার্থে জানালার পাশে হেলান দিয়ে কর্নেল বসে আছেন এবং তাঁর পাশে পণ্ডিতমশাই। কানে এল, কর্নেল জিজ্ঞেস করছেন, "আচ্ছা ডঃ সিংহ, ট্রেনের সঙ্গে স্ট্রেইনের কোনো সম্পর্ক আছে কি, মানে ভাষাতাত্ত্বিক সম্পর্ক?"

"আছে। বিলক্ষণ আছে। প্রথমে ধরুন ট্রেন শব্দটা। এর আক্ষরিক অর্থ কিছু টেনে নিয়ে যাওয়া। টে-নে!" ডঃ সিংহ নড়ে বসলেন। "বাংলা টান শব্দটা দেখুন। টে-নে নিয়ে যাওয়া। টানাটানি সহজ কাজ নয়, কষ্টকর। স্ট্রেইন শব্দের আক্ষরিক অর্থও কষ্টে টেনে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু এ থেকে কী বেরিয়ে এল দেখুন! ইংরেজি ট্রেন আর বাংলা টান একই শব্দের দুটো রূপ। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে, আমরা বাঙালিরা এবং ইংরেজরা একই জানো।"

কর্নেল প্রশ্ন করলেন, "শিং-এর সঙ্গে সিংহের সম্পর্ক আছে কি?"

"অ্যাঁ?" পণ্ডিতমশাই হকচকিয়ে গেলেন। তারপর হোহো করে হেসে বললেন, "আপনার রসবোধ আছে। উগাণ্ডার বুগাণ্ডা মিউজিয়ামে যখন ডিরেক্টর ছিলুম, ডঃ হোয়াংহলা হোটিটি প্রায় ঠাট্টা করে বলতেন, সিংহকে আমরা বলি শিম্‌বা। তোমার পূর্বপুরুষ নিশ্চয় আফ্রিকান ছিলেন।

...হ্যাঁ, আপনার প্রশ্নটা ভাববার মতো। শিং এসেছে সংস্কৃত শৃঙ্গ থেকে। যা উঁচুতে থাকে। যেমন পর্বতশৃঙ্গ। পর্বতশৃঙ্গের ছবি দেখবেন, কেমন ছুঁচলো—খোঁচার মতো। আকাশকে যেন গুঁতোচ্ছে। তাই না? তবে সিংহ, সিংহের স্থানও জন্তুদের মধ্যে উঁচুতে। তার মানেটা দাঁড়াচ্ছে, দুটো শব্দেই উচ্চতা বোঝাচ্ছে, আবার হিংস্রতাও বোঝাচ্ছে। শৃঙ্গী জন্তু গুঁতো মারে, আর সিংহ মারে থাবা।"

"শিংওয়ালা জন্তুর গুঁতোয় মানুষ মারা পড়ে, শুনেছি।" কর্নেল বললেন। "রূপগঞ্জে নাকি ছাগলের গুঁতোয় একটা মানুষ মারা পড়েছে। শুনে একটু অস্বস্তি হচ্ছে।"

ডঃ সিংহ ভুরু কুঁচকে বললেন, "ছা-ছাগল...কথাটা কে বলল বলুন তো? কাগজে তো অন্য খবর পড়েছি। প্রাচীন শিবমন্দিরের ত্রিশূলে...হ্যাঁ, আসল কথাটা তা হলে খুলেই বলি। ওই শিবমন্দিরটা পাথরের, বুঝলেন? গত মাসে একবার গিয়ে দেখে এসেছি। আমার ধারণা, ওটা অন্তত দেড় থেকে দু'হাজার বছরের পুরনো। শৈব রাজাদের রাজধানী ছিল রূপগঞ্জ। নদীর নামটা সেই স্মৃতি বহন করছে—শৈব্যা! জঙ্গলের ভেতর ঢিবি, পাথরের স্তম্ভ। শৈব্যাও অনেক স্মৃতিচিহ্ন গ্রাস করেছে। রাক্ষুসি নদী মশাই, শৈব্যা!"

"ব্যা-করণ!" কর্নেল কথাটা বলেই চুরুট জ্বালতে ব্যস্ত হলেন।

ডঃ সিংহ বললেন, "কী, কী? ব্যাকরণ..." বলেই আবার একচোট হাসলেন। "আপনার রসবোধ আছে! শৈব্যাতে ব্যা আছে বটে।"

"ছাগলও ব্যা করে।" একরাশ চুরুটের ধোঁয়ায় কর্নেলের মুখ আবছা হয়ে গেল।

ডঃ সিংহের মুখে কেমন যেন সন্দিগ্ধ ভাব, ফের ভুরু কুঁচকে বললেন, "আপনার এই ছাগলের ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে, ছাগলের কথা কে বলল আপনাকে, মানে, ছাগলের গুঁতোয় মানুষ মারা পড়ার কথা?"

কর্নেল বললেন, "হাওড়া স্টেশনে একদল লোক বলাবলি করছিল। আচ্ছা, ডঃ সিংহ, ছাগল এবং পাগলে কোনো ভাষাতাত্ত্বিক সম্পর্ক আছে কি?"

ডঃ সিংহ হাসতে গিয়ে হাই তুলে বললেন, "আপনার রসবোধ অতুলনীয়। তো যদি কাইন্ডলি, অনুমতি দেন, আমি এখানেই একটু গড়িয়ে নিই। এখনও দু'ঘণ্টা থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগবে। বিচ্ছিরি ঘুম পাচ্ছে।"

বলে অনুমতির তোয়াক্কা না করে সেই কাগজে-জড়ানো বোঁচকাটি খুললেন এবং কর্নেলকে আরও কোণঠাসা করে শতরঞ্জি-চাদর-বালিশ সাজিয়ে চিত হলেন। বেঁটে হওয়ার দরুন শোয়াটি বেশ পুরোপুরি হল। কর্নেলের চোখে আমার চোখ পড়ল। কর্নেল মিটিমিটি হাসছেন। একটু পরে বললেন, "ডঃ সিংহ কি ঘুমিয়ে পড়লেন?"

"উঃ...হ্যাঁ—না...কী?"

"আপনার পুরো নামটি জানতে ইচ্ছে করছে।"

"তি-তিনকড়িচন্দ্র সিংহ।" বলে পণ্ডিতপ্রবর নাক ডাকাতে শুরু করলেন। আমি তো থ। এরকম ঘুম কখনও কাউকে ঘুমোতে দেখিনি, এক কর্নেল বাদে।

"আবার তিন!" কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন। "তিন তিরেক্কে নয়। নয়-নয়ে একাশি।"

নাকডাকা বন্ধ হল। চোখও খুলে গেল। শিবনেত্র হয়ে বললেন, "কী, কী?"

"কিছু না। আপনি ঘুমোন।" কর্নেল বললেন। "আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছি।"

আবার নাক ডাকতে থাকল।

কর্নেল বললেন, "বুঝলে জয়ন্ত, অ্যাস্ট্রোলজি বা জ্যোতিষের মতো সংখ্যাতত্ত্ব বলে একটা শাস্ত্র আছে। না, স্ট্যাটিসটিক্স নয়, নিউমারোলজি। অ্যাস্ট্রোলজির আওতায় পড়ে এটা। সংখ্যারও নাকি শুভাশুভ আছে। নাম, জন্মের সন-মাস-তারিখ, এসব থেকে সংখ্যা বের করে ভূত-ভবিষ্যৎ জানা

যায় শুনেছি। তো দ্যাখো, ছাগল আর পাগল, শুধু ব্যঞ্জনবর্ণই ধর্তব্য, তিনটি সংখ্যার শব্দ। এও তিন তিরেক্কে নয়। নয়-নয়ে একাশি, সেই ছাগলীয় একাশি। তারপর ইনি বললেন, রূপগঞ্জের নদীটার নাম শৈব্যা, আমি তো শুনেছিলুম 'শোভানদী', রূপগঞ্জের পাশে সুন্দর ফিট করে যায়। কিন্তু ইনি পণ্ডিত মানুষ, বিশেষ করে পুরাতাত্ত্বিক। কাজেই নদীটা নিশ্চয় প্রাচীন যুগে 'শৈব্যা' ছিল। শিবসিংহের রাজধানীর পাশে শৈব্যা নদী ফিট করে যায়। যাই হোক, এখানেও একটা ব্যাকরণঘটিত ব্যাপার দেখা যাচ্ছে। ব্যা-করণ রহস্য, ডার্লিং! ছাগলের আদি-অকৃত্রিম ল্যাঙ্গোয়েজ, ব্যা!"

অসহ্য। কাঁহাতক আর বকবক ভালো লাগে। চোখ বুজেছিলুম। তারপর কখন যেন ঘুমিয়েও পড়েছিলুম। চলমান যানবাহনে মানুষের ঘুম পায় কেন, এ-নিয়ে বিজ্ঞানীরা নিশ্চয় গবেষণা করে থাকবেন।

হঠাৎ কী-সব শব্দ এবং আমার পায়ের ওপরও ভারী কিছু পড়ল। চোখ খুলেই ভীষণ হকচকিয়ে গেলুম। আতঙ্কে মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! মারদাঙ্গার ফিল্মে অবিকল যেমনটি দেখা যায়।

আমার পায়ের ওপর বসে পণ্ডিতপ্রবর কর্নেলের সঙ্গে হাতাহাতি করছেন। হাতাহাতি কী বলছি! পণ্ডিতের হাতে একটা ছোরা, কর্নেল সেই হাতটা নিজের দু'হাতে ধরে মোচড় দিচ্ছেন।

মাত্র এক সেকেন্ডের দৃশ্য। পায়ে বেঁটে গাব্দাগোব্দা ওজনদার কিছু চাপানো থাকলে ওঠা কঠিন। অগত্যা পা দুটো যথাশক্তি নাড়া দিলুম। একই সঙ্গে ছোরাটাও ঠকাস করে মেঝেয় পড়ে গেল এবং ডঃ তিনকড়িচন্দ্র সিংহ কর্নেলের পেটে ঠিক ছাগলের মতোই ঢুঁ মারলেন। কর্নেল গুঁতো খেয়ে একটু পিছিয়ে গেছেন, পণ্ডিত হাত বাড়িয়ে নিজের ফোলিও ব্যাগটা নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে নীচে ঝাঁপ মারলেন।

ট্রেনের গতি খুব কম। দাঁড়ানোর মুখে বলে মনে হচ্ছিল। পায়ে ব্যথার দরুন উঠতে একটু সময় লাগল। কর্নেল ততক্ষণে ছোরাটা কুড়িয়ে নিয়েছেন এবং দরজায় উঁকি দিচ্ছেন। বাইরে বিদ্যুতের আলো। তা হলে কোনো স্টেশন আসছে। মালগাড়ি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার মুখে কথা নেই। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। কর্নেল ক্লান্তভাবে একটু হাসলেন, "লোকটা বিছানা ফেলে গেল!" বলে বিছানাটা গুটোতে থাকলেন। "রেডি হও, ডার্লিং! রূপগঞ্জ এসে গেছে!"

ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললুম, "কী সাঙ্ঘাতিক!"

"হ্যাঁ, সাঙ্ঘাতিক।" কর্নেল আস্তে বললেন। "আমি ঘুমের ভান করে নাক ডাকাচ্ছিলুম। চোখের ফাঁক দিয়ে দেখি, লোকটা আসলে ঘুমোয়নি। আমার মতোই ঘুমনোর ভান করছিল। হঠাৎ চোখ খুলে আমাকে আর তোমাকে দেখে নিল। তারপর সাবধানে উঠে ছিটকিনিটা সরিয়ে দরজা হাট করে খুলে দিল। আমার ভুল হল, রিভলভারটা বের করিনি সঙ্গে-সঙ্গে। ও কী করে, দেখতে চেয়েছিলুম। বাঙ্ক থেকে আমার কিটব্যাগ নামিয়ে চেন খুলে তন্নতন্ন করে কী খুঁজল। না পেয়ে রেখে দিল। তারপর স্যুটকেসটা নামাতে যাচ্ছে, তখন মনে হল, আর চুপ করে থাকা ঠিক হচ্ছে না। যেই বলেছি, "ডঃ সিংহ কি কিছু খুঁজছেন" অমনি এই ছোরা বের করে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাগ্যিস, ওই সময় ট্রেন লাইন বদল করছিল! খুব নড়ছিল এই ক্যুপেটা। টাল খেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। আমি সেই সুযোগে ওর ছোরা-ধরা হাতটা দু'হাতে চেপে ধরে ঠেলে দিলুম। লোকটা তোমার পায়ের ওপর পড়ল। কিন্তু গায়ে কী প্রচণ্ড জোর! কুস্তিগির পালোয়ান একেবারে!"

উঠে দাঁড়িয়ে দুই ঠ্যাং নাড়া দিয়ে রক্ত-চলাচল ঠিক করে নিয়ে বললুম, "আপনাকে আপত্তি জানিয়েছিলুম, আপনি শুনলেন না। এবার বুঝুন উটকো লোক ঢুকিয়ে কী বিপদ বাধিয়েছিলেন!"

কর্নেল চুরুট বের করে জ্বেলে বললেন, "লোকটা জাল ডঃ টি. সি. সিংহ, জয়ন্ত! ডঃ সিংহকে

আমি চিনি। তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান অধ্যাপক। বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত। এই লোকটাকে ক্যুপেতে জায়গা দেওয়ার কারণ ছিল। ...চলো, দেখি ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার কামালসায়েব জিপ পাঠিয়েছেন কি না। নইলে বরাতে কিছু দুর্ভোগ আছে।"

ট্রেন রূপগঞ্জ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকছিল। রাত প্রায় একটা বাজে।

প্ল্যাটফর্মে নেমে কর্নেল বললেন, "এক মিনিট। তিনকড়িচন্দ্রের বিছানাটা স্টেশনমাস্টারকে জিম্মা দিয়ে আসি। মাইক্রোফোনে ঘোষণা করতেও বলব।"

"এ-বদান্যতার মানে হয় না!" আপত্তি জানিয়ে বললুম। "বরং রেল-পুলিশের কাছে জমা দিন। আর সাঙ্ঘাতিক ঘটনাটা ওদের জানান।"

কর্নেল আমাকে পাত্তা দিলেন না। এত রাতে যাত্রীর সংখ্যা কম। প্ল্যাটফর্মেও নিঝুম খাঁখাঁ অবস্থা। মাঝারি স্টেশন যেমন হয়। একটু গা-ছমছম করছে। কর্নেল যতক্ষণ না ফিরলেন, এদিকে-ওদিকে মুহুর্মুহু তিনকড়িচন্দ্রকে দেখতে পাচ্ছিলুম। বেঁটে হোঁতকা লোক দেখলেই ঘুসি বাগিয়ে রেডি হচ্ছিলুম। তারপর কর্নেল ফিরে এলেন। মুখে শান্ত হাসি। গেটের কাছে পৌঁছলে একজন গুঁফো তাগড়াই চেহারার লোক মিলিটারি কায়দায় স্যালুট ঠুকল। কর্নেল সহাস্যে বললেন, "কেমন আছ শের আলি?"

শের আলি বিনীতভাবে বলল, "জি, ভালো আছে বান্দা। বহোত ভালো। তো সাব আসতে পারল না। বোলা, কর্নিলসাবকো বোলো, সুবেমে জরুর মিলেঙ্গে। উনির বেটির বুখার হয়েছে, কর্নিলসাব! কুছু অসুবিস্তা হোবে না। বান্দা হাজির আছে, কর্নিলসাব!"

কর্নেল আলাপ করিয়ে দিলেন। শের আলি জিপের ড্রাইভার। এক সময় মিলিটারিতে ছিল। তাই কর্নেলসায়েবকে এত খাতির করে। তাকে দেখে এতক্ষণে মনে সাহস ফিরে এল। কর্নেলের কাছে রিভলভার থাকা না-থাকা সমান। গুলি চালিয়ে তিনকড়িচন্দ্রকে খতম করে দেবেন, এটা নিছক দুঃস্বপ্ন। বাইরে জিপের কাছে যেতে-যেতে শুনতে পেলুম, স্টেশনে ঘোষণা করা হচ্ছে, "ডঃ টি. সি. সিন্‌হা! ডঃ টি. সি. সিন্‌হা! আপকা বিস্তারা ইঁহাপর সংরক্‌ষিত হ্যায়! প্রত্যার্পণকে লিয়ে হমলোগ্‌ প্রতীক্‌ষা কর রহি হ্যায়।" ঘোষিকার কণ্ঠস্বরে আর ভাষায় বিরক্তিকর ভদ্রতা। গা জ্বলে যায়। কিন্তু ভাষাজ্ঞান এসে গেল। যা বিস্তার করা যায়, তাই বিস্তারা। যা বিছানো যায়, তাই বিছানা। বাঃ!

জিপে উঠে কর্নেল বললেন, "রূপগঞ্জ পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু নদীর ওপারে বিহার। এখানে দ্বিভাষী লোক দেখে অবাক হোয়ো না। অবশ্য শের আলি ইউ. পি-র লোক।"

এতক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের খয়াটে চাঁদটা চোখে পড়ল। বাঁ দিকে বসতি এলাকা, ডাইনে উঁচু-নিচু মাটি। ঝোপ-জঙ্গল ঝুপসিকালো হয়ে রাতের হাওয়ায় নড়াচড়া করছে। এই রাস্তায় আলো নেই। খানিকটা এগিয়ে বাঁ দিকে আঙুল তুলে কর্নেল বললেন, "ওইগুলো পুরোনো রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। এবার আমরা নদী পেরোব। তারপর চড়াই। ওই যে সামনে উঁচুতে আলো দেখতে পাচ্ছ, ওটাই সেই বাংলো। বিহার মুলুক। খুব চমৎকার জায়গায় বাংলোটা তৈরি করা হয়েছে। নীচে বিশাল জলাধার। পাখিদের অভয়ারণ্য বলা চলে। ...হ্যাঁ, রেনবো অর্কিড নদীর এপারে। দেখাব'খন। মাথা খারাপ হয়ে যাবে ডার্লিং!"

একটা টিলামতো উঁচু জায়গায় সেচ-বাংলো। চৌকিদার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। শের আলি জানিয়ে গেল, সকাল আটটার মধ্যে সে কর্নেলসারের সেবায় জিপ নিয়ে আসবে এবং ডি.ই. সাবও আসবেন। কর্নেলসারের জন্য এই জিপগাড়িটি বরাদ্দ করা হয়েছে, এ-কথাও জানিয়ে গেল সে।

খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে তিনকড়িচন্দ্রকে ভুলে গেলুম। চৌকিদার মাধবলালও কর্নেলকে চেনে। কর্নেলকে কে না চেনে? কর্নেলের সবার মন-জয়-করা স্বভাব তো বটেই, উপরন্তু খোলা হাতে

বখশিসও একটা কারণ। মাধবলাল খাওয়ার সময় কর্নেলকে প্ররোচিত করতে থাকল ক্রমাগত। ...কর্নেলসাব গতবার যে কানে কলম-গোঁজা পাখিটা (সেক্রেটারি-বার্ড) দেখেছিলেন, সেটা ড্যামের অন্য একটা জলটুঙ্গিতে বাসা বেঁধেছে। সামনে এদের ডিম পাড়বার ঋতু। এখন থেকেই তৈরি হচ্ছে। কর্নেলসাব ওদিকের মাঠে যে প্রজাপতি দেখেছিলেন, তারা আছে। মাধবলাল আপনা আঁখসে দেখেছে। সে আঙুল তুলে দেখাল, "তিন রোজ দেখা সাব—এক্‌হি ফাট্‌রাঙ্গা!"

কর্নেল মুরগির ঠ্যাং কামড়ে বললেন, "তিন! তিন তিরেকে নয়। নয়ে-নয়ে একাশি।"

মাধবলাল বুঝতে না পেরে বলল, "হুজৌর?"

"শিবমন্দিরের ত্রিশূলে রক্তের দাগ দেখে এসেছ মাধবলাল?"

সে অমনি চমকে উঠে করজোড়ে প্রণাম করে বলল, "আই বাপ! শিউজিকা পূজা বন্‌ধ থা। তো আদমি বলিদান হো গয়া সাব! উও বাঙ্গালি ঠাকুরমশাইভি আচ্ছা আদমি নেহি থা। বহোত্‌ ঝামেলাবাজ থা। খালি ইসকা-উসকা সাথ টোক্কর লাগাতা। শিউজি উনহিকো বলিদান লে লিয়া।"

"মুরারিবাবুকে চেনো?"

মাধবলাল খিকখিক করে হাসতে হাসতে ঝুঁকে পড়ল। "পাগলা! সিরফ্‌ পাগলা!"

কেন পাগলা, জিজ্ঞেস করলে মাধবলাল অনর্গল তার মাতৃভাষায় মুরারিবাবু সম্পর্কে একটা লম্বা বক্তৃতাই দিল। আমাদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা একটানা চলল। তার সংক্ষিপ্তসার হল এই :

মুরারিবাবুর ঠাকুর্দার আমলে রূপগঞ্জে ওঁদের খুব দাপট ছিল। অমন বড়লোক এ-তল্লাটে আর কেউ ছিল না। প্রচুর জমিজমা, মহাজনি কারবার, বিশাল দালানবাড়ি, একটা মোটরগাড়ি পর্যন্ত ছিল। তারপর যা হয়! সাত শরিকে মামলা-মকদ্দমা, ঝগড়াঝাটি। একটা ভাঙা দেউড়ি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট অবধি আইনের লড়াই তিন পুরুষ ধরে। ততদিনে দেউড়িটার মাত্র আধখানা টিকে আছে। আধখানা দেউড়ির মাথায় জঙ্গল গজিয়ে গেছে। সাবেকি বাড়ি মুখ থুবড়ে পড়েছে। কড়ি-বরগা, দরজা-জানালা চৌকাঠসুদ্ধু যে যখন সুযোগ পেয়েছে, উপড়ে নিয়ে গেছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ওই আধখানা দেউড়ি মুরারিবাবুর হাতছাড়া হয়ে গেল, আর সেই থেকে তাঁর মাথাও খারাপ হয়ে গেল। মামলা এমন জিনিস, বেশিদিন চালিয়ে গেলে মানুষের ঘিলু টেঁসে যায়। ফলে দেউড়িটা নাকি দেখবার মতো জিনিস। এত উঁচু দেউড়ি সচরাচর দেখা যায় না। মাধবলালের ধারণা, পাশের শিবমন্দিরটার চেয়ে দেউড়িটা উঁচু করে তৈরির জন্যই শিবের কোপ পড়েছিল ধাড়াবাবুদের বংশের ওপর। শিবের চেলারা দেউড়ির মাথায় সারা রাত নাচত, দমাদ্দম লাথি মারত, দাপাদাপি করে বেড়াত। কাজেই যত শক্তই হোক, ওটা ধসে পড়ার কারণ ছিল। তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, পাথরে কখনও উদ্ভিদ গজায়? শিউজির শাপে পাথর ফেটে তাও গজিয়েছিল। তবে মুরারিবাবুর মাথা খারাপ হওয়ার মূল কারণ সম্পর্কে মাধবলাল নিশ্চিত নয়। তার শোনা কথা, মুরারিবাবু ভাঙা দেউড়ির মাথায় নাকি বিকট চেহারার কোনো শিবের চেলার দর্শন পেয়েই আতঙ্কে পাগলা হয়ে যান।...

কর্নেল এবং আমার জন্য উত্তর-পূর্ব কোণে একটা বড় ডাবল বেডরুম তৈরি রাখা হয়েছে। উত্তরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কর্নেল বললেন, "এখান থেকে জলাধার দেখলে তোমারও মাথা খারাপ হয়ে যাবে, ডার্লিং! তবে আতঙ্কে নয়, আনন্দে! কী অপূর্ব! কী অলৌকিক সৌন্দর্য! শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় এলে তুমি সত্যিই আকাশের পরিদের ঝাঁকে-ঝাঁকে নেমে স্নান করতে দেখতে। কৃষ্ণপক্ষে জ্যোৎস্নাটা তত খোলতাই নয়।"

বললুম, "খোলা জানালা দিয়ে তিনকড়িচন্দ্র ছোরা না ছোঁড়ে!"

"তুমি বড় বেরসিক, জয়ন্ত!" কর্নেল হাসলেন। "তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। মাধবলালকে যতই রোগাভোগা দেখাক, ওকে নিরীহ ভেবো না। ও এমন মানুষ, যার ঘুমন্ত অবস্থায় কান দুটো দিব্যি জেগে থাকে।"

দরজার পরদার বাইরে থেকে মাধবলালের সাড়া পাওয়া গেল তখনই। "সব ঠিক হ্যায়, সাব?"

কর্নেল বললেন, "ঠিক হ্যায়। তুম শো যাও।"

বলে দরজা এঁটে দিয়ে এলেন। তারপর জানালার ধারে চেয়ার টেনে বসে চুরুট টানতে থাকলেন। একটু হিমের ছোঁয়া এপ্রিলেও। ফ্যানের হাওয়া এবং পেছনের জলাধারও তার কারণ। চাদর-মুড়ি দিলুম। কর্নেল এয়ারকন্ডিশন্ড রুম একেবারে পছন্দ করেন না। প্রকৃতিবাদীর কারবার! এয়ারকন্ডিশন্ড রুম হলে অন্তত তিনকড়িচন্দ্রের পরোয়া না করে আরামে ঘুমনো যেত।

এপাশ-ওপাশ করছিলুম। মশারি নেই, কারণ মশা নেই। কিন্তু মশারি থাকলে খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত, যদিও ছোরার মশারি ফুঁড়ে ঢোকার ক্ষমতা আছে। শুধু একটা সুবিধে আমার বিছানার পশ্চিমে নিরেট দেওয়াল এবং দক্ষিণে বাথরুম। কর্নেলের বিছানার পাশেই পুবের জানালা, মাথার দিকে উত্তরের জানালা, দুটোই খোলা। ফ্যানটা দুই বিছানার মাঝামাঝি আস্তে ঘুরছে। ছোরা ছুঁড়লে কর্নেলের বিপদের চান্স নিরানব্বুই শতাংশ। দৈবাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ছিটকে এলে তবেই আমার বিপদ এবং সেটার চান্স এক শতাংশ মাত্র।

নাঃ, এই হিসেব করেও আতঙ্ক কাটছে না। ঘুমও আসছে না। একটু পরে দেখি, কর্নেল কোনার দিকের টেবিলের কাছে গেলেন। টেবিলবাতি জ্বেলে সেই চাকতিটা বের করলেন। তারপর নোটবইতে কী সব লিখতে শুরু করলেন। ঘড়ির রেডিয়াম-দেওয়া কাঁটা তিনটের ঘরে, যাকে বলে কাঁটায়-কাঁটায় রাত তিনটে।

বিরক্ত হয়ে ইচ্ছে করেই সশব্দে পাশ ফিরলুম। কর্নেল বললেন, "ঘুমের ওষুধ হিসাবে ভেড়ার পাল কল্পনা করে ভেড়া গোনার ব্যবস্থা আছে। এক্ষেত্রে তুমি তিন-শিংওয়ালা ছাগলটিকে কল্পনা করো। ঘুম এসে যাবে। কল্পনা করো, ওটা দৌড়চ্ছে, তুমিও তাকে ধরার জন্য দৌড়চ্ছ এবং ধরতে পারলেই বলি দেবে শিবের মন্দিরে। নাও, স্টার্ট!"

রাগ করে বললুম, "আমি কি বাচ্চাছেলে যে..."

কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন, "কী বললে? কী বললে?"

"আমি বাচ্চা ছেলে নই যে এসব বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘুম পাড়াবেন!"

"মাই গুডনেস!" কর্নেল ঘুরে বসলেন আমার দিকে। চোখ দুটো উজ্জ্বল।

"কী হল?"

কর্নেল চুপ। একটু পরে ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমি চোখ বুজে ঘুমোতে চেষ্টা করলুম এবং সত্যিই একটি তিন-শিংওয়ালা ছাগল কল্পনা করলুম, যেটা দৌড়চ্ছে। মনে-মনে তার পেছনে দৌড়তে থাকলুম। দৌড়তে দৌড়তে দৌড়তে...

"চায়, ছোটাসাব!" তিন-শিংওয়ালা ছাগলটা বলল। "সাব! চায় পিজিয়ে।"

চোখ খুলে দেখি তিন-শিংওয়ালা ছাগল নয়, মাধবলাল। ঘরে উজ্জ্বল রোদ্দুরের ছটা ঝলমল করছে। সে বিনীতভাবে বলল, "বড়াসাব বোলকে গেয়া, সাড়ে সাত বাজকো ছোটাসাবকো বেড-টি দেনা।"

উঠে বসে চায়ের কাপ-প্লেট নিলুম। জিজ্ঞেস করলুম, "কর্নেলসাব কখন বেরিয়েছেন?"

"ছয় বাজকে।" মাধবলাল খিকখিক করে হাসল। "ফাট্রাঙ্গা পাকাড়নে গেয়া, মালুম হোতা। কর্নিলসার ইস দফে জরুর কম-সে-কম একঠো তো পাকড়ায়েগা!...তো হামি বলল, জেরাসা বড়া হোনা চাহিয়ে। কর্নিলসাব বলল, হাঁ, বড়া নেট লেকে আয়া।"

'ফাটরাঙ্গা' জিনিসটা যে প্রজাপতি, বুঝে গেছি। গরম চা খেয়ে চাঙ্গা হওয়া গেল। তারপর বাথরুম সেরে এসে দেখি, প্রকৃতিবিদ গেটে ঢুকছেন। ঢুকে ফুলে-ফুলে সাজানো সুদৃশ্য লনের ওপর দিয়ে উত্তরের নিচু পাঁচিলের কাছে গেলেন। চোখে বাইনোকুলার স্থাপন করলেন। উত্তরের জানালায় গিয়ে জলাধারটি দেখতে পেলুম। অবিকল চিল্কা হ্রদের মতো। প্রচুর পাখিও দেখা যাচ্ছিল। এদিকে-ওদিকে ছোট্ট দ্বীপের মতো টিলা জঙ্গলে ঢাকা।

ভালো করে দেখার জন্য বেরিয়ে গিয়ে বারান্দায় বসলুম। কর্নেলের পাখি দেখা শেষ হল। ঘুরে বারান্দার দিকে আসতে-আসতে সম্ভাষণ করলেন, "গুড মর্নিং, ডার্লিং! আশা করি, ছাগলটি ধরতে পারোনি?"

হাসতে-হাসতে বললুম, "আশা করি আপনিও ফাটরাঙ্গা ধরতে পারেননি?"

কর্নেল বিমর্ষভাবে বললেন, "নাঃ। বেজায় ধূর্ত। ...কী আশ্চর্য!"

হঠাৎ তিনি ছড়ির ডগায় আটকানো গুটিয়ে-থাকা সূক্ষ্ম তন্তুর নেটটি ছাতার মতো বোতাম টিপে খুলে দিলেন। তারপর পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেলেন। একটা ফুলের ঝোপের মাথায় প্রজাপতিটাকে এবার দেখতে পেলুম। রোদ্দুরে ডানা ঝিলমিল করছে। কিন্তু তারপরই ওটা উড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে ডানায় অবিকল সাতটা রঙ রামধনুর মতো স্পষ্ট দেখতে পেলুম। কর্নেল বললেন, "যাঃ! একটুর জন্য..."

প্রজাপতিটা নিচু পাঁচিল পেরিয়ে উধাও হয়ে গেল। কর্নেল বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকার পর চলে এলেন। বারান্দায় উঠে বললেন, "যাই হোক, নেটে ধরতে না পারলেও ক্যামেরায় ধরেছি। এটাই একটা সান্ত্বনা। তবে ঠিক-ঠিক রংগুলো আসবে কি না কে জানে।"

বললুম, "তিনকড়িচন্দ্রের দেখা পাননি তো?"

কর্নেল হাসলেন। "পেয়েছি। নদীর ব্রিজ থেকে বাইনোকুলারে ওপারের ধ্বংসাবশেষ দেখছিলুম। এক মিনিট ধরে দেখলুম, তিনকড়িবাবু ব্যস্তভাবে এদিক-ওদিক করে বেড়াচ্ছেন। ওদিকেই সূর্য। তাই সরাসরি লেন্সে রোদ্দুর পড়ছিল। বাকিটা দেখতে পেলুম না।"

কর্নেল কথাগুলো এমন নির্বিকার মুখে বললেন, যেন গতরাতে ট্রেনে আসতে-আসতে তিনকড়িচন্দ্রের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে। হিরো-ভিলেন ফাইটটা নেহাত ফিল্মি ঘটনা, অর্থাৎ স্রেফ অভিনয়! স্বভাবত আমার মুখে রাগ ফুটে বেরিয়েছিল। বারান্দার সাদা রং মাখানো বেতের টেবিলে মাধবলাল ট্রে-তে কফির পট, পেয়ালা রেখে গেল। বুঝলুম, সে কর্নেলের রীতি-নীতি এবং পছন্দ-অপছন্দের সঙ্গে বেশ পরিচিত।

আমার মনের ভাব ধুরন্ধর বৃদ্ধের চোখ এড়ায়নি। বললেন, "চলন্ত ট্রেন, তা যত আস্তে চলুক, বেয়াড়া যাত্রীদের পছন্দ করে না। তা ছাড়া নিয়ম হল, গতিশীল যানবাহন থেকে নিরাপদে নামতে হলে যেদিকে গতি, সেইদিকে ঝাঁপ দিতে হয়। উলটো দিকে ঝাঁপ দিলে হাড়গোড় ভাঙা অনিবার্য। সোজাসুজি ঝাঁপ দিলে তার চান্স সামান্য কমে। আমাদের তিনকড়িবাবু এই প্রাকৃতিক নিয়ম জানেন। তিনি গতির দিকেই ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই যে বললুম, চলন্ত ট্রেন বেয়াড়া যাত্রীদের পছন্দ করে না। বেচারা একটু ল্যাংচাচ্ছেন। হাতে ছড়ি নিতে হয়েছে। পক্ষান্তরে, তোমার অবস্থা বিবেচনা করো, জয়ন্ত! তুমি অমন ওজনদার মানুষের ধাক্কা সামলে দিব্যি হাঁটাচলা করতে পারছ। একটুও ল্যাংচাচ্ছ না।"

বলার ভঙ্গিতে রাগ পড়ে গেল। বললুম, "ছোরার ঘা কিন্তু আপনিই খেতেন। যাকে বেচারা বলে সমবেদনা জানাচ্ছেন, তার ছোরাটা এখন একবার চাক্ষুষ করলে আমার মতোই রেগে যাবেন।"

কর্নেল জ্যাকেটের ভেতর-পকেট থেকে যে-জিনিসটা বের করলেন, সেটা ছোরার বাঁট বলে মনে হল। অবাক হয়ে বললুম, "বাঁট আছে, ফলা নেই! ভেঙে গেল কী করে?"

কর্নেল বাঁটের একটা জায়গায় চাপ দিতেই ছ-সাত ইঞ্চি ঝকঝকে ফলা গোখরো সাপের ফণার মতো বেরিয়ে পড়ল। বললেন, "স্প্রিংওয়ালা ছোরা। বিদেশি জিনিস। তবে আফ্রিকার নয়, এবং বুগান্ডা মিউজিয়ামের ডঃ হোয়াঙ্গুলা হোটিটি উপহার দেননি, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। একটু ভিজে দেখাচ্ছে, লক্ষ করো। আবছা সবুজে রঙের মলম মনে হচ্ছে না? ওটা সাপের বিষ থেকে তৈরি। তার মানে, একটু খোঁচা খেলেই ঘা বিষিয়ে যাবে। এমনকি, ক্রমশ রক্ত বিষিয়ে মারা পড়তেও পারো।"

ভয়ে বুক ধড়াস করে উঠল। বললুম, "তবু শয়তানটাকে আপনি বেচারা বলছেন!"

কর্নেল আবার স্প্রিংয়ের বোতাম টিপে ফলা ঢুকিয়ে মারাত্মক জিনিসটা পকেটে চালান করে দিলেন। বললেন, "এটা আমার জাদুঘরের জন্য একটা চমৎকার স্যুভেনিরও বটে। বছর-দশেক আগে ঠিক এরকম একটি ছোরার সান্নিধ্যে এসেছিলুম, কোকো আইল্যান্ডে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানকার পুলিশকর্তা সেটি হাতিয়ে নেন। একই ছোরা, একই কোম্পানির তৈরি এবং একই বিষের মলম। তিনকড়িবাবু আমাকে ভাবিয়ে তুলেছেন, জয়ন্ত!"

আমরা কফি খেতে খেতে শের আলি জিপ নিয়ে এসে স্যালুট ঠুকল। বলল, "আফসোস কা বাত, কর্নিলসাব! ডি. ই. সাব আসতে পারল না। বেটি কি বুখার বহত বাড়ল। তো হাথিয়াগড় মিশনারি হসপিট্যালমে চলিয়ে গেলেন। উনি মাফি মাঙ্গা আপসে।"....

তিন

মুরারিবাবুকে শের আলি চেনে। উনি এখানে 'পাগলাবাবু' নামে সুপরিচিত। কিন্তু ওঁর বাড়ি পর্যন্ত জিপ যাবে না। ঘিঞ্জি গলির পর ধ্বংসস্তূপ আর জঙ্গলে-ঢাকা এলাকা। সেখানে কিছু পুরোনো একতলা বাড়ি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার একটাতে মুরারিবাবু থাকেন। শের আলির কাছে জানা গেল, সেও ওঁর নিজের বাড়ি নয়। শিবের ত্রিশূলের আঘাতে যাঁর রহস্যময় মৃত্যু ঘটেছে, সেই নকুলেশ্বর ঠাকুরের বাড়ি। একটা ঘরে মুরারিবাবুকে থাকতে দিয়েছিলেন।

শের আলি বাজারের রাস্তায় জিপ রেখে আমাদের নিয়ে গেল। ডাক শুনে একজন আমার বয়সি যুবক বেরোল। মাথা ন্যাড়া দেখে বুঝলুম, নকুলবাবুর শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেছে। মফস্বলের খবর কলকাতার কাগজের হাতে পৌঁছতে দেরি হয়। 'সম্প্রতি' বলে যে ঘটনা ছাপা হয়, তা হয়তো ঘটে গেছে এক-দু'সপ্তাহ আগে। মুরারিবাবুও এমন অস্পষ্টভাষী মানুষ, ওঁর কথা শুনে মনে হচ্ছিল, সদ্য ঘটনাটি ঘটেছে।

যুবকটি অবাক চোখে আমাদের দেখছিল। শের আলি বলল, "কর্নিলসাব, ইয়ে ঠাকুরমেশার ভাই আছে। আপলোগ বাতচিত কিজিয়ে। ম্যায় গাড়িকা পাশ ইন্তেজার করুঙ্গা।"

সে চলে গেলে যুবকটি বলল, "আপনারা কোত্থেকে আসছেন স্যার?"

কর্নেল বললেন, "কলকাতা থেকে। মুরারিবাবুর সঙ্গে একটু দরকার আছে।"

যুবকটি খাপ্পা হয়ে গেল হঠাৎ। "মুরারিদাকে নিয়ে পারা যায় না! ওঁর মাথায় কী করে যে ঢুকে গেছে, সোনার মোহর-ভরা ঘড়া পোঁতা আছে কর্তাবাবার ভিটেয়! স্যার, আপনারা বুঝতে পারেননি মুরারিদার মাথায় ছিট আছে?"

কর্নেল অমায়িক হেসে বললেন, "তোমার নাম কী ভাই?"

"বীরেশ্বর..." বলেই সে চেঁচিয়ে উঠল, "অ্যাই মুরারিদা, ওখানে কী করছ? দেখছেন পাগলের কারবার?" সে তেড়ে গেল।

একটু তফাতে একটা ঝাঁকড়া গাছ। তার উঁচু ডালে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে মুরারিবাবু উলটোদিকে ঘুরে কী যেন দেখছিলেন। মুখ ঘুরিয়েই আমাদের দেখতে পেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সেই বিদঘুটে খ্যাঁক হেসে হনুমানের মতো চমৎকার নেমে এলেন, পরনে পাঞ্জাবি-ধুতি এবং ধুতির কোঁচা পকেটে গোঁজা! গাছটার তলায় জুতো রাখা ছিল। পা গলিয়ে পরে সহাস্যে এগিয়ে এলেন নমস্কার করতে-করতে। "এসে গেছেন! নকুলদা বলেছিল, আমার কিছু হলেই খবর দিবি। ঠিকানাও নিজের হাতে লিখে দিয়েছিল। কিন্তু যাব কী করে? যেতে দিলে তো? সাত দিন স্যার, সাত-সাতটা দিন বন্দী!... এই বিরুটাকে অ্যারেস্ট করা উচিত। আমাকে সা-ত দিন আটকে রেখেছিল। ...এও স্যার তিনের খেলা। তিন সাত্তে একুশ...দুইয়ের পিঠে এক একুশ... এবার দেখুন, দুই প্লাস এক ইজ ইকোয়াল টু থ্রি—অ্যাই বিরু! অমন করে তাকাবিনে! ইনি কে জানিস?"

বিরু রাগতে গিয়ে একটু হেসে ফেলল। "কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারছেন তো আপনারা?"

মুরারিবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, "শাট আপ! তুই সেদিনকার হাফপেন্টুল-পরা ছেলে। তুই কী বুঝিস? আসুন স্যার, আমার ডেরায় আসুন।"

বিরু বলল, "মুরারিদার কোনো কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না স্যার! ওঁর পাল্লায় পড়েই দাদা মার্ডার হয়ে গেল। সোনার মোহর-ভরা ঘড়ার লোভে না পড়বে, না মার্ডার হবে।"

সদর-দরজা খুলে থান-পরা এক মহিলা উঁকি দিচ্ছিলেন। বললেন, "ঠাকুরপো, জিজ্ঞেস করো তো উনি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার নাকি?"

চমকে উঠেছিলুম। কর্নেল টুপি খুলে বিলিতিভাবে মাথা একটু নামিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ম্যাডাম। আমিই।"

সেই মুহূর্তে একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটল, কর্নেল টুপি খুলতেই টাক ঝকমকিয়ে উঠেছিল এবং সেই টাকে একটা ছোট্ট ঢিল এসে পড়ল। কর্নেল টাকে হাত দিয়ে দ্রুত ঘুরলেন। উলটো দিকে একটি একতলা বাড়ির ছাদে বছর দশ-বারো বছরের একটি ছেলে জিভ দেখিয়ে ভো-কাট্টা হয়ে গেল।

বিরু চেঁচিয়ে বলল, "দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি।"

মুরারিবাবু দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, "বাপের আশকারা পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে। মারব এক থাপ্পড়!... এসো এবার 'ঘুঁড়ি আঁটকে গেঁছে জ্যাঁঠামশাই, পেঁড়ে দিন' বলতে!... তিন তিরেক্কে নয়, নয়-নয়ে একাশি দেখিয়ে দেব।"

নেপথ্যে আওয়াজ এল, "ব্যা-ব্যা-অ্যা!"

অমনি কর্নেল ফিক করে হেসে বললেন, "ব্যা-করণ!"

মুরারিবাবু বাড়িটার চারপাশে ছুটোছুটি শুরু করলেন। দুর্বোধ্য কীসব কথাবার্তা। বিরুর বউদি গম্ভীরমুখে বললেন, "ছেড়ে দিন! আপনারা ভেতরে আসুন। ঠাকুরপো, ওঁদের নিয়ে এসো।"

ভেতরে একটুকরো উঠোন। কুয়োতলা। উঁচু বারান্দা। একটা ঘর খুলে দিলেন বিরুর বউদি। বিরু বলল, "বসুন স্যার! দাদার ঘর। বাইরে বসার ঘরটা মুরারিদাকে থাকতে দিয়ে গেছে দাদা।"

ঘরের ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলুম। কর্নেলের মুখেও বিস্ময় ফুটে উঠল। ঘরভর্তি পুরোনো বই-পত্রপত্রিকা, তাক এবং আলমারিতে বিচিত্র গড়নের সব পুতুল, পাথরের টুকরোয় খোদাই-করা আঁকিবুকি। কর্নেল বললেন, "এ তো দেখছি প্রত্নশালা! বিরু, তোমার দাদা কী করতেন?"

বিরু বলল, "দাদার ওই এক বাতিক ছিল স্যার! কোত্থেকে সব কুড়িয়ে এনে জড়ো করতেন। স্কুলে মাস্টারি করতেন। মাস্টারি ছেড়ে বাতিক আরও বেড়ে গিয়েছিল। সারাদিন জঙ্গলে ঢিবিতে ঘুরে বেড়াতেন টোটো করে। আর রাজ্যের যত উদ্ভুট্টে জিনিস কুড়িয়ে আনতেন।"

কর্নেল ঘুরে-ঘুরে সব দেখছিলেন। মুখে বিস্ময় আর তারিফের ছাপ। বিড়বিড় করছিলেন আপনমনে। "...শিলালিপি! ...দাঁতের জীবাশ্ম! ...বুদ্ধমূর্তি, নাকি শিব... আশ্চর্য! বড় আশ্চর্য! এমন ব্যক্তিগত সংগ্রহ কোথাও দেখিনি! ...মাই গুডনেস! এ তো কুষান মুদ্রা! ...ব্রোঞ্জের যক্ষিনী...তাম্রশাসন..."

বাইরে থেকে ডাক এল, "ঠাকুরপো!"

বিরু চলে গেল। কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত! বুঝতে পারছ কিছু?"

বললুম, "হ্যাঁ, আপনার মতোই কুড়ুনে স্বভাবের লোক ছিলেন। তবে আপনি আবার রহস্যভেদীও। আর এই নকুলবাবু রহস্যভেদী ছিলেন না, এই যা।"

"না জয়ন্ত! রহস্যভেদ করতে গিয়েই প্রাণে মারা পড়েছেন ভদ্রলোক।"

"সোনার মোহর-ভরা ঘড়ার রহস্য।"

"উঁহু। ব্যা-করণ রহস্য।" বলে কর্নেল এতক্ষণে চেয়ারে বসলেন।

এইসময় মুরারিবাবু হন্তদন্ত এসে ঢুকলেন। তক্তাপোশে পাতা বিছানায় ধপাস করে বসে বললেন, "পালিয়ে গেল বাঁদরটা! বিষ্ণুবাবুর ঘরে এই এক অবতার। তিন তিরেক্কে দেখিয়ে ছেড়ে দিতুম।"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "ছেলেটি বেশ।"

"বেশ? বিচ্ছু! বাঁদর!" মুরারিবাবু বললেন। "গাছে-গাছে ঘোরে। দালানের মাথায়-মাথায় ছোটে। দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায়, স্যার!..." বলে খ্যাঁক করলেন। "তবে আমারই ট্রেনিং, বুঝলেন? একদিন ঘুড়ি আটকে গেছে গাছের ডগায়, করুণ মুখে তাকিয়ে আছে। আমাকে দেখে কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, জ্যাঠামশাই, আপনি তো গাছে চড়তে পারেন, দিন না ঘুড়িটা পেড়ে। ...পেড়ে দিলুম। তারপর ট্রেনিং দিতে শুরু করলুম। ...একদিন স্যার নকুলদা বলল, মুরারি, তুমি তো বেশ গাছে চড়তে পারো দেখেছি। বললুম, হুঁ, পারি। বলে কী, তোমাদের দেউড়ির মাথায় চড়তে পারবে? ...না স্যার! কড়িদার সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে লড়ে হেরে গেছি। কড়িদা এখানে নেই তো কী হয়েছে? চক্ষুলজ্জা বলে কথা। ...নকুলদা স্যার, বড্ড গোঁয়ার। বিষ্ণুবাবুর ছেলে ওই যে দেখলেন, ...বিচ্ছু, বাঁদর..."

কর্নেল বললেন, "ছাগলও বলতে পারেন। কেমন ব্যা-অ্যা ডেকে ভেংচি কাটল!"

মুরারিবাবু কান করলেন না। "ওর ডাকনাম আবার বিট্টু...বি-ট্-টু...এও তিন! তিন তিরেক্কে নয়, নয়ে-নয়ে একাশি!"

"আপনি কি নিউমারোলজিস্ট, মুরারিবাবু?"

"আজ্ঞে। একটু-আধটু চর্চা করি আর কি!" মুরারিবাবুর ট্রেন চলতে থাকল। "নকুলদা বিট্টুকে ঘুড়ির লোভ দেখিয়ে চড়াল। বাপ্স্! দেউড়ির মাথায় চড়াল। ...বাপ নিজের মাথায় চড়িয়েছে, নকুলদা এককাঠি সরেস। দেউড়ির মাথায় চড়াল। তারপর থেকে রোজ দেখি দেউড়ির মাথায়... শাসালুম, থাম। কড়িদা আসছে! জিভ দেখায় আর ব্যা করে। ইউ আর রাইট। পূর্বজন্মে ছাগলই ছিল।"

"আপনার এই কড়িদাটি কে?"

"তিনকড়িদা। আমার জ্ঞাতি। মহাভারত কি মিথ্যা, বলুন আপনি? কুরুক্ষেত্র কি মিথ্যা? তবে এখন যুদ্ধ কাগজে-কলমে, উকিলে-ব্যারিস্টারে...জজের সামনে। বেধে গেল লড়াই।"

"তিনকড়িবাবু থাকেন কোথায়?"

"শুনেছি জাহাজে চাকরি করে। কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক ঘোরে। সমুদ্রে মহাসাগরে। বলবেন, তা হলে মামলা কে লড়ল? ...মামলা লড়ে ব্যারিস্টার। ওর ভগ্নীপতি ব্যারিস্টার। ...হারিয়ে দিলে! সবই

তিন তিরেক্কের খেলা সার!" মুরারিবাবু পকেট থেকে নোটবই বের করে একটা পাতা খুলে দেখালেন। "এই দেখুন! হিসেব কষে রেখেছি। আপনিই খুঁজে বের করতে পারবেন নকুলদাকে কে মারল, শিব না মানুষ? নামের ব্যাঞ্জনবর্ণগুলোই লক্ষ করুন স্যার।"

উঁকি মেরে দেখলুম, লেখা আছে :

ক+র+ন +ল+ন+ল+দ+র+স+র+ক+র=১২

১+২=৩

ন+ক+ল+শ+ব+র+ঠ +ক+র=৯

৩×৩=৯

৯ ÷ ৩ = ৩

কর্নেল নোটবই ফেরত দিয়ে বললেন, "নকুলেশ্বর ঠাকুরকে এলাকায় ঠাকুরমশাই বলত কেন, মুরারিবাবু? নিছক পদবির জন্য?"

"পদবি এল কোত্থেকে?" মুরারিবাবু বললেন, "নকুলদা'র ঠাকুর্দা পর্যন্ত শিবমন্দিরের সেবাইত ছিলেন। আমার ঠাকুর্দা জমিদার আর নকুলদা'র ঠাকুর্দা জমিদারবাড়ির মন্দিরের পুজো-আচ্চা করতেন। সেই থেকেই তো এই সম্পর্ক। ঠাকুরমশাই ডাকতে-ডাকতে ঠাকুর হয়ে গেল। ঠা-কু-র...তিন! নাম্বারের খেলা। অঙ্ক! অঙ্কে অঙ্কে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে। এক থেকে তিন...ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর...তিন থেকে তেত্তিরিশ কোটি। খালি তিনের লীলা!...তিন তিরেক্কে নয়, নয়-নয়ে একাশি!...ছাগলটা দেউড়ির মাথায় চড়েছিল, স্যার! বলল, "একাশি!...তি-ন দিন।" বলে মুরারি তিনটে আঙুল তুললেন।

কান ঝালাপালা! এতক্ষণে বিরুর বউদি ট্রে হাতে ঢুকলেন। কর্নেল বললেন, "এ কি! আমরা সদ্য ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়েছি।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "একটু মিষ্টিমুখ না করলে চলে? কত ভাগ্যে আপনি এসেছেন। উনি প্রায় বলতেন, কর্নেলসায়েবকে চিঠি লিখতে হবে। উনি ছাড়া এর জট...না, না। আপনি অন্তত একটা সন্দেশ খান।" বলে বিরুর বউদি আমার দিকে তাকালেন। "তুমি, বলছি ভাই, কিছু মনে কোরো না। তুমি আমার ঠাকুরপোর বয়সি। খাও! এখানকার মিষ্টি খাঁটি ছানার। তোমাদের কলকাতার মতো সয়াবিনের ছানা নয়।"

মুরারিবাবু উসখুস করছিলেন। বললেন, "আমার এই বউদি, স্যার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা! যেমন রূপ, তেমনি গুণ।" বলে কর্নেলের প্লেট থেকে দুটো প্রকাণ্ড সন্দেশ তুলে মুখে পুরলেন।

বিরুর বউদি বললেন, "আহা, ওই তো তোমার প্লেট! তোমাকে নিয়ে পারা যায় না!"

মুরারিবাবু প্লেট গুনলেন। "এক...দুই...তিন!...অ! আমি ভাবলুম...যাকগে! খেয়ে যখন ফেলেইছি...কর্নেলস্যারের যা বয়স, মিষ্টি খাওয়া উচিত না।" উনি নিজের প্লেটটা হাতিয়ে নিলেন এবং খাওয়ার দিকে মন দিলেন।

বিরুর বউদি আস্তে বললেন, "যেদিন রাতে উনি মারা যান, সেদিনই বেশ কয়েকবার আমাকে বলছিলেন, কর্নেলসায়েবকে চিঠি লেখা হচ্ছে না। অ্যাড্রেসটা জোগাড় করেছি। নোটবইতে লেখা আছে। যদি আমি কোনো বিপদে পড়ি তো ওঁকে খবর দিও। পরদিন তো যা মনের অবস্থা, চিঠি লিখব কী! পরের দিন লিখে বিট্টুকে দিয়ে ডাকে পাঠালাম। প্রত্যেকদিন ভাবি, আজই আসবেন। এ-এই করে করে..."

মুরারিবাবু শুনছিলেন। বললেন, "আমাকে তোমরা পর ভাবো। নকুলদা ভাগ্যিস আমাকে বলে রেখেছিল। ...হুঁ হুঁ, কী ভাবছ? এই শর্মাই গতকাল কলকাতা গিয়ে ওঁকে টেনে এনেছে। ...ওই বিরুটা! বিরুটা আমাকে ঘরে তালা আটকে সাতদিন...সা-তটা দিন বন্দী করে রাখল। তারপর আর

এ-ঘরে ঢুকতে পাইনি যে নকুলদার নোটবই থেকে ঠিকানা নেব। ...শেষে পরশুদিন নোটবইটা বিট্টুকে দিয়ে হাতিয়ে...এই দ্যাখো!" বলে পকেট থেকে সেই নোটবইটা বের করলেন।

বিরুর বউদি সেটা ছিনিয়ে নিয়ে কর্নেলকে দিলেন। "দেখছ কাণ্ড? তাই খুঁজে পাচ্ছি না কাল থেকে। বেরোও! বেরোও বলছি ঘর থেকে! পাগলামির একটা সীমা থাকা উচিত।"

মুরারিবাবু বললেন, "উপকার করলে এই হয় সংসারে। ঠিক আছে। তিন কাপ চা দেখছি। অঙ্ক কষলেই এক কাপ আমার। খেয়েই বেরোচ্ছি। আর তোমাদের ত্রিসীমানায় আসব না।"

"হুঁ, গাছে চড়ে বসে থাকোগে!" বিরুর বউদি বললেন, "ওদিকে উনি মার্ডার হয়েছেন, এদিকে একে নিয়ে ঝামেলা। সামলানো কঠিন। শেষে বুদ্ধি করে বিরু আটকে রাখল ঘরে। ...ঠাকুরপো! শোনো তো!"

বিরু বারান্দা থেকে বলল, "কী?"

"বিট্টুকে ডেকে নিয়ে এসো তো। ঘুড়ির লোভ দেখিও, আমার নাম করে। তা হলে আসবে।"

মুরারিবাবু কোঁত-কোঁত করে চা গিলে বললেন, "বিরুর কম্ম নয়। আমি যাচ্ছি।"

উনি দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। বিরুর বউদি বললেন, "ঠাকুরপো, তুমি যাও। মুরারি ঢিল খেয়ে রক্তারক্তি হবে।"

কর্নেল চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "অবশ্য আজকাল ডাকে চিঠি যেতে খুব দেরি হচ্ছে। তাই হয়তো আপনার...তুমিই বলছি বরং... জয়ন্তকে যেভাবে 'তুমি' বলেছ!" কর্নেল প্রায় অট্টহাস্য করলেন।

বিরুর বউদি বললেন, "না, না। আপনি আমার বাবার বয়সি। তুমিই বলুন।"

"তোমার নাম কী মা?"

"রমলা।"

"তোমার স্বামী আমার কথা কবে থেকে বলতে শুরু করেন, মনে আছে?"

রমলা একটু ভেবে বললেন, "আজ ৯ এপ্রিল। উনি মার্ডার হন ২৮ মার্চ। ...হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ১৭ মার্চ রাতে, তখন প্রায় দশটা বাজে, বাড়ি ফিরলেন। কেমন যেন চেহারা...খুব ভয় পেলে যেমন দেখায় মানুষকে। ...তো এমনিতে খুব কম কথা বলতেন। জিজ্ঞেস করলুম, কী হয়েছে? বললেন, কিছু না। শরীরটা ভালো না। সেই রাতে হঠাৎ বললেন, একটা ধাঁধায় পড়েছি। কর্নেলসায়েবকে চিঠি লিখব। তারপর আপনার পরিচয় দিলেন। কিন্তু ধাঁধাটা কী, কিছুতেই বললেন না। শুধু বললেন, আমার নোটবইতে টুকে রেখেছি। তুমি বুঝবে না।"

কর্নেল নোটবইটার পাতা ওলটাতে থাকলেন। "হুঁ, ওঁর ডেডবডি কোথায় পাওয়া যায়?"

"ওই অলুক্ষুনে দেউড়ির নীচে।"

"কে দেখেছিল?"

"মুরারি। জ্যোৎস্না ছিল সে-রাতে। রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরছেন না দেখে মুরারি আর বিরুকে পাঠালুম। বিরু গিয়েছিল বাজারের ওদিকে লাইব্রেরিতে। ওখানে রোজই যেতেন।"

"মুরারিবাবু দেউড়ির দিকে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। ...দেখে এসে...একে আধপাগলা মানুষ, আরও পাগল হয়ে গেলেন। কান্নাকাটি, আবোলতাবোল কথা, ঢিল ছোড়াছুড়ি, যাকে সামনে পান মারতে যান, ভাঙচুর...দু'দিকে দুই বিপদ তখন।"

"আচ্ছা রমলা, তোমাকে নকুলবাবু তিন-শিংওয়ালা ছাগলের কথা বলেছিলেন?"

রমলা চমকে উঠলেন। একটু পরে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলেছিলেন মনে পড়ছে। সবাইকে জিজ্ঞেস করতেন, কেউ কখনও তিন-শিঙে পাঁঠা দেখেছে নাকি? এটা উনি

মার্ডার হওয়ার ক'দিন আগের কথা। শুধু মুরারি বলল, দেখেছে। ও তো পাগল! ওর কথা! উনি আমল দেননি।"

"তুমি তিনকড়িবাবুকে চেনো?"

"একটু-আধটু চিনি। জাহাজে চাকরি করেন। বার-দুই এসেছিলেন। মুরারির জ্ঞাতি-ভাই। ওর সঙ্গে মামলা লড়ে মুরারির এই অবস্থা। তবে মামলা চলছিল তিন পুরুষ ধরে।"

"একটা দেউড়ি নিয়ে?"

রমলা অনিচ্ছায় হাসলেন। "তাই তো শুনেছি। আসলে জেদের লড়াই।"

"তিনকড়িবাবুর এখানে আর কোনো আত্মীয় আছেন?"

"আছে। করালীবাবু। এখন বাজারের ওখানে বাড়ি করেছে। ব্যাবসা করে খুব পয়সা কামাচ্ছে। তিনকড়িবাবুর কাকার ছেলে।"

"তিনকড়িবাবু কি বেঁটে, মোটাসোটা, চল্লিশের কাছাকাছি বয়স?"

"বয়স জানি না। বার-দুই বিরুর দাদার কাছে এসেছিলেন। হ্যাঁ, বেঁটে। মোটাসোটা মানুষ। আপনি চেনেন ওঁকে?"

কর্নেল জবাব দিলেন না সে-কথার। বললেন, "নোটবইটাতে মুরারিবাবু খুব হাত লাগিয়েছেন, এটাই সমস্যা। এটা আমি রাখছি, রমলা!"

"রাখুন। আপনি..." রমলা ধরা গলায় বললেন, "একটা নিরীহ সাদাসিধে মানুষকে কে অমন করে মারল, কেন মারল, খুঁজে বের করুন।"

"আপনার ঠাকুরপো কী করে?"

রমলা আস্তে বললেন, "ভাইটাকে মানুষ করতে পারেননি স্কুলটিচার হয়েও। স্কুল ফাইনালে দু'বার ফেল করে এতদিনে একটা চাকরি জুটিয়েছে। ব্যারেজে হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশন আছে। সেখানকার সিকিউরিটি গার্ড। আসলে দাদা-ভাই দু'জনেই একটু গোঁয়ার, জানেন? দাদা তো কার সঙ্গে ঝগড়া করে স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভাই কবে না একই পথ ধরে! আমার হয়েছে জ্বালা!"

"তা হলে নকুলবাবু রিটায়ার করেননি?"

"না। ভেতরে-ভেতরে খুব রাগী আর জেদি মানুষ ছিলেন। আত্মসম্মানবোধ ছিল ভীষণ। তবে বাইরে থেকে বোঝা যেত না। খুব ভদ্র আর..."

"নিরীহ বলছিলেন?"

রমলা জোর দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ। একটা পোকা মারতে হাত কাঁপত। তবে রাগ হলে মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলে দিতেন। এ জন্যই রূপগঞ্জে ওঁকে কেউ পছন্দ করত না। আর ওই এক স্বভাব—তর্ক! পণ্ডিতি তর্ক।"

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, "শুনলুম, লোকে বলছে, শিবমন্দিরের ত্রিশূলে রক্তের দাগ ছিল। বডিতে তিনটে ক্ষত ছিল। তোমার কী ধারণা?"

রমলা ঠোঁট কামড়ে ধরে বললেন, "উনি নাস্তিক মানুষ ছিলেন। সেজন্য ওসব রটানো হয়েছে। আর ত্রিশূলে রক্তের দাগ? মিথ্যা। সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে কেউ।"

"পুলিশ কী বলছে?"

"পুলিশ ত্রিশূলের লাল দাগ তুলোয় মাখিয়ে টেস্ট করতে পাঠিয়েছে। রোজ থানায় গিয়ে খোঁজ নিই। বলে, এখনও কলকাতা থেকে রিপোর্ট আসেনি।"

কর্নেল উঠলেন। "চলি। আমি আছি ইরিগেশন বাংলোয়। দরকার হলে বিরুকে দিয়ে খবর পাঠিও।"

রমলা ব্যস্তভাবে বললেন, "বিট্টুকে খুঁজতে গেল ওরা। চিঠিটা ডাকে দিয়েছিল কি না..."

"থাক। ও-নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই।"....

ঘিঞ্জি গলি দিয়ে বাজারে পৌঁছে দু'জনে থমকে দাঁড়ালুম। শের আলি এবং তার জিপটা নেই। সামনে একটা চায়ের দোকান থেকে একটি ছেলে এসে বলল, "শের আলি বোলা, উও দেখিয়ে সাব! মহিন্দার সিংকা গ্যারিজ...উঁহা চলা যাইয়ে। উও দেখিয়ে শের আলি খাড়া হ্যায়!"

বললুম, "হঠাৎ গ্যারেজে কেন?"

কর্নেল কিছু বললেন না। হনহন করে এগিয়ে চললেন। রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। বাঙালি-বিহারি চেনা কঠিন। দুই রাজ্যের সীমানাবর্তী শহরে এই এক জগাখিচুড়ি।

শের আলি দৌড়ে এল। মুখ উত্তেজনায় লাল। "হারামিলোগোকা খাসিয়ত এইসা হো গেয়া, কর্নিলসাব! দো চাক্কা ফাঁসা দিয়া, ঔর কারবুরেটর জ্যাম কর দিয়া! চাক্কু চালায়া ইঞ্জিনকি অন্দর! তার উরভি কাট দিয়া। কম-সে-কম তিন-চার ঘণ্টে লাগেগি! ম্যায় কা কুঁরু? দেখনে সে তো কলিজা ফাঁসা দেতা।"

কর্নেল একটু হাসলেন। "ঠিক আছে। তুমি এখানেই অপেক্ষা করো। আমরা আর একটু ঘুরে আসি।"

একটা সাইকেল-রিকশা দাঁড় করিয়ে কর্নেল বললেন, "শিউজিকো পুরানা মন্দির দর্শন করে ভাই! চলো!"

রিকশায় বসে বললুম, "ব্যাপারটা রহস্যময়!"

"হ্যাঁ। ব্যা-করণ রহস্যের অবস্থা জমজমাট হয়ে উঠল।" কর্নেল বললেন। "তবে এখন আমার ভাবনা আর মুরারিবাবুর জন্য হচ্ছে না। হচ্ছে হালদারমশাইয়ের জন্যে!"

সঙ্গে-সঙ্গে হালদারমশাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। বললুম, "সত্যিই কি মুরারিবাবুকে উনি ফলো করে এতদূর এসেছেন? বিশ্বাস হয় না।"

কর্নেল পকেট থেকে একটা চিরকুট বের করে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। বললেন, "ভোর ছ'টায় মর্নিং ওয়াকে বেরনোর সময় গেটের বাইরে একটা কাঁটাগাছে এটা আঁটা ছিল, চোখে পড়ার মতো জায়গায়। তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম।"

চিরকুটে লাল ডটপেনে লেখা আছে :

পাতিঘুঘু বলিদান
বুড়োঘুঘু সাবধান

বললুম, "সর্বনাশ! হালদারমশাই তা হলে অলরেডি..."

কর্নেল আমার হাত থেকে চিরকুটটা ছিনিয়ে নিয়ে বললেন, "কলকাতা থেকে রূপগঞ্জ থানায় ট্রাঙ্ককলে অলরেডি জানানো হয়েছে। গতকাল এখানে উনি পৌঁছনোর আগেই পুলিশ সতর্ক থাকার কথা। স্বয়ং ডাইরেক্টর জেনারেল অব পুলিশের নির্দেশ। তবু কিছু বলা যায় না।"

শেষ বাক্যটি শুনে বুকটা ধড়াস করে উঠল।

চার

জঙ্গলে ঢাকা একটা টিবির কাছে এসে সাইকেল-রিকশাওয়ালা বলল, "আর যাবেক না সার! হেঁটি-হেঁটি চলেক যান। ম্যালাই লোক যেছে বাটেক বাবার ঠেঞে।"

টিবির জঙ্গল ফুঁড়ে টাটকা পায়ে-চলা পথের দাগ চোখে পড়ছিল। রিকশার ভাড়া মিটিয়ে কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে টিবিটি তদন্ত করে দেখলেন যেন। তারপর মুচকি হেসে বললেন, "হেঁটি-হেঁটি চলেক যাই, ডার্লিং!"

সঙ্কীর্ণ নতুন রাস্তাটি করার সময় ঝোপঝাড়ও কাটা হয়েছে। কিছুটা এগিয়ে একদঙ্গল লোক যাচ্ছে দেখলুম। একজনের কাঁধে একটা পাঁঠা। তবে দুটো শিং। একটি ঢাকও নিয়ে যাচ্ছে। বললুম, "এ দেশের লোক বড্ড হুজুগে।"

কর্নেল বললেন, "সব দেশের লোকই হুজুগে, জয়ন্ত! তবে তফাতটা হল, এ-দেশে এখনও মানুষের হাতে প্রচুর সময়। সেই সময়কে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা কম। আর যদি কুসংস্কারের কথা বলো, সেও সবখানে মানুষের মগজে ঠাসা। মহা-মহা পণ্ডিতের সঙ্গে আমার চেনাজানা হয়েছে। পিদিমের তলায় আঁধারের মতো তাঁদের এক-একজনের এক-একরকম উদ্ভট কুসংস্কার দেখেছি। ...হুঁ, নাস্তিকদেরও কুসংস্কার দেখেছি, জয়ন্ত! আসলে সত্যিকার নাস্তিক হতে গেলে মনের জোর থাকা চাই। খাঁটি নাস্তিক হওয়া সহজ নয়। অবিশ্বাস করাটা শক্ত বিশ্বাস করাটা সহজ। কারণ আজন্ম মানুষ বিশ্বাস ব্যাপারটাতে অভ্যস্ত। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসই মানুষের সমাজটাকে বেঁধে রেখেছে। ওই রিকশাওয়ালার কথাই ধরো। আমরা তাকে ভাড়া দেব বিশ্বাস করেই আমাদের বয়ে আনল! বিশ্বাস, ডার্লিং, বিশ্বাস জিনিসটা না থাকলে মানুষের বাঁচা কঠিন হত। কিন্তু কিছু বেয়াড়া লোক থাকে। তারা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে। যে বিশ্বাস চালু, তাকে অবিশ্বাস করে। তারপর? চালু-বিশ্বাস যদি বা ভাঙে, আর এক নতুন বিশ্বাসের জন্ম হয়।..."

কর্নেলের এই দীর্ঘ দার্শনিক ভাষণের তাৎপর্য বুঝতে পারছিলুম না। ফালি রাস্তার পর ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে সামনে ধ্বংসস্তূপ এবং তার পেছনে একটা মন্দিরের চূড়া চোখে পড়ল। চূড়ায় কালচে রঙের ত্রিশূল। কর্নেল বাইনোকুলারে ত্রিশূলটি দেখে নিলেন। বললুম, "রক্তের দাগ দেখতে পাচ্ছেন?"

কর্নেল কথায় কান না দিয়ে উদাত্ত কণ্ঠস্বরে বললেন, "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।"

বিরক্ত হয়ে হাঁটতে থাকলুম। উনি সমানে বক্তৃতা চালিয়ে গেলেন। তারপর ঢাক বেজে উঠল। ধ্বংসস্তূপগুলোর পর একটা খোলা পাথর-বাঁধানো চত্বর। ফাঁকে-ফোকরে উদ্ভিদ গজিয়েছিল। কেটে সাফ করা হয়েছে। একদঙ্গল লোক বসে আছে এবং প্রত্যেকের হাতে একটা করে নানা সাইজের পাঁঠা। প্রকাণ্ড মন্দিরের সামনে হাড়িকাঠ এবং রক্তে ভেসে যাচ্ছে জায়গাটা। ঢাক-কাঁসি বাজছে। ধেইধেই নাচও চলছে। রক্তারক্তি দেখলে আমার গা গুলোয়। মন্দিরটা দেখতে থাকলুম। কালো পাথরে তৈরি খয়াটে এবং ফাটলধরা প্রাচীন স্থাপত্যের কেমন যেন ভয়াল চেহারা। দেখলেই গা-ছমছম করে। এতক্ষণে লোহার ত্রিশূলে কালচে রক্তের দাগ স্পষ্ট চোখে পড়ল।

আমাদের দেখতে পেয়ে কয়েকজন পাণ্ডা ভিড় করল। কারও পরনে গেরুয়া, কারও পট্টবস্ত্র এবং প্রত্যেকের কপালে সম্ভবত রক্তের ফোঁটা। সাজিয়ে শিবের প্রিয় বেলপাতা, জবাফুল। কিছু ধুতরো ফুলও দেখতে পেলুম। কর্নেল প্রত্যেককে একটা করে টাকা বিলোচ্ছেন দেখে অবাক হলুম, কলকাতা থেকে একগুচ্ছের এক টাকার নোট জোগাড় করেই এসেছেন! আমার এই বৃদ্ধ বন্ধুটি সত্যিই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা।

ঢাকের বাজনার তালে-তালে একজন সন্ন্যাসী চেহারার লোক নেচে-নেচে গাইছে :

নাচে পাগলাভোলা গলায় মালা
হাতে লয়ে শূল
প্রমথ প্রমত্ত নাচে
কানে ধুতুরারই ফুল...

কর্নেল এক টাকার হরির লুঠ দিয়ে লম্বা পায়ে কেটে পড়লেন। মন্দিরের পেছনে গিয়ে ওঁর নাগাল পেলুম। আবার খানিকটা খোলা জায়গা এবং সামনে একটা প্রকাণ্ড উঁচু আধখানা দেউড়ি দেখা গেল। পাথরের এমন তোরণ দিল্লির মেহরৌলিতে কুতবমিনারের কাছে দেখেছি।

"অসাধারণ স্থাপত্যশৈলী!" কর্নেল মুগ্ধদৃষ্টে তাকিয়ে বলে উঠলেন। "এর মালিকানার জন্য একটা কেন একশোটা কুরুক্ষেত্র বাধা স্বাভাবিক। সত্যিই ডার্লিং! রাজা শিবসিংহের এই উত্তুঙ্গ কীর্তির ভগ্নাবশেষ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা লড়ে ফতুর হতে আমারও ইচ্ছে করছে। দুঃখের বিষয়, সরকার দেশের প্রাচীন কীর্তি সম্পর্কে এত অমনোযোগী কেন, ভেবে পাইনে! ফিরে গিয়ে প্রত্ন-দফতরে কড়া করে চিঠি লিখব।"

বলে কর্নেল ক্যামেরায় নানা দিক থেকে ছবি তুললেন। তারপর কাছে গিয়ে বললেন, "ওপরটা ভেঙে গেলেও অনুমান করছি, তোরণটা অন্তত পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু ছিল। আর এই দ্যাখো, চওড়ায় কী বিশাল! প্রায় দশ ফুট!"

ওদিকে গিয়ে দেখলুম, তোরণ বা দেউড়িটির মাথায় ঘন ঝোপ গজিয়ে রয়েছে। আস্ত একটা বেঁটে বটগাছ মাথা তুলেছে এবং সেটার শেকড় সাপের মতো এঁকেবেঁকে নেমে এসেছে গা বেয়ে।

হঠাৎ দেউড়ির মাথায় ঝোপের ভেতর আওয়াজ হল, "একাশি!"

চমকে উঠলুম। ঝোপ ফুঁড়ে কালো একটা ছাগলের মুখ দেখা যাচ্ছে এবং রীতিমতো আশ্চর্য ঘটনা, তার তিনটে শিং! উত্তেজনায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলুম, "কর্নেল! কর্নেল!"

কর্নেল বাইনোকুলারে দেখছিলেন। ঝটপট ক্যামেরা তাক করে শাটার টিপলেন। ছাগমুণ্ডটি দাড়ি ও তিন শিং নেড়ে ফের বলে উঠল মানুষের ভাষায়, "একাশি!" তারপর বেমালুম নিপাত্তা হয়ে গেল।

কর্নেল এবং আমি ভাঙা দেউড়িটার চারদিকে ছোটাছুটি করে তাকে আর খুঁজে পেলুম না। কর্নেল ব্যস্তভাবে পাথরের খাঁজ আঁকড়ে এবং শেকড়বাকড় ধরে ওঠার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। তখন বললেন, "তোমার তো মাউন্টেনিয়ারিং-এ ট্রেনিং নেওয়া আছে। দ্যাখো তো চেষ্টা করে। আসলে আমার শরীরটা বেজায় ভারী হয়ে গেছে। নইলে আমিও কিছু পাহাড়ের চুড়োয় উঠেছি একসময়। জয়ন্ত! কুইক!"

একটু দোনামনা করে বললুম, "মাউন্টেনিয়ারিংয়ের জন্য বিশেষ জুতো পরা দরকার। এই জুতো পরে ওঠা সম্ভব নয়।"

"চেষ্টা করো ডার্লিং!"

কর্নেলের তাড়ায় পাথরের খাঁজে পা রেখে বুটের শেকড় আঁকড়ে অনেকটা ওঠা গেল। প্রায় মাঝখানে পৌঁছে হল বিপদ। শেকড়টা এখন বেশ মোটা। খাঁজে গজানো গুল্ম ধরে উঠতে গেলেই উপড়ে যাচ্ছে। নীচে থেকে কর্নেল ক্রমাগত উৎসাহ দিচ্ছেন। এইবার একটা মোটা লোহার আংটা চোখে পড়ল মাথার ওপরে। মরচে-ধরা আংটা। টেনে দেখলুম, ওপড়ানোর চান্স নেই।

আংটাটি আঁকড়ে বারের কসরত করে গিরগিটির মতো উঠতেই একটা শক্ত ঝোপ বাঁ হাতের নাগালে এসে গেল। এরপর আর ওঠাটা কষ্টকর হল না। ঝোপ আঁকড়ে পাথরের খাঁজে পা রেখে-রেখে মাথায় উঠলুম। ফুট-দশেক চওড়া জায়গা জুড়ে ঘন ঝোপ। তিন-শিঙে ছাগল যেখানে মুখ বের করেছিল, সেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। নীচে থেকে কর্নেল বললেন, "গর্ত দেখতে পাচ্ছ কি?"

এমনভাবে বললেন, যেন নিজেও একবার উঠে আবিষ্কার করে গেছেন। হাসতে-হাসতে বললুম, "গর্ত নয়। কুয়ো।"

কর্নেল উত্তেজিতভাবে বললেন, "সিঁড়ি আছে দ্যাখো!"

"আছে!"

"নির্ভয়ে নেমে যাও।"

"পাগল!"

"পাগল না ডার্লিং, ছাগল।"

"কী যা-তা বলছেন?"

"ছাগল নেমে গেছে যখন, তখন তুমিও নামতে পারো। কুইক!"

কথাটা মনে ধরল। সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলুম। একটু পরে ঘুরঘুটে আঁধার। সেই আঁধারে আবার ব্যা-ডাক শুনতে পেলুম। পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বেলে দেখলুম সিঁড়ির নীচে সমতল পাথর-বাঁধানো মেঝে। একটা করে দেশলাইকাঠি জ্বালি আর সেই আলোয় ভয়ে-ভয়ে পা ফেলি। তিনকড়িচন্দ্র খুঁড়িয়ে হাঁটছে যখন, তখন এই দুর্গম সুড়ঙ্গপথে তার হামলার আশঙ্কা যে নেই, এটাই আমার দুঃসাহসের কারণ। কিছুটা চলার পর সুড়ঙ্গপথ শেষ হল। বাইরের আলো এসে পড়েছে সামনে। আবার সিঁড়ির ধাপ উঠে গেছে ওপরে। এতক্ষণে অস্বস্তি কেটে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলুম। মাথায় ঘন ঝোপ ও লতার বুনোট। সম্ভবত তিনশিঙে ছাগলটির যাতায়াতে সবুজ রঙের বুনোটটি ছেঁদা হয়ে গেছে। সেই ছেঁদা দিয়ে বেরিয়ে দেখি, একটা ছাদবিহীন ভাঙা ঘরের ভেতর এসে পড়েছি। দু'দিকে ভাঙা উঁচু পাঁচিল, একদিকে ধ্বংসস্তূপ, অন্যদিকটায় জঙ্গল।

এইমাত্র কেউ বা কিছু জঙ্গল ভেদ করে চলে গেছে, ঝোপগুলো তখনও দুলছে। ছাগলটাই হবে। সুড়ঙ্গের মুখের দিকে তাকালে বোঝবার উপায় নেই কিছু। মনে হবে ওটা নেহাত আরও সব জঙ্গলের মতো জঙ্গল।

ছাগলটা যেদিকে গেছে বলে সন্দেহ হল, সেদিকেই পা বাড়ালুম। কিন্তু আর এগোনো কঠিন। গুঁড়ি মেরে অবশ্য ঢোকা যায়, এবং চারঠেঙে জন্তুর পক্ষেই খুদে গড়নের জন্য গলিয়ে যাওয়া সম্ভব। কাজেই সে-চেষ্টা ত্যাগ করে ধ্বংসস্তূপের দিকটায় এগিয়ে গেলুম। তারপর কী কষ্টে যে পাথরের স্ল্যাব, ইট আর ঝোপঝাড়লতার ভেতর দিয়ে খোলা সমতল জায়গায় পৌঁছলুম, বলার নয়।

কিন্তু এবার যেদিকে তাকাই, ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি আর একই ধ্বংসস্তূপ। শিবমন্দিরের চূড়া বা তোরণটাও দেখা যাচ্ছে না। একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলুম। ডাকলুম, "কর্নেল! কর্নেল!"

সঙ্গে-সঙ্গে সাড়া এল, "চলে এসো ডার্লিং! ব্র্যাভো!"

দক্ষিণের একটা ভাঙা ঘরের দরজায় প্রাজ্ঞ বন্ধুবর সাদা দাড়ি নেড়ে এবং টুপি খুলে মাথা একটু ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালেন। "মার্ভেলাস, জয়ন্ত! কনগ্রাচুলেশন! তবে এতখানি নার্ভাস হয়ে পড়ার কারণ ছিল না। এই স্তূপটায় উঠে বাইনোকুলারে মাটি ভেদ করে তোমার উদ্ভিদরূপী অভ্যুত্থান দেখেছি। আমি জানতুম, এটাই ঘটবে।"

কর্নেল খোলা জায়গায় নেমে এলেন। বললুম, "জানতেন! কী জানতেন?"

"তোমার এভাবেই অভ্যুত্থান ঘটবে।"

"তার মানে, আপনি বলতে চাইছেন ওই সুড়ঙ্গপথটার কথা, আপনি জানতেন?"

কর্নেল আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "অঙ্ক ডার্লিং! স্রেফ অঙ্ক! পিওর ম্যাথস। তিন তিরেক্কে নয়, নয়-নয়ে একাশি। তবে ব্যাকরণেও অঙ্কের নিয়ম কার্যকর। এক এবং আশি যোগ করলে যেমন একাশি হয়, তেমনি সন্ধি করলেও একাশি হয়। চলো! এবার থানায় গিয়ে হালদারমশাইয়ের খোঁজখবর নেওয়া যাক।"

ধ্বংসস্তূপগুলোর ভেতর দিয়ে কিছুটা এগিয়ে এতক্ষণে দক্ষিণে সেই শিবমন্দিরের ত্রিশূল চোখে পড়ল। হঠাৎ কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন, "তিনকড়িবাবু! তিনকড়িবাবু! আপনার বিছানা স্টেশনে... কী আশ্চর্য!"

এক পলকের জন্য দেখলুম, শিবমন্দিরের পেছন দিকে ছড়ি হাতে ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে সেই তিনকড়িচন্দ্র উধাও হয়ে গেলেন। কর্নেল অট্টহাসি হেসে বললেন, "না—ওঁর দোষ নেই। আসলে সেকালের লোকেরা বড্ড ধাঁধা ভালোবাসতেন। একালে যে হঠাৎ ক্যুইজের হুজুগ উঠেছে, সেও সেই পুরোনো স্বভাবের পুনরুভ্যুত্থান। সভ্যতার এই নিয়ম। পুরোনো বাতিক নতুন করে বারবার যুগে-যুগে ফিরে আসে। কিন্তু সমস্যা হল, কিছু লোক আছে, সভ্যতার ব্যাকরণ বোঝে না। ব্যাকরণ মানে না। তারা হাঁসজারুর পেছনে হন্যে হয়।"

কর্নেলের পুনঃ দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শেষ হল, মন্দির-চত্বর পেরিয়ে টিবির জঙ্গলচেরা সঙ্কীর্ণ নতুন রাস্তার নীচে পিচের সড়কে পৌঁছে। এতক্ষণে পুণ্যার্থীদের ভিড় বেড়েছে। সাইকেলরিকশা তখনই পাওয়া গেল।

কর্নেল বললেন, "থানেমে লে চলো, ভাই! জলদি যানা পড়ে। বখশিস মিলে গা।"

সাইকেলরিকশাওয়ালা ফিক করে হেসে বলল, 'স্যার, চিনতে পারলেক নাই বটেক। আমিই তো তখন সারদের লইয়ে এলাম বটেক।"

কর্নেল বললেন, "তাই বটেক!"

আমি বললুম, "ওহে রিকশাওয়ালা, তোমাদের এই বটেকটা কী বলো তো?"

রিকশাওয়ালা একগাল হেসে বলল, "উটো একটো কথাই বটেক!"

"কথা তো বটেই! কিন্তু..."

"স্যার লিজের মুখেই তো বইললেন বটেক।"

কর্নেল গম্ভীর মুখে মন্তব্য করলেন, "বুঝলে না? বটে তো বটেই বটেক!"...

থানার সামনে রিকশা দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা গেট দিয়ে ঢুকলুম। দু'ধারে ফুলে-ফুলে ছয়লাপ। বললাম, "রূপগঞ্জের ব্যাপার! খুব রূপসচেতন। খালি ফুল আর ফুল। থানাতেও ফুল! খুনে-বদমাশ চোর-জোচ্চোরদের ধরে এনে ফুল শোঁকানো হয় মনে হচ্ছে।"

থানাঘরে ঢুকতেই একজন পুলিশ-অফিসার কর্নেলকে দেখে চেয়ার ছেড়ে প্রায় লম্ফ দিলেন। "হ্যাল্লো কর্নেলসায়েব, আসুন, আসুন। ও.সি. সায়েব এখনই আপনার কথা বলছিলেন।"

অফিসারটি পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। দত্যিদানোর মতো প্রকাণ্ড এবং গুঁফো অফিসার-ইন-চার্জ ভদ্রলোকও অনুরূপ লম্ফ দিয়ে হাত বাড়ালেন। পেল্লায় ধরনের হ্যান্ডশেকের পর বিকট অট্টহাসিতে কানে তালা ধরে গেল। বললেন, "কল্যাণবাবুকে এখনই বলছিলুম, এলে নিশ্চয় ইরিগেশন বাংলোয় উঠবেন। দেখুন তো খোঁজ নিয়ে। কাল ডি. জি-সায়েবের ট্রাঙ্ককল পেয়েই বুঝে গেছি, সিরিয়াস কেস। কাল ট্রেনও দু'ঘণ্টা লেট ছিল। স্টেশনে স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক মোতায়েন ছিল।"

বলে বড়বাবু বসলেন। কর্নেল বললেন, "হালদারমশাইয়ের খবর?"

বড়বাবু বেজার মুখে বললেন, "ওরা তেমন সন্দেহজনক কাউকে তো দেখতে পায়নি। পাগলাবাবুকে কেউ ফলো করেনি। হালদারবাবুর চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছেন ডি. জি-সায়েব, তেমন কাউকে দেখা যায়নি।"

আমি বললুম, "ছদ্মবেশ ধরার বাতিক আছে ওঁর।"

বড়বাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "আপনিই আশা করি সেই সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী? কর্নেলের মুখে আপনার কথা শুনেছি। ভালো, খুব ভালো। কিন্তু আপনি তো ভাবিয়ে তুললেন দেখছি!"

কর্নেল বললে, "মিঃ হাটি, মন্দিরের ত্রিশূলের রক্তের দাগ সম্পর্কে ফরেনসিক রিপোর্ট পেয়েছেন কি?"

"আজ সকালে পেয়েছি। মানুষেরই রক্ত। তার চেয়ে সমস্যা, নকুলবাবুর ব্লাড-গ্রুপের সঙ্গে মিলে গেছে।"

শুনেই আঁতকে উঠলুম। বললুম, "তা হলে ওই ত্রিশূলেই নকুলবাবুকে..."

আমার কথায় বাধা দিয়ে বড়বাবু মিঃ হাটি বললেন, "ওই ত্রিশূল ওপড়ানোর সাধ্য মানুষের নেই। তবে স্বয়ং মহাদেবের থাকতে পারে।" বলে আবার সেই দানবীয় অট্টহাসি হাসলেন। হাসি তো নয়, মেঘের ডাক। তার আওয়াজে যেন ভূমিকম্পও হচ্ছিল। অন্তত তাঁর শরীরে সেই কাঁপুনি দেখে তাই মনে হয়।

কর্নেল বললেন, "মন্দিরটা দেখলুম খুব উঁচু। তা ছাড়া চূড়াটা ছুঁচলো এবং শ্যাওলায় পিছল হয়ে আছে। উঁচু মই ছাড়া ওঠাও অসম্ভব। ত্রিশূলে নকুলবাবুর রক্ত কী করে মাখানো হল?"

মিঃ হাটি গুম হয়ে বললেন, "এটাই আশ্চর্য! আমরা ফায়ারব্রিগেড আনিয়ে ত্রিশূল থেকে রক্তের নমুনা নিয়েছিলুম। ফায়ারব্রিগেডের মই ছাড়া চূড়োয় ওঠা যেত না। কল্যাণবাবুও উঠেছিলেন চূড়োর চারদিক পরীক্ষা করতে। সাধারণ মই দিয়ে উঠলে মইয়ের ডগার দাগ পড়ত।"

কল্যাণবাবু বললেন, "কোনো দাগ দেখতে পাইনি। তবে এক হতে পারে, লম্বা বাঁশের মাথায় রক্তমাখা তুলো বেঁধে ত্রিশূলে ঘষে দিয়েছিল খুনি। কিন্তু ভালোভাবে পরীক্ষা করেছি, ত্রিশূলে তুলোর আঁশ লেগে নেই। এমনকি, ত্রিশূলের গা বেয়েও রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে পড়েনি। চূড়োতেও রক্তের ফোঁটা নেই কোথাও। তন্নতন্ন খুঁজেছি।"

আমি বললুম, "ন্যাকড়ায় রক্ত মাখিয়ে..."

আবার বাধা পড়ল হাটিবাবুর বিকট অট্টহাস্যে। বললেন, "তা হলে তো মশাই রক্তের ফোঁটায় চূড়ো একাকার হয়ে থাকত। তুলো রক্ত শুষে নেয়। ন্যাকড়া অত শুষতে পারে কি? ভেবে বলুন।"

হাবা বনে বসে রইলুম। কর্নেল বললেন, "কিন্তু আমার ভাবনা প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের জন্য। এই দেখুন।" বলে কর্নেল পকেট থেকে সচ্ছিদ্র চিরকুটটা বড়বাবুর হাতে দিলেন। "বাংলোর গেটের বাইরে একটা কাঁটাঝোপে এটা লটকানো ছিল।"

ছড়াটা পড়ে পুনঃ বিকটহাস্যের জন্য রেডি হয়েই বড়বাবু মিঃ হাটির মুখ তুম্বো হয়ে গেল। ভুরু বেজায় কুঁচকে গোঁফ চুলকে বললেন, "মন্দিরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ডি. জি-সায়েবের নির্দেশ দিল সাদা পোশাকের পুলিশ রাখতে, অক্ষরে-অক্ষরে তা পালন করেছি। পাঁঠাগুলোর দিকে লক্ষ রাখতে বলেছিলুম। তিন শিঙে পাঁঠা বলির জোগাড় দেখলেই যেন বমাল আসামি ধরে থানায় পাঠায়। কিন্তু এখনও তেমন কিছু ঘটেনি। নরবলি তো দূরস্থান!"

কর্নেল বললেন, "রাতেও আশা করি পুলিশ ছিল?"

"আলবাত ছিল," মিঃ হাটি জোর গলায় বললেন, "নরবলি যে হয়নি, সেটার গ্যারান্টি দিতে পারি। কাজেই এটা স্রেফ হুমকি।"

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "অন্য কোনো মন্দিরেও তো... মানে, ওদিকটা অনেক ভাঙাচোরা মন্দির দেখলুম। যদি হালদারমশাইকে..."

বড়বাবুর শেষদফা আটকে-রাখা বিকট হাস্যটির বিস্ফোরণ ঘটল। পরিশেষে প্রকাণ্ড মুণ্ড জোরে নেড়ে বললেন, "এখন পর্যন্ত ওই এরিয়া কেন, কোথাও কোনো ডেডবডির খবর নেই। ডি. জি-র ট্রাঙ্ককল পেয়েই আমরা অ্যালার্ট, রেড সিগন্যাল বোঝেন তো?"

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন, "আচ্ছা মিঃ হাটি, তিনকড়িচন্দ্র ধাড়াকে চেনেন?"

মিঃ হাটির ভুরু বেশ পুরু। কুঁচকে তাকালেন কল্যাণবাবুর দিকে।

কল্যাণবাবু বললেন, "কেন? করালীবাবুর আত্মীয়...সেই স্মাগলার স্যার! জাহাজে চাকরি করে। ...সরডিহির রাজবাড়ির মন্দির থেকে সোনার ঠাকুর চুরির কেসের মূল আসামি ছিল। আইনের

ফাঁকে ছাড়া পেয়ে নিপাত্তা হয়ে গেল। এক মিনিট। কেসের ফাইলটা খুঁজে আনছি।" কল্যাণবাবু সবেগে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনার একটু সাহায্য এখনই চাই মিঃ হাটি!"

"অবশ্যই পাবেন। বলুন!"

"আমি শিবমন্দিরের ভেতরটা একবার দেখতে চাই। ভক্তদের সেন্টিমেন্টে আঘাত লাগতে পারে। সেজন্যই পুলিশের সাহায্য ছাড়া এ-কাজটা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।"

বড়বাবু হাঁকলেন, "কল্যাণবাবু, ফাইল পরে হবে। প্লিজ, চলে আসুন!" ...বলে কর্নেলের দিকে ঘুরে বললেন, "মার্ডার কেস! ধম্মকম্ম নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই, কর্নেলসায়েব! ভগবান আছেন, মাথায় থাকুন। আর স্বয়ং ভগবানই বলেছেন কি না 'যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানি...' এট্‌সেট্‌রা এট্‌সেট্‌রা!"

পুনঃ ভূমিকম্পসদৃশ বিকট অট্টহাস্য! বাপ্‌স! পুলিশকে এমন হাসতে কখনও দেখিনি। এই ভদ্রলোক যদি চোর-জোচ্চোরকে বেটনের গুঁতোর বদলে এই সাঙ্ঘাতিক হাসির গুঁতো মারেন, সঙ্গে-সঙ্গে পেটের কথা উগরে দেবে। মারমুখী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাসের বদলে এঁর লাফিং গ্যাস প্রয়োগ করলে অনেক বেশি কাজ হবে সন্দেহ নেই।

কল্যাণবাবু থানার সেকেন্ড অফিসার। সঙ্গে দু'জন সশস্ত্র সেপাই। গেটে রিকশাওয়ালা অপেক্ষা করছিল। কর্নেল এবং আমার সঙ্গে এবার পুলিশ দেখে আঁতকে উঠে সে কেটে পড়তে যাচ্ছিল। কর্নেল মধুর হেসে তার হাতে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে সম্ভাষণ করলেন, "এই যে ভাই! ভাড়া আর ওয়েটিং চার্চ তো লিবেই বটেক।"

রিকশাওয়ালা ভয়ে-ভয়ে টাকাটা নিয়ে পালিয়ে যেতে এক সেকেন্ড দেরি করল না। একজন সেপাই মুচকি হেসে বলল, "বহত্‌ কামাতা শিউজিকা কিরপাসে।"

পুলিশের জিপে এবার তিন মিনিটেই পৌঁছে গেলুম। জিপ রাস্তায় রইল। কর্নেল বললেন, "একজন কনস্টেবল জিপের কাছে থাক, কল্যাণবাবু!"

কল্যাণবাবু বললেন, "কোনো দরকার নেই, কর্নেল! এ আপনার কলকাতা শহর নয়। দেহাতি গঞ্জ। এখানে পুলিশ কেন, পুলিশের জুতোকেও ভয় পায় লোকেরা। রাস্তায় ফেলে গেলেও ছোঁবে না। তা ছাড়া চাবি!" বলে রিঙের চাবিটা নাড়া দিলেন।

মন্দিরে বলিদান চলেছে। তেমনি ঢাক বাজছে। এখন ভিড়টা বেশ বেড়েছে। আমাদের দেখে তিড় থেকে দু'জন তাগড়াই চেহারার লোক বেরিয়ে এল। বুঝলুম, সাদা পোশাকের পুলিশ। কল্যাণবাবু মন্দিরের উঁচু বারান্দায় উঠলেন। পাণ্ডারা এবং তাদের দলপতি গেরুয়াধারী সেই সাধু-সন্ন্যাসী চেহারার লোকটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। জুতো খুলে রেখে আমরা ভেতরে ঢুকলুম। মন্দিরের ভেতরটা চওড়া। ভাঙাচোরা শিবলিঙ্গে প্রচুর সিঁদুর মাখানো হয়েছে। কর্নেল পকেট থেকে টর্চ জ্বেলে ছাদে আলো ফেললেন। চোখে বাইনোকুলার স্থাপনও করলেন।

একটু পরে টর্চ নিবিয়ে এবং বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, "হুঁ! বোঝা গেল।"

কল্যাণবাবু বললেন, "কী বোঝা গেল, কর্নেল?"

"মই বাইরে ব্যবহার করা যায়নি। কারণ অত উঁচু মই জোগাড়ের সমস্যা ছিল। কিন্তু মন্দিরের মেঝে উঁচু। একটা বিশ ফুট মই যথেষ্ট। বিশেষ করে এই লিঙ্গের বেদিতে যদি মইয়ের গোড়া রাখা যায়, মাত্র ফুট-পনেরো মই হলেই চলে।" বলে বেদির পেছনে টর্চের আলো ফেললেন। পকেট থেকে এবার একটা আতস কাচ বের করে ঝুঁকে পড়লেন। তারপর সোজা হয়ে ফের বললেন, "হুঁ, বেদিতেই মইয়ের গোড়া দুটো রাখা হয়েছিল। পাথরে গোল দুটো ধুলোর ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে এখনও। জল ঢেলে মন্দিরের ভেতরটা পরিষ্কার করার তর সয়নি। খুনের পরদিনই তাড়াহুড়ো করে

পুজো আর বলির আয়োজন করা হয়েছিল। হিসেবি মাথার কাজ, কল্যাণবাবু! স্টার্ট করে দিলেই পুজো আর বলিদানের মেশিন চলবে, জানা কথা। কিন্তু এটাই আশ্চর্য ব্যাপার, অপরাধী নিজের অজ্ঞাতে কিছু সূত্র রেখে যাবেই।"

কল্যাণবাবু হাঁ করে শুনছিলেন। বললেন, "ব্যাপারটা কী, খুলে বলুন তো।"

কর্নেল হাসলেন। "আপনিই তো দমকলের মইয়ে চূড়োয় উঠেছিলেন। ত্রিশূলের গোড়ায় গোল লোহার চাকতি আঁটা আছে, কী করে আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল?"

কল্যাণবাবু যেন একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "দৃষ্টি এড়াবে কেন? গোল প্রায় সাত-আট ইঞ্চি ব্যাসের লোহার চাকতি আঁটা আছে। তার সেন্টার থেকে ত্রিশূলটা উঠে গেছে।"

কর্নেল কৌণিক ছাদের কেন্দ্রে ফের টর্চের আলো ফেলে বললেন, "দেখুন, তলাতেও অমনি একটা লোহার গোল চাকতি আঁটা। চাকতিটা নতুন! মরচে ধরেনি!"

"মাই গুডনেস!" নড়ে উঠলেন কল্যাণবাবু। "ওপরের চাকতিটাও মরচে-ধরা ছিল না। কিন্তু..."

"কল্যাণবাবু হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, "তাই তো! আসলে আমি রক্তের দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়েছিলুম।"

"ঠিক তাই। আপনার দৃষ্টি ছিল তৎকালীন উত্তেজক বস্তুর একমাত্র লাল রং, অর্থাৎ রক্তের মতো জিনিসটার দিকেই।" কর্নেল টর্চ নিভিয়ে বললেন। "এমন সুপ্রাচীন মন্দিরের ত্রিশূল মরচে ধরে আস্ত থাকার কথা নয়—যদি না সেটা বিখ্যাত জাহানকোশা তোপ বা কুতুবমিনারের প্রাঙ্গণে স্তম্ভটার মতো বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি লোহা হয়। এ-ত্রিশূল সেই লোহার নয়। বাইনোকুলারে ত্রিশূল এবং ওই চাকতিতে টাটকা পেটাইয়ের দাগ স্পষ্ট। ডগা খুব তীক্ষ্ণ। তবে চাকতি বলছি, জিনিসটা চাকতি নয়। ওটা ঘুড়ির লাটিমের গড়ন সচ্ছিদ্র একটুকরো লোহা। ত্রিশূলটা স্ক্রু'র মতো ওতে পেঁচিয়ে ঢোকানো আছে। প্রাচীন যুগের বহু মন্দিরে এই পদ্ধতিতে ত্রিশূল আটকানো রয়েছে। কেন জানেন? পাখির বিষ্ঠা বা ময়লা লাগলে খুলে সাফ করার জন্য। তা ছাড়া মরচে ধরলে যাতে বদলানো যায়, সেও একটা কারণ।"

কর্নেল বেদির পেছনে মেঝেয় টর্চের আলো ফেললেন। "ওই দেখুন, কত মরচে-ধরা লোহার গুঁড়ো পড়ে আছে। মরচে-ধরা প্রাচীন ত্রিশূল তলা থেকে ভেঙেচুরে টেনে বের করা হয়েছে। তারপর একই পদ্ধতিতে নতুন ত্রিশূল তলা দিয়ে ঢুকিয়ে ওপরকার পাথরের গোলাকার খাঁজে আটকে দেওয়া হয়েছে। যাতে ফোকর গলে পড়ে না যায়, লোহার গোঁজ ঠোকা হয়েছে তলা থেকে। ছাদের ঝুলকালির জন্য গোঁজগুলো সহজে চোখে পড়ে না।"

কল্যাণবাবু ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, "কে সে? কার পেটে-পেটে এমন সাঙ্ঘাতিক কুচুটে বুদ্ধি?"

কর্নেল বেরিয়ে গিয়ে বললেন, "এলাকার কামারশালাগুলোতে খোঁজ নিন। তবে আমার মাথায় এখন হালদারমশাইয়ের জন্য ভাবনা। কল্যাণবাবু, এখান থেকে সোজা পশ্চিমে হেঁটে গেলে কি নদীর ধারে পৌঁছব?"

"হ্যাঁ। এই টিবির নীচেই হাইওয়ে, তার নীচে নদী। কি দরকার হাঁটবার? চলুন, জিপে পৌঁছে দিই।"

কর্নেল একটু ভেবে বললেন, "হ্যাঁ, তাই চলুন।"

জিপের কাছে পৌঁছেই কল্যাণবাবু হঠাৎ মুরারিবাবুর মতোই তিড়িংবিড়িং করে জিপটার চারদিকে চক্কর মেরে হুমড়ি খেয়ে সামনের চাকার কাছে বসলেন। বসেই লাফিয়ে উঠলেন। মস্ত একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, "কে সে...শয়তান, আমি তাকে দেখে নেব...এত সাহস!"

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "টায়ার ফাঁসিয়েছে। কারবুরেটর জ্যাম করেছে। ইঞ্জিনের ভেতরকার তার কেটেছে। যাকগে, কল্যাণবাবু, আপাতত বিদায়। আবার দেখা হবে।"

কর্নেল আমার হাত ধরে টেনে হনহন করে হাঁটতে থাকলেন। আমি হতবাক। কিছুটা এগিয়ে একটা সাইকেল-রিকশা দাঁড় করিয়ে কর্নেল বললেন, "মহিন্দার সিংকা গ্যারিজ। তুরন্ত চল্‌না ভাই।"

এই রিকশাওয়ালা 'বটেক'-এর বদলে বলল, "জরুর, চলিয়ে না, যাঁহাপর যানা।"

গ্যারেজে গিয়ে দেখি, শের আলির জিপ রেডি। স্যালুট ঠুকে বলল, "সব ঠিক হ্যায় কর্নিলসাব! মালুম হোতা, কই বদমাশ গ্যাংকা কুছ খতরনাক মতলব হ্যায়। উও আপকো হেঁয়া ঘুমনা পসন্দ্‌ নেহি করতা।"

অজানা আতঙ্কে বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল।

পাঁচ

উত্তরের উজানে ব্যারেজ এবং জলাধারের দরুন এখানে নদীটার দশা করুণ। বুকে বড়-বড় পাথর নিয়ে ক্ষতবিক্ষত চেহারায় পড়ে আছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনসূত্রে পাওয়া দয়ার দান সামান্য জলে এত গভীর নদীকে বড্ড গরিব দেখাচ্ছে! হাইওয়ের ধারে একটা বটতলায় জিপ দাঁড় করিয়ে কর্নেল শের আলিকে বললেন, "ফিরতে দেরি হবে। তুমি বরং চলে যাও। বিকেল চারটে নাগাদ বাংলোয় যেও।"

শের আলি স্যালুট ঠুকে জিপ নিয়ে চলে গেল। আমরা টিবিতে উঠে গেলুম। খানিকটা খোলামেলা জায়গায় দাঁড়িয়ে কর্নেল বললেন, "দেখো, দেখো! রামধনুর জেল্লা দেখো। ওই গাছগুলোর ডালে ফুলন্ত রেনবো অর্কিডের ঝাঁক দেখতে পাচ্ছ না? সূর্যের আলো তিনটে পাপড়ির ভেতর দিয়ে সাতটা রঙে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তিনটে পাপড়ি নয়, যেন তিনটে প্রিজম্‌।"

সত্যিই মুগ্ধ হওয়ার মতো দৃশ্য। বললুম, "ছবি তুলে নিন। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার কৃষির পাতায় ছাপিয়ে দেব। তবে আমারও লোভ হচ্ছে। একটা অর্কিড স্যুভেনির হিসেবে নিয়ে যেতুম। কিন্তু অত উঁচুতে ওঠা তো অসম্ভব। বিট্টুকে কিংবা মুরারিবাবুকে পেলে ভালো হত।"

কর্নেল একটা প্রকাণ্ড গাছের দিকে এগিয়ে গেলেন। গাছটার ডালে-ডালে প্রচুর রেনবো অর্কিড। আপন মনে বললেন, "এও সংখ্যাতত্ত্বের লীলা। তিনটে পাপড়ি। ঘুরে-ফিরে সেই তিনের অঙ্ক।"

বললুম, "কিন্তু তিন তিরেক্কে নয় হচ্ছে না। সাতটা রং!"

"উঁহু! ভুল করছ, ডার্লিং!" কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, "তিন সাত্‌তে একুশ। দুইয়ের পিঠে এক একুশ। এবার দুই প্লাস এক সমান তিন। অঙ্ক ডার্লিং, অঙ্ক! প্রকৃতি অঙ্কের মাস্টারমশাই।"

কর্নেল গাছটার ওপাশে গিয়ে হঠাৎ বললেন, "কী আশ্চর্য!" তারপর মুখ তুলে গাছের ডালপালা দেখতে থাকলেন। কাছে গিয়ে দেখি একজোড়া ছেঁড়াফাটা তাপ্পিমারা পামপশু। কর্নেল বললেন, "লক্ষণ ভালো নয়। জুতো খুলে রেখে মুরারিবাবু এই গাছে চড়েছিলেন। কিন্তু গাছে তো উনি নেই!" বাইনোকুলারে চারদিকে ঘুরে গাছগাছালি তল্লাশ শুরু করলেন। আমি অবাক।

অবাক এবং উদ্বিগ্ন। বিট্টুকে মুরারিবাবু ডাকতে গিয়েছিলেন নকুলবাবুর বাড়ি থেকে। তারপর এতক্ষণে এই গাছের তলায় ওঁর জুতো! অথচ ওঁর পাত্তা নেই। ভারী অদ্ভুত ঘটনা। ডাকলুম, "মুরারিবাবু, মুরারিবাবু!"

কর্নেল চাপাস্বরে বললেন, "চুপ!" তারপর হন্তদন্ত এগিয়ে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করলুম। ঘন জঙ্গল আর ধ্বংসস্তূপ, উঁচু-নিচু গাছ, ঝোপঝাড়ের ভেতর নানা গড়নের পাথরের স্ল্যাব—এই

তা হলে সেই রাজা শিবসিংহের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। দিনের বেলায় এখানে গাঢ় ছায়া। হাওয়ায় ভুতুড়ে গা-ছমছম করা কত রকমের বিদঘুটে শব্দ। একখানে একটা বৌদ্ধ স্তূপের গড়নের গোলাকার প্রকাণ্ড পাথর। গর্তের মতো একটা জায়গা। দরজার ভাঙাচোরা ফোকর। মুখে ঝোপ গজিয়ে আছে। এতক্ষণে কানে এল ফোঁস-ফোঁস গোঁ-গোঁ অদ্ভুত সব শব্দ। কর্নেল ফোকরের মুখের কাছে গিয়ে ঝোপ সরিয়ে টর্চের আলো ফেললেন ভেতরে। তারপর বললেন, "মুরারিবাবু! ওখানে কী করছেন?"

আবার ফোঁস-ফোঁস, যেন নাক ঝাড়ছেন মুরারিবাবু। কিন্তু গোঁ-গোঁ করছেন কেন? কর্নেলের পাশে গিয়ে উঁকি মেরে দেখি, মুরারিবাবু একটা পাথরের চাঁই নড়ানোর চেষ্টা করছিলেন। ফিসফিসিয়ে ডাকলেন, "আসুন, আসুন, হাত লাগান!"

কর্নেলের পেছন-পেছন ঢুকে গেলুম। মুরারিবাবু হাঁপাচ্ছেন। ফোঁস-ফোঁস শব্দ করে বললেন, "তিন তিরেক্কে নয়। নয় নয়ে একাশি।"

কর্নেল পাথরের চাঁইটার ওপর টর্চের আলো ফেলে বললেন, "আপনি কি গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছেন মুরারিবাবু?"

মুরারিবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, "হ্যাঁ, আলো নেভান। হাত লাগান। ঝটপট। ওরা এসে পড়লেই কেলেঙ্কারি।"

বলে আবার হাত লাগিয়ে ফোঁস-ফোঁস, গোঁ-গোঁ শব্দে ঠেলতে শুরু করলেন। কর্নেলের ইশারায় আমিও অগত্যা হাত লাগালুম। উত্তেজনায় প্রায় কম্পমান অবস্থা। তিনজনের ঠেলাঠেলিতে পাথরের চাঁইটা ওপাশের নিচু জায়গায় গড়িয়ে পড়ল। একটা প্রকাণ্ড গর্ত দেখা গেল। মুরারিবাবু বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ার মতো আওড়ালেন, "তিন তিরেক্কে নয়, নয় নয়ে একাশি। আটের পিঠে এক একাশি। তা হলে আট আর একে ফের পাচ্ছি নয়। নয় বিভক্ত তিন। ভাগফল তিন।"

কর্নেল টর্চের আলো ফেললেন গর্তের ভেতর। ফুট পাঁচ-ছয় নীচে উর্ধ্বমুখী একটা মাথা—মানুষেরই মাথা এবং জ্যান্ত মাথা। প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে আমাদের দেখছে। মুখে টেপ সাঁটা।

ক্রমে চোখে পড়ল পিঠমোড়া করে দুটো হাত বাঁধা। পা দুটো খোলা। কিন্তু যোগীর আসনে যেন বসে রয়েছে। মুরারিবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, "ধ্যাত্তেরি, কিসের বদলে কী! একাশির বদলে এক!"

কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত, নামো। হালদারমশাইকে ওঠাও।"

হালদারমশাই? এতক্ষণে ভ্যাবাচাকা কেটে গেল। বললুম, "কী সর্বনাশ! তা নামবার দরকার কী? হালদারমশাই, উঠে পড়ুন।"

হালদারমশাই জোরে মাথা নাড়লেন। কর্নেল ব্যস্তভাবে বললেন, "দেরি কোরো না, জয়ন্ত! নেমে গিয়ে ওঁকে ওঠাও। কী মুশকিল! বুঝতে পারছ না পিঠমোড়া করে হাত-বাঁধা অবস্থায় বসিয়ে রাখলে নিজের থেকে সোজা হয়ে ওঠা যায় না?"

তাই বটে। এক লাফে নেমে গেলুম চওড়া গর্তটাতে। হালদারমশাইকে টেনে দাঁড় করালুম। দড়ির বাঁধন খুলে দিলুম। হালদারমশাই হাত দুটো ঝাঁকুনি দিয়ে এক লাফে গর্তের কিনারা আঁকড়ে ধরে চমৎকার উঠে পড়লেন। আমিও উঠে এলুম। অনেক চেষ্টায় ওঁর মুখের টেপ ছাড়ানো গেল। সেটা পকেটস্থ করার পর কর্নেল বললেন, "পরে কথা হবে। পাথরটা গর্তের মুখে চাপা দিতে হবে। আসুন, হাত লাগান সবাই!"

এবার একটু বেশি পরিশ্রমই হল। ওজনদার পাথরটা নিচু জায়গা থেকে উঁচুতে গড়িয়ে তুলতে ঘেমে একাকার। হালদারমশাইয়ের হাতে ব্যথা। তবু হুম-হুম শব্দে সবিক্রমে হাত লাগিয়েছেন। পাথরটা আগের মতো গর্তের মুখে রেখে আমরা বেরিয়ে গেলুম।

মুরারিবাবু 'জুতো' বলে ছিটকে দলছাড়া হয়ে গেলেন। সেই গাছটার তলায় গিয়ে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হল। তাঁর মুখের ভঙ্গিতে বিরক্তি আর নৈরাশ্য। বললেন, "বিট্টুকে তাড়া করে এসে হারিয়ে ফেলেছিলুম। এই গাছটা বেশ উঁচু। মগডালে চড়ে ছেলেটাকে খুঁজছি, হঠাৎ দেখি ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে হতচ্ছাড়া তিনকড়িদা আসছে। হাতে ছড়ি। কোথায় কার মার খেয়ে ঠ্যাং ভেঙেছে...তিন তিরেক্কে নয়, নয় নয়ে একাশির কারবার। অঙ্কে ভুল হলেই গেছ!... সঙ্গে দুটো লোকের কাঁধে বস্তা!"

হালদারমশাই দ্রুত বললেন, "বস্তার ভেতর আমি।"

মুরারিবাবু বাঁকা মুখে বললেন, "আমি ভাবলুম সোনার মোহরভর্তি ঘড়া। তাই নিয়ে ভেতরে ঢুকল। একটু পরে খালি বস্তা নিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর গাছ থেকে নেমে দৌড়ে চলে গেলুম। গর্তটা দেখেছি। পাথরটাও দেখেছি। গর্ত আর পাথর একসঙ্গে দেখিনি। কাজেই গর্ত এক, পাথর এক, আর খালি বস্তা এক। একুনে হল তিন।"

কর্নেল চুরুট ধরাচ্ছিলেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "আমরাও এখন তিন, মুরারিবাবু!"

মুরারিবাবু চিন্তিতমুখে বললেন, "তা হলে সোনার মোহরভর্তি ঘড়া পাওয়া উচিত। পাচ্ছি না কেন বলুন তো?"

"পাওয়ার চান্স আছে," কর্নেল বললেন, "যদি প্লিজ অন্তত গোটা-তিন অর্কিড আমাকে পেড়ে দিতে পারেন। ওই দেখুন, ওইগুলো। দেখতে পাচ্ছেন তিনটে করে পাপড়ি? দা নম্বর থ্রি!"

মুরারিবাবু জুতো খুলে তড়াক করে হনুমানের মতো দিব্যি গুঁড়ি আঁকড়ে গাছে উঠে গেলেন। কর্নেল তাঁকে আঙুল দিয়ে কোনটা পাড়তে হবে দেখাতে থাকলেন।

এবার হালদারমশাইয়ের দিকে মনোযোগ দিলুম। জামা ছিঁড়ে গেছে। প্যান্ট অবশ্য অটুট আছে। কিন্তু ধুলোকাদায় নোংরা। মুখে এতক্ষণে রাগের ছাপ স্পষ্ট হয়েছে। বললেন, "ব্যাটারা আবার নস্যির কৌটোটা পকেট সার্চ করে খামোখা কেড়ে নিল, এ-দুঃখ আর রাগ জীবনে ঘুচবে না। বলে, কি, নস্যি নিলেই হাঁচবে। হাঁচলে লোকে সাড়া পাবে। ভাববে বস্তার ভেতর হাঁচি কেন?...জানেন? বস্তার ফুটো দিয়ে দেখছি, দিনদুপুরে রাস্তাঘাট, বাজার, মানুষজন—সব। পুলিশ পর্যন্ত! একজন ব্যাপারি গোছের লোক জিজ্ঞেস করল, কী মাল দাদা? ব্যাটারা বলল, কুমড়ো। ছিরুবাবুর ছেরাদ্দর ভোজ-কাজ হবে। কিনে নিয়ে যাচ্ছে। ...উঃ, জয়ন্তবাবু, হেনস্থার একশেষ।"

"আপনাকে কীভাবে ধরল ওরা?"

"আর বলবেন না। আমারই বোকামি।" হালদারমশাই শ্বাস ছাড়লেন। "এই গেছো-ভদ্রলোককে ফলো করে তো এলুম। কী খেয়াল হল, স্টেশনের রিটায়ারিং রুমের দোতলায় একটা সিঙ্গল রুম বুক করলুম। তারপর রেল-ক্যান্টিনে খাওয়াদাওয়া করে সন্ধে সাতটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লুম। মুরারিবাবুর বাড়ির খোঁজ করে শুনি, তাঁর আদতে বাড়িই নেই। তখন শিবমন্দিরে গেলুম। হ্যাজাক জ্বেলে বলিদান হচ্ছে। ঢাক বাজছে। তদন্ত শুরু করলুম। একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, কোথায় বাবা মহাদেব ত্রিশূল মেরে মানুষের রক্ত খেয়েছেন যেন? সে বলল, চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি। ওদিকটা অন্ধকার। পা বাড়িয়ে মনে পড়ল, ওই যাঃ! রেলের রেস্টরুমে ব্যাগের ভেতর রিভলভারটা ফেলে এসেছি। তো কী আর করব! খানিকটা গেছি, লোকটা বলে উঠল—একাশি! আর সঙ্গে-সঙ্গে কারা আমাকে ধরে ফেলল। তারপরই মুখে টেপ। পিঠমোড়া

করে বেঁধে এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা বাড়িতে ঢোকাল। বাড়িটাতে লোকজন নেই। অন্ধকার। একটা ঘরে ঢুকিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল।"

"পিঠমোড়া করে বাঁধা অবস্থায়?"

হালদারমশাই করুণ হাসলেন। "না। বাঁধন খুলে খাটের বিছানার সঙ্গে মড়াবাঁধা করে বাঁধল। সেই যেমন 'কাকতাড়ুয়া' কেসে কাটরার শ্মশানে বেঁধেছিল, ঠিক তেমনি। তারপর সারাটা রাত ওইভাবে..."

হঠাৎ কর্নেল বললেন, "চুপ!" তারপর ইশারায় গাছটার পেছনে ঝোপের আড়ালে লুকোতে বললেন। নিজেও এসে ঘাপটি পেতে বসলেন আমাদের সঙ্গে।

দেখলুম, ওদিকে জঙ্গলের ভেতর স্তূপটার দিকে এগিয়ে চলেছে চারজন লোক। একজন সেই তিনকড়িচন্দ্র—হাতে ছড়ি, দু'জন ষণ্ডামার্কা লোক, অপরজন সেই সন্ন্যাসীবেশী লোকটা, সে মন্দির প্রাঙ্গণে নেচে-নেচে গান গাইছিল। কিন্তু এখন তার হাতে একটা চকচকে ধারালো খাঁড়া। হালদারমশাইকে শিউরে উঠে চোখ বুজতে দেখলুম। আমিও আঁতকে উঠে চোখ বুজেছিলুম, আর দেরি করলে কী হত ভেবেই। কর্নেল মিটিমিটি হাসছিলেন।

গাছের ডগা থেকে মুরারিবাবুও ওদের দেখতে পেয়েই চুপ করে গেছেন। ডালের সঙ্গে সেঁটে রয়েছেন কাঠবেড়ালির মতো।

দীর্ঘ মিনিট-পাঁচেক পরে তিনকড়িচন্দ্রকে আবার দেখা গেল। মুখে রোদ পড়েছে, সেজন্যও নয়, রাগে ও ব্যর্থতায় মুখটা দাউদাউ জ্বলছে। সন্ন্যাসীবেশী লোকটা খাঁড়ার উলটো দিক কাঁধে রেখে দাঁত কিড়মিড় করছে। ষণ্ডামার্কা লোক দুটো হাত-মুখ নেড়ে কী বলছে এতদূর থেকে শোনা যাচ্ছে না।

তারপর তারা খোলামেলা জায়গাটার দিকে এগিয়ে এল। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল, মুরারিবাবুর জুতো দুটো চোখে পড়লে ওরা কী করবে? কিন্তু কিছুটা এগিয়ে আসতেই কর্নেল অদ্ভুত গলায় শব্দ করলেন, "ব্যা-অ্যা-অ্যা!"

অমনি প্রথম খাঁড়াধারী সন্ন্যাসী লোকটা "ওরে বাবা!" বলে আর্তনাদ করে দৌড়ে পালিয়ে গেল। ষণ্ডামার্কা লোক দুটোও আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে দুই দিকে ঝোপজঙ্গল ফুঁড়ে উধাও হয়ে গেল। তিনকড়িচন্দ্র হকচকিয়ে গিয়েছিল প্রথমে। কর্নেল আবার "ব্যা-অ্যা" ডাক ডাকতেই সেও ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে পিটটান দিল।

তারপর যা ঘটল, তা আরও তাজ্জব ঘটনা। মুরারিবাবু তরতর করে গাছ থেকে নেমে এসে জুতো দুটো হাতে নিলেন এবং "এ ব্যা তো সে ব্যা নয়", বলে দৌড়ুলেন। চোখের পলকে তিনিও উধাও হয়ে গেলেন।

কর্নেল বললেন, "হুঁ, ব্যা-করণ রহস্য।"

আমি বললুম, "পাগল, পাগল।"

হালদারমশাই বললেন, "ছাগল, ছাগল!"

কর্নেল উঠে গিয়ে মুরারিবাবুর পেড়ে দেওয়া দুটো অর্কিড কুড়িয়ে পরীক্ষা করে দেখে বললেন, "নাঃ! ছিঁড়ে ফেলেছেন গোড়াটা। এভাবে অর্কিড বাঁচানো যায় না। যাকগে, পরে দেখা যাবে। চলুন হালদারমশাই, আপাতত এই পর্যন্ত। ফেরা যাক।"

হাইওয়েতে নেমে কর্নেল হালদারমশাইয়ের বৃত্তান্তটি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন, "এবেলা বরং আমার গেস্ট হোন। রেস্ট নিয়ে তারপর রেস্টরুম থেকে আপনার ব্যাগ-ট্যাগ নিয়ে আসবেন। জিপের ব্যবস্থা করা যাবে।"

হালদারমশাই মাথা নেড়ে মাতৃভাষায় বললেন, "না, কর্নেলস্যার! এখনই রেস্টরুমে যাইয়া ব্যাগটা লইয়া আসি। আমার খাবারটা রেডি রাইখ্যেন বরং। উইপ্ন্ হাতে না লইয়্যা বারাইলে কী হয়, ট্যার পাইছি।"

বলে হনহন করে আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। কর্নেল বললেন, "ভাগ্যিস নকুলবাবুর নোটবইটাতে ওই স্তূপটার উল্লেখ ছিল এবং গর্তটার কথাও লেখা ছিল। নইলে সত্যিই হালদারমশাই বলি হয়ে যেতেন! আসলে আমি ভেবেছিলুম কথামতো ওঁকে অ্যারেস্ট করে থানার লক-আপে সাদরে রাখা হবে, ওঁর নিরাপত্তার জন্যই। কিন্তু থানায় গিয়ে দেখলুম তা করা হয়নি। থানায় আমার যাওয়া অবধি ওঁর বেঁচে থাকার চান্স পুরোপুরি ছিল অবশ্য। কিন্তু আমি মন্দিরে গিয়ে যখন ত্রিশূল রহস্য ফাঁস করছি, তখন লক্ষ করলুম, দরজার কাছে কান পেতে ওই সন্ন্যাসী লোকটি আমার কথা শুনছে। অমনি মনে হল, এবার বন্দী হালদারমশাইয়ের বিপদ আসন্ন। ওরা ধরেই নিয়েছে বা কলকাতা পর্যন্ত মুরারিবাবুকে ফলো করে টের পেয়েছে, আমরা যাচ্ছি এবং হালদারমশাই আমাদেরই লোক।"

বললুম, "তা হলে মন্দির থেকে সোজা স্তূপে এলেন না কেন?"

কর্নেল আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "তোমাকে বরাবর বলেছি ডার্লিং, তুমি সাংবাদিক। কিন্তু ভালো সাংবাদিক হতে গেলে ভালো পর্যবেক্ষক হওয়া দরকার। সন্ন্যাসী লোকটা আমাদের পেছন-পেছন এসেছিল। আমরা রিকশায় চাপলে সেও একটা রিকশায় চেপেছিল। ভাবলুম আমাদের ফলো করছে। কিন্তু ধাড়া ট্রেডিং কোম্পানির দোকানের সামনে সে রিকশা থেকে নামল! তখন বুঝলুম সে তিনকড়িবাবুকে খবর দিতে যাচ্ছে।"

বলে কর্নেল সেই নোটবইটা খুলে দেখালেন। "এই দ্যাখো, এরিয়া-ম্যাপ। এই হাইওয়ের বটতলা থেকে উঠলে স্তূপটা খুঁজে বের করা সোজা। মন্দিরের দিক থেকে এগোলে অনেকগুলো ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এই বিশেষ স্তূপটা খুঁজে বের করা কঠিন হত। যাই হোক, মুরারিবাবু জুতো দুটো আমাকে পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করেছিল।"

ব্যারেজের ব্রিজে পৌঁছে জিজ্ঞেস করলুম, "আপনার ব্যা-ডাক শুনে অমন আতঙ্কের কারণ কী বলুন তো?"

কর্নেল বাইনোকুলার চোখে রেখে জলাধারের পাখি দেখতে দেখতে বললেন, "তিন-তিরেক্কে নয়, নয় নয়ে একাশি। একাশিতেই ব্যা-করণ রহস্য বা ব্যাকরণ রহস্য যাই বলো, লুকনো আছে।"

"প্লিজ, হেঁয়ালি নয়।"

"তোমাকে তা হলে প্রাচীন ভারতীয় মিথলজি পড়তে হবে। শিবকে পশুপতি বলা হয়। মহেনজো-দরোর একটি সিলে পশুপতিদেবের মূর্তি পাওয়া গেছে। তাঁর শিং আছে। কোনো কোনো পণ্ডিতদের মতে তিনটে শিং ছিল। একটা শিং ক্ষয়ে গেছে। তিনটে শিং নাকি ত্রিশূলের প্রতীক। শৈবযুগে এ-অঞ্চলে তিন-শিংওয়ালা ছাগলরূপী পশুপতিদেবের পুজো হত। সেটা ব্রোঞ্জের চাকতিতে দেখেছ। শিবসিংহের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষে এখনও নাকি কৃষ্ণপক্ষে পশুপতিদেবের সেই অবতার দেখা দেন এবং ব্যা-ডাক ডাকেন। এই ডাক নাকি ভীষণ অলুক্ষুনে। শুনলেই অমঙ্গল। নকুলবাবু তিনশিঙে ছাগল সত্যিই দেখেছিলেন এবং আমরাও আজ স্বচক্ষে দেখেছি।"

এ পর্যন্ত শুনেই কে জানে কেন, আতঙ্কে বুক ধড়াস করে উঠল। এতক্ষণে মনে হল, ভাঙা দেউড়িতে উঠে এবং সুড়ঙ্গপথে নেমে কী সাঙ্ঘাতিক গোঁয়ার্তুমি না করেছি! অমন বিপজ্জনক ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হয়নি। তার চেয়ে ভয়ানক ব্যাপার, আমি সেই প্রাণীরূপী অবতারের অলুক্ষুনে ব্যা-ডাক শুনেছি। দিনদুপুরে বুক টিপটিপ করতে থাকল।

বাংলোয় পৌঁছে আড়াইটে অবধি অপেক্ষা করেও হালদারমশাইয়ের দেখা পাওয়া গেল না। কর্নেল নকুলবাবুর নোটবইটা নিয়ে প্রতিটি পাতা আতস কাচ দিয়ে পরীক্ষা করলেন। নিজের নোটবইতে কী সব টুকলেনও। মুখটা গম্ভীর, এবং মাঝে-মাঝে তিতিবিরক্ত ভাব ফুটে বেরোচ্ছিল। কয়েকবার হালদারমশাইয়ের না আসার কথাটা তুললুম। কানেই নিলেন না।

খাওয়ার পর সবে শুয়েছি, ভাতঘুমের বাঙালি অভ্যাস, কর্নেল চোখ বুজে ইজিচেয়ারে বসে চুরুট টানছিলেন, হঠাৎ তড়াক করে উঠে বসলেন। তারপর সেই নোটবইটা খুলে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "জয়ন্ত, জয়ন্ত, গুপ্তধন গুপ্তধন!"

বিরক্ত হয়ে বললুম, "এখানে গুপ্তধন কোথায়?"

গোয়েন্দাপ্রবর আমাকে টেনে ওঠালেন এবং বারান্দায় নিয়ে গেলেন। বেতের চেয়ারে বসে বললেন, "বোসো ডার্লিং! সত্যিই গুপ্তধনের সঙ্কেত-লেখ আবিষ্কার করেছিলেন নকুলবাবু। মুরারিবাবু ইচ্ছেমতো আঁকিবুকি কেটে গণ্ডগোল বাধিয়েছেন। তবে আমার সৌভাগ্য, সঙ্কেত-লিপিটা অন্য একটা পাতায় ঠিকই আছে। আতস কাচের সাহায্যে অবিকল কপি করেছি। এই দ্যাখো।"

কর্নেল তাঁর নিজের নোটবইয়ের একটা পাতা খুলে দেখালেন। কিছুই বুঝতে পারলুম না। কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং একেই বলে।

বললুম, "মাথামুণ্ডু নেই! এ কী অদ্ভুত লিপি!"

কর্নেল বললেন, "এটা একটা শিলালেখ থেকে অবিকল কপি। খানিকটা অংশ ভেঙে গিয়েছিল। এই শিলালেখটা নকুলবাবুর ঘরে আছে কি না দেখা দরকার। তবে একটা ব্যাপার আশ্চর্য! ব্রোঞ্জের সিল বা মুদ্রাটির লিপির সঙ্গে এর হুবহু মিল। তুমি নিজেই দ্যাখো।"

পরীক্ষা করে দেখে বললুম, "একই লিপি বলে মনে হচ্ছে।"

কর্নেল চিন্তিতমুখে বললেন, "লিপিটা খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না। ...না, ব্রাহ্মী-লিপি নয়। কিন্তু ব্রাহ্মীর সঙ্গে প্রচুর মিল।"

বলে আবার কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন এবং টাকে হাত। তারপর চোখ খুলে বললেন, "জয়ন্ত! এখনই শের আলি জিপ নিয়ে এসে পড়বে। ...হুঁ, ওই আসছে। তুমি এক কাজ করো। বাংলো ছেড়ে বিশেষ বেরিও না। আমি নকুলবাবুর বাড়ি হয়ে থানায় যাব। তারপর পুলিশের জিপে কলকাতা..."

ছটফটিয়ে বললুম, "না, না। আমিও যাব।"

কর্নেল হাসলেন। "কাল দুপুরের মধ্যে এসে পড়ব, ডার্লিং! প্রাচীন লিপিটার পাঠোদ্ধার খুব জরুরি। তুমি হালদারমশাইয়ের সান্নিধ্যে আশা করি ভালোই কাটাবে। ভেবো না, ওঁর কাছে রিভলভার আছে।"

"কিন্তু ওঁকে পাচ্ছি কোথায়?"

"পাবে।" কর্নেল আশ্বস্ত করলেন। "ধারালো খাঁড়া দেখার পর হালদারমশাই আর বেপরোয়া হবেন না। আমার বিশ্বাস!...আরে! শের আলির জিপে মুরারিবাবু এসেছেন দেখছি। ভালোই হল। ততক্ষণ ওঁর সান্নিধ্যে কাটাও।"

কর্নেল ঘরে ঢুকলেন পোশাক বদলাতে। গেট খুলে দিল মাধবলাল। জিপ এসে বারান্দার ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। মুরারিবাবু এক লাফে নেমে সহাস্যে বললেন, "তখন একটু গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল।—ইয়ে আপনার নামটা কী যেন..."

"জয়ন্ত চৌধুরী।"

মুরারিবাবু খ্যাঁক করলেন। "ঘরপোড়া গোরু। সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়, বুঝলেন না? কর্নেলসায়েব কই? ঘুমোচ্ছেন বুঝি? থাক, ঘুম ভাঙাব না। আপনার সঙ্গেই গল্পগুজব করা যাক। তিন তিরেক্কে নয়...দাঁড়ান। আপনার নামের নম্বর-ইউনিট বের করি। বর্গীয় জ..." আঙুল গুনতে শুরু করলেন উনি। হিসেব শেষ হলে বললেন, "সপ্ত ব্যঞ্জন। সাত। সাত তিনে একুশ। দুইয়ের পিঠে এক। তা হলে দুই যুক্ত এক সমান তিন। সেই তিন! যাবেন কোথায় আপনি? আমার নামও দেখুন। মুরারিমোহন ধাড়া। অষ্ট ব্যঞ্জন। আটকে তিন দিয়ে গুণ করুন। চব্বিশ হল। দুইয়ের পিঠে চার চব্বিশ। তা হলে দুই যুক্ত চার, সমান ছয়। ছয়কে আধখানা করুন। সেই তিন। হল তো?"

বলে এবার দু'বার খ্যাঁক করলেন। বড় বিপদে পড়া গেল দেখছি। এঁকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে কর্নেল কেটে পড়লে আমার অবস্থা হালদারমশাইয়ের চেয়ে করুণ হবে।

কর্নেল বেরিয়ে এলেন কাঁধে কিটব্যাগ, গলায় বাইনোকুলার আর ক্যামেরা ঝুলিয়ে। মাথায় ছাইরঙা টুপি। শের আলি স্যালুট দিল। মুরারিবাবুও উঠে কতকটা একই ভঙ্গিতে কপালে হাত ঠেকালেন। উনি কিছু বলার আগেই কর্নেল বললেন, "জয়ন্তর সঙ্গে গল্প করুন মুরারিবাবু! আমি আসছি।"

তারপর সোজা গিয়ে জিপে উঠলেন এবং শের আলি তাঁকে নিয়ে গর্র্র্ করে বেরিয়ে গেল। তুম্বো মুখে বসে রইলুম। কোনো মানে হয়?

মুরারিবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "কী কাণ্ড! কিছু বোঝা গেল না তো?"

বললুম, "বুঝতে হলে ফলো করুন মুরারিবাবু!"

মুরারিবাবু বললেন, "মাথা খারাপ? শের আলির জিপ না, রকেট। ওই দেখুন, কোথায় চলে গেছে। যাঃ! হারিয়ে গেল। শের আলি—চার ব্যঞ্জন। তিন গুণ করুন। বারো হল। বারোর অর্ধেক ছয়। ছয়ের অর্ধেক তিন। সেই তিন! যাবেন কোথায় মশাই? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অণু-পরমাণু চলছে অঙ্কে। তিন-তিরেক্কে নয়, নয় নয়ে একাশি। শিবের জীব বলেছিল, একাশি।"

সমানে বকবক করতে থাকলেন মুরারিবাবু। মাধবলাল দূরে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। পাগলাবাবুকে দেখেই তার হাসি পায় মনে হল।

এই পাগলাবাবুর হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করা যাক। "বসুন, আসছি," বলে উঠে ঘরে গেলুম। তারপর উত্তরের জানালায় গিয়ে বিদঘুটে স্বরে ডাকলুম, "ব্যা-অ্যা-অ্যা!"

অমনি মুরারিবাবুর খ্যাঁক-খ্যাঁক কানে এল। অর্থাৎ ভয় পাননি, হাসছেন। ঘরে ঢুকে সহাস্যে বললেন, "বারে-বারে আর ভুল হবে না। তবে খুব আনন্দ হল জয়ন্তবাবু! আপনি রসিক লোক। আমার খুব পছন্দ।" তারপর বসে বকবক শুরু করলেন।

কিছুক্ষণ পরে বাইরে হালদারমশাইয়ের ডাক শোনা গেল, "জয়ন্তবাবু, আইয়া পড়ছি।"

ছয়

বেরিয়ে গিয়ে দেখি, গেটের ওধারে একটা এক্কা ঘোড়াগাড়ি থেকে লাফ দিয়ে সবে নেমেছেন হালদারমশাই। মাধবলাল ঘোড়ার গাড়িকে ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। গাড়িটা চলে গেল। হালদারমশাই বললেন, "কর্নেলস্যারের লগে রাস্তায় দ্যাখা হইল।"

মুরারিবাবু হালদারমশাইকে দেখে অভ্যাসমতো খ্যাঁক করলেন। বললেন, "তখন তাড়াহুড়োর মধ্যে...আর কর্নেলসায়েব গাছে চড়ালেন...মশাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়নি। আপনাকে কেন তিনকড়িদা গর্তে ঢুকিয়ে বলি দিতে চাইছিল বলুন তো?"

বারান্দায় বসে প্রাইভেট ডিটেকটিভ একটু চটে গিয়ে বললেন, "আপনি আমাকে কলকাতায় কর্নেলস্যারের ঘরে দেখেছেন। এখন বলছেন, পরিচয় হয়নি। আপনার জন্যই আমার আজ..."

ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললুম, "সন্ধিবিচ্ছেদ হয়ে যেত ব্যাকরণমতে।"

হালদারমশাই অনিচ্ছায় হাসলেন। "হ্যাঁ, ধড় আর মুণ্ডু আলাদা হতে বসেছিল।"

জিভ চুকচুক করে দুঃখ দেখিয়ে মুরারিবাবু বললেন, "আহা রে! তিনকড়িদা'টা মহা ধড়িবাজ। তিন-তিরেক্কে নয়, নয় নয়ে একাশির খেলা আর কি!"

"একাশি!" গোয়েন্দাপ্রবর নড়ে বসলেন। বেতের চেয়ার মচমচ করে উঠল। "আমাকে যারা বন্দী করে বলি দিতে যাচ্ছিল, তারাও একাশি বলেছিল। ব্যাপারটা কী?" বলে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন মুরারিবাবুর দিকে।

মুরারিবাবু কিছু বলার আগে তাঁকে ঝটপট হালদারমশাইয়ের পরিচয় দিলুম। শোনার পর মুরারিবাবু খুব খুশি হয়ে বললেন, "তা হলে আর চিন্তা নেই। ডিটেকটিভে ডিটেকটিভে ছয়লাপ। যাবে কোথায়? নকুলদা, খুনের কিনারা হবে। সোনার মোহরভর্তি ঘড়াও বেরোবে। তিনপুরুষে তিন-তিরেক্কে নয়, নয় নয়ে একাশির মামলা। সবরকম কোঅপারেশন পাবেন স্যার!"

মাধবলালকে চা করতে বললুম। হালদারমশাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "জয়ন্তবাবুর লগে দুইখান কথা আছে।" তারপর আমার হাত ধরে ঘরে ঢুকে ফিসফিস করলেন, "সঙ্গে রিভলভার আছে। আর ভয় নেই। কর্নেলস্যার নিজের লাইনে চলুন, আমরা বলি নিজের লাইনে। কী কন?"

বললুম, "কর্নেল কলকাতা গেলেন। কাল দুপুরের মধ্যে ফিরবেন।"

"অ্যাঁ!" বলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন হালদারমশাই। চোখের পাপড়ি কাঁপতে থাকল।

"হ্যাঁ। আমাকে বলে গেছেন কোথাও যেন না বেরোই।"

"এটা কি একটা কথা হইল? আপনে পোলাপান নাকি? ছাড়েন তো!" কিটব্যাগ টেবিলে রেখে হালদারমশাই ভেতর থেকে রিভলভার আর গুলি বের করলেন। ছ'টা গুলি খোপে ঢুকিয়ে অস্ত্রটা ঢোলা প্যান্টের পকেটে রাখলেন। তারপর নস্যির কৌটো বের করে বললেন, "এই নস্যির জন্য লাঞ্চের নেমন্তন্ন খেতে আসতে পারিনি। যাকগে, এখন তো কর্নেলস্যারের খাটেই তা হলে আমার শোয়ার জায়গা হবে।"

মুরারিবাবু আপনমনে তিন-তিরেক্কে করতে করতে নীচের লনে ফুল দেখে বেড়াচ্ছেন আর সম্ভবত ফুলেদের ভূত-ভবিষ্যৎ গণনা করছেন। মাধবলাল নজর রেখেছিল। কিচেন থেকে হাঁক ছাড়ল, "এ বাবুমোশা! ফুলউলসে হাত মাত্ লাগাইয়ে।"

মুরারিবাবু চটে গিয়ে বললেন, "ক্যা ফুল দেখাতা হ্যায় তুম?...হুঁ! মা-ধ-ব-লা-ল! পঞ্চব্যঞ্জন হ্যায়। ব্রিফ্ পাঁ-চ। সমঝতা? তিনোসে নেহি আতা! তিন ঔর দো—ব্যস! তিন কাটা যায়েগা, দো রহেগা!" বলে বুড়ো আঙুল নেড়ে দিলেন। "অঙ্কের বাইরে পড়ে গেছ, সমঝা?"

হাসি চেপে বললুম, "তা হলে আমাদের ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের নামের হিসেবটা করে দিন মুরারিবাবু। সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে..."

বাধা দিয়ে মুরারিবাবু বললেন, "পুরো নাম?"

হালদারমশাই খুব আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, "নিউমারোলজি? আপনি জানেন? তাই বলুন! আমার নাম কৃতান্তকুমার হালদার।"

চা আসতে-আসতে হিসেব কষে ফেললেন মুরারিবাবু। "একাদশ ব্যঞ্জন। ...হুঁ, একটু গণ্ডগুলে নম্বর। সেইজন্যই খাঁড়ার ঘা প্রায় এসে পড়েছিল! ...আরে তাই তো! এগারোকে তিনগুণ করলে তে-তিরিশ। দু-দুটো তিন পাশাপাশি। আপনাকে মারে কে? সেই তো! আপনাকে পাঁঠাবাঁধা করে বেঁধে গর্তে ফেলে খাঁড়ায় শান দিতে গিয়ে দেরি হতই। হয়েছে!"

বলে ফুঁ দিয়ে সশব্দে চা টানলেন। মাধবলালকে ডেকে বললুম, "ডরো মাত্ মাধবলাল! হাম হিসাব কার দেতা। তিন পাঁচ পন্দেরাহ্। এক পাঁচ। এক ঔর পাঁচ ছে। ইস্‌মে দো তিন হ্যায়!"

মুরারিবাবু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চাপা খ্যাঁক করলেন। মাধবলাল চলে গেলে ফিসফিস করে বললেন, "ভয় দেখাচ্ছিলুম। বুঝলেন না? তিন নেই কোথায়? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনের খেলা। তিন তিরেক্কে নয়, নয় নয়ে একাশি।"

বুঝলুম চা পেয়ে খুশি হয়েছেন খুব। তারিয়ে-তারিয়ে চা শেষ করে ফের বললেন, "চলুন ডিটেকটিভমশাই!"

হালদারমশাই উৎসাহে উঠে দাঁড়ালেন। আমাকেও টেনে ওঠালেন। সাহস দিয়ে বললেন, "সঙ্গে উইপন্ আছে। চলে আসুন! কর্নেলসারেরে দেখাইয়া দিমু...এমন চান্স আর পাইবেন না। কাইল আইয়া দেখবেন..." বলে ভুরু নাচিয়ে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন, কী ঘটবে।

মুরারিবাবুরও প্রচণ্ড তাড়া। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়েই বেরোলাম বাংলো থেকে। হালদারমশাই মন্দ বলেননি। কর্নেল ফেরার আগেই রহস্যভেদ এবং খুনে-লোকগুলোকে পাকড়াও করিয়ে দিয়ে তাক লাগানোর চান্স ছাড়া ঠিক নয়।...

এবার মুরারিবাবু আমাদের গাইড। হাইওয়ের ওধারে উঁচু জঙ্গুলে টিবিতে উঠে হালদারমশাই বললেন, "আগে সেই দেউড়ি!"

মুরারিবাবুর পেছন-পেছন ঘন জঙ্গল আর ধ্বংসস্তূপের ভেতর হাঁটছিলুম। এখনই জায়গাটা আবছা আঁধারে ভরে গেছে। এবেলা বাতাস বন্ধ। গুমোট গরম। নিঝুম বন আর ধ্বংসাবশেষে ঝিঁঝিপোকা আর পাখির ডাককে মনে হচ্ছে স্তব্ধতারই একটা আলাদা স্বাদ। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠছি। কিছুক্ষণ পরে খোলা একটা জায়গায় পৌঁছলুম। এবার সামনে সেই ভাঙা তোরণ দেখতে পেলুম।

হালদারমশাই বললেন, "কোথায় বডি পড়ে ছিল, দেখিয়ে দিন।"

মুরারিবাবু দেউড়ির ওধারে গিয়ে পাঁচিলের নীচে একটা জায়গা দেখালেন। "এইখানে উপুড় হয়ে পড়েছিল নকুলদা।" একটু তফাতে গিয়ে ওপরে আঙুল তুলে বললেন, "আর ওইখানে তিন-শিঙে ছাগলটা..."

কথা শেষ না হতেই দেউড়ির ওপরে তিন-শিঙে সেই কালো ছাগলের মুণ্ডু ঝোপ ফুঁড়ে বেরোল এবং অদ্ভুত গলায় বলে উঠল, "এ-কাশি!"

সঙ্গে-সঙ্গে মুরারিবাবু তখনকার মতোই দিশেহারা হয়ে মন্দিরের দিকে ঘুরেছিলেন। কিন্তু তখনই হালদারমশাই "তবে রে" বলে রিভলভার বের করে টিসুম আওয়াজে গুলি ছুড়লেন। একঝাঁক টিয়া চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে পালিয়ে গেল। ছাগলের মুণ্ডুটা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

হালদারমশাই রিভলভার তাক করে আবার কিম্ভুত প্রাণীটিকে খুঁজছেন, সেই সময় হইহই করে একদঙ্গল লোক আর কল্যাণবাবু দু'জন বন্দুকধারী সেপাইসহ এসে পড়লেন। মুরারিবাবুও তাঁদের সঙ্গে আছেন। কল্যাণবাবু আমার দিকে না-তাকিয়ে সোজা হালদারমশাইকে চার্জ করলেন, "আর য়ু মিঃ কে. কে. হালদার, দা প্রাইভেট ডিটেকটিভ?"

হালদারমশাই সগৌরবে এবং সহাস্যে বললেন, "ইয়েস, আই অ্যাম!"

"ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট। কাম উইথ মি।"

"হোয়াই?" বলে হালদারমশাই পকেট থেকে তাঁর আইডেনটিটি কার্ড বের করলেন।

কিন্তু কল্যাণবাবুর ইশারায় সাদা পোশাকের পুলিশ এবং বন্দুকধারী সেপাইরা তাঁকে ঘিরে ধরল। কল্যাণবাবু বললেন, "গিভ মি ইওর আর্মস, প্লিজ!"

বোবা হয়ে গেলেন হালদারমশাই। রিভলভারটি কল্যাণবাবুর হাতে সঁপে দিয়ে ফোঁস করে একটি শ্বাস ছাড়লেন।

আমি বললুম, "এ কী হচ্ছে কল্যাণবাবু? কর্নেল তো আর..."

আমাকে থামিয়ে রূপগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার গম্ভীর মুখে বললেন, "আই অ্যাম অন ডিউটি মিঃ চৌধুরী! প্লিজ ডোন্ট ইন্টারভেন।"

হালদারমশাই ব্যূহবেষ্টিত হয়ে গোমড়ামুখে চলে গেলেন। ভিড়টা সরে গেলে মুরারিবাবু ফিসফিস করে বললেন, "কিছু বুঝতে পারলুম না! তিন-তিরেক্কে হয়ে গেল কেন বলুন তো? আমি তো শুধু তিন-শিঙে..." বলে বুকে ও কপালে হাত ঠেকালেন। "শিব! শিব! বাবা গো!" বিড়বিড় করে এই মন্ত্র জপতে জপতে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন।

জিজ্ঞেস করলুম, "আমরা যাচ্ছি কোথায়?"

"আমার ডেরায়।" ভয়ার্ত মুখে মুরারিবাবু বললেন। "আসলে কী জানেন? ওই ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের পাশাপাশি দুটো তিন বড্ড গণ্ডগুলে নম্বর। শেষ পর্যন্ত বেঁচে যাবেন। তবে বেশ ভোগাবে। চলুন, বউদির সঙ্গে গল্প করতে-করতে তেলেভাজা খাব। আর তো কিছু করার নেই।"

শটকার্টে নিয়ে যাচ্ছিলেন মুরারিবাবু। এবার একটা করে একলা পোড়োভাঙা বাড়ি আর ঝোপঝাড়, কিছু উঁচু গাছ। হানাবাড়ি মনে হচ্ছিল কোনো-কোনো বাড়িকে। হঠাৎ কোত্থেকে ব্যা-অ্যা-অ্যা ডাক ভেসে এল। মুরারিবাবু পালাতে যাচ্ছেন, ওঁকে পেছন থেকে ধরে ফেললুম। মুরারিবাবু হাঁসফাঁস করে বললেন, "পা চালিয়ে চলুন। এসব বাড়ি হানাবাড়ি। লোকজন নেই।"

বাঁ দিকে তাকাতেই একটা বাড়ির পেছনে সেই ছেলেটি, বিটুকে দেখতে পেলুম। বুঝলুম ব্যা-ডাক কে ডেকেছে। কিন্তু সাহস আছে তো বিটুর! এই হানাবাড়ি এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে একা।

বললুম, "মুরারিবাবু, ওই দেখুন ব্যা-করণ রহস্য!"

মুরারিবাবু দেখামাত্র চ্যাঁচালেন। "পাজি, বাঁদর, ভূত, সবসময় খালি...এবার এসো 'জ্যাঠামশাই, দিন না ঘুঁড়িটা পেড়ে' বলে কাঁদতে।"

বিটু জিভ দেখিয়ে উধাও হয়ে গেল।

মুরারিবাবু শাসালেন। "বিষ্ণুদাকে বলে তিন-তিরেক্কে করে দিচ্ছি, থামো!"...

বিরুর বউদি মুরারিবাবুর সাড়া পেয়ে সদর দরজা খুললেন। আমাকে দেখে মিষ্টি হেসে বললেন, "এসো জয়ন্ত ঠাকুরপো! কর্নেলসায়েব এসেছিলেন সওয়া চারটে নাগাদ। বলে গেলেন, কলকাতা থেকে কাল ফিরবেন। বিরুকে পাঠিয়ে তোমার খোঁজ নিতে বললেন! এসো, ভেতরে এসো।"

মুরারিবাবু বললেন, "আমার গেস্ট। আমার ঘরে বসাই, বউদি! গরম-গরম তেলেভাজা খাওয়াব বলে নিয়ে এলুম।"

রমলাবউদি চোখ পাকিয়ে বললেন, "তোমার ঘরের যা ছিরি করে রেখেছ! থাক্। এ-ঘরে এসো জয়ন্ত!"

কোনো-কোনো মানুষ থাকেন, মনে হয় কতদিনের চেনা। এক মুহূর্তে আপনার জন হয়ে ওঠেন। আসলে এটা পরকে আপন করে নেওয়ার স্বভাব। রমলাবউদি সেইরকম মানুষ। নকুলবাবুর জাদুঘরে আমাদের বসিয়ে তেলেভাজা করতে গেলেন। বিরুর নাইট ডিউটি। একটু আগেই বেরিয়ে গেছে। মুরারিবাবু খ্যাঁক করে হেসে বললেন, "ডিটেকটিভবাবুকে অ্যারেস্ট করল কেন বলুন তো? গুলি ছোঁড়ার জন্য তিন-তিরেক্কে হয়ে গেলেন? তা যাই বলুন, গুলি ছোঁড়াটা উচিত কাজ হয়নি। বাবার সাক্ষাৎ-অবতার। আমার বড্ড ভয় করছে, জানেন?"

কোনো কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। ভয় আমারও করছে। সেচ-বাংলোয় ফেরা এবং একা রাত কাটানো—তিনকড়িচন্দ্রের ষণ্ডা লোকদুটো নয়, বারবার সেই খড়্গধারী সন্ন্যাসী লোকটার চেহারাই মনে ভেসে উঠছিল। শেষে ভাবলুম, থানায় গিয়ে ওসি ভদ্রলোককে বলে পুলিশ-জিপে পৌঁছে দিতে বলব। কল্যাণবাবু খচে আছেন, তার কারণ বোঝা যাচ্ছে। জিপের টায়ার ফাঁসানোতে আগুন হয়ে ঘুরছিলেন। মন্দির থেকে নীচের রাস্তা পর্যন্ত নিশ্চয় ফাঁদ পাতা ছিল। মাঝখান থেকে রাগটা গিয়ে পড়েছে হালদারমশাইয়ের ওপর।

মুরারিবাবু সমানে তিন-তিরেক্কে কষে চলেছেন। ঘরের ভেতর আঁধার হয়ে আসছে। রমলাবউদি বারান্দার বাতি জ্বালিয়ে একথালা তেলেভাজা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, "এই তিন-তিরেক্কেওয়ালা! আলো জ্বালতে পারোনি?"

সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলেন নিজেই। মুরারিবাবু নড়ে বসে বললেন, "একাশির ধাক্কা! মাথা ভোঁভোঁ করছে।" তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তেলেভাজার ওপর। সংখ্যাতত্ত্ববিদ—কাজেই ঝটপট গুনে ফেললেন। "উরেব্বাস! তিন-তিরেক্কে নয়!"

রমলাবউদি ভেংচি কেটে বললেন, "মুখেরটা গুনেছ? তিন-তিরেক্কে নয় তো করছ। খাও ভাই! চা নিয়ে আসছি। তারপর গল্প করব।"

গরম তেলেভাজা মন্দ নয়। কিন্তু মনে দুর্ভাবনা। ওসি ভদ্রলোক যদি বাইরে গিয়ে থাকেন দৈবাৎ? নাঃ, ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। শিগগির কেটে পড়াই ভালো। মাধবলালকে সাহসী লোক বলেই মনে হয়েছে। বরং পাশের এয়ারকন্ডিশন্‌ড্‌ ঘরটা খুলে দিতে বলব। জানালা বন্ধ করেও আরামে ঘুমনো যাবে।...

রমলাবউদি চা নিয়ে এলেন। বললেন, "কর্নেলসায়েবকে চিঠির ব্যাপারটা বলেছি। তোমাকে বলি। বিট্টু চিঠি ডাকে দিতে গিয়েছিল। পোস্টাফিসে একটা লোক ওর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে নেয়। বলে, আমি ফেলে দিচ্ছি! পোস্টবক্সটা দেওয়ালে ফোকরের মতো তৈরি। একটু উঁচুতে মুখটা। চিঠি ফেললে ঘরের ভেতর গিয়ে জমবে। তো বিট্টু চিঠিটা ওর হাতে দিয়েই চলে আসে। অত বুদ্ধি কি ওর আছে?"

বললুম, "বোঝা যাচ্ছে একটা দল এর পেছনে আছে।"

"তিনকড়িবাবুর কীর্তি শুনলুম কর্নেলসায়েবের কাছে। পইপই করে বলে গেছেন, তাকে যেন পাত্তা না দিই। যদি এসে গণ্ডগোল করে পুলিশে খবর দিতেও বলে গেছেন।"

বলে রমলাবউদি জানলার দিকে ঝুঁকে গেলেন। "কে রে? কে ওখানে? দাঁড়া তো, দেখাচ্ছি মজা!"

রমলাবউদি ছুটে বেরিয়ে গেলেন। জানলায় উঁকি মেরে কিছু দেখতে পেলুম না। মুরারিবাবু বললেন, "তিন-তিরেক্কে খেলা! ছেড়ে দিন! বউদির দিনদুপুরে ভূত দেখা অভ্যেস আছে। নামেই তিন-ব্যঞ্জন কিনা! র+ম+ল।"

ভদ্রমহিলার সাহস আছে! জানলা দিয়ে দেখলুম, টর্চ আর একটা মস্ত কাটারি হাতে পেছনের পোড়ো জমিটায় চক্কর দিচ্ছেন। আমি এভাবে বসে থাকা উচিত মনে করলুম না। বেরিয়ে গিয়ে উঠোনে নেমেছি উনি ফিরে এলেন। বললেন, "কে যেন দাঁড়িয়ে ছিল জানলার ওধারে। ঠাকুরপোকে বলব, ছাদের চারদিকে বাল্ব লাগাতে।"

একটু ইতস্তত করে বললুম, "আমাকে বাংলোয় ফিরতে হবে, বউদি! ওদিকে যেতে নাকি সন্ধ্যার পর রিকশা বা ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যায় না।"

রমলাবউদি বললেন, "হ্যাঁ, চড়াই রাস্তা। তার ওপর বিরুর দাদা মার্ডার হওয়ার পর ওদিকের রাস্তায় কেউ পারতপক্ষে যেতে চায় না। এ তো ভাই তোমাদের কলকাতা শহর নয়। নামেই টাউন। মানুষজনের মনে রাজ্যের কুসংস্কার।"

একটু হেসে বললুম, "কুসংস্কার কলকাতাতেও কম নেই। তো, চলি বউদি!"

"মুরারিঠাকুরপোর সবসময় পাগলামি করতে লজ্জা হয় না?" রমলাবউদি তেড়ে গেলেন। "তখন তো আমার গেস্ট বলে খুব জাঁক দেখাচ্ছিলে! গেস্টকে পৌঁছে দিতে হবে না?"

তাড়া খেয়ে মুরারিবাবু বেরোলেন। মুখে অনিচ্ছার ভাব। চুপচাপ হাঁটতে থাকলেন। আমরা এবার বাজারের দিকে চলেছি। একটু পরে মুরারিবাবু বললেন, "আমি, কিন্তু, বুঝলেন বাংলো অবধি যাচ্ছি না। কেন জানেন? বউদিকে গার্ড দিতে হবে। জানলার পেছনের লোকটা...একাশি! তিন-তিরেক্কে করে দিলেই হল। মেয়েরা একা না বোকা। বুঝলেন না?"

"বুঝলুম।" হাসবার চেষ্টা করে বললুম, "অন্তত একটা এক্কাগাড়ি কোথায় পাব, দেখিয়ে দিন বরং।"

"পেয়ে যাবেন। ওই তো রাস্তা। কত লোক, কত গাড়িঘোড়া। ভয়টা কীসের?" বলে মুরারিবাবু বাঁই করে ঘুরে হনহন করে গলিপথে নিপাত্তা হয়ে গেলেন। সম্ভবত তিন-তিরেক্কে নয়—এই নয়টা 'না'-অর্থব্যঞ্জক। অর্থাৎ স্রেফ না হয়ে যাওয়া। নঞর্থক হওয়া মানেই সন্ধিবিচ্ছেদ। ধড় এবং মুণ্ডু পৃথক হয়ে যাওয়া। সোজা কথায় খতম। তখন শিবের চেলা হয়ে ঘোরো। প্রেতাত্মা বা ভূত হয়ে যাও। সর্বনাশ!

গলিটা যেখানে বড় রাস্তায় পৌঁছেছে, সেখানে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে এক্কাগাড়িই খুঁজছিলুম। কারণ সাইকেল-রিকশা চড়াই ঠেলে ওদিকে যাবে না শুনেছি। ইতিমধ্যে রূপগঞ্জের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কিত মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেছে। আসলে এই জনপদটা কোনো যুগে নদীর তীরে একটা পাহাড়ের মাথা সমতল করে গড়ে উঠেছিল। তাই পশ্চিম ঘরে যে হাইওয়েটা নদীর সমান্তরালে বিহারের দিকে দক্ষিণে এগিয়ে গেছে, সেটা টানা চড়াই। ব্যারেজের মোড়ে পৌঁছলে আর চড়াই ভাঙতে তত হবে না। ব্রিজের ওপরটা স্বভাবত সমতল। তারপর সেচ-বাংলো পর্যন্ত যেটুকু চড়াই, সেটুকু সামান্যই।

"সার ইখানে ডাঁড়িয়ে আছে বটেক!"

শুনেই তাকিয়ে দেখি, সেই সাইকেল-রিকশাওয়ালা। রিকশার ব্রেক কষে সদ্য সামনে থেমেছে। মুখে মধুর হাসি। বললুম, "এই যে ভাই, তুমি শের আলিকে চেনো?"

শের আলির কথা ওকে দেখামাত্র মনে পড়েছিল। ও এই রোগা পাকাটি শরীর অমন চড়াই রাস্তায় রিকশা তুলতে পারবে না, জানা কথা। কাজেই যদি শের আলির কাছে পৌঁছে দেয়, একটা জিপের আশা আছে। রিকশাওয়ালা বলল, "শের আলি? হ্যাঁ সার, চিনি বটেক।"

"ওর বাড়ি নিয়ে চলো তো।" বলে রিকশায় উঠলুম।

রিকশাওয়ালা বলল, "সে তো সার দূর বটেক। রেলের লাইন পেরিয়ে পাঁচ-ছ' মাইল। ইরিগেশং কুয়াটার বটেক..."

"অত দূরে?"

"হাঁ সার, উদিকে ড্যাম আছে বটেক। তার উত্তুর সাইডে বটেক।"

আরও ভাবনায় পড়া গেল দেখছি। অতদূরে গিয়ে যদি শুনি শের আলি নেই? তার স্যারের মেয়ের অসুখ। যদি সেই ভেবে কর্নেল তাকে বলে থাকেন, জিপের দরকার নেই, এবং কলকাতা যাওয়ার মুখে সেটা বলাই স্বাভাবিক, তা হলে তার স্যার অর্থাৎ ডি. ই. কামালসায়েব কোথাকার মিশনারি হাসপাতালে অসুস্থ মেয়েকে দেখতে যাওয়ার জন্য এবার নিজের জিপই ব্যবহার করবেন। এই অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। ইরিগেশন কোয়ার্টার থেকে ফিরতে মোট দশ-বারো মাইল—তার মানে, আরও রাত হয়ে যাওয়া।

চুপ করে আছি দেখে রিকশাওয়ালা বলল, "ভাড়া লিয়ে ভাবছেন বটেক!" সে খুব হাসতে লাগল। "বুঢ়াসাহেবের লোক বটেক আপনি। ক্যানে উ ভাবনা গো? চলেন, লিয়ে যাই। যা দিবেন, লিব বটেক।"

খুলে বলাই উচিত মনে করলুম। "দ্যাখো ভাই, যাব আমি ইরিগেশন বাংলোয়। চেনো তো?"

"চিনি বটেক। ড্যামের দক্ষিণে।" রিকশাওয়ালা উৎসাহ দেখিয়ে বলল। "তা হলে শের আলির কথা ক্যানে?"

"তুমি যেতে পারবে ইরিগেশন বাংলোয়?" চরম কথাটি বললুম এবার।

"হাঁ-আ। ঠেইলতে...ঠেইলতে...ঠেইলতে পহুঁচে দিব বটেক।" রিকশাওয়ালা বলল। "ই মানিককে দেখে সার ভাবছেন কী বটেক? রেকশায় জম্মো, রেকশায় মরণ হবেক—ই মালিক সিটাই জানে বটেক। চল্‌হেন, চল্‌হেন!" সে প্যাডেলে পায়ের চাপ দিল। চল্—এর সঙ্গে একটি হ-বর্ণ উচ্চারণ তার জোরটা জানিয়ে দিল।

কিছুটা এগিয়ে বাঁয়ে মোড় নিতেই সুনসান নিরিবিলি এলাকা। আলো নেই। তারপর হাইওয়ে এবং ক্রমশ চড়াই। ডান দিকে খাপচা-খাপচা ঝুপসি জঙ্গল। তার ওদিকে অনেকটা দূরে ড্যাম। চড়াইয়ের মাথার দিকটায় যেখানে ব্যারেজ শুরু, সেখানেই আলো জুগজুগ করছে।

মানিক রিকশাওয়ালাকে অবশেষে নামতেই হল। এতক্ষণে বাতাস উঠেছে এবং আমরা এগোচ্ছি দক্ষিণে, ফলে সামনে বাতাসের ধাক্কা। বললুম, "ওহে মানিক, বরং আমি হেঁটে যাই।"

সে খুব অবাক হয়ে গেল। "কী ভাবছেন বটেক? পারবেক না মানিক?"

"না, না।" একটু হেসে বললুম, "ব্রিজে গিয়ে চাপব। আসলে কী জানো? একলা এই রাস্তায় যেতে একটু কেমন-কেমন লাগে। একজন সঙ্গী চেয়েছিলুম। তুমি আমার সঙ্গী বটেক।"

'এতে খুশি হল না, রিকশা-চালকের আঁতে ঘা লাগল। একজন খাঁটি পরিশ্রমী মানুষ সে। বলল, "বুলেছি পঁহুছে দিবেক, তো দিবেক বটেক।"

গোঁ ধরে সে হ্যান্ডেল ধরে টেনে নিয়ে চলল। বিচ্ছিরিরকমের চড়াই। বাঁ দিকে প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ, ডান দিকে জঙ্গল। জঙ্গলের আড়ালে কিছুটা দূরে মাঝে-মাঝে ড্যামের জলে তারার আলোর ঝিকিমিকি, ঝিকিমিকি গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। বাতাসে ঢেউ উঠেছে জলে।

হঠাৎ দপ করে রিকশার সামনেকার বাতি নিভে গেল। মানিক হাঁসফাঁস করে বলল, "নিভাক! ই মানিকের সার, আলো-আঁধার এক বটেক।"

কিন্তু এটাই আশ্চর্য, এটা হাইওয়ে। অথচ কোনো মোটরগাড়ি এখনও দেখলুম না। ভাবলুম, এটা নেহাত একটা চান্সের ব্যাপার। ঠিক এ সময়টাতে কোনো গাড়ি এখানে এসে পৌঁছচ্ছে না, কিন্তু যে-কোনো সময় দেখা যাবে কোনো ট্রাক বা বাস। হঠাৎ মানিক বলল, "কে বটেক?"

অন্ধকারে দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়েছে ততক্ষণে। রিকশার সামনে কয়েকটা কালো মূর্তি। একজন হুঙ্কার দিয়ে বলল, "একাশি।"

অমনি রিকশা থেকে লাফিয়ে নীচে পড়লুম। পালিয়ে যেতুম, না একহাত লড়তুম, জানি না। রাস্তায় নামতেই আমাকে তারা জাপটে ধরল। ধরেই মুখে টেপ সেঁটে দিল। মানিক চেঁচিয়ে উঠেছিল। তারপরই সে অদ্ভুত নাকিস্বরে গোঁ-গোঁ করতে লাগল। বুঝলুম, তার মুখেও টেপ পড়ে গেছে।

হালদারমশাইয়ের অবস্থাই হল। লোকগুলোর গায়ে সাঙ্ঘাতিক জোর। লড়তে গেলেই আরও বিপদ বাধবে। কী আর করা যাবে? পিঠমোড়া করে বেঁধে কাঁধে তুলল যখন, তখন ঠ্যাং ছুড়লুম না। সন্ধিবিচ্ছেদের জন্য তৈরি হয়ে গেছি। এরা হালদারমশাই বেহাত হয়ে ঠকেছে, অতএব এবার আর দেরি করবে না। প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে সেই সন্ন্যাসী লোকটাকে খোঁজার চেষ্টা করছিলুম,

যার হাতে খাঁড়া ছিল। কিন্তু কী যাচ্ছেতাই অন্ধকার। উঁচু ঢিবির ওপর জঙ্গলের ভেতর অন্ধকার একেবারে গাঢ় কালি। অদ্ভুতভাবে মনে একটা কথা ভেসে এল। মুণ্ডু আর ধড় আলাদা হলে রক্ত প্রচুর বেরোবে। কিন্তু রক্তগুলোও লাল দেখাবে না। কালোই দেখাবে।

একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে ওরা থামল। ভারিক্কি গলায় একজন বলল, "কথা আদায় কর! সত্যি কথা না বেরোলে বলিদান।"

অন্য একজন বলল, "কাশী তো হাজতে। বলিদানের খাঁড়াটাও পুলিশের হাতে গচ্চা গেল। বলি, দেবেটা কে?"

"কাশীটা একটা গাধা!" গলাটা সেই তিনকড়িচন্দ্রেরই মনে হল। "যাকগে, টেপ খুলে কথা আদায় কর। বুড়োঘুঘুটার সঙ্গী যখন, তখন সব জানে। কতদূর এগিয়েছে, ঠিকঠাক জানা দরকার।"

একজন আমার মুখের টেপ এক ঝটকায় খুলে দিল। চামড়া, গোঁফসুদ্ধু উপড়ে গেল যেন। যন্ত্রণায় "উহুহু" করে উঠলুম। তারপর পিঠে ছুঁচলো কিছু ঠেকল। একজন বলল, "টুঁ করলেই উলটো দিক থেকে হার্ট ছেঁদা হয়ে যাবে। সাবধান!"

একজন আমার কাঁধ ধরে ঠেলে বসিয়ে দিল ঘাসের ওপর। এতক্ষণে কানে আবছা ভেসে এল ঢাকের শব্দ। তা হলে মন্দিরটার কাছাকাছি কোথাও আছি। সামনের লোকটার হাতে ছড়ি দেখতে পেলুম। ঠিকই চিনেছি তা হলে। বললুম, "ডঃ সিংহ নাকি?"

ছড়ির খোঁচা খেলুম পেটে। "শাট আপ! ন্যাকামি হচ্ছে? ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দ্যাখোনি?"

"দেখতে পাচ্ছি তিনকড়িবাবু!"

"মোটকু, কথা আদায় কর!" তিনকড়িচন্দ্র একটু তফাতে বসল। "দেরি করিসনে!"

পিঠে ছুরির ডগার চাপ পড়ল। বললুম, "বলছি, বলছি।"

"বলো!" উদাস গলায় তিনকড়িচন্দ্র বলল। "বলো কদ্দুর এগিয়েছে বুড়োঘুঘু?"

বললুম, "অনেকদূর! কলকাতা অবধি।"

"তার মানে?"

"কর্নেল কলকাতা গেছেন। একটা ভাঙা শিলালিপির পাঠোদ্ধার করতে।"

"তার মানে? তার মানে?"

"নকুলবাবুর নোটবইতে ওই শিলালিপির নকল আঁকা আছে। ওতেই নাকি সোনার মোহরভর্তি ঘড়ার কথা আছে।"

"শাট আপ!" তিনকড়িচন্দ্র ধমক দিল। "মোহর-টোহর বোগাস! আমি জানতে চাইছি একাশিদেবের কথা!"

অবাক হয়ে বললুম, "সবসময় একাশি-একাশি শুনেছি! একাশিদেবের কথা তো শুনিনি।"

"সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না।" তিনকড়িচন্দ্র শাসাল। "নোক্‌লো ব্যাটাচ্ছেলেকে ত্রিশূলে গেঁথেছি। তোমাকে...তোমাকে..." তিনকড়িচন্দ্র আমার জন্য সাঙ্ঘাতিক মৃত্যু খুঁজতে-খুঁজতে বলল, "হুঁ, তোমার গা পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কাটব। বলো, কোথায় একাশিদেব লুকনো আছে?"

"কী আশ্চর্য! আমি জানলে তো বলে দিতুম। শিলালিপির ভেতর তার খোঁজ আছে হয়তো। কর্নেল সেজন্যই তো কলকাতা গেছেন। পাঠোদ্ধার করে তবে না জানা যাবে।"

আমার কথায় তিনকড়িচন্দ্র একটু ভাবনায় পড়ে গেল হয়তো। বলল, "ওক্কে। মোটকু, ওকে কাশীর ঘরে...না, কাশীর ঘরে পুলিশ আসার চান্স আছে। স্তূপের ভেতর গর্তটা ভালো জায়গা ছিল। বুড়ো চিনে ফেলেছে। এক কাজ কর।"

পেছনে মোটকু বলল, "বস্তায় ভরে টিকটিকিবাবুর মতো..."

"নাঃ! পুলিশ বস্তা দেখলেই সার্চ করছে দেখে এলুম।" তিনকড়িচন্দ্র উঠল। "একে বরং ভোম্বলবাবুদের পোড়োবাড়িতে নিয়ে চল। ঠ্যাং দুটোও বেঁধে মুখে ফের টেপ সেঁটে ফেলে রাখবি। তালা ভেঙে নতুন তালা এঁটে দিবি ঘরটাতে। বুড়োঘুঘু ফিরলে উড়ো চিঠিতে জানিয়ে দেব, মাল দাও, মাল নাও! গিভ অ্যান্ড টেক। ব্যস!"

সাত

ঘুরঘুট্টে অন্ধকার হয়ে গেল ওরা চলে যেতেই। দয়া করে একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়েছে, এই যা। পিঠমোড়া করে দু'হাত বাঁধা, পা-দুটো বাঁধা। কাত হতে গেলে কষ্ট। চিত হতেও কষ্ট। অতএব উপুড় হয়ে আছি। ঘরটায় অদ্ভুত সব শব্দ। মাঝে-মাঝে কী সুড়সুড়ি দিচ্ছে। গায়ে চলাফেরা করছে। শেষে বুঝলুম, আরশোলা আর ইঁদুরের রাজত্ব ঘরের ভেতর। সাপ থাকাও অসম্ভব নয়। ওদের টর্চের আলোয় মেঝেয় প্রচুর গর্ত দেখেছি।

দরজা-জানলা বন্ধ এয়ারকন্ডিশনড্ ঘর এ-রাতে আশা করেছিলুম। তার বদলে এই সাঙ্ঘাতিক উপহার। আমার নামে কি জোড়া নম্বর থ্রি আছে? পুরো নাম জয়ন্তকুমার চৌধুরী। তা হলে দশ ব্যঞ্জন—মুরারিবাবুর হিসেবে। তিন-তিরেক্কে নয়, হাতে রইল এক।... নাঃ। ...তিন দশে তিরিশ, তিনের পাশে জিরো। জিরো নম্বর নয়—মুরারিবাবুর মতে। তা হলে স্রেফ তিন হয়। কিন্তু তিন তো পয়া নম্বর।

মুরারিবাবুর মতোই ঘিলু টেঁসে যাবে। ঘুমনোর চেষ্টা বৃথা। অনবরত আরশোলার সুড়সুড়ি। ইঁদুরের হপ-স্টেপ-জাম্প্ রেস। র‍্যাটরেস আর কি! মনে-মনে গত রাতে কর্নেলের উপদেশ স্মরণ করে তিন-শিঙে ছাগলের পাল কল্পনা করে গুনতে শুরু করলুম। হঠাৎ মনে পড়ল, ছাগলটা 'একাশি' বলে এবং তিনকড়িচন্দ্র 'একাশিদেব' বলল। বড় গোলমেলে ব্যাপার।

তারপর চমকে উঠলুম। কী একটা লম্বা লিকলিকে প্রাণী আমার পিঠের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে। সেটা যে সাপ, তাতে সন্দেহ নেই। দম বন্ধ করে কাঠ হয়ে পড়ে রইলুম। সাপটা সম্ভবত ইঁদুরকে তাড়া করেছে। এরপর আর নড়াচড়া করা ঠিক হবে না। শ্বাসপ্রশ্বাসেও সাবধান হওয়া উচিত। মনে-মনে বাবা একাশিদেবকে ডাকতে থাকলুম।

এতকাল ধরে কর্নেলের সঙ্গে দেশ-বিদেশে কত সব ভয়ঙ্কর অ্যাডভেঞ্চারে গেছি, কিন্তু এমন বিদঘুটে ধরনের বিপদে কখনও পড়িনি। এই বিপদটা বেজায় অপমানজনকও বটে। আরশোলার সুড়সুড়ি, ইঁদুরের কাতুকুতু, সাপের বেয়াদপি। বাইরেও সন্দেহজনক কেমন সব শব্দ। শোঁশোঁ...শনশন...মচমচ...খটখট।

যেন কতকাল ধরে এইরকম নিছক কাঠে পরিণত হয়ে পড়ে আছি। হয়তো গায়ে শ্যাওলা জমেছে। ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে। একসময় অন্ধকার কমে গেছে টের পেলুম। ক্রমশ জানলার ফাঁকে এবং ঘুলঘুলিতে ধূসর আলো, তারপর একটু করে ফিকে লালচে ছটা ফুটে উঠল। এবার ঘরের ভেতরটা পরিষ্কার দেখা গেল। মাদুরে চিবুক ঠেকিয়ে মাথা তুললুম। এবড়োখেবড়ো মেঝে, গর্ত, দেওয়াল ফুঁড়ে শেকড়বাকড়। ফাটল।

আরও কিছু সময় কাটল। তারপর একটা জানলার পাশে ধুপধুপ, খসখস, কিছু টানা-হেঁচড়ার শব্দ শুনতে পেলুম। অমনি যত জোরে পারি দম নাকে টেনে মুখ দিয়ে বের করলুম। টেপটাও সম্ভবত ঘামে নরম হয়েছিল। ফুটুস শব্দে একটুখানি খসে গেল বাঁ দিকে। গলা শুকিয়ে এমন অবস্থা যে যত জোরে কণ্ঠস্বর বের করলুম, ততটা জোরে বেরোল না। "কে আছ ভাই" কথাটা অদ্ভুত "কঁক্‌কাছ্-ছ-ভাঁ" হয়ে গেল।

কিন্তু সেই যথেষ্ট। সেই জানলাটার ছিটকিনি মরচে ধরে ভেঙে গেছে। খড়াক করে খুলে গেল এবং একটা মুখ দেখতে পেলুম। বিট্টু!

তার হাতে ঘুড়ি-লাটাই। এই ঘরের ছাদে চড়ে হয়তো ঘুড়ি ওড়ানোর চেষ্টায় ছিল। আমাকে এ অবস্থায় দেখামাত্র সে বড়-বড় চোখে তাকাল। তারপর ফিক করে হেসে উঠল।

তারপর জিভ দেখাল এবং ব্যা-অ্যা করল। সত্যিই বিচ্ছু ছেলে। ধুপ শব্দে লাফিয়ে পড়ে তখনই উধাও হয়ে গেল। কিছু বলার সুযোগই পেলুম না।

রাগে-ক্ষোভে ছটফট করা ছাড়া উপায় নেই। অদ্ভুত ছেলে তো! একটা লোক এমন অবস্থায় পড়ে আছে দেখেও তার সঙ্গে ফক্কুড়ি করে কেটে পড়ল!

কিছুক্ষণ পরে বাইরে ধুপধুপ শব্দ আবার। তারপর জানলায় এবার মুরারিবাবুর মুখ এবং আমাকে দেখে অবাক হবেন কী, সেই খ্যাঁক করলেন।

অতিকষ্টে বললুম, "দরজা প্লি-ই-জ!"

মুরারিবাবু সরে গেলেন। দরজার দিকে তাঁর কথা শোনা গেল, "এই রে! তিন-তিরেক্কে করে রেখেছে। বিট্টু! হাতুড়ি! হাতুড়ি! বউদিকে গিয়ে বল্, কয়লাভাঙার হাতুড়ি দাও!"

তারপর কড়া টানাটানির বিকট শব্দ এবং দরজার কপাট কাঁপতে থাকল। সেইসঙ্গে মুরারিবাবুর ফোঁস-ফোঁস, গোঁ-গোঁ। স্তূপের ভেতর গর্তের মুখে পাথর ঠেলে সরানোর সময় যেমনটি শুনেছিলুম।

কিন্তু ক্রমশ উনি যেন রেগে যাচ্ছিলেন। "তবে রে তিন-তিরেক্কে নয়, নয় নয়ে একাশি! মারে জো—হেঁইয়ো!...জোরসে টানো—হেঁইয়ো!...ঔর থোড়া—হেঁইয়ো!" কড়াক শব্দে কড়া উপড়ে গেল এবং দরজাও প্রচণ্ড জোরে খুলে গেল। এত জোরে যে, দেওয়াল থেকে পলেস্তরা খসে পড়ল ঝুরঝুর করে।

মুরারিবাবু ঘরে ঢুকে পুনঃ খ্যাঁক করলেন। কোমরে দু'হাত রেখে আমাকে দেখতে-দেখতে বললেন, "এই! এই তিন-তিরেক্কের ভয়েই কাল সন্ধ্যাবেলা আপনার সঙ্গে যাইনি। বুঝলেন তো এবার?... আহা রে! কী অবস্থা করেছে দেখছ? একেবারে নয় নয়ে একাশি... ওদিকে আরও এক তিন-তিরেক্কে। মানিক রিকশাওয়ালাকে ডাকাতরা শুনলুম মেরে ফর্দাফাঁই করেছে। মুখে টেপ!...সেই তিন-তিরেক্কের টেপ! ডিটেকটিভবাবুর মতোই অবস্থা। ...আরে! আপনার মুখেও তিন-তিরেক্কে?"

বলে একটু ঝুঁকে টেপটা ওপড়ালেন। যন্ত্রণায় উহুহু করে উঠলুম। বাঁধন খুলে দিচ্ছেন না এখনও। কথা বলতে গলায় যন্ত্রণা। "খু-খুলে দি-দিন" বলে চুপ করলুম।

হঠাৎ মুরারিবাবু এক লাফে পিছিয়ে "বাপ রে, সাপ" বলে একেবারে দরজার বাইরে চলে গেলেন।

অতিকষ্টে মাথা ঘুরিয়ে কোথাও সাপটাকে দেখতে পেলুম না। তবে কোণায় গর্তের পাশে একটা সাপের খোলস দেখা যাচ্ছিল। সেইসময় রমলাবউদির গলা ভেসে এল। "কই? কোথায়! কোথায় ঠাকুরপোকে বেঁধে রেখেছে?"

মুরারিবাবু ঘুরে বললেন, "একেবারে তিন-তিরেক্কে! তার সঙ্গে সাপ।"

রমলাবউদি দরজায় এসে আমাকে দেখেই "ও মা! এ কী!" বলে ঘরে ঢুকলেন। ওঁর হাতে একটা হাতুড়ি। আমার হাতের এবং পায়ের বাঁধন খুলে দু'হাতে আমাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর হাতুড়ি তুলে তেড়ে গেলেন মুরারিবাবুর দিকে। "হাঁ করে এতক্ষণ মজা দেখা হচ্ছিল, ভূত কোথাকার।"

মুরারিবাবু নিমেষে উধাও হয়ে গেলেন। রমলাবউদি এসে আমার কাঁধ ধরে বললেন, "কী সর্বনেশে কাণ্ড! কাল তুমি গেলে বটে, বড্ড ভয় করছিল। পথে কোনো বিপদ-আপদ যেন না ঘটে। চলো, চলো! ইশ! এক রাত্তিরেই কী অবস্থা হয়ে গেছে তোমার!"

বিট্টু নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ চলে গেল। ছেলেটা আপনভোলা খেয়ালি স্বভাবের। কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য ওকে আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু কর্নেলের সেই রামধনু প্রজাপতির মতো এই ছটফটে সুন্দর ছেলেটিকে নাগালে পাওয়া কঠিন।

কাল শেষবিকেলে মুরারিবাবুর সঙ্গে এই হানাবাড়ি এলাকা দিয়ে এসেছিলুম। তখন আমি এক মানুষ, এখন আমি আর-এক মানুষ। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যেন বেতো-রুগিকে। এ দিকটা নিরিবিলি সুনসান। সকালের রোদ্দুর মিটিমিটি হাসছে আমার দশা দেখে, কাল হালদারমশাইয়ের দশা দেখে আমি যেমন হেসেছিলুম, তেমনি হাসি।

গরম দুধ খাইয়ে রমলাবউদি আমাকে চাঙ্গা করে তুললেন। বিরু নাইট ডিউটি করে এসে ঘুমোচ্ছিল। হাই তুলতে-তুলতে এসে আমাকে একবার দেখে গেল। গম্ভীর মুখে বলেও গেল, "চান করে নিন দাদা! বড্ড বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে আপনাকে।" আয়নায় নিজেকে দেখে শিউরে উঠলুম। আমি না অন্য কেউ? প্যান্ট-শার্টে ঝুলকালি, আরশোলার নাদি। চুলে মাকড়সা পর্যন্ত কখন জাল পেতেছিল। রাতারাতি একেবারে আস্ত ভূতে পরিণত হয়েছি।

রমলাবউদির তাড়ায় স্নান করতে হল। বিরুর পাঞ্জাবি-পাজামা পরে আয়নার সামনে চুল আঁচড়াতে গিয়ে দেখলুম, আমি আবার আমাকে ফিরে পেয়েছি। একটু পরে যখন খেতে বসেছি এবং রমলাবউদি সামনে বসে তিনকড়িচন্দ্রের শ্রাদ্ধ করছেন, তখন মুরারিবাবু হন্তদন্ত ফিরলেন। বললেন, "থানায় গিয়েছিলুম। আপনার ব্যাপারটা যে বলব, শুনলে তো? তিন-তিরেক্কে করতে এল। তবে করালীদাকে শাসিয়ে এসেছি। ...অবাক কাণ্ড মশাই! করালীদা বলল, তিনু তো জাহাজে। ওদের জাহাজ এখন প্যাসিফিক ওসেনে ভাসছে। বুঝুন তিন-তিরেক্কের কারবার!"

রমলাবউদি ধমক দিয়ে বললেন, "বকবক কোরো না তো! ঠাকুরপোকে খেতে দাও। আর শোনো, ইরিগেশন-বাংলোয় গিয়ে ঠাকুরপোর জিনিসপত্র নিয়ে এসো।"

বললুম, "না বউদি, আমি বাংলোয় ফিরে যাই, কর্নেল এসে আমাকে না দেখে ভাবনায় পড়ে যাবেন।"

রমলাবউদি কড়া মুখে বললেন, "না। সারারাত্তির ঘুমোওনি। খেয়েদেয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ো। আর তোমাকে একা বেরোতে দিচ্ছিনে। মুরারি, দেখছ পাগলের কাণ্ড? এই আছে, এই নেই। আস্ত ভূত!"

মুরারিবাবু ততক্ষণে কেটে পড়েছেন। বাংলোয় আমার জিনিসপত্র আনতে যে যাননি, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। গেলেও মাধবলাল ওঁকে তা দেবে না। গেট থেকেই ভাগিয়ে দেবে।

স্নান করে চাঙ্গা হয়েছিলুম। কিন্তু পেটে ভাত পড়ার পর চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে এল। আর দেরি না করে নকুলবাবুর জাদুঘরে ঢুকলুম। রমলাবউদি বিছানা গুছিয়ে পেতে দিতেই লম্বা হয়ে পড়লুম এবং ঘুমও আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সেই ঘুম ভাঙল যখন, তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। চোখ খুলে প্রথমে একটি চকচকে টাক দেখতে পেলুম। জানলা দিয়ে শেষ রোদ্দুরের ছটা এসে সেই টাকে পড়েছে। টেবিলে টুপি। ধুড়মুড় করে উঠে বসলুম। "কর্নেল!" বলে উল্লাসে হাঁক ছাড়লুম।

প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ ঘুরলেন না। টেবিলে একটুকরো ভাঙা কালচে পাথরের ফলক আর নোটবই নিয়ে কী একটা করছেন। একপাশে মুরারিবাবু আর রমলাবউদি গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু পরে মুরারিবাবু বললেন, "তিন-তিরেক্কের হিসেব। দেখুন, মিলে যাবে।"

"মিলেছে।" বলে কর্নেল এতক্ষণে আমার দিকে ঘুরলেন। "কী জয়ন্ত? একাশির পাল্লায় তা হলে তুমিও পড়েছিলে? তোমাকে পইপই করে বলেছিলুম, বাংলো ছেড়ে বেরিও না।"

বললুম, "পড়লেও একাশিদেবের নাম জপে বেঁচে গেছি।"

"একাশিদেব?" কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন। "হুঁ, একাশির পাশে দেব যুক্ত করতে পেরেছ, এটাই লাভ। ...না, মুরারিবাবু! তিন যুক্ত দুই পাঁচ করে আর ঝামেলায় পড়বেন না।"

মুরারিবাবু ঝটপট বললেন, "পাঁচে ঝামেলা নেই কর্নেলসায়েব। তিন পাঁচে পনেরো। একের পিঠে পাঁচ। পাঁচ প্লাস এক—ছয়। দুটো নম্বর থ্রি। ...মাধবলালের নামের সংখ্যাতত্ত্ব জয়ন্তবাবুই বের করেছিলেন। ওঁর ক্রেডিট পাওনা। কিন্তু কী মিলেছে বলুন এবার?"

কর্নেল বললেন, "ব্যা-করণ রহস্য ফাঁস করে তবে সব বলব। চলুন, বেরনো যাক। জয়ন্ত, ওঠো। রমলা, ফলকটা যেখানে ছিল, রেখে দাও।"

রমলাবউদি পাথরেরর ভাঙা ফলকটা নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন। একটু পরে বারান্দা থেকে বললেন, "চায়ের জল চাপানো আছে। চা খেয়ে তবে বেরোবেন বাবামশাই!"

কর্নেল কখন তা হলে রমলাবউদিরও বাবামশাই হয়ে গেছেন! ষষ্ঠীর বাবামশাই ক্রমশ দেখছি, বিশ্বসুদ্ধ লোকের বাবামশাই হয়ে উঠছেন।

চা খেয়ে যখন বেরোলুম, তখন প্রায় সাড়ে-পাঁচটা বাজে। কর্নেল হানাবাড়িগুলোর দিকে চলেছেন। মুরারিবাবু কেন কে জানে, ভীষণ গম্ভীর। কর্নেল আমার বন্দী হওয়ার ঘটনাটা জেনে নিলেন হাঁটতে-হাঁটতে। তারপর আপন মনে বললেন, "ঘুরে-ফিরে সেই ব্যাকরণ রহস্য অথবা ব্যা-করণ রহস্য এসে পড়ছে। এক আর আশি একাশি। সন্ধি প্রকরণ! মুরারিবাবু, আপনি জয়ন্তর সঙ্গে ভাঙা দেউড়ির ওখানে যান। আমি একটু ঘুরপথে যাচ্ছি।" বলে আমার দিকে ঘুরে একটু হাসলেন। "ভয় নেই ডার্লিং! তিনকড়িচন্দ্র এখন ওদিকে পা বাড়াতে সাহস পাবে না। পুলিশ ওৎ পেতে আছে। সে তত বোকা নয়।"

মুরারিবাবু এবার চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। বুঝলুম, তিনকড়িচন্দ্রের ভয়ে এ-তল্লাটে আসতে বড় অনিচ্ছা ছিল। তাই অমন গম্ভীর দেখাচ্ছিল ওঁকে। লম্বা পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন। বললেন, "পুলিশ ওত পেতে আছে। আর তিন-তিরেক্কে করে কে? নয় নয়ে একাশি হয়ে যাবে। কিন্তু একাশিদেব কোন্ দেবতা বলুন তো জয়ন্তবাবু?... শোনা-শোনা মনে হচ্ছে। ...কার কাছে যেন শুনেছিলুম নামটা। পেটে আসছেন, মুখে আসতেই তিন-তিরেক্কে হয়ে যাচ্ছে।"

কর্নেল ঝোপঝাড়-ধ্বংসস্তূপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই দেউড়ির কাছে পৌঁছে গেলুম। এখনও দিনের আলো আছে। তবু চারদিকে ভয়ে-ভয়ে তাকাচ্ছিলুম। মুরারিবাবুও তাকাচ্ছিলেন। ভুরু কুঁচকে চাপা গলায় বললেন, "পুলিশ ওৎ পেতে আছে! পুলিশ কীভাবে ওৎ পাতে জানেন? কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ঝোপঝাড়ের আড়ালে... এক মিনিট! ওই ঝোপটা দেখে আসি। স্বচক্ষে না দেখলে মশাই, বুকটা খালি তিন-তিরেক্কে তিন-তিরেক্কে করতেই থাকবে।"

এই বলে যেই পা বাড়িয়েছেন, দেউড়ির মাথা থেকে বিদঘুটে আওয়াজ এল, "এ-কা-শি!" সেই তিন-শিঙে ছাগলের মুণ্ডু। মুরারিবাবু থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। তারপরই আচমকা খাপ্পা হয়ে একটুকরো আধলা ইঁট কুড়িয়ে "নিকুচি করেছে তোর একাশির!" বলে ছুড়ে মারলেন। ছাগলের মুণ্ডুটা অদৃশ্য হলে গেল দেউড়ির মাথায় ঝোপের ভেতর। মুরারিবাবু আবার ইঁটের টুকরো কুড়িয়ে ছুঁড়লেন। সে একটা দেখার মতো দৃশ্য। ক্রমাগত ঢিল-ছোড়াছুড়ি করে চলেছেন মুরারিবাবু। ওঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "এ কী করছেন! পুলিশ ওৎ পেতে আছে কোথাও। কারও মাথায় পড়লে কী হবে?"

মুরারিবাবু ক্ষান্ত হলেন সঙ্গে-সঙ্গে। জিভ কেটে বললেন, "সরি, ভেরি সরি!" তারপর চারদিকে করজোড়ে নমস্কার করে অদৃশ্য পুলিশদের উদ্দেশে বললেন, "কিছু মনে করবেন না স্যাররা! একাশির ঠ্যালা। মাথা ঠিক রাখা কঠিন।"

এইসময় দেউড়ির পেছন থেকে কর্নেলের আবির্ভাব ঘটল। মুখে উজ্জ্বল হাসি। কিন্তু হতভম্ব হয়ে দেখলুম, ওঁর হাতে সেই তিন-শিঙে ছাগলটার মুণ্ডু। বললুম, "সর্বনাশ!"

"সর্বনাশ নয়, ডার্লিং! বলিদান-করা মুণ্ডু নয়।" কর্নেল সহাস্যে বললেন। "রক্ত দেখতে পাচ্ছ কি?"

মুরারিবাবু চোখ টেরিয়ে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর সামনে মুণ্ডুটা কর্নেল তুলে ধরে বললেন, "কী মুরারিবাবু? নকল একাশিদেবকে চিনতে পারছেন কি?"

অমনি মুরারিবাবু খ্যাঁক করে হাসলেন। তারপর মুণ্ডুটা ছিনিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, "কী কাণ্ড! এও দেখছি তিন-তিরেক্কের খেলা। মুখোশ!"

"হ্যাঁ, মুখোশ।" কর্নেল বললেন, "সুড়ঙ্গের মুখে ঝোপের আড়ালে ওৎ পেতে ছিলুম। যেই ঝোপ ফুঁড়ে উঠেছে, শিং ধরে ফেললুম। মুখোশ উপড়ে এল। আসল প্রাণীটি দুই ঠ্যাঙে দৌড়ে পালিয়ে গেল।"

"বিট্টু?" প্রায় চেঁচিয়ে উঠলুম, "নিশ্চয় বিট্টু এই মুখোশ পরে মুরারিবাবুকে নিয়ে জোক করত!"

মুরারিবাবু মারমুখী হয়ে "তবে রে হতচ্ছাড়া, বিচ্ছু বাঁদর," বলে ছুটে গেলেন। বিট্টুকে খুঁজে পাবেন কি না সন্দেহ। কর্নেল বললেন, "ওই যাঃ! মুরারিবাবু মুখোশটা নিয়ে চলে গেলেন যে!"

"যাকগে! শিলালিপির পাঠোদ্ধার হয়েছে কি না বলুন।"

"চলো। বাংলোয় ফিরে গিয়ে বলব।"

টিবি-এলাকা থেকে হাইওয়েতে নেমে বাংলোর দিকে হাঁটতে-হাঁটতে কর্নেল বললেন, "এও একটা সন্ধিবিচ্ছেদ বা ধড়-মুণ্ডুবিচ্ছেদ হওয়ার ঘটনা বলা চলে, ডার্লিং! তবে এটা নকল। আসলটা ফাঁস হবে মধ্যরাতে—বারোটা নাগাদ। ফাঁদ পেতে এসেছি। দেখা যাক্।"

"খুলে বলুন। হেঁয়ালি আর ভাল্লাগে না!"

কর্নেল আমার কথার জবাবই দিলেন না। চোখে বাইনোকুলার রেখে পাখি দেখতে দেখতে চললেন। বাংলোর গেটে মাধবলাল উদ্বিগ্নমুখে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, "ছোটসাবকে লিয়ে হাম বহত্ শোচতা থা। রাতভর নিঁদ নেহি! আজ সারে দিনতকভি শোচতে শোচতে...হা রামজি!"

"জলদি কফি বানাও, মাধবলাল।" বলে কর্নেল বারান্দায় উঠে বেতের চেয়ারে বসলেন। একটু পরেই কফি এল। বারান্দার বাতিটা জ্বালিয়ে দিল মাধবলাল। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন। সেটা খুলে টেবিলে বিছিয়ে বললেন, "কলকাতা যাব বলে রওনা হয়ে বর্ধমানে পৌঁছে হঠাৎ মনে হল, ডঃ টি সি সিংহের সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়া উচিত। তাঁর কার্ড তিনকড়িচন্দ্র পেল কী করে? তা ছাড়া ডঃ সিংহ একজন পুরাবিদ এবং ভাষাবিজ্ঞানীও। ...হুঁ, যা ভেবেছিলুম। তিনকড়িচন্দ্র তাঁর কাছে একটা শিলালিপির একটুখানি ভাঙা অংশ নিয়ে গিয়েছিল। উনি সেটা কপি করে রেখে সময় চেয়েছিলেন। লিপিটা দেখে ওঁর অবাক লেগেছিল। তিনকড়িচন্দ্র তার চর মারফত খবর পেয়ে থাকবে, আমি পরের ট্রেনে আসছি। সে বর্ধমান থেকে আমাদের সঙ্গ নিল।"

"কার্ড চুরি করল কী করে?"

"চুরি নয়। চেয়ে নিয়েছিল। নেমকার্ড চাইলে কি দেবেন না" বলে কর্নেল কাগজের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। "এই লিপি খ্রিস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের কুষান-লিপি। ব্রাহ্মীর রকমফের। কিন্তু মজার ব্যাপার, এর ভেতর বাংলায় কিছু কথা লেখা আছে। সম্ভবত ধাড়াবংশের কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কীর্তি।"

বললুম, "কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং!"

কর্নেল হাসলেন। "ব্যাকরণ রহস্য ডার্লিং! ব্যঞ্জনবর্ণ-স্বরবর্ণ সন্ধি করলেই কথাটা বেরিয়ে আসবে। এই দেখো! ত+ও+র+ণ=তোরণ। শ+ই+র+এ=শিরে। গ+উ+প+ত+গ+র+ত=গুপ্ত গর্ত। ম+আ+ঝ+এ=মাঝে। ন+আ+ম+ও=নামো। ব+আ+ম+দ+ই+ক+এ=বাম দিকে। ত+ই+ন+ধ+আ+প=তিন ধাপ। ... এরপর শুধু 'ব'। বাকিটা ভেঙে গেছে এবং সেই ভাঙা অংশটা তিনকড়িচন্দ্র দিয়ে এসেছে ডঃ সিংহকে। তাই মিলিয়ে পুরো গুপ্তবাক্যটি হল :

তোরণশিরে গুপ্তগর্ত মাঝে নামো। বাম দিকে তিন ধাপ। বাম হাতের তর্জনী।

বুঝতে পেরে বললুম, "সত্যিই তিন-তিরেক্কের ব্যাপার। বাপ্‌স! কিন্তু বাম হাতের তর্জনী মানে?"

"সেখানে দাঁড়ালে হাত ঝুলিয়ে বাম হাতের তর্জনী যেখানে ঠেকবে, সেখানেই..."

"ঘড়াভর্তি সোনার মোহর?"

"না। একাশিদেব।" বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন। তোমার মুখে 'বাচ্চা ছেলে' কথার সূত্রে আমার মাথায় আইডিয়াটা আসে। তবে বিট্টু ছেলেটির হাড়ে-হাড়ে বুদ্ধি। নকুলবাবু ওকে তাড়াতেন আর ইতিহাসের গল্প শোনাতেন। শিবের তিন-শিঙে ছাগল-অবতারের গল্প শুনে বিট্টু বাজারের মুখোশ তৈরির দোকানে অর্ডার দিয়েছিল। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, এ-অঞ্চলে মুখোশ তৈরির প্রচুর দোকান আছে। ছৌ-নাচের মুখোশ এইসব দোকান থেকেই লোকে কেনে। আসলে মুরারিবাবুকে ভয় দেখাতেই বিট্টুর এই দুষ্টুমি। কিন্তু বাচ্চা ছেলে বলে ক্লুটা তুমিই দিয়েছিলে।"

"একাশিদেব ব্যাপারটা কী?"

"আজ রাত বারোটায় দেখবে। ডঃ সিংহকে বলে এসেছি, তিনকড়িচন্দ্রকে শিলালিপিটার বাকি অংশের কপি দেবেন। যেন উনি বর্ধমান মিউজিয়ামে এর খোঁজ পেয়েছেন! ফাঁদটা বুঝলে তো?"

"রাত বারোটা কেন?" উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে বললুম। "আরও আগে নয় কেন?"

"ওই সময় অমাবস্যা পড়ছে। মন্দিরে খুব ভিড় হবে আজ রাতে। কাজেই সবার মন পড়ে থাকবে মন্দিরে। এদিকে নির্বিঘ্নে তিনকড়ি একাশিদেবকে উদ্ধার করবে। তিনপুরুষ ধরে ভাঙা দেউড়ি নিয়ে মামলার আসল কারণটা তো এই।"

একটু ভেবে বললুম, "কিন্তু তিনকড়িচন্দ্র বেঁটে? দেউড়ির মাথায় সুড়ঙ্গে তিন ধাপ নেমে বাঁ হাত ঝুলিয়ে ওর তর্জনী যেখানে ঠেকবে, মুরারিবাবুর সেখানে ঠেকবে না। একজন বেঁটে, একজন লম্বা।"

কর্নেল হাসলেন। "সেজন্যই অনেক পাথরের ইট ওপড়াতে হবে তিনকড়িচন্দ্রকে। শাবল দিয়ে ইট ওপড়াতে শব্দ হবে। রাত বারোটায় অমাবস্যায় আজ পুজোর ধুম। ঢাক বাজবে প্রচুর। ঢাকের শব্দে শাবলের শব্দ চাপা পড়বে।"

রাত সাড়ে এগারোটায় থানা-পুলিশের জিপ আমাদের হাইওয়ের বটতলায় পৌঁছে দিল। সঙ্গে সেই দত্যিদানোর মতো প্রকাণ্ড মানুষ অফিসার-ইন-চার্জ মিঃ হাটি। পুলিশের দারোগা না হলে হাতিমশাই বলা যেত। তিনি ভূমিকম্প-হাসি হাসছিলেন না। সম্ভবত ডিউটিতে আছেন বলেই। নয়তো খানতিনেক হাসলেই দেউড়ি ধসে পড়ত। কিন্তু রাত বারোটা বাজতেই চায় না। গুমোট গরম আর স্তব্ধতা। এ-রাতে বাতাস বন্ধ। ঝোপের আড়ালে আমরা বসে সময় গুনছি, কখন মন্দিরে বলির ঢাক বেজে উঠবে অমাবস্যার লগ্নে। সামনে আকাশের নক্ষত্রের ওপর একটা কালো ছায়া, ওটাই ভাঙা দেউড়ি।

একসময় মন্দিরের দিকে হঠাৎ তুমুল ঢাক বেজে উঠল। ভক্তদের জয়ধ্বনি শোনা গেল। ঝোপঝাড়-ধ্বংসস্তূপের ফোকর গলিয়ে মাঝেসাঝে আলোর ঝিলিমিলি। কর্নেল ফিসফিস করে বললেন "মশাল-নৃত্য!"

তারপর চোখে পড়ল কালো তোরণের ওপর কয়েকটা ছায়ামূর্তি নড়াচড়া করছে। মিঃ হাটি ফোঁস-ফোঁস শব্দে বললেন, "এসে গেছে। কখন আসামি ধরতে হবে, জানিয়ে দেবেন।"

কর্নেল তেমনই চাপা স্বরে বললেন, "মিঃ হাটি, এবার আসুন আমরা সুড়ঙ্গের মুখে গিয়ে অপেক্ষা করি। ওরা কাজে নামুক। বেরনোর সময় মালসুদ্ধ আসামি ধরবেন।"

তিনজনে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলুম। মিঃ হাটির পায়ের শব্দ নেই, যেন শূন্যে হাঁটছেন। বুঝলুম পুলিশ ট্রেনিং। আমার পা বারবার শুকনো লতাপাতায় পড়ে মচমচ শব্দ উঠছে। কর্নেলের এ-তল্লাট নখদর্পণে, এমন করে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন ঘুরঘুট্টে অন্ধকারে। কিছুক্ষণ পরে যেখানে থামতে হল, সেটা একটা ভাঙা বাড়ি। মনে পড়ল, এর মেঝেতে ঝোপের ভেতর সুড়ঙ্গের দরজা রয়েছে। হঠাৎ কর্নেল বলে উঠলেন, "এই রে, মুরারিবাবু মনে হচ্ছে!"

একটু দূরে টর্চের আলো জ্বলে উঠতে দেখলুম। পায়ের কাছে আলো ফেলতে ফেলতে কেউ এগিয়ে আসছে এদিকে। মিঃ হাটি বললেন, "পাগলাটাকে সামলানো দরকার।"

কর্নেল বললেন, "উনি তিন-শিঙে ছাগলের মুখোশ পরেছেন দেখা যাচ্ছে! এক মিনিট! আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। এই নতুন প্ল্যানে মুরারিবাবুকে কাজে লাগাব।"

বলে উনি গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলেন। তারপর মুরারিবাবুর ওপর আচমকা টর্চের আলো ফেললেন। মুরারিবাবু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পালালেন না। বিচ্ছিরি, 'ব্যা-অ্যা' ডেকে উঠলেন। কর্নেল টর্চ নিভিয়ে চাপা স্বরে বললেন, "চুপ!" বোঝা গেল, মুরারিবাবুর ব্যা-ডাক ভয় দেখাতেই। কিন্তু নিজেই ভয় পেলেন। তাঁর টর্চের আলো কর্নেলের ওপর পড়ল। তারপর খ্যাঁক করে হেসে টর্চ নেভালেন। মহানন্দে বললেন, "বিট্টুর কাছে সুড়ঙ্গের দরজার খোঁজ পেয়েছি। সোনার মোহরের ঘড়া আনতে যাচ্ছি।"

"চুপ, চুপ। আস্তে!" কর্নেল বললেন, "শুনুন! আপনি সুড়ঙ্গের মুখে ঝোপের ভেতর শুধু মুণ্ডটা বের করে বসুন। আপনার তিনকড়িদা দলবল নিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকেছেন। ওঁর ফেরার সময় ব্যা-অ্যা করবেন। খুব শিঙ নাড়বেন কিন্তু!"

মুরারিবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, "নাড়ব মানে? তিন-তিরেক্কে নয়, নয় নয়ে একাশিবার নাড়ব। আমার ঠাকুর্দার সোনার মোহরভর্তি ঘড়া!"

"আস্তে! থানার বড়বাবু আছেন, এই দেখুন। রেগে যাবেন।"

মুরারিবাবু শ্বাসের সঙ্গে বললেন, "ও! আচ্ছা!" তারপর ঝোপঝাড় ঠেলে বাড়ির ভাঙা দেওয়ালের পাশের ঝোপ ঠেলে ঢুকে পড়লেন। একবার টর্চ জ্বেলে জায়গাটা শনাক্ত করে নিলেন। সম্ভবত সুড়ঙ্গের মুখে চারঠেঙে প্রাণীর মতোই বসলেন।

কতক্ষণ কেটে গেল। তারপর মুরারিবাবু যেখানে ঢুকেছেন, সেখানে কয়েকবার আবছা টর্চের আলো ঝিলিক দিল। একটু পরে মুরারিবাবুর বিকট ব্যা-অ্যা-অ্যা ডাক শোনা গেল। অমনি কর্নেল বলে উঠলেন, "মিঃ হাটি, জয়ন্তকে নিয়ে আপনি দেউড়ির ওখানে যান। হুইসল বাজিয়ে আপনার লোকেদের ডাকুন গিয়ে।"

মিঃ হাটি এবার ভূমিকম্পের মতো মাটি কাঁপিয়ে হাঁটতে বা দৌড়তে থাকলেন। সেই সঙ্গে হুইসলও বাজতে থাকল। দেউড়ির দিকে ঝলকে ঝলকে টর্চের আলো, পাল্টা হুইসল, দুদ্দাড়, হুলুস্থুলু। ঝড়, ভূমিকম্প হয়ে গেছে এমন তাণ্ডব! দেউড়ির মাথায় টর্চের আলো পড়েছে এদিক-ওদিক থেকে। সেই আলোয় দেখলুম, সেই ষণ্ডামার্কা মোটকু আর তার সঙ্গী ঝাঁপ দেবার তাল করছে। কিন্তু পারছে না। হাড়গোড় ভেঙে তো যাবেই, তার ওপর পুলিশের খপ্পরে পড়বে। মিঃ হাটি গর্জন করলেন, "খুলি ফুটো হয়ে যাবে। যেখানে আছ, তেমনই থাকো। কল্যাণবাবু!"

কল্যাণবাবুর সাড়া পাওয়া গেল। "ইয়েস স্যার!"

"ওদিকে যান। সুড়ঙ্গের মুখে পাগলাবাবু ওখানে আছে। তিন-শিঙে ছাগলের মুণ্ডু দেখে ভয় পাবেন না যেন।" বলে মিঃ হাটি সেই ভূমিকম্প-হাসি হাসলেন।

টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে কল্যাণবাবু একদল সেপাই নিয়ে ছুটে গেলেন। দেউড়ির মাথায় মোটকু এবং তার সঙ্গী এইসময় গর্তের দিকে ঝুঁকল। তারপরই "ও রে বাবা" বলে পিছিয়ে এসে মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দিল। ঝাঁপ দিয়েই আর্তনাদ করে উঠল। ক'জন সেপাই গিয়ে ঘিরে ধরল তাদের। তারা আছাড়ের চোটে কাতরাতে থাকল। বেটনের গুঁতোও খাচ্ছিল মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো। কিন্তু এদিকে আমি উদ্বিগ্ন। সুড়ঙ্গের ভেতর কর্নেল তিনকড়িচন্দ্রের সঙ্গে ট্রেনের কুপেতে যেমন ফিল্মি লড়াই লড়ছিলেন, তেমন কিছু ঘটছে না তো? টর্চের আলো দেউড়ির মাথায় ফেলে ডাকলুম, "কর্নেল! কর্নেল!"

কর্নেলের বদলে বেরোলেন ছাগলাবতাররূপী মুরারিবাবু। বললেন, "একাশি।"

মিঃ হাটি আবার ভূমিকম্প-হাসি হাসতে লাগলেন।

চেঁচিয়ে বললুম, "কর্নেল কোথায় মুরারিবাবু?"

মুরারিবাবু মুখোশ খুলে বললেন, "তিনকড়িদাকে তিন-তিরেক্কে করে ফেলেছেন।" বলেই তারপর গর্তে ঢুকে গেলেন। ব্যাপারটা বোঝা গেল না।

দূরে সুড়ঙ্গের মুখের দিক থেকে ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে কল্যাণবাবুরা আসছেন দেখতে পেলুম। সঙ্গে কর্নেলও আছেন। কল্যাণবাবু তিনকড়িচন্দ্রের জামার কলার ধরে আছেন। সে ল্যাংচাচ্ছে। কাছে এসে কর্নেল বললেন, "একাশি! না—একাশীদেব। তালব্য শ-এ দীর্ঘ ঈ হবে। একটু বানানভুল আর কি!"

ওঁর হাতে একটা ছোট্ট পাথরের মূর্তি। মূর্তিটা তিন-শিঙে ছাগলের। বললুম, "এ কি?"

"ডার্লিং, এটা বিদেশে বেচতে পারলে কোটি টাকা পেতেন তিনকড়িবাবু। তোমাকে বলেছিলুম এক এবং আশি সন্ধি করে একাশি। ব্যা-করণ বা ব্যাকরণ রহস্য।" কর্নেল শিঙ তিনটে দেখিয়ে ব্যাখ্যা করলেন। "একে চন্দ্র—নামতা, জয়ন্ত! শিবের মাথায় চন্দ্র থাকে। মাঝখানেরটা আশী অর্থাৎ সাপ। আশীবিষ পুরো সাপ। এটা আসলে সাপের ফণার প্রতীক। শুধু ফণাটুকু, তাই আশী। ওকে শাস্ত্রে বলে 'কূটাভাস'। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে রাজা শিবসিংহের আমলে শিবের কূটাভাস তিন-শিঙে ছাগলে পরিণত হয়েছিল। পশুপতিদেব কিনা! মহেনজো-দরোর ঐতিহ্য, জয়ন্ত। শিবের মাথায় চন্দ্রকলা এবং মাঝখানে সাপের ফণা। সন্ধি করলে এক প্লাস আশি সমান একাশি। ব্যাকরণ রহস্য। তবে ব্যা-করণ রহস্যই বলব। কারণ..."

মুরারিবাবু হাঁফাতে-হাঁফাতে এসে বললেন, "কই, সোনার মোহরভর্তি ঘড়া?"

কর্নেল তাঁকে একাশীদেবের মূর্তিটা দেখিয়ে শুধু বললেন, "একাশী!"

রাগের চোটে মুরারিবাবু বিকট 'ব্যা-অ্যা-অ্যা' করে ভেংচি কেটেই বুঝলেন, থানার বড়বাবু-মেজোবাবুদের সামনে বেয়াদপি হয়ে গেছে। টর্চ জ্বালতে জ্বালতে প্রায় দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। ব্যাকরণে আর রহস্য নেই, বুঝতে পেরেছেন মুরারিবাবু।

কর্নেল বললেন, "চলুন। থানায় গিয়ে এবার হালদারমশাইকে উদ্ধার করি।"

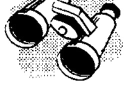

আজব বলের রহস্য

"এক কিলো তুলো ভারী, না এক কিলো লোহা ভারী?" ষষ্ঠীচরণ ট্রে-তে কফি আর স্ন্যাক্স রেখে চলে যাচ্ছিল। এই বেমক্কা প্রশ্নে হকচকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল এবং ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, "আজ্ঞে বাবামশাই?"

তার 'বাবামশাই' মানে, আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার চোখ কটমটিয়ে বললেন, "এক কিলো তুলো আর এক কিলো লোহার মধ্যে কোনটা বেশি ভারী?"

ষষ্ঠী ফিক করে হেসে বলল, "নোহা।" সে সবসময় 'ল'-কে 'ন' এবং 'ন'-কে 'ল' করে ফেলে।

আমি হোহো করে হেসে ফেললুম। ষষ্ঠী গাল চুলকোতে-চুলকোতে সম্ভবত ভুলটা খোঁজার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমাকে অবাক করে কর্নেল বললেন, "ঠিক বলেছিস। বকশিস পাবি।"

ষষ্ঠী খুশি হয়ে চলে গেল। কর্নেল পেয়ালায় কফি ঢালতে থাকলেন। মুখে সিরিয়াস ভাবভঙ্গি। আমি একটু ধাঁধায় পড়ে গেলুম। কর্নেল আমার হাতে কফির পেয়ালা তুলে দিয়ে বলল, "ষষ্ঠী কিন্তু ঠিক বলেনি।"

"বলেছে।" কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "তুমি কী বলতে চাইছ জানি, জয়ন্ত। এ-ধরনের প্রশ্নকে আগের দিনে বলা হত 'জামাই-ঠকানো প্রশ্ন'। এক কিলো তুলো আর এক কিলো লোহা। দুটোরই ওজন যখন এক, তখন একটা আর-একটার চেয়ে ভারী হতে পারে না। ঠিক কথা। কিন্তু সত্যিই তুলোর চেয়ে লোহা অনেক ভারী জিনিস। আয়তন ডার্লিং, আয়তন! তুমি আয়তনের কথাটা ভুলে যাচ্ছ। আমরা যখন কোনো বস্তুকে দেখি, আগে সেটার আয়তনই চোখে পড়ে। এক কিলো তুলোর যা আয়তন, তা যদি লোহার হয়, তা হলে লোহাটাই বেশি ভারী নয় কি?"

বিরক্ত হয়ে বললুম, "কিন্তু ভারী বলতে তো ওজনই বোঝায়।"

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, "হুঁ। তবে ভুলে যাচ্ছ, আমরা আয়তন বাদ দিয়ে কোনো বস্তুকেই কল্পনা করতে পারি না। একটু তলিয়ে ভাবা দরকার জয়ন্ত! বস্তুর যেমন ওজন আছে, তেমনই আয়তনও আছে।"

"আপনার যুক্তির মাথামুণ্ডু নেই। আমি দুঃখিত।"

কর্নেল আমার কথায় কান না দিয়ে বললেন, "আচ্ছা জয়ন্ত, সমান আয়তনের কোনো ধাতু, ধরো, একটা ক্রিকেটবলের সাইজ লোহা, সোনা আর সিসের মধ্যে কোনটা বেশি ভারী?"

একটু ভেবে বললুম, "সম্ভবত সোনা।"

"হুঁ, সোনা। আমরা সচরাচর যেসব জিনিস হাতে নাড়াঘাঁটা করে থাকি বা মোটামুটিভাবে হাতের কাছে পাই, তাদের মধ্যে সোনা সবচেয়ে ভারী এবং সেটা আয়তনের দিক থেকে।" বলে কর্নেল হেলান দিলেন এবং চোখ বন্ধ। সাদা দাড়ি এবং চওড়া টাকে বাঁ হাতটা পর্যায়ক্রমে বুলোতে থাকলেন। এটা ওঁর চিন্তাভাবনার লক্ষণ।

বললুম, "ব্যাপারটা কী? আজ সকালবেলায় হঠাৎ এসব নিয়ে মাথাব্যথার কারণ কী বুঝতে পারছি না।"

কর্নেল একই অবস্থায় থেকে বললেন, "ওই শোনো ডার্লিং! দোতলায় লিন্ডার প্রিয় কুকুর রেক্সি চেঁচামেচি জুড়েছে। সিঁড়িতে ধুপধুপ ভারী পায়ের শব্দ। এবার কলিং বেল বাজাটা অনিবার্য।" বলে হাঁকলেন, "ষষ্ঠী!" এবং চোখ খুলে সিধে হয়ে বসলেন।

সত্যিই কলিং বেল বাজল। ষষ্ঠীর দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। তারপর কর্নেলের এই জাদুঘরসদৃশ ড্রয়িংরুমে দু'টি মূর্তির আবির্ভাব ঘটল। আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম।

একজন মাঝারি গড়নের ছিমছাম চেহারার প্রৌঢ় ভদ্রলোক। পরনে ধুতি ও সিল্কের পাঞ্জাবি। অন্যজন একেবারে দানো বললেই চলে। পেল্লায় গড়নের পালোয়ান। পরনে হাফপেন্টুল ও স্পোর্টিং গেঞ্জি। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। গলায় চাঁদির তক্তি। তার মাথায় একটা ছোট্ট চটের থলে, যে-ধরনের থলেতে বাজার করা হয়। থলের মুখটা দড়ি দিয়ে আঁটো করে বাঁধা আছে। পালোয়ান লোকটি দু'টি পেশিবহুল হাতে থলেটি ধরে আছে এবং এই মোলায়েম এপ্রিলে সে দরদর করে ঘামছে, টলছে এবং হাঁফাচ্ছে। ফোঁস-ফোঁস শব্দ ছাড়ছে নাক-মুখ থেকে।

ভেবেই পেলুম না একটা তোবড়ানো থলের ভেতর কী ওজনদার জিনিস আছে যে এমন পেল্লায় গড়নের মানুষকে কাহিল হতে হয়েছে!

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, "কী রে ভোঁদা? দাঁড়িয়ে থাকবি, না নামাবি?"

পালোয়ান হাঁসফাঁস শব্দে বলল, "ধরতে হবে।"

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "জয়ন্ত! এসো, আমরা ওকে একটু সাহায্য করি। ভবেশবাবু, মনে হচ্ছে আপনাকেও হাত লাগাতে হবে। ষষ্ঠী! তুইও আয়।"

ষষ্ঠী দরজার পরদায় উঁকি মেরে পিটপিটে চোখে ব্যাপারটা দেখছিল। এগিয়ে এল। তারপর আমরা সবাই মিলে পালোয়ানের মাথা থেকে চটের থলেটি নামিয়ে টেবিলে রাখলুম।

বলছি বটে নামিয়ে রাখলুম, যেন আস্ত একটা পাহাড়কে কাত করে ফেললুম। থলের ভেতরে কী আছে কে জানে, মনে হল, অন্তত পাঁচ কুইন্টালের কম নয় সেটির ওজন। টেবিলটা যে মড়মড় করে ভেঙে গেল না, এটাই আশ্চর্য! তবে টেবিলে রাখার সময় বাড়িটাই যেন ভূমিকম্পে নড়ে উঠল। অবশ্য মনের ভুল হতেও পারে।

কর্নেল থলে খুলতে ব্যস্ত হলেন। পালোয়ান মেঝের কার্পেটে বসে হুমহাম শব্দে বলল, "ফ্যান! ফ্যান! জল!"

ষষ্ঠী ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে দিল। তারপর জল আনতে দৌড়ল। ততক্ষণে কর্নেল দড়ি খুলে থলেটা ফাঁক করেছেন। দেখলুম, থলের ভেতর ক্রিকেটবলের সাইজের কালো একটা জিনিস। অবাক হয়ে বললুম, "এই জিনিসটা এত ভারী? কী এটা?"

ভবেশবাবু সোফায় বসে বললেন, "সেটাই তো রহস্য মশাই! তবে তার চেয়ে বেশি রহস্য, আমার বাথরুমে জিনিসটার আবির্ভাব।"

যে-টেবিলে আজব বলটি রাখা হয়েছে, সেটি কর্নেলের রিসার্চ-ক্ষেত্র বললে ভুল হয় না। টেবিলটি এতদিন ধরে দেখে আসছি। কিন্তু সেটি যে এমন শক্তিশালী তা এই প্রথম জানতে পারলুম। অমন ওজনদার জিনিসের চাপে একটুও মচকাল না। কর্নেল ড্রয়ার থেকে আতসকাচ বের বের করে ততক্ষণে খুঁটিয়ে পরীক্ষা শুরু করেছেন। এদিকে পালোয়ান পর-পর তিন গ্লাস জল খেয়ে মাথায় হাত বুলোচ্ছে। ভবেশবাবু খুব আগ্রহের সঙ্গে কর্নেলের দিকে লক্ষ রেখেছেন।

আমি ভবেশবাবুকে বললুম, "প্লিজ, ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন কি?"

ভদ্রলোক একটু বদরাগী অথবা উত্তেজিত অবস্থায় ছিলেন। যে-জন্যই হোক, খ্যাঁক করে উঠলেন। "ওই তো বললুম মশাই! রহস্য! আর রহস্য বলেই কর্নেলসায়েবের কাছে আসা।" বলে কর্নেলের দিকে তাকালেন। "কিছু আঁচ করতে পারলেন স্যার?"

কর্নেল আতশকাচ রেখে সোফার কাছে জানালার ধারে তাঁর ইজিচেয়ারে এসে বসলেন। বললেন, "আপাতত কিছু বোঝা যাচ্ছে না ভবেশবাবু! জিনিসটা সত্যিই রহস্যময়। কিছুটা সময় লাগবে।"

ভবেশবাবু বললেন, "বেশ তো! যত ইচ্ছে সময় নিন। তবে স্যার, সত্যি বলতে কী, ওই বকশিশ জিনিস আমার ফেরত নিয়ে যেতেও আপত্তি আছে! বাপ্‌স্‌! গতকাল বিকেলে বাথরুমে ওটা আবিষ্কারের পর থেকে যা-সব ঘটেছে, সবই তো আপনাকে টেলিফোনে বলেছি।"

পালোয়ান এতক্ষণে মেঝে থেকে উঠে সোফায় বসল। তার ওজনও কম নয়। সোফা মচমচ শব্দে কেঁপে উঠল। সে বলল, "ভূতুড়ে জিনিস স্যার! মামাবাবুকে এত বলছি, কানে করছেন না। নির্ঘাত ওটা ভূতের ঢিল।"

কর্নেল বললেন, "ঠিক। ভূতটা সারারাত ঢিলটা ফেরত নিতে বাড়ি চক্কর দিয়েছে। নানারকম ভয়-দেখানো আওয়াজ করেছে। তাই না ভবেশবাবু?"

ভবেশবাবু বললেন, "হ্যাঁ স্যার! সারারাত ঘুমোতে পারিনি। জানলার বাইরে ফিসফিস। দরজায় টোকা। বাগানে শাঁইশাঁই ঘূর্ণি হাওয়া। তারপর ছাদে বেহালার বাজনা! আমার অমন দাপুটে অ্যালসেশিয়ান টারজন, স্যার, সে পর্যন্ত ভয়ে কুঁকড়ে কাঠ।"

পালোয়ান ভোঁদা বলল, "আর সেই ঝনঝন শব্দটা, মামাবাবু? সেটার কথা বলুন!"

"হ্যাঁ, ঝনঝন শব্দ।" ভবেশবাবু চাপা গলায় বললেন, "ঘুম ভেঙে প্রথমে ভাবলুম, পাড়ায় কোথায় মাইকে খত্তাল বাজছে। পরে বুঝলুম, না—অন্য কিছু।"

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "ভূতের কেত্তন!"

পালোয়ান সোফা কাঁপিয়ে হ্যা-হ্যা করে হাসতে লাগল। তারপর তার মামাবাবুর ধমক খেয়ে গম্ভীর হয়ে গেল। আমি ওকে বললুম, "ভোঁদাবাবু! আপনি তো ব্যায়ামবীর..."

পালোয়ান ঝটপট বলল, "আমার নাম জগদীশ। তবে আপনি ব্যায়ামবীর বললেন, সেটা ঠিকই। গত বছর স্টেট মাস্‌ল্‌ এগজিবিশনে ওই টাইটেল পেয়েছি।"

বলে সে ডান হাত তুলে তাগড়া-তাগড়া পেশি ফুলিয়ে নমুনা দেখাল। দেখার মতো বস্তু হলেও আমার কেন যেন অস্বস্তিকর লাগে। মানুষের শরীরকে মানুষ ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বিকট করে তোলে এবং সেজন্য খেতাবও জুটে যায়! একে দেহসৌষ্ঠব বা সৌন্দর্য বলে প্রশংসাও করা হয় 'শ্রী' শব্দ সহযোগে। ব্যাপারটার মানে বুঝি না। কিন্তু কর্নেল জগদীশ ওরফে ভোঁদার পেশি-প্রদর্শনীর তারিফ করে বললেন, "অসাধারণ।"

আর অমনি পালোয়ানটি উঠে দাঁড়িয়ে আচমকা অঁক শব্দ করে শরীর বাঁকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়াল, যেমনটি 'দেহশ্রী'-ক্যাপশনযুক্ত ছবিতে দেখা যায়। ষষ্ঠী ফের অতিথিদের জন্য কফি-টফি আনছিল। থমকে সভয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

ভবেশবাবু ধমক দিলেন, "খুব হয়েছে। আর বীরত্ব দেখিয়ে কাজ নেই। কাল রাত্তিরে কোথায় ছিল পালোয়ানি? ঠকঠক করে কেঁপে মা-মা-মা-মা করে আমাকে জড়িয়ে ধরে...হুঁঃ!"

কাঁচুমাচু হেসে পালোয়ান বসল। বলল, "মানুষ তো নয়! মানুষ হলে এক আছাড়ে ছাতু করে ফেলতুম। ভূত-প্রেতের সঙ্গে পারা যায়? ওদের তো বডি নেই।"

কর্নেল বললেন, "যাই হোক, খুব মেহনত করেছ তুমি। কফি খেয়ে চাঙ্গা হও।"

"কফি-চা এসব আমার মানা।" পালোয়ান বলল, "তবে কর্নেল-সার, ইওর অনার।" বলে সে কফির পেয়ালা তুলে একটানে গরম কফি গিলে ফেলল। তারপর স্ন্যাক্সের সবটাই প্রকাণ্ড দুই হাতের চেটোয় তুলে মুখে ভরল।

ভবেশবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমিও ভাগনেবাবাজির মতো চা-কফি খাই না। আর মনের যা অবস্থা, খাওয়াদাওয়াই ছেড়ে দিয়েছি। আমি উঠি স্যার! আপনি এই রহস্যের কিনারা করুন।"

মামা-ভাগনে চলে যাওয়ার পর বললুম, "তা হলে আপনার লোহা ভারী না তুলো ভারীর রহস্যের সূচনাটা বোঝা গেল। কিন্তু সবটা খুলে না বললে মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে!"

কর্নেল হেলান দিয়ে বসে নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে বললেন, "ওই ভদ্রলোক, ভবেশবাবু একজন লোহালক্কড়ের ব্যবসায়ী। দোকান বড়বাজারে। বাড়ি দমদম এলাকায়। গত পরশু একটা লোক ওঁর দোকানে ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে ওই জিনিসটা বেচতে নিয়ে গিয়েছিল। উনি লোহা ভেবে ওটা ওজন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওজনে সাঙ্ঘাতিক ভারী এবং জিনিসটা লোহাও নয়। তাই কেনেননি। হঠাৎ নাকি গতকাল দুপুরে ওঁর স্ত্রী বাথরুমে স্নান করতে ঢুকে জিনিসটা মেঝেয় দেখতে পান। তিনিও নাড়াচাড়া করতে গিয়ে অবাক হন। ওঁকে ফোন করেন। তারপর যা ঘটেছে, তুমি তো শুনলে।"

"কিন্তু তা হলে তো রহস্যটা অনেক বেশি বেড়ে গেল দেখছি!"

"হুঁ। আমাদের হালদারমশাইয়ের ভাষায় বলা চলে প্রচুর রহস্য!"

হালদার প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির কে. কে. হালদারের কথা শুনে বললুম, "আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। ভবেশবাবুর বাড়িতে যা-সব ঘটেছে, তার রহস্যভেদে হালদারমশাইকে লাগিয়ে দিন। আর জিনিসটা কী, সেটা জানার জন্য বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তই যথেষ্ট। খবর পেয়েছি, উনি বনে কী একটা বিজ্ঞানী সম্মেলনে যোগ দিয়ে সদ্য কলকাতা ফিরেছেন।"

কর্নেল হাসলেন। "তোমার প্ল্যান আমার মাথায় অনেক আগেই এসেছে, ডার্লিং! সাড়ে ন'টা বাজে। চন্দ্রকান্তবাবুর আসার সময় হয়ে গেল। হালদারমশাই এতক্ষণ ছদ্মবেশে ভবেশবাবুর বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরছেন আশা করি। একটু অপেক্ষা করো।"

"একটা ব্যাপার অদ্ভুত লক্ষ করছি।"

"একটা কেন জয়ন্ত, সবটাই।"

"না...মানে, আমি বলতে চাইছি, যে-লোকটা ভবেশবাবুকে ওই জিনিসটা বেচতে গিয়েছিল, তার হাত থেকে কেন এবং কী করে ওটা ভবেশবাবুর বাথরুমে ঢুকে পড়ল?"

"এ-বিষয়ে তোমার কী ধারণা, শুনি।"

"লোকটা কোনো অজানা কারণে জিনিসটা ভবেশবাবুর কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল এবং তা দিয়েছে।"

এই সময় কলিং বেল বাজল। তারপর বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত চৌধুরী হন্তদন্ত ঘরে ঢুকে দমফাটানো গলায় বললেন, "স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি পঞ্চান্ন পয়েন্ট ছয়! ভাবতে পারেন? তামার আট পয়েন্ট নয়। সিসের এগারো পয়েন্ট চৌত্রিশ। সোনার উনিশ পয়েন্ট তিরিশ। ইউরেনিয়ামের প্রশ্ন তুলছি না। কারণ খালি হাতে তেজস্ক্রিয় ধাতু ঘাঁটা বিপজ্জনক। কিন্তু পৃথিবীর কোনো ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব অত বেশি হতেই পারে না। পঞ্চান্ন পয়েন্ট ছয়! আমার মাথা বনবন করে ঘুরছে। পশ্চিম জার্মানির বন থেকে ফিরে এই বনবন করে মাথা ঘোরা। ধুস!"

বেঁটে গাবদাগোবদা মানুষ, চিবুকে নিখুঁত তিনকোনা দাড়ি, বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত ধপাস করে সোফায় বসলেন। কর্নেল প্যাটপেটে চোখে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "জিনিসটা আপনি তো দেখেননি। হাতে পাওয়া দূরের কথা। তা হলে কী করে ওটার আপেক্ষিক গুরুত্ব হিসেব করলেন চন্দ্রকান্তবাবু?"

বিজ্ঞানীপ্রবর দাড়ি চুলকে ফিক করে হাসলেন। "ও! গোড়ার কথাটা বলাই হয়নি। দিন-তিনেক আগে রেডারে টের পেলুম কী-একটা খুদে জিনিস কলকাতার আকাশে এদিক-সেদিক করে বেড়াচ্ছে। তক্ষুনি কমপিউটারের সামনে বসে পড়লুম। বড্ড ফিচেল জিনিস মশাই! ঠিক আপনার

ওইসব প্রজাপতির মতো। চিন্তা করুন, ছটফটে রংচঙে বিরল প্রজাতির প্রজাপতি দেখলে আপনার কেমন অবস্থা হয়।"

টিপ্পনি কাটলুম, "কর্নেল খাঁটি পাগল হয়ে যান তখন।"

"ঠিক তাই," বিজ্ঞানী সায় দিলেন। "আমার অবস্থাও তাই হয়েছিল। ওটাকে ফলো করতে-করতে দক্ষিণ-পশ্চিমে থিতু হতে দেখলুম। আলট্রাসোনিক রে পাঠিয়ে জানলুম, একরকম শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করছে ওটা। সেই শব্দতরঙ্গের সূত্রে অপেক্ষিক গুরুত্ব মাপা হয়ে গেল। সারারাত তাই নিয়ে হিসেবনিকেশ করেছি। সকালে হঠাৎ আপনার ফোন। যাই হোক, জিনিসটা কি এসে গেছে?"

কর্নেল বলার আগে আমি বললুম, "ওই দেখুন।"

চন্দ্রকান্ত তড়াক করে উঠে টেবিলের কাছে গেলেন। তারপর পকেট থেকে কয়েকটা নানারকম যন্ত্র বের করে ওটার গায়ে ঠেকাতে থাকলেন। সেই সঙ্গে নোটবই বের করে খসখস করে কীসব লিখেও নিলেন। শেষে বললেন, "হুঁ। আশ্চর্য! জিনিসটা একটা অপার্থিব ধাতু। কোনো গ্রহ থেকে ছিটকে পড়েছে পৃথিবীতে। এটা আমার ল্যাবে নিয়ে যাওয়া দরকার।"

বললুম, "কিন্তু নিয়ে যাবেন কী করে? সাঙ্ঘাতিক ওজন। আপনার রোবট ধুন্ধুমারকে সঙ্গে আনা উচিত ছিল।"

"ধুন্ধু'র আজকাল বড় দুষ্টুমি জেগেছে, বুঝলেন?" বিজ্ঞানী গম্ভীর হয়ে বললেন, "এটা পেলে হয়তো ক্রিকেট খেলতে শুরু করে দেবে। আসলে আজকাল চারদিকে যেরকম ক্রিকেট নিয়ে বাড়াবাড়ি! ধুন্ধু'র দোষ নেই। বাগান থেকে খেলার মাঠটা দেখা যায়। ক্রিকেটবল অনেক সময় বাগানে এসে পড়ে। ধুন্ধু কুড়িয়ে ছুঁড়ে দেয়। হতভাগা একেবারে ভুলে গেছে যে, সে মানুষ নয়, মেশিন। মানুষের মধ্যে বেশিদিন থাকলে যা হয়!"

কর্নেল বললেন, "তা হলে ওটা ট্রাকে চাপিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করা যাক। নাকি ভবেশবাবুর পালোয়ান ভাগনেকে ওবেলা আসতে বলব? সে-ই কিন্তু জিনিসটা এতদূর বয়ে এনেছে।"

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত একটু হেসে বললেন, "বিকল্প ব্যবস্থা না করেই কি এসেছি ভাবছেন?" তিনি একটা ইঞ্চি ছয়েক লম্বা যন্ত্র দেখালেন। "দেখতে পাচ্ছেন? বলুন তো এটা কী?"

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে মাথা দোলালেন।

"এ. জি. এল.। আমার আবিষ্কার।" চন্দ্রকান্ত হাসলেন। "মহাকাশের কোথাও দাঁড়িয়ে এটার সাহায্যে পৃথিবীকে ছুঁড়ে ফেলতে পারি মশাই! অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি লিফটার। যা-তা জিনিস নয়। এটা দিয়ে যদি জয়ন্তবাবুকে ছুঁই, উনি ভরহীন এবং ওজনহীন হয়ে পড়বেন।"

বললুম, "বাঃ! বেশ মজা তো!"

"মজা!" বাঁকা হেসে বিজ্ঞানী বললেন, "ভরহীন হলে কী অবস্থা হবে, বুঝতে পারছেন? ওজনহীন হলে না-হয় পাখির মতো উড়ে বেড়াবেন। কিন্তু ভরহীন হলে? পরমাণু কেন, স্রেফ কণিকা-উপকণিকা হয়ে চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায় স্পেসে বিলীন হয়ে যাবেন। আপনার টিকিটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

আঁতকে উঠে বললুম, "সর্বনাশ!"

চন্দ্রকান্ত আরও ভয় পাইয়ে দিয়ে বললেন, "ফোটনেও পরিণত হতে পারেন।"

কর্নেল বললেন, "চন্দ্রকান্তবাবু, তা হলে আপনার এ. জি. এল. ওই আজব বলটি ছুঁলে তো কেলেঙ্কারি!"

"না। এই লাল সুইচটা দেখছেন। এটা পদার্থের ভরকে জিরোতে পরিণত করে। জয়ন্তবাবুর সঙ্গে আমি একটু জোক করছিলুম। যাই হোক, এই সুইচটা টিপব না। টিপব এই সাদা সুইচটা। এটা

ওজনকে জিরো করে দেবে। ভর এবং ওজনের মধ্যে সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। অথচ দেখুন, এই শর্মা সেই অসাধ্যসাধন করেছে।" বলে চন্দ্রকান্ত থলের মুখটা খুলে আজগুবি বলটার গায়ে যন্ত্রটা চেপে ধরলেন।

অমনি একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল।

বিদঘুটে বলটা শূন্যে ভেসে উঠল এবং বাঁই করে খোলা জান.. দিয়ে উধাও হয়ে গেল। চন্দ্রকান্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, "যাঃ! পালিয়ে গেল! পালিয়ে গেল!" তারপর জানলায় গিয়ে উঁকি দিলেন।

কর্নেলের গলায় সবসময় বাইনোকুলার ঝোলে। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলায় গিয়ে বাইনোকুলার চোখে তুললেন। তারপর সেখান থেকে ব্যস্তভাবে ছাদের সিঁড়ির দিকে চললেন।

ছাদে কর্নেলের বাগান, গোয়েন্দাপ্রবর হালদারমশাই যেটির নাম দিয়েছেন 'শূন্যোদ্যান'। সেখানে অদ্ভুত, বিকট, বিদঘুটে গড়নের সব উদ্ভিদ। ক্যাকটাস, অর্কিড, আরও কত বিচিত্র গাছাপালা। সেই শূন্যোদ্যানে পৌঁছে দেখলুম চন্দ্রকান্ত তাঁর যন্ত্রগুলোর এটা টিপছেন, ওটা টিপছেন এবং কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে পশ্চিমের আকাশ দেখছেন। এপ্রিলের উজ্জ্বল নীল আকাশে অবাধ শূন্যতা। দেখতে দেখতে চোখ টাটিয়ে গেল আমার।

একটু পরে বাইনোকুলার নামিয়ে কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "মনে হচ্ছে গঙ্গা পেরিয়ে হাওড়ায় গেল। ওখানে প্রচুর লোহালক্কড়ের দোকান আছে অবশ্য। দেখা যাক।"

চন্দ্রকান্ত ব্যস্তভাবে বললেন, "না। না। ওটার গতি সেকেন্ডে প্রায় হাজার কিলোমিটার। এই দেখুন। আমার ধারণা, এতক্ষণে ওটা সাহারা মরুভূমিতে পৌঁছে গেছে। আমার এখনই ল্যাবে ফেরা উচিত। কমপিউটারের সামনে বসতে হবে। প্রচুর হিসেবনিকেশ করতে হবে, প্রচুর!"

"হ্যাঁ, প্রচুর। তবে যন্ত্রে হইব না। এ সায়েন্টিস্টের কাম না মশায়! ডিটেকটিভের হাতে ছাইড়া দেওনই ভালো।"

ঘুরে দেখি, সিঁড়ির দিক থেকে এগিয়ে আসছেন গোয়েন্দা কে. কে. হালদার। মুখে রহস্যময় হাসি। কর্নেল বললেন, "খবর বলুন হালদারমশাই! এতক্ষণ আপনার জন্য হা-পিত্যেশ করছি!"

হালদারমশাই আগে একটিপ নস্যি নিলেন। তারপর চাপা স্বরে বললেন, "ভবেশ রক্ষিত লোকটা ভালো না। পুলিশ-সোর্সে আগে খবর নিয়েছিলাম। তিনবার চোরাই মালের দায়ে ধরা পড়েছিল।"

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। কোনো বিদায়সম্ভাষণ করলেন না। বুঝলুম, বাড়ি ফিরেই ল্যাবে ঢুকবেন।

কর্নেল বললেন, "চলুন হালদারমশাই! নীচে গিয়ে কফি খেতে-খেতে আপনার তদন্ত রিপোর্ট শোনা যাক।"

একটু পরে ড্রয়িংরুমে বসে প্রচুর দুধে প্রায় সাদা কফি ফুঁ দিয়ে খেতে-খেতে প্রাইভেট গোয়েন্দা কৃতান্তকুমার হালদার তাঁর তদন্ত রিপোর্ট দিলেন।

আজকাল কোনো জিনিসই ফেলনা নয়। পুরনো ছেঁড়া জামাকাপড় বা জুতো, কৌটো-শিশি-বোতল, অ্যালুমিনিয়ামের টুটাফাটা পাত্র থেকে শুরু করে গেরস্থালির পরিত্যক্ত সমস্ত আবর্জনা কেনবার জন্য লোকেরা অলিগলি হাঁক দিয়ে বেড়ায়, "বিক্কিরিওলা! বিক্কিরি-ই-ই-ই!" হালদারমশাই বিক্কিরিওলা সেজে ভবেশবাবুর বাড়ি গিয়েছিলেন। ভবেশ-গিন্নি খুব জাঁদরেল মহিলা। বিক্কিরিওলা বড্ড বেশি খোঁজখবর নিচ্ছে দেখে ডাকাতের চর ভেবে পালোয়ান ভাগনেকে ডাক দেন। ভাগ্যিস, তখন সে মামার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। উনি পুলিশে ফোন করতে যাচ্ছেন আঁচ করেই গোয়েন্দা কেটে পড়েন। তবে আজব বলটার কথা ততক্ষণে জানা

হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সত্যি একটা প্রচণ্ড ভারী খুদে বল বাথরুমে পড়েছিল। গত রাতে বাড়ির আনাচেকানাচে ভূতেরা উৎপাতও করেছে বটে। কিন্তু সন্দেহজনক ব্যাপার হল, বড়বাজারে ভবেশবাবুর দোকানে ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে যে-লোকটা ওই ভুতুড়ে বল বেচতে গিয়েছিল, তার চোখ ট্যারা এবং গতকাল বিকেলে ভবেশবাবুর বাড়ির কাছাকাছি একটা গলিতে যে-লোকটাকে সিঁটিয়ে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়, তার চোখও ট্যারা। কাজেই হালদারমশাই থানা থেকে হাসপাতালের মর্গ ছোটাছুটি করে বেড়িয়েছেন। তাঁর হাতে এখন বড় তথ্য মৃত লোকটির নামধাম।

নোটবই খুলে গোয়েন্দামশাই বললেন, "গজকুমার সিং। ৮২/৩/ই চারু মিস্ত্রি লেন। জায়গাটা বেলঘরিয়ায় একটা মেসবাড়ি। গজকুমারের রেস খেলার নেশা ছিল। ওঁর মেসের লোকেরা বললেন, ফালতু লোক। মাথায় ছিট ছিল। ইদানীং বড়াই করে বলতেন, শিগগির কোটিপতি হয়ে যাবেন। হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন।"

এইসময় ফোন বাজল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন। "...লোকেট করতে পেরেছেন? খুব ভালো কথা। ...না, না। আপত্তি কী? শুভস্য শীঘ্রং। হাঃ হাঃ হাঃ! এই বুড়ো বয়সে মহাকাশযাত্রা? ...ঠিক আছে। রাখছি।" ফোন রেখে কর্নেল মিটিমিটি হেসে হালদারমশাইকে বললেন, "গ্রহান্তরে গোয়েন্দাগিরি করবেন নাকি হালদারমশাই?"

আমি অবাক। হালদারমশাই সম্ভবত কিছু না বুঝেই ঝটপট নস্যি নাকে গুঁজে বললেন, "হুঁঃ!"

দুই

কর্নেলের কথামতো সন্ধে ছ'টা নাগাদ যখন বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের বাড়ি পৌঁছলুম, দেখি, হালদারমশাই আগেই চলে এসেছেন। যথারীতি এক প্লেট সিন্থেটিক পকৌড়া এবং কফি খেয়ে নস্যিতে নাক জেরবার করে ফেলেছেন। মুখে চাপা উত্তেজনা থমথম করছে। চন্দ্রকান্ত তাঁর ল্যাবে ছিলেন। এসে খুশি-খুশি মুখে বললেন, "সুস্বাগত জয়ন্তবাবু! আপনি মহাকাশ থেকে কিটো গ্রহে পৌঁছেও রেগুলার আপনার দৈনিক 'সত্যসেবক' পত্রিকায় রিপোর্ট পাঠাতে পারেন। কিন্তু সমস্যা হল, আপনাদের কাগজের অফিসের টেলেক্স তা রিসিভ করতে পারবে না। দেখা যাক, যদি কোনো ব্যবস্থা করতে পারি।"

বললুম, "রিপোর্ট পরে হবে চন্দ্রকান্তবাবু! আমরা কিটো গ্রহে যাচ্ছি বললেন। সেটা কোথায়?"

"সেকেন্ডে গ্যালাক্সিতে। তবে ও-নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। গ্রহ ইজ গ্রহ।"

"সেখানে বাতাস আছে তো?"

বিজ্ঞানী হাসলেন, "কয়েকশো টন বাতাস সঙ্গে নিয়ে যাব। আপনি তো আমার এ. জি. এল. যন্ত্রটি দেখেছেন। বাতাসকে চাপ দিয়ে ঘনীভূত করে ফেলব। এ. জি. এল. তার ওজন জিরো করে ফেলবে। ব্যস!"

কোথায় প্রিঁ-প্রিঁ শব্দ হল। চন্দ্রকান্ত বললেন, "ধুন্ধু সন্দেহজনক কিছু দেখেছে। এক মিনিট, আসছি।"

চন্দ্রকান্তের এই বাড়িটা দমদম শহরতলি এলাকায় এক টেরে। এলাকাটা গ্রাম বলেই মনে হয়। চারদিকে ঘন গাছপালা। হালদারমশাই সন্দেহজনক শব্দটা কান পেতে শুনে তড়াক করে উঠে বললেন, "বসুন, আসছি।"

বললুম, "ধুন্ধু'র পাল্লায় পড়বেন কিন্তু!"

অমনি গোয়েন্দাপ্রবর বসে পড়লেন। বেজার মুখে বললেন, "হঃ! ওই এক হতচ্ছাড়া! জয়ন্তবাবু, ওই পাজিটাকে যদি সঙ্গে নেন সায়েন্টিস্ট, আমি কিন্তু যাচ্ছি না।"

মনে পড়ল, সেবার চুপিচুপি বিজ্ঞানীর বাড়ি ঢুকতে গিয়ে হালদারমশাইয়ের কী অবস্থা হয়েছিল ধুন্ধু'র হাতে। কিন্তু এমনিতে শ্রীমান ধুন্ধু বেশ খোশমেজাজি রোবট। ইদানীং তাকে চন্দ্রকান্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাচ্ছেন। ধাতব গলায় বেশ গায় সে।

চন্দ্রকান্ত ফিরে এসে বললেন, "ধুন্ধুটা ভিতু হয়ে যাচ্ছে দিনে-দিনে। অন্ধকারে বেড়াল দেখেও চমকে ওঠে।"

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল এসে পড়লেন। ওঁর পিলোব্যাগে প্রজাপতি-ধরা নেটের স্টিক উঁকি মেরে আছে চেনের ফাঁকে। অবাক হয়ে বললুম, "চন্দ্রকান্তবাবু! কিটো গ্রহে প্রজাপতিও আছে নাকি?"

বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ অট্টহাসি হাসলেন। বিজ্ঞানী বললেন, "আহা! চান্স মিস করতে নেই। যদি সত্যিই থাকে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আমরা কতটুকু জানি মশাই, যাই হোক, আমাদের রেডি হওয়া দরকার। ইন্টারন্যাশনাল স্পেস কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে টাইম সিডিউল পেয়েছি সাড়ে সাতটা থেকে আটটা। এই আধঘণ্টা পৃথিবীর স্পেস-উইন্ডোর ট্রাফিক আমাদের জন্য বরাদ্দ।"

হালদারমশাই নড়ে উঠলেন। "সেটা কী?"

কর্নেল বললেন, "আমি বুঝিয়ে বলছি। চন্দ্রকান্তবাবু, আপনি স্পেসশিপ রেডি করুন ততক্ষণ।"

বিজ্ঞানী চলে গেলে কর্নেল বললেন, "পৃথিবীর আকাশ থেকে মহাকাশে পৌঁছনো একটা সমস্যা, হালদারমশাই! যেখান-সেখান দিয়ে বেরনো যায় না। একটা নিরাপদ যাত্রাপথ আছে, সেটাই স্পেস-উইন্ডো। কোনো দেশ থেকে মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পেসশিপ পাঠাতে হলে আগে জানা দরকার পথটা ফাঁকা আছে কি না। নইলে অন্য দেশের পাঠানো স্পেসশিপের সঙ্গে ঠোক্কর লাগতে পারে। তা ছাড়া উল্কার বিপদ আছে। পৃথিবীর চৌম্বক-ক্ষেত্র আছে। সেইসব বিপদ-আপদ এড়িয়ে নিরাপদ পথ আবিষ্কার করতে হয়েছে।"

হালদারমশাই খুব মাথা নাড়ছিলেন বটে, মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, কিছু বুঝতে পারছেন না।

বিজ্ঞানীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "আপনারা ল্যাবে চলে আসুন। ল্যাবের গেট নাম্বার টু'র সামনে দাঁড়ান। লিফট পাবেন। লিফট সরাসরি স্পেসশিপে পৌঁছে দেবে। কুইক!"

ল্যাবে ঢুকে দু'নম্বর গেটের সামনে আমরা দাঁড়ালুম। দরজা দু'পাশে সরে লিফট দেখা গেল। লিফটে ঢুকে হালদারমশাই ফিসফিস করে বললেন, "সেই পাজি ধুন্ধুটা সঙ্গে যাচ্ছে না তো?"

নেপথ্যে চন্দ্রকান্তের হাসি শোনা গেল। "ধুন্ধু মাস্ট মিঃ হালদার। তবে ওকে ভয় পাবেন না। ওকে বলে দিয়েছি, ও আপনার বন্ধু হয়ে থাকবে।"

স্পেসশিপে ঢুকে বুঝলুম গড়ন ডিমালো এবং ছাদের একটা গম্বুজের মাথায় বসানো। চন্দ্রকান্তের পাশে কর্নেল বসলেন। আমি আর হালদারমশাই বসলুম পেছনে। তারপর হালদারমশাই হঠাৎ আঁতকে উঠে বললেন, "গেছি! গেছি!"

পেছন থেকে ধুন্ধু ওঁর কাঁধে হাত রেখেছে। হাসতে হাসতে বললুম, "ধুন্ধু আপনার কাঁধে হাত রেখে বন্ধুতা জানাচ্ছে, হালদারমশাই! আপনিও ওকে বন্ধুতা জানান।"

হালদারমশাই ভয়ে-ভয়ে ঘুরে ধুন্ধু'র চিবুকে ঠোনা মেরে আদর করলেন, "লক্ষ্মীসোনা!"

চন্দ্রকান্ত বললেন, "আমরা উড়ছি। রেডি!"

একটা ঝাঁকুনি লাগল। তারপর কাচের জানালা দিয়ে দেখলুম, নীচের অজস্র আলোর ফুটকি দেখতে-দেখতে মিলিয়ে গেল। হালদারমশাই ফিসফিস করে বললেন, "আচ্ছা জয়ন্তবাবু! আমাদের স্পেসসুট পরালেন না তো সায়েন্টিস্টমশাই! আমার কেমন যেন ঠেকছে!"

চন্দ্রকান্ত তা শুনতে পেয়ে সহাস্যে বললেন, "এই শর্মার সেটাই কৃতিত্ব মিঃ হালদার। স্পেসসুট-টুট সবই প্রিমিটিভ করে ফেলেছি। কত কিলোমিটার বেগে যাচ্ছি, জানেন? সেকেন্ডে দু'হাজার মাইল। ওই দেখুন, সূর্য ঝলমল করছে।"

হালদারমশাই বললেন, “কিন্তু রোদ্দুর কোথায়? আকাশই বা এত কালো কেন? ধুস!”

তিনি নস্যি নিলেন। অমনি ধুন্ধু পিছন থেকে মুণ্ডু এগিয়ে দিল। হালদারমশাই খি-খি হেসে তার নাকে খানিকটা নস্যি গুঁজে দিলেন। ধুন্ধু নস্যির চোটে ধাতব হাঁচি হাঁচতে হাঁচতে কাত হয়ে পড়ল। চন্দ্রকান্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, “মিঃ হালদার! কেলেঙ্কারি করবেন দেখছি। ধুন্ধু'র নড়াচড়ায় স্পেসশিপ ব্যালান্স হারালেই...এই রে! সর্বনাশ!”

হালদারমশাই প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, “ক্কী? ক্কী? ক্কী?”

চন্দ্রকান্ত খুটখুট শব্দে বোতাম টেপাটেপি করতে করতে বললেন, “গতিপথ বদলে গেছে। আপনি মশাই বড্ড ঝামেলা বাধান! এই রে! আমরা কোথায় চলেছি কে জানে?”

কর্নেল চুপচাপ নির্বিকার মুখে চুরুট টানছেন। আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলুম। বললুম, “চন্দ্রকান্তবাবু, অ্যাক্সিডেন্ট হবে না তো?”

“হবে কী মশাই? হয়ে গেছে।” বিজ্ঞানী তেতো মুখে বললেন, “আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি।”

“কিন্তু স্পেসশিপ ভেঙে পড়বে না তো?”

“দেখা যাক।”

আরও ভয় পেয়ে হালদারমশাইয়ের দিকে তাকালুম। উনি মুখ চুন করে বসে আছেন। বললুম, “এবার কী হবে ভাবুন তো হালদারমশাই!”

গোয়েন্দা ভদ্রলোক বললেন, “হঃ। ভাবতাছি। তবে আমারে দোষ দেবেন না য্যান। ওই পাজি হতচ্ছাড়া নাক বাড়াইয়া...”

উনি থেমে গেলেন। ধুন্ধু আবার নাক বাড়িয়েছে ওঁর কাঁধের ওপর দিয়ে। বিজ্ঞানী টের পেয়ে ধমকে দিলেন, “ধুন্ধু! ট্রাট ট্রাট ট্রাট!”

ওটা নিশ্চয় সাঙ্কেতিক ভাষা। ধুন্ধু ধাতব স্বরে বলল, “ক্রাট ক্রাট ক্রাট!”

“ক্রিও ক্রিও ক্রিও!” হুঙ্কার দিলেন বিজ্ঞানী।

ধুন্ধু তার চৌকো থাবা দিয়ে হালদারমশাইয়ের কাঁধ আঁকড়ে ধরল। কর্নেল বললেন, “নস্যি হালদারমশাই! ধুন্ধু নস্যির মজা টের পেয়েছে। না পেলে আপনার কাঁধের হাড় ভেঙে দেবে। শিগগির!”

হালদারমশাই দ্রুত নস্যির কৌটো বের করে বাকি নস্যির সবটাই ধুন্ধু'র নাকে গুঁজে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হল ধুন্ধু'র বিকট হাঁচি এবং হাঁচতে হাঁচতে সে এমন নড়তে থাকল, স্পেসশিপ বেজায় ঝাঁকুনি খাচ্ছিল। চন্দ্রকান্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'ইমপসিবল! নিন! কোথায় নামছেন, দেখুন আপনারা।”

নীচে রোদে ঝকমকে সোনালি বালি। যতদূর চোখ যায়, শুধু বালি। অসমতল, কোথাও সমতল বালির বিস্তার। কাছে ও দূরে বালিরই পাহাড়। জায়গাটা মরুভূমি তাতে সন্দেহ নেই। প্রচণ্ড বালি উড়িয়ে স্পেসশিপ অবশ্য নিরাপদে থামল। কর্নেল দরজা খুলে নেমেই বললেন, “বাঃ! অসাধারণ।”

তারপর উনি যথারীতি চোখে বাইনোকুলার তুলে চারদিক দেখতে থাকলেন। আমি আর হালদারমশাই দরজা খুলে নেমে গেলুম। ঘড়ি দেখে অবাক। সাতটা চল্লিশ বাজে। তার মানে দশ মিনিটের জার্নি। ঘড়িতে একই তারিখ যে। সাধারণ জ্ঞানে বুঝলুম, আমরা নিশ্চয় পশ্চিম দিকে সূর্যের পেছন-পেছন ছুটে এসেছি। তাই এখন বিকেলের দেখা পাচ্ছি এখানে। কিন্তু কী বিচ্ছিরি গরম!

হালদারমশাইয়ের দোষেই মহাকাশযাত্রা ব্যর্থ এবং পৃথিবীর কোনো সৃষ্টিছাড়া মরুভূমিতে এসে পড়েছি। হালদারমশাইকে সম্ভবত সেজন্যই কাতর দেখাচ্ছে। তাই ওঁকে সান্ত্বনা দিতে বললুম,

"সত্যি বলতে কী, আমার আনন্দ হচ্ছে জানেন হালদারমশাই? কোন্ উদ্ভুট্টে গ্রহে গিয়ে কী বিপদে পড়তুম কে জানে। তার চেয়ে এটা বরং ভালোই হল।"

হালদারমশাই কিন্তু বেজার মুখে বললেন, "হঃ! ভালোই হল! মরুভূমিতে আইয়া পড়ছি। এখন বেদুইন ডাকাতগুলি আইয়া পড়লেই গেছি!"

"আপনি বেদুইনের কথা ভাবছেন কেন? এটা মেক্সিকোর মরুভূমিও হতে পারে।"

হালদারমশাই চাপা স্বরে বললেন, "আমি ডিটেকটিভ, ডোন্ট ফরগেট দ্যাট। নামবার সময় গম্বুজওয়ালা ঘর দেখছিলাম একখানে। আরবের ড্যাজার্ট না হইয়া যায় না।"

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, "হুঁ, 'ড্যাজার্টে' অনেক হ্যাজার্ড আছে মনে হচ্ছে হালদারমশাই!"

"ক্যান, ক্যান?" হালদারমশাই তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

"ওইদিকে বালির পাহাড়ের মাথায় একটা বেঁটে লোক দেখলুম। গোল কুমড়োর গায়ে নাক-মুখ-চোখ এঁকে দিলে যেমন দেখায়, তেমনি চেহারা। লোকটার হাত-পা কিচ্ছু নেই। দিব্যি গড়াতে গড়াতে ওধারে উধাও হয়ে গেল। কুমড়ো-মানুষের দেশে এসে পড়েছি আমরা।"

রসিকতা করছেন ভেবে একটু হেসে বললুম, "কুমড়োপটাশের দেশে বলুন!"

কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেন, "হাসির কথা নয়, ডার্লিং! মনে হল, কুমড়ো-মানুষটা বসতিতে খবর দিতে গেল।" বলে ডাকলেন, "চন্দ্রকান্তবাবু! নেমে আসুন!"

বিজ্ঞানী স্পেসশিপের ভেতর বসে কীসব করছিলেন। তড়াক করে নেমে এসে বললেন, "আশ্চর্য কর্নেল, খুবই আশ্চর্য! আমরা পথভ্রষ্ট হইনি। সঠিক জায়গায় পৌঁছেছি।"

চমকে উঠে বললুম, "সেই কিটো গ্রহে এসে গেছি নাকি?"

চন্দ্রকান্ত খুশি-মুখে বললেন, "হ্যাঁ! খামোকা ধুন্ধুকে দোষ দিচ্ছিলুম। ধুন্ধু দু'-দু'বার জার্ক না দিলেই বরং গতিপথ থেকে এক ডিগ্রি সরে যেতুম। ফলে কী হত জানেন? অনন্তকাল মহাকাশে ভেসে বেড়াতুম। কর্নেল! চলে আসুন! জয়ন্তবাবু! মিঃ হালদার! কুইক! ডিটেক্টরের কাঁটা সেই বলটার দিকে তাক করে আছে। আমরা সেদিকেই এবার যাব।"

কর্নেল আবার বাইনোকুলারে দূরে কিছু দেখছিলেন। বললেন, "যাওয়ার আগে কুমড়ো-মানুষদের একটা গ্রুপফোটো নিতে চাই চন্দ্রকান্তবাবু!"

"কুমড়ো-মানুষ!" বিজ্ঞানী অবাক হয়ে বললেন। "কই, কোথায়?"

"ওই দেখুন, দলবেঁধে গড়াতে গড়াতে আসছে।"

এবার ব্যাপারটা চোখে পড়ল। সেই বালির পাহাড় বেয়ে অন্তত শ'খানেক জ্যান্ত কুমড়ো গড়াতে-গড়াতে নামছিল। সমতলে নেমে এবার তারা গড়াতে-গড়াতে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। অবিকল প্রকাণ্ড ফুটবল মনে হচ্ছে। মাঝে-মাঝে কয়েকটা যেন কিক খেয়ে আকাশে উঠছে। আবার নেমে পড়ছে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, "কী বিপদ! নাঃ, ধুন্ধুকে বের করি। কিছু বলা যায় না।"

তিনি স্পেসশিপের পেছনের খোপের দরজা খুলে দিলেন। শ্রীমান ধুন্ধুমার বেরিয়ে এসে আমাদের পাশে দাঁড়াল। হালদারমশাই তার কাছ ঘেঁষে রইলেন। চন্দ্রকান্তকে দেখলুম, হাতে মারাত্মক লেসার-পিস্তল নিয়েছেন।

কিন্তু আমার বৃদ্ধ বন্ধু ক্যামেরা তাক করে আছেন।

কুমড়ো-মানুষেরা আমাদের প্রায় পঞ্চাশ মিটার দূরে এসে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। নাঃ! দাঁড়াবে কী করে? ঠ্যাংই তো নেই। কাজেই থামল বলাই ভালো। এই সময় লক্ষ করলুম, কেমন

অদ্ভুত চাপা একটা ঝাঁ-ঝাঁ শব্দ হচ্ছে। ওটাই কি ওদের ভাষা? ক্রমে চোখে পড়ল, ওদের মধ্যে নানা বয়সি কুমড়ো-মানুষ আছে। তারপর সবাই আমাদের জিভ দেখাতে থাকল।

হালদারমশাই খাপ্পা হয়ে বললেন, "অসভ্যতা দ্যাখছেন? মুখ ভ্যাঙায় কেমন!"

কর্নেল টেলিলেন্স ফিট করে কয়েকটা ছবি নিলেন। তারপর আমাদের অবাক করে সোজা এগিয়ে গেলেন ওদের দিকে। চন্দ্রকান্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, "যাবেন না! যাবেন না!"

আমিও চেঁচিয়ে ডাকলুম, "কর্নেল! কর্নেল!"

কর্নেল কান করলেন না। সেই ঝাঁ-ঝাঁ শব্দটা এখন থেমে গেছে। হালদারমশাই চাপা স্বরে বললেন, "বিপদ বাধবে! ওই দ্যাখেন, কর্নেল-স্যারেরে চক্কর দিয়া ঘিরতাছে।"

কিন্তু এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতেও আমার হাসি পেল, যখন দেখলুম, কর্নেলও ওদের মতো জিভ বের করে অনবরত ভেংচি কাটার ভান করছেন।

তারপর সে এক বিচিত্র ব্যাপার। কুমড়ো-মানুষগুলো কর্নেলের ওপর এসে পড়ল। কেউ ওঁর কাঁধে, কেউ ওঁর মাথায় চড়ল। মাথারটি কর্নেলের টুপি খুলে নিজের মাথায় পরল এবং কর্নেলের চকচকে টাকে সেঁটে বসে রইল। একজন ওঁর দাড়িতে আটকে গেল। এবার আরও আজব দৃশ্য। সার্কাসে লোহার বলের ওপর পা রেখে বলটাকে গড়াতে-গড়াতে এগনো দেখেছি। কর্নেল কি সে-খেলাও জানেন? ওঁর পায়ের তলায় কয়েকটা কুমড়ো-মানুষ এবং উনি দিব্যি নাচার ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছেন। এদিকে ওঁর চারপাশে ওড়াউড়ি করছে আরও সব কুমড়ো-মানুষ। সম্ভবত বসার জুতসই জায়গা খুঁজছে।

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত ব্যস্তভাবে বললেন, "মনে হচ্ছে, কর্নেলকে ওরা বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। অসহ্য বেয়াদপি! ধুন্ধু! ট্রুট ট্রুট, ক্রুট্ ক্রুট!"

ধুন্ধু বালির ওপর দমাস-দমাস পা ফেলে এগিয়ে গেল। ওকে পেছনে দেখামাত্র কুমড়ো-মানুষের একটা দঙ্গল ঝাঁ-ঝাঁ শব্দে তেড়ে এল। ধুন্ধু'র ওপর তারা প্রকাণ্ড ঢিলের মতো পড়তে থাকল। ধুন্ধু টাল সামলে নিয়ে খপ করে একটাকে ধরে দূরে ছুড়ে ফেলল।

কিন্তু তার কিছুই হল না। সে আবার গড়াতে-গড়াতে এসে লাফ দিয়ে ধুন্ধু'র একটা কানে এসে পড়ল। চন্দ্রকান্ত বললেন, "ওই যাঃ!"

দেখলুম, ধুন্ধু নেতিয়ে হাঁটু দুমড়ে ধরাশায়ী হল। চন্দ্রকান্ত বললেন, "বাঁ কানের নীচেই সুইচ। চাপ পড়লে ধুন্ধু ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায়।" বলে তিনি লেসার-পিস্তল উঁচিয়ে দৌড়ে গেলেন।

লেসার-পিস্তলের গুলিতে কোনো কাজ হল না। কুমড়ো-মানুষেরা কর্নেলের মতোই বিজ্ঞানী ভদ্রলোককে নাচাতে-নাচাতে নিয়ে চলল। উনি পেছন ফিরে চেঁচিয়ে কিছু বললেন। বোঝা গেল না।

হালদারমশাই ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, "কোনো মানে হয়? ব্যাটাচ্ছেলেরা..."

ওঁর কথা থেমে গেল। আমাদের পেছনে স্পেসশিপ। তার আড়ালে কখন একদঙ্গল কুমড়ো-মানুষ এসে লুকিয়ে ছিল টের পাইনি। আচমকা তারা এসে হালদারমশাইকে ঘিরে ফেলল এবং তারপর একই দৃশ্য দেখতে পেলুম। ঢ্যাঙা গোয়েন্দাপ্রবর নাচতে-নাচতে চলেছেন আর চ্যাঁচাচ্ছেন, "জয়ন্তবাবু! জয়ন্তবাবু! বাঁচান, বাঁচান!"

কিন্তু আমার দিকে কুমড়ো-মানুষদের লক্ষ নেই কেন? একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলুম। এ তো ভারি অপমানজনক ব্যাপার! আমাকে ওরা বন্দী করল না, গ্রাহ্যই করল না! আমি কি এতই ফেলনা? আঁতে বড্ড ঘা লাগছিল এবং অভিমান হচ্ছিল।

আর-এক আশ্চর্য ব্যাপার, সূর্য যেখানকার সেখানেই আছে। এ কি তা হলে এক চির-বিকেলের দেশ? সোনালি বালির ওপর নরম গোলাপি রোদ্দুর। একটু ভ্যাপসা গরম আছে, এই যা। একটুও

বাতাস বইছে না। কুমড়ো-মানুষেরা তিন বন্দীকে নিয়ে বালির পাহাড় পেরিয়ে উধাও হয়ে গেলে ধুন্ধু'র কাছে গেলুম।

হঠাৎ মনে হল, ধুন্ধুর এক কানে অফ্ করার সুইচ আছে যখন, অপর কানেও কি পালটা অন করার সুইচ নেই?

যেই কথাটি মাথায় আসা, ডান কানের সুইচটা টিপে দিলুম। অমনি ধুন্ধু ঝনঝন শব্দে উঠে দাঁড়াল। তারপর আমার দিকে ঘুরে একখানা স্যালুট ঠুকল। খুশি হয়ে বললুম, "হ্যালো ধুন্ধু! কনগ্র্যাচুলেশন!"

ধুন্ধু তার ধাতব কণ্ঠস্বরে বলল, "ট্রাও ট্রাও ট্রাও!"

এই রোবট-ভাষা আমি বুঝি না। ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বললুম। স্পেসশিপের কাছে গিয়ে দেখি, সে আমার ইশারা বুঝতেই পারেনি। বালির পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মরুক হতচ্ছাড়া! আমার তেষ্টা পেয়েছে, যা-সব আক্কেল গুড়ুম করা কাণ্ড ঘটল! স্পেসশিপে ঢুকে জলের ফ্লাস্ক থেকে অনেকটা জল খেলুম। চন্দ্রকান্তের সিটে গিয়ে স্পেসশিপ চালানোর চেষ্টা করব নাকি?

এই ভেবে উঠতে যাচ্ছি, চোখে পড়ল ধুন্ধু দমাস-দমাস করে বালির পাহাড়টার দিকে হেঁটে চলেছে। রাগে গা জ্বালা করছিল। কিন্তু কী আর করা যায়? নিজের আসনে বসে সিগারেট ধরালুম। এখন আমি মরিয়া। বরাতে যা আছে ঘটুক।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ কী একটা শব্দ। দরজা খোলা ছিল বলেই কানে এল। তাকিয়ে দেখি, কী আশ্চর্য, একটা রোগা খেঁকুটে চেহারার মানুষ, হ্যাঁ, আমার মতোই মানুষ, অবাক চোখে স্পেসশিপটা দেখছে।

তিন

এমন সৃষ্টিছাড়া এক জায়গায় মানুষ দেখলে মানুষের মনে আনন্দ উপচে পড়ে। লাফ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বললুম, "নমস্কার, নমস্কার!"

মানুষটি চমকে উঠে দু'পা পিছিয়ে গেলেন। তারপর ভয়ে-ভয়ে বললেন, "আপনি মানুষ বটে তো?"

হাসতে হাসতে বললুম, "আপনার সন্দেহের কারণ? আমি জলজ্যান্ত মানুষ।"

"ওরে বাবা! জ্যান্ত বললেন নাকি?"

"হ্যাঁ। জ্যান্ত বইকি। আপনার মতোই জ্যান্ত।"

"উঁহু। আমি কিন্তু জ্যান্ত নই, মড়া!"

বড় রসিক লোক তো! হো-হো করে হেসে বললুম, "আপনার রসিকতায় বড় আনন্দ পেলুম। এতক্ষণ এই কুমড়ো-মানুষদের দেশে যা-সব কাণ্ড হল, বাপ্‌স্! আপনাকে দেখে ধাতস্থ হওয়া গেল। তা মশাইয়ের নাম?"

"আপনার নাম আগে শুনি।"

"জয়ন্ত চৌধুরী। স্পেশ্যাল রিপোর্টার। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা।"

"ওরে বাবা! এখানেও রিপোর্টার?" বলে ভদ্রলোক আরও সরে গেলেন।

"আরে! আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন?"

"ভয় পাব না? মরেও রেহাই নেই দেখছি। পেছনে রিপোর্টার লেলিয়ে দিয়েছে।"

"মরে মানে?"

"হুঁ, পৃথিবীতে মশাই, রিপোর্টারদের জ্বালাতেই হার্টফেল করেছি। ওঃ! প্রশ্নে-প্রশ্নে জেরবার। এই বল কোথায় পেলেন? কে দিল? কী ধাতুতে তৈরি? আমার..."

"বল?" সন্দিগ্ধ হয়ে বললুম, "মশাইয়ের নাম?"

"ঈশ্বর গজকুমার সিং।"

"গজকুমার সিং! আপনি...কী আশ্চর্য! আপনিই তো সেই আজব বল বিক্রি করতে গিয়েছিলেন ভবেশবাবুর দোকানে?" বলেই ওঁর চোখের দিকে তাকালুম। চোখ দুটি ট্যারা! তা হলে ইনি সত্যিই সেই লোকটা।

গজকুমারবাবু বিষণ্ণ মুখে বললেন, "আর বলবেন না! বলটা আমার ঠাকুরদা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেই থেকে আমাদের বিহার মুলুকের বাড়িতে ছিল। খুলে বলছি মশাই, আমি একজন রেসুড়ে। আগামী শনিবার একটা ঘোড়ার ওপর মোটা দান ধরব ভেবে ওটা বাড়ি থেকে মেসে এনে রেখেছিলুম। তারপর বেচতে যদি গেলুম, বিক্রি হল না। ফেরার পথে কী করে খবর হল কে জানে, ঝাঁকে-ঝাঁকে খবরের কাগজের রিপোর্টার ঘিরে ধরল। প্রাণে মারা পড়লুম।"

"বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি এখানে কী করে এলেন?"

গজকুমারবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "তা তো জানি না। শুধু জানি, আমি মরে গেছি। তারপর একটু আগে চোখ খুলে দেখি, ওইখানে বালির ওপর শুয়ে আছি। উঠে বসলুম। তখন আপনার এই গাড়িটা চোখে পড়ল। চলে এলুম।"

"গজকুমারবাবু! সমস্ত ব্যাপারটা রহস্যময়। আমার ধারণা, আপনি সত্যি মারা পড়েননি। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। ভুল করে আপনাকে মড়া ভেবে মর্গে ঢোকানো হয়েছিল। তারপর কেউ বা কারা আপনাকে এই কুমড়ো-মানুষদের গ্রহে পাঠিয়ে দিয়েছে!"

গজকুমারবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, "যাক্‌গে! একটা সিগারেট দিন।"

সিগারেট দিলুম। উনি আরামে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ফের বললেন, "মরুভূমি তো। তাই বড্ড গরম। তা আপনি কী যেন বললেন, কুমড়ো-মানুষ না কি?"

"হ্যাঁ। এই গ্রহের নাম কিটো। এখানে অবিকল কুমড়োর মতো মানুষরা থাকে। তাদের হাত-পা নেই। গড়াতে-গড়াতে, লাফাতে-লাফাতে চলে। আমার তিন সঙ্গীকে তারা ধরে নিয়ে গেছে।"

"আপনাকে ধরে নিয়ে যায়নি কেন বলুন তো?"

"সেটাই তো ভাবছি।"

গজকুমারবাবু আমাকে খুঁটিয়ে দেখার পর বললেন, "আমার মনে হচ্ছে, ওরা কী করে টের পেয়েছে, আপনি কাগজের রিপোর্টার। তাই আপনাকে এড়িয়ে গেছে। আপনি প্রশ্নে-প্রশ্নে জেরবার করে হাঁড়ির খবর বের করবেন এবং জব্বর স্কুপ ঝাড়বেন। সেই ভয়েই আপনাকে ধরে নিয়ে যায়নি।"

"কিন্তু আপনাকে ধরে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কেন যায়নি?"

গজকুমারবাবু কাঁচাপাকা চুল আঁকড়ে ধরে একটু ভাবলেন। তারপর খোঁচাখোঁচা গোঁফদাড়ি খুব করে চুলকে নিয়ে বললেন, "বালিতে বেজায় পিঁপড়ে। জ্বালা করছে। কুমড়ো-মানুষদের দেশে পিঁপড়েগুলোও একই গড়নের। গোটাকতক টিপে মেরেছি। ...হ্যাঁ, আপনি একটা ভালো প্রশ্ন তুলেছেন, আমাকে ধরে নিয়ে যায়নি কেন? আমার মনে হচ্ছে, আমাকে যে বা যারা এখানে নিয়ে এসেছে, তাকে বা তাদের ওরা ভয় পায়। কিন্তু কথা হল, কে বা কারা আমাকে এখানে নিয়ে এল? আপনি ঠিকই বলেছেন জয়ন্তবাবু! সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যময়।"

একটু ইতস্তত করে বললুম, "এক কাজ করা যাক। চলুন না, দু'জনে চুপিচুপি ওই বালির পাহাড়ের দিকে যাই। গিয়ে দেখি, আমার সঙ্গীদের কী অবস্থা হল। মানুষ হয়ে মানুষকে বাঁচানো কর্তব্য নয় কি? আমাদের রিস্কটা নেওয়া উচিত।"

গজকুমারবাবু বললেন, "চলুন। কিন্তু হাতে অন্তত একটা লাঠি-ফাটি থাকলে ভালো হত। এই আজগুবি মরুভূমিতে একটা ঝোপঝাড় পর্যন্ত নেই। দেখুন না, আপনাদের গাড়ির ভেতর রড-টড পান নাকি। যা হোক কিছু পেলেই চলবে। অগত্যা একটা হাতুড়ি কি স্ক্রু ড্রাইভার। ছুরি থাকলে আরও ভালো। কুমড়ো-মানুষ বললেন। প্যাঁক করে পেটে ঢুকিয়ে দেব।"

উনি খ্যা-খ্যা করে হেসে উঠলেন। তবে যুক্তিটা মন্দ নয়। স্পেসশিপে ঢুকে চন্দ্রকান্তের সিটের পাশে সৌভাগ্যক্রমে টুলস-ব্যাগটা পেয়ে গেলুম। হাতুড়ি বা ছুরি নেই। নানা সাইজের স্ক্রু-ড্রাইভার, প্লাস, আরও কতরকম টুকিটাকি জিনিস আছে। বুদ্ধি করে দুটো বড় সাইজের স্ক্রু-ড্রাইভার নিলুম।

দু'জনে এভাবে সশস্ত্র হয়ে বালির পাহাড়টার দিকে হাঁটতে থাকলুম। এতক্ষণে টের পেলুম, যে ঝাঁ-ঝাঁ শব্দ তখন শুনেছি, তা এই বালির ভেতর থেকে উঠছে। বইতে পড়েছি, পৃথিবীর বহু মরুভূমিতে বালির ওপর চলাফেরা করলে অদ্ভুত সব শব্দ হয়। কোথাও-কোথাও নাকি অর্কেস্ট্রাও শোনা যায়।

বালিতে হাঁটার সমস্যা আছে। দ্রুত এগনো যায় না। তাতে ক্রমাগত অস্বস্তিকর ঝাঁ-ঝাঁ ঝনঝন শব্দ। পাহাড়টা আন্দাজ শ'তিনেক ফুট উঁচু। কিন্তু যতবার উঠতে যাই, পা হড়কে গড়িয়ে পড়ি। দু'জনে অনেক খোঁজাখুঁজি করে অপেক্ষাকৃত শক্ত জায়গা পেলুম। সেখান দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে উঠলুম। তারপর চোখে পড়ল, নীচে উপত্যকার মতো একটা জায়গা এবং সত্যিই স্বর্গোদ্যান বলা চলে।

উজ্জ্বল সবুজ গাছপালা, সুন্দর ঝিরঝিরে ঝরনাধারা এবং ওলটানো বিশাল বাটির মতো অসংখ্য রং-বেরঙের ঘর। ঝরনার ধারে একটা সবুজ ঘাসের মাঠ। মাঠে কুমড়ো-মানুষদের ভিড়। কিন্তু আশ্বস্ত হয়ে দেখলুম, আমার সঙ্গীদের ওরা ধরে নিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু বন্দী করে রাখেনি। তিনটে মোড়ার মতো গড়নের নিটোল রঙিন আসন দিয়েছে বসতে। তিনজনের হাতেই আধখানা প্রকাণ্ড ডিমের খোলার মতো পাত্র। ওঁরা তারিয়ে-তারিয়ে কিছু খাচ্ছেন। ধুন্ধু'র অবস্থা অন্যরকম। সে চিত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। বুঝলুম, বেয়াদপি করেছিল। তার শাস্তি। কুমড়ো-মানুষরা নাচানাচি করছে। যেন রং-বেরঙের বড়-বড় বেলুন উড়ছে। গজকুমারবাবু ফিসফিস করে বললেন, চলুন, এরা খুব সজ্জন মনে হচ্ছে। আমার খুব খিদেও পেয়েছে।"

বললুম, "আগে বুঝে নিন, আপনাকে ওরা পছন্দ করছে কি না।"

গজকুমারবাবু স্ক্রুড্রাইভার নাচিয়ে বললেন, "বেগড়বাঁই করলে প্যাঁক করে ঢুকিয়ে দেব। চলে আসুন।"

বলে উনি উঠে দাঁড়ালেন। দু'হাত তুলে সাড়া দিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে গেলেন। কুমড়ো-মানুষেরা থেমে গেল এবং এদিকে তাকাল। তারপর গজকুমারবাবুকে কর্নেলদের মতোই পায়ের তলায় ঢুকে নাচাতে-নাচাতে নিয়ে গেল।

দেখলুম, আমার বৃদ্ধ বন্ধু চোখে বাইনোকুলার তুললেন। তারপর হাত নেড়ে চলে যেতে ইশারা করলেন। খুব রাগ হল। আমাকে কেন হেনস্থা করা হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কুমড়ো-ব্যাটাচ্ছেলেরা আমাকে দিব্যি দেখতে পাচ্ছে। অথচ গ্রাহ্য করছে না।

গোঁ ধরে ঢাল বেয়ে নামতে থাকলুম। খানিকটা নেমেছি, কয়েকটা খোকা কুমড়ো-মানুষ বাঁই-বাঁই করে ফুটবলের মতো এসে আমাকে ধাক্কা মারল। গড়িয়ে পড়ে গেলুম। তারপর যেই উঠে দাঁড়াই, অমনি বাঁই করে গায়ে পড়ে আর আছাড় খাই।

বুঝলুম, আমাকে যে-কোনো কারণেই হোক, এরা পছন্দ করেনি। রাগ করে ঢালে হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে ফিরে এলুম।

তাতেও রক্ষা নেই। বিচ্ছু খোকাগুলো উড়ে এসে দমাদ্দম গায়ে পড়ছে। ঠাসা বালিশের মতো জিনিস। তাই আঘাতটা গায়ে তত বাজছে না। কিন্তু আছাড় খাচ্ছি।

কী আর করা যাবে? অগত্যা স্পেসশিপে ফিরে এলুম। বালির ওপর হাঁটাহাঁটিতে খিদে পেয়েছে। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত নিশ্চয় সঙ্গে খাবার-দাবার এনেছেন। কিন্তু কোথায় তা? খোঁজাখুঁজি শুরু করলুম। একখানে ইংরেজিতে লেখা আছে : 'খিদে পেলে একটা ক্যাপসুল খান। না পেলে দুটো খান। তারপর একটা খান।'

একটা ক্যাপসুল খেলুম। ফ্লাস্ক থেকে জল খেয়ে ঢেকুর তুলে আসনে হেলান দিলুম। এটা চন্দ্রকান্তের আসন। কী খেয়াল হল, বোতামগুলো টিপতে শুরু করলুম, হয়তো রাগের চোটে মরিয়া হয়েই। তারপর হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি।

এবং স্পেসশিপ আকাশে উঠে পড়েছে।

সর্বনাশ! যদি অনন্ত মহাকাশে চিরকাল ভেসে চলে? ভয় পেয়ে সামনে যে বোতাম দেখি, টিপে ধরি। তারপর এক চিররাত্রির দেশ। শুধু আকাশভরা তারা আর অন্ধকার। ভয়ে চোখ বুজে গেল।

কতক্ষণ পরে ফের ঝাঁকুনির চোটে খুলে দেখি, বাইরে নীলাভ আশ্চর্য আলো। আবার কোথায় এলুম কে জানে! দরজা খুলতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল সামনে ভিশনস্ক্রিনে ফুটে উঠেছে ইংরেজিতে সতর্কবাণী : 'নামতে পারো। কিন্তু সাবধান, পৃথিবীর চেয়ে মাধ্যাকর্ষণ ৯০ শতাংশ কম। উড়ে যাওয়ার সুখ পাবে। তবে নামা কঠিন হবে। তাই বুকে হেঁটে চলবে।'

কী বিপদ! আমি কি সরীসৃপ?

ব্যাপারটা খারাপ লাগছে এই ভেবে যে আমাকে কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন বড্ড বেশি হেনস্থা করতে চাইছে। কাগজের লোক হওয়ার জন্যই কি? গজকুমারবাবুর কথাটা মনে ধরল।

নেমেই মনে হল কী একটা শক্তি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। তাই তক্ষুনি উপুড় হয়ে গিরগিটির মতো হাঁটতে থাকলুম। নীলচে রোদ্দুরে মায়াময় দেখাচ্ছে জায়গাটা। তবে বালি নেই, শক্ত পাথর। মাটিও চোখে পড়ল না। এখানে-ওখানে ন্যাড়া পাথরের স্তূপ। দূরে ও কাছে ছোট-বড় বিচিত্র গড়নের বিশাল ভাস্কর্যের মতো পাহাড়। পাথরের রং ঘন কালো।

হঠাৎ দেখি, সামনে একটা ক্রিকেট বলের সাইজের পাথর পড়ে আছে, কর্নেলের ঘরে যেমনটি দেখেছিলুম।

মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। পাথরটা হাতে নিলুম এবং উঠে দাঁড়ালুম। হুঁ, ঠিকই ধরেছি। এই পাথর নিয়ে দিব্যি দু'ঠ্যাঙে চলাফেরা করা যায়—স্বচ্ছন্দে মানুষের মতোই। মাধ্যাকর্ষণ এখানে কম। তাই পাথরটা খুব কাজের।

তা হলে কি সেই পাথর এখানকারই? তার চেয়ে বড় কথা, এটা কোন্ গ্রহ এবং পৃথিবী থেকে কত দূরে?

ভাবতে ভাবতে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছি, দেখি, খানিকটা দূরে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপাশে কালো লোমশ গোরিলার মতো একটা প্রাণী হেঁটে যাচ্ছে। তার মাথার চুলের সঙ্গে এমনি একটা পাথর বাঁধা। টিকিতে পূজারী ব্রাহ্মণ যেমন করে ফুল বেঁধে রাখেন।

কিন্তু এ তো সর্বনেশে ব্যাপার! যেখানে অমন সাঙ্ঘাতিক প্রাণীর বসবাস আছে, সেখানে চলাফেরা করা নিরাপদ নয়। বিশেষ করে ওই পেল্লায় গড়নের প্রাণীদের সঙ্গে এঁটে ওঠার মতো অস্ত্রও সঙ্গে নেই।

কিন্তু মানুষের স্বভাব অজানাকে জানা। আমি এই আদিম সহজাত স্বভাব থেকে নিষ্কৃতি পেলুম না। জায়গাটা ভালো করে দেখার জন্য সাবধানে পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলুম।

তারপর দেখি, একশো গজ দূরে একটা টিলার গায়ে বিশাল চৌকো সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গ দিয়ে গোরিলা-মানুষেরা যাতায়াত করছে। সবারই চুলের সঙ্গে এমনি পাথরের বল বাঁধা।

অনেকক্ষণ ধরে ঘাপটি মেরে বসে লক্ষ রাখলুম। এক-সময় দেখলুম, প্রকাণ্ড এক গোরিলা-মানুষ বেরিয়ে এসে একটা উঁচু চত্বরে দাঁড়াল। তার হাতেও একটা বল। বলটা সে ছুঁড়ে দিল আকাশের দিকে। তারপর হা-হা করে বিকট হেসে উঠল। আর সব গোরিলা-মানুষও হাসিতে যোগ দিল। কানে তালা ধরে গেল সেই তুমুল হাসির শব্দে। ওদিকে বলটা উধাও হয়ে গেল।

এবার আর-একজন গোরিলা-মানুষ চত্বরটায় উঠল। তার হাতেও একটা বল। সে বলটা ছুড়ল। কিন্তু বলটা আকাশে না গিয়ে সোজা একটা পাহাড়ের ওপর পড়ল। বেচারা কাঁচুমাচু মুখে নেমে গেল।

কিন্তু এ তো দেখছি যেন ডিসকাস ছোড়ার খেলা! তা হলে কি এদের এই খেলারই বল দৈবাৎ পৃথিবীতে গিয়ে পড়ে?

আনন্দে নেচে উঠলুম। আমাদের অভিযানের লক্ষ্য যদি হয় সেই ওজনদার বলের রহস্য উন্মোচন, তা হলে সেই কৃতিত্ব আমার বরাতে জুটে গেল। কিন্তু কৃতিত্ব নিয়ে এখন করবটা কী? কোন কিটো গ্রহে কর্নেলেরা রয়ে গেলেন, আর কোথায় আমার প্রিয় পৃথিবী, আর কোথায় এই অজানা গ্রহ!

স্পেসশিপের কাছে ফিরে এলুম। যানটি এমন জায়গায় নেমেছে, প্রায় চারদিকেই প্রকাণ্ড সব পাথরের স্তূপ। তাই ওদের চোখে পড়বে না। কিন্তু দৈবাৎ কেউ যদি এদিকে এগিয়ে আসে?

এবার বিকট হল্লার শব্দ, মাঝে-মাঝে হা-হা-হা-হা প্রচণ্ড হাসির শব্দ ভেসে আসছে। সম্ভবত আজ ওদের খেলাধুলোর উৎসব চলেছে। তাই এদিকে কারও আসার চান্স কম। এই সুযোগে আরও কয়েকটা বল কুড়িয়ে স্পেসশিপে বোঝাই করা যাক।

এত কম মাধ্যাকর্ষণ, কাজেই গোটা ছয়েক বল কুড়িয়ে আনা কঠিন হল না। তারপর বোতাম টিপতে থাকলুম, আগের মতোই এলোপাথাড়ি। এতে কাজ হল। ঝাঁকুনি দিয়ে স্পেসশিপ আকাশে উঠে পড়ল। কিন্তু তারপর টালমাটাল অবস্থা। বিমান ঝড়ের মধ্যে পড়লে যেমন হয়। ভিশনস্ক্রিনে ফুটে উঠল : 'বেশি ভারী হয়ে গেছি। ওজন কমাও। নইলে বিপদ।'

মনমরা হয়ে একটা দুটো তিনটে করে ছ'টা পাথর ছুঁড়ে ফেলার পর বাকি রইল আমার হাতেরটা। ভিশনস্ক্রিনে ফুটল : 'আরও ওজন কমাও।'

রাগ করে বললুম, "ধ্যাত্তেরি! তুমি যাই বলো, হাতেরটা ফেলছি না। এটা আমার আবিষ্কারের সাক্ষী!"

ভিশনস্ক্রিনে বারবার লাল হরফে ফুটে উঠতে থাকল : 'বিপদ...বিপদ...বিপদ...'

তারপর ঝাঁকুনি খেলুম। স্পেসশিপ নেমেছে। সেই গ্রহ বলেই মনে হচ্ছে। কারণ নীচে রোদ্দুর এবং কালো পাথুরে পারিপার্শ্বিক। আবার তা হলে গোরিলা-মানুষদের গ্রহেই ফিরে এলুম!

বলটা প্যান্টের পকেটে ভরে নেমে গেলুম সাবধানেই। একটা সমতল উপত্যকার মতো জায়গা। দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখছি, হঠাৎ কী-একটা এসে আমার ওপর পড়ল এবং হ্যাঁচকা টান। দেখলুম, ল্যাসো ছুঁড়ে কেউ আমাকে আটকেছে এবং টানছে। আমি পড়ে যাচ্ছি না, তার কারণ বোঝা সহজ। কিন্তু ল্যাসোটার অন্য প্রান্তে কিছু দেখা যাচ্ছে না। বহু দূর থেকে কেউ ল্যাসো ছুঁড়েছে। কম মাধ্যাকর্ষণের গ্রহে এটা সম্ভব। কিন্তু কে সে? কোনো গোরিলা-মানুষ হলে সত্যিই বিপদ। ভাষা না জানলে কাউকে কিছু বুঝিয়ে বলা কঠিন। ভাষা যে কী অসাধারণ জিনিস, এতক্ষণে মাথায় সেটা স্পষ্ট হল।

বন্দিদশায় চলেছি তো চলেছি। কতক্ষণ পরে দেখতে পেলুম, একটা ছোট্ট নদীর ধারে পাথরের চৌকো বাড়ি। বাড়ির সামনে, কী অবাক, আমার মতোই একটা মানুষ! তার হাতে ল্যাসোর ডগা। তার চেহারা বেজায় রাগী। মুখটা চিনাদের মতো। চিবুকে ছাগলদাড়ি। ঠোঁটের দু'ধার দু'চিলতে সূক্ষ্ম গোঁফ। পরনে আলখাল্লার মতো পোশাক। মাথায় ছুঁচলো টুপি। টুপির ডগায় একই রকম একটা বল বসানো।

সামনাসামনি হলে সে ইংরেজিতে বলল, "আমি সেই চাংকো, দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট। ওহে প্রথম ব্রহ্মাণ্ডের পুঁচকে ছোকরা! কোন সাহসে তুমি বিনা অনুমতিতে আমার সাম্রাজ্যে ঢুকেছ?"

খট্ করে মিলিটারি স্যালুট ঠুকে বললুম, "বেয়াদপি মাফ করবেন সম্রাট বাহাদুর। আমি দৈবাৎ এখানে এসে পড়েছি। যদি অনুমতি পাই, সব কথা খুলে বলব।"

সম্রাট চাংকো কুতকুতে চোখে আমাকে দেখতে দেখতে বললেন, "তোমাকে ভালো ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। অন্তত ওই লোকটার ডেঁপো ভাগনেটার মতো নও। বিচ্ছুটা আমায় বলে কী—সে নাকি প্রথম ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় 'দেহশ্রী' খেতাব পেয়েছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!"

সন্দিগ্ধ হয়ে বললুম, "আপনি ভবেশবাবুর ভাগনে ভোঁদা-পালোয়ানের কথা বলছেন কি? তাদের কী করে পেলেন এখানে?"

সম্রাট চাংকো ফাঁস খুলে খুব হেসে-টেসে বললেন, "ধরে এনেছি। তবে পালোয়ানের অবস্থা দেখবে এসো।"

চার

পালোয়ানের অবস্থা করুণই বটে! পরনে সেই হাফপেন্টুল আর স্পোর্টিং গেঞ্জি। কিন্তু এ কী দশা তার!

একটা বিশাল হলঘরের ভেতর তাকে ছাদে টিকটিকির মতো সেঁটে থাকতে দেখলুম। ডাকলুম, "জগদীশবাবু! জগদীশবাবু!"

পালোয়ান সিলিং থেকে আমাকে দেখতে পেয়ে কাতর মুখে বলল, "দাদা, আমি নামতে পারছি না। যতবার নামবার চেষ্টা করছি, সিলিংয়ে আরও সেঁটে যাচ্ছি।"

"মাধ্যাকর্ষণের অভাব, জগদীশবাবু!" একটু হেসে বললুম, "আপনার উচিত ছিল এখানকার একটা বল কুড়িয়ে পকেটে রাখা। তা হলে ওজন বেড়ে যেত, দিব্যি চলাফেরা করতে পারতেন।"

"রেখেছিলুম তো! ওই লোকটা কেড়ে নিল।"

সম্রাট চাংকো খাপ্পা হয়ে বললেন, "লোকটা! তুমি আমাকে লোকটা বলছ? আমি সম্রাট চাংকো। আমার সঙ্গে ফাজলামি? যাও তোমাকে বল দিতুম, আর দিচ্ছি না।"

বললুম, "সম্রাটবাহাদুর, আপনার আর এক অতিথি কোথায়?"

সম্রাট চাংকো চোখ পাকিয়ে বললেন, "অতিথি? সে তো আমার বন্দী। তাকে প্রথম ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে নোংরা জায়গা থেকে ধরে এনেছি।"

"কেন সম্রাটবাহাদুর?"

"আমার বন্ধুর নাতি তাকে একটা বল বেচতে চেয়েছিল। সে তাচ্ছিল্য করে কেনেনি। ছাদে দাঁড়িয়ে দূরবীনযন্ত্রে আমি সব দেখেছি। ওকে পরীক্ষার জন্য বলটা ওর বাড়িতে পর্যন্ত পাঠিয়েছিলুম। সেই বলকে সম্মানে পুজো না করে সে এই হোঁতকা পালোয়ানের মাথায় চাপিয়ে এক দাড়িওলা বুড়োর বাড়ি নিয়ে গেল। ওঃ! অসহ্য, বড় অসহ্য অপমান!" এই বলে সম্রাট চাংকো দাঁত কিড়মিড় করতে থাকলেন।

জিজ্ঞেস করলুম, "আপনার বন্ধুর নাম?"

"ঐরাবত সিং। প্রথম ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে নোংরা গ্রহে তার জন্ম।"

"পৃথিবী সত্যিই বড় নোংরা গ্রহ, সম্রাটবাহাদুর!"

সম্রাট চাংকো আমার কাঁধে হাত রেখে চুপিচুপি বললেন, "কাউকে বোলো না! আমার জন্মও সেখানে। রাগ করে পালিয়ে এসেছি। ছ্যা-ছ্যা! দিনরাত্তির ঝগড়াঝাঁটি, খুনোখুনি, দলাদলি। সামান্য স্বার্থের জন্য লড়াই। ঘেন্না ধরে গিয়েছিল হে! বিশেষ করে আমার বন্ধু ঐরাবত সিং—ওই যে কী বলে তোমাদের পৃথিবীতে, হুঁ, ভোটের লড়াইয়ে নেমেছিল। হেরে গেল। তোমাদের ভালো করার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু কেন হারল জানো কি? তাকে কারচুপি করে হারিয়ে দিল। রাগে-দুঃখে বেচারা হার্টফেল করে মারা গেল। খবরটা পেলুম দেরিতে। তখন আমি কুমড়ো-মানুষদের গ্রহ সবে জয় করেছি।"

শোনামাত্র বলে ফেললুম, "কুমড়ো-মানুষদের গ্রহেই আমার তিন সঙ্গী এখন বন্দী। দয়া করে ওদের উদ্ধার করুন, ইওর এক্সেলেন্সি! তাঁদের মধ্যে আপনার বন্ধুর নাতিও আছেন।"

সম্রাট চাংকো হা-হা করে হেসে বললেন, "সবই জানি হে ছোকরা! আমার দূরবীনযন্ত্রে সবই দেখেছি। একটু অপেক্ষা করো। আমার বাহিনী পাঠিয়েছি সেখানে। তাদের নিয়ে আসবে।"

এমন সময় একজন বিকট চেহারার গোরিলা-মানুষের কাঁধে চেপে ভবেশবাবুর আবির্ভাব ঘটল। কাঁধ থেকে নেমে ভবেশবাবু আমাকে দেখতে পেলেন। অবাক হয়ে বললেন, "মশাইকে চেনা-চেনা ঠেকছে?"

পরিচয় দিয়ে বললুম, "আপনার ভাগনেকে একটু বুঝিয়ে বলুন, যেন সম্রাটবাহাদুরকে সম্মান দেখান। তা না হলে ওঁকে টিকটিকি হয়েই কাটাতে হবে।"

গোরিলা-মানুষটি ততক্ষণে লাফ দিয়ে-দিয়ে পালোয়ানকে কাতুকুতু দিতে শুরু করেছে। কাতুকুতুর চোটে পালোয়ান হেসে অস্থির এবং সিলিং-এ বুক ঠেকিয়ে এদিক-ওদিক করে বেড়াচ্ছে। সম্রাট চাংকোও খুব হাসছেন। ভবেশবাবু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, "উপযুক্ত শাস্তি! পালোয়ানি দেখাবে বেপাড়ায়? নাও, বোঝো ঠ্যালা। আমি তোমাকে বাঁচাব না। তুমি হেসে মরো আর যাই করো। হতভাগা বুদ্ধু!"

বললুম, "সম্রাটবাহাদুর! যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। এবার ওঁকে রেহাই দিন।"

"তুমি বলছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কথা দিচ্ছি, ও যাতে আর বেয়াদপি না করে আমি দেখব।"

সম্রাট চাংকো গোরিলা-মানুষটিকে অদ্ভুত ভাষায় বললেন, "হাম্বো জাম্বো কাম্বো।" তারপর আলখাল্লার ভেতর থেকে একটা বল বের করলেন। গোরিলা-মানুষটি চলে গেল। তখন সম্রাট চাংকো পালোয়ানকে বললেন, "ওহে পালোয়ান! বল ছুঁড়ে দিচ্ছি। লুফে নিতে হবে। দেখি, তোমার হাতের তাক। না লুফতে পারলে আটকে থাকবে কিন্তু!"

পালোয়ানের দিকে ফের দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তার মামা বললেন, "তোকে বলতুম ক্রিকেট খেলাটা শিখে নে! শিখলে কাজে লাগত।"

চারবারের বার বলটা ক্যাচ ধরল পালোয়ান এবং ধুপ করে নামতে পারল। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম অভ্যাসে, "আউট! আউট! আউট!"

সম্রাট চাংকো চোখ কটমট করে বললেন, "আর যাই বলো হে ছোকরা, তোমাদের ওই নোংরা জায়গার ভুতুড়ে খেলার টার্মগুলো আওড়াবে না। কান পচে যায়।"

পালোয়ান মুচকি হেসে বলল, "দাদা! সত্যিই আউট করে দিয়েছি বলুন! কেমন একখানা ক্যাচ ধরেছি!"

"আবার? আবার?" সম্রাট চাংকো হুঙ্কার দিলেন, "বল কেড়ে নেব বলে দিচ্ছি।"

"ভোঁদা-পালোয়ান ভড়কে গিয়ে জিভ কাটল, "সরি স্যার!"

"স্যার নয়, ইওর এক্সেলেন্সি বলো!"

ভোঁদা মুখ-তাকাতাকি করছে এবং তার মামা চোখ-ইশারা করছেন। আমিও করছি। সম্রাট চাংকো ক্রুদ্ধ হয়ে চোখ পিটপিট করছেন। অগত্যা ভোঁদা বলল, "সরি, ইওর এক্সেলেন্সি!"

সম্রাট চাংকো খুশি হয়ে বললেন, "এসো।"

ঘরের পর ঘর, সবই কালো, তারপর ঘর। অনেক গোলকধাঁধা পেরিয়ে একটা ঘরে পৌঁছলুম আমরা। এতক্ষণে বুঝলুম, সম্রাট চাংকো একজন বিজ্ঞানী। চন্দ্রকান্তবাবুর চেয়ে উঁচুদরের বিজ্ঞানী নিঃসন্দেহে। বিশাল ল্যাব। কতরকম যন্ত্র। জার। কত বিচিত্র সব কমপিউটার। এককোণে সোফায় আমাদের বসতে বললেন সম্রাট চাংকো। বসার পর তারিফ করে বললুম, "আমাদের বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তেরও একটা ল্যাব আছে। তবে এর কাছে নস্যি!"

সম্রাট চাংকো বাঁকা হেসে বললেন, "চন্দ্রকান্ত বিজ্ঞানের বোঝে কী? ও তো একটা বুদ্ধু।"

"তাঁকে আপনি চেনেন সম্রাটবাহাদুর?"

"আলবাত চিনি। আমার সঙ্গে তাইপে'তে আলাপ হয়েছিল একটা সেমিনারে। যাই হোক, এবার ওদের ধরে আনার ব্যবস্থা করি।" বলে সম্রাট চাংকো একটা যন্ত্রের সামনে বসলেন, "শুধু একটাই সমস্যা। কুমড়ো-মানুষগুলো বেয়াড়া। খুব আমুদে স্বভাবের কিনা! তাই আমাদের জিনিস পেলে ছাড়তে চায় না। দেখা যাক। নইলে আমার গোরিলা-সেনা পাঠাতে হবে। ওদের ওরা খুব ভয় পায়।"

বিশাল ভিশনস্ক্রিনে এবার ফুটে উঠল সেই কিটো গ্রহের মনোরম সবুজ উপত্যকা আর রং-বেরঙের কুমড়ো-মানুষ। আমার বৃদ্ধ বন্ধু চোখে বাইনোকুলার রেখে যথারীতি এদিকে-ওদিকে, সম্ভবত পাখি খুঁজছেন অথবা প্রজাপতি। কিটো গ্রহে পাখি-প্রজাপতি দেখেনি। তবে কর্নেলের চোখ। কিছু বলা যায় না!

গজকুমারবাবুকে দেখলুম রেসের আয়োজন করেছেন। কুমড়ো-মানুষেরা দৌড়চ্ছে। উনি হাততালি দিচ্ছেন। হালদারমশাই একটা ডিমালো বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করছেন। গোয়েন্দার স্বভাব। আর বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত নোটবইতে কীসব টুকছেন। কুমড়ো-মানুষেরা রেসের জায়গায় ভিড় করেছে।

সম্রাট চাংকো বললেন, "ওদের এক্সরের ল্যাসেতে বন্দী করে আনা যায়। যেভাবে আমার বন্ধুর নাতি আর এই মামা-ভাগনেকে ধরে এনেছি। কিন্তু চন্দ্রকান্ত মহা ধূর্ত। ওর পকেটে একটা রে-ডিটেক্টর আছে। টের পেয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেই সমস্যা। কুমড়ো-মানুষদের ঘরগুলো এমন ধাতুতে তৈরি, কোনো অদৃশ্য রশ্মিই ঢুকতে পারবে না। হুঁ, গোরিলা-বাহিনীই পাঠানো যাক।" বলে হাঁক দিলেন, "টাম্বো মাম্বো জাম্বো!"

অমনি ভিশনস্ক্রিনের দৃশ্য মুছে একদঙ্গল গোরিলা-মানুষের ছবি ফুটে উঠল। তারপর দেখলুম। সেই দানোর মতো গোরিলা-মানুষ, যে ভোঁদা-পালোয়ানকে কাতুকুতু দিচ্ছিল, গোরিলা-মানুষদের চুলের ডগা থেকে আজব বলগুলো খুলে নিল।

সঙ্গে-সঙ্গে তারা বাঁই-বাঁই শূন্যে ভেসে উঠল এবং দেখতে দেখতে উধাও হয়েও গেল। সম্রাট চাংকো বসে রইলেন। এই সুযোগে ফিসফিস করে ভবেশবাবুকে বললুম, "আপনি ওই গোরিলা-মানুষটার কাঁধে চেপেছিলেন কেন?"

ভবেশবাবু তেতোমুখে অমনি চাপা স্বরে বললেন, 'ইচ্ছে করে কি চেপেছি মশাই? ব্যাটাচ্ছেলে আমাকে কী পেয়েছে কে জানে। যখন-তখন এসে কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আর নামবার চেষ্টা করলেই কাতুকুতু।"

সম্রাট চাংকো ঘুরে বললেন, "কীসের ষড়যন্ত্র হচ্ছে যেন? সাবধান!"

ঝটপট বললুম, "না, ইওর এক্সেলেন্সি! আমরা আপনার ক্ষমতার প্রশংসা করছি।"

"এ কী ক্ষমতা দেখছ হে ছোকরা! আসল ক্ষমতা দেখবে, চাঁদুটাকে আসতে দাও আগে।"

"চাঁদু, মানে চন্দ্রকান্তবাবুর কথা বলছেন কি?"

সম্রাট চাংকো অট্টহাসি হেসে বললেন, "আবার কার?"

বলে তিনি খুটখুট করে বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের মতোই কমপিউটারের বোতাম টিপতে থাকলেন। একটু পরে ভিশনস্ক্রিনে একটা অদ্ভুত দৃশ্য ফুটে উঠল। প্রথমে মনে হল একটা বাজপাখি উড়ে আসছে। কিন্তু ক্রমে সেটা বড় হতে থাকল। তখন দেখলুম বাজপাখি গড়নের একটা বিকট মানুষ, দু'টি প্রকাণ্ড ডানা।

সম্রাট চাংকো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। বললেন, "সর্বনাশ! আবার ঈগল-মানুষটা হানা দিতে আসছে দেখছি! জানি না, আমার কোন প্রজাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে। সমস্যা হল, ওকে কোনো অস্ত্রেই কাবু করা যায় না।" বলে একটা ছোট্ট স্পিকার হাঁকলেন, "আম্বো ডাম্বো হ্রাম্বো! আম্বো ডাম্বো হ্রাম্বো!"

তারপর আসন ছেড়ে উঠে সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

আমরা ওঁকে অনুসরণ করলুম। একটু পরে খোলা চত্বরে দেখলুম সম্রাট চাংকো একটা লম্বাটে পিস্তল তাক করে আছেন। নীলচে রোদ্দুরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ঈগল-মানুষটা আকাশে চক্কর দিচ্ছে। গোরিলা-মানুষদের অবস্থা দেখে মায়া হল। তারা তাড়াহুড়ো করে যে-যেখানে পারছে, লুকিয়ে পড়ছে। আড়াল থেকে বড়-বড় পাথরও ছুঁড়ছে কেউ-কেউ। মাধ্যাকর্ষণ কম। তাই প্রকাণ্ড পাথরগুলো আকাশে ছুটে যাচ্ছে। আশ্চর্য, ঈগল-মানুষটা পায়ের নখ দিয়ে পাথর ধরে ফেলে পালটা ছুঁড়ে দিচ্ছে। কিন্তু সেগুলো তুলোর মতো উড়তে উড়তে বহু দূরে গিয়ে আস্তে-আস্তে নেমে যাচ্ছে। সম্রাট চাংকোর পিস্তল থেকে নীল-লাল-হলুদ আলোর গুলি শাঁই-শাঁই করে বেরিয়ে ঈগল-মানুষটাকে আঘাত করছে। কিন্তু তার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। ধোঁয়া হয়ে চাপচাপ উড়ে যাচ্ছে। আকাশ যেন ক্রমে সাদা মেঘে-মেঘে ঢেকে গেল। তার ভেতর একটা অতিকায় ঈগলের ওড়াওড়ি।

ভোঁদা-পালোয়ান হঠাৎ খেপে গেল। অঁক শব্দে পেশী ফুলিয়ে বলল, "তবে রে বদমাশ!" তারপর সে উরুতে থাপ্পড় মেরে ঈগল-মানুষটাকে কুস্তিতে চ্যালেঞ্জ করতে লাগল, "চলা আও! কাম অন!"

ভবেশবাবু ধমক দিলেন, "অ্যাই বাঁদর! মারা পড়বি যে! সাঙ্ঘাতিক নখ দেখতে পাচ্ছিস না?"

ভোঁদা-পালোয়ান গর্জে বলল, "নখ ভেঙে ছাতু করে দেব। কাম ইন ঈগলকা বাচ্চা!"

আমি বললুম, "জগদীশবাবু! জগদীশবাবু! আগে গোটাকতক বল কুড়িয়ে নিন। তা হলে ঈগল-মানুষটাকে নামিয়ে এনে লড়তে পারবেন। সম্রাটবাহাদুর! আপনার ল্যাসো কোথায়?"

সম্রাট চাংকো বলে উঠলেন, "খাসা বুদ্ধি! তুমি বকশিশ পাবে হে ছোকরা! আমার মাথা খুলে গেছে। হায়, হায়! কেন যে এটা অ্যাদ্দিন মাথায় ঢোকেনি?" বলে তিনি আলখাল্লা থেকে সেই ল্যাসোটা বের করলেন। ঝটপট কয়েকটা বল কুড়িয়ে পালোয়ানের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, "আমি ওকে আটকাচ্ছি। তুমি রেডি হও, পালোয়ান!"

তিনবারের বার ল্যাসোটা ঈগল-মানুষের এক পায়ে আটকে গেল। আমি আর ভবেশবাবু ল্যাস্বোর গোড়ায় হাত লাগালুম। তিনজনে টানতে থাকলুম হেঁইয়ো-হেঁইয়ো করে। ঈগল-মানুষটার জোরে এঁটে ওঠা কঠিন। পালোয়ান এবার বলের ওজনে খুব ওজনদার মানুষ। সে-ও হাত লাগাল। এতক্ষণ ঈগল-মানুষ জব্দ হল। নীচে নামানো গেল তাকে। তারপর পালোয়ান

একটা বল ছুড়ল তার দিকে। ঠকাস করে লাগল ডানায়। আমরা তিনজনে ততক্ষণে পাথুরে মাটিতে উপুড় হয়েছি।

পালোয়ান ফের বল ছুঁড়তে যাচ্ছিল, নিষেধ করে বললুম, "না, না। ওজন কমে যাবে আপনার। এবার কুস্তি শুরু করুন। কিন্তু সাবধান! ঠুকরে না দেয়!"

পালোয়ান বলল, "ওজন বেড়েই তো প্রবলেম দাদা! লাফাতে পারছি না যে! ওজন কমাই আগে। তারপর এক লাফে...।" বলে বাড়তি বলগুলো ফেলে দিতে গিয়ে হঠাৎ সে থামল। বলল, "নাহ্ দাদা! বলসুদ্ধু ওর পিঠে চাপব। তা হলে কাবু হবে। আপনারা টেনে আটকে রাখুন।"

ঈগল-মানুষটার ডানার ঝাপটানিতে ঝড় বইছিল। পালোয়ান চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে একফাঁকে লাফ দিয়ে তার পিঠে চেপে গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। ঈগল-মানুষটা তীক্ষ্ণ ঠোঁট ঘুরিয়ে বিকট ক্র্যাঁ-ক্র্যাঁ গর্জন করতে করতে নেতিয়ে পড়ল। পালোয়ান একগাল হেসে বলল, "রামটিপুনির চোটে ব্যাটাচ্ছেলের দম বেরিয়ে গেছে।"

সে ঈগল-মানুষটার পিঠে দাঁড়িয়ে আছে দেখে ভবেশবাবু বললেন, "নেমে আয় ভোঁদা! আর বীরত্ব দেখাতে হবে না।"

পালোয়ান এক-লাফে নামল। তারপর বাড়তি বলগুলো ঈগল-মানুষের প্রকাণ্ড ঠোঁটের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, "বডি উড়ে যাবে না! এ কী জায়গা বাবা! বলগুলো না থাকলে উড়ে যায় মানুষ।"

ঈগল-মানুষ পড়ে রইল। সম্রাট চাংকো পালোয়ানের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "তোমার ওপর খুব খুশি হয়েছি হে, ছোকরা! এসো, তোমাকে এক গ্লাস অমৃত খাইয়ে দিই। চিরজীবী হবে। তবে বলে রাখা উচিত, এই গ্রহ ছেড়ে তোমাদের ওই নোংরা গ্রহে গেলে কিন্তু অমৃত-শরবত কোনো কাজ দেবে না। ভেবে দ্যাখো, কী করবে।"

ভবেশবাবু ভাগনেকে চোখের ইশারায় খেতে নিষেধ করলেন। কিন্তু পালোয়ান বলল, "মামাবাবু! আমি আর পৃথিবীতে ফিরব না। এখানেই কুস্তির আখড়া খুলব। গোরিলা-মানুষদের বডি বিল্ডআপ শেখাব। ওদের অমন তাগড়াই বডি। কিন্তু কোনো কাজে লাগাতে জানে না। খেলা বলতে খালি বল ছোঁড়া। ধুস! ও তো পুঁচকে ছেলেমেয়েদের খেলা।"

ল্যাবে ফিরে সম্রাট চাংকো এক গ্লাস অমৃত দিলেন ভোঁদাকে। সে মামাবাবুর ফের নিষেধ সত্ত্বেও চোঁ-চোঁ করে খেয়ে বলল, "ওঁদেরও দিন দাদু! একলা খাওয়া কি..."

সম্রাট চাংকো ফুঁসে উঠলেন, "দাদু? দাদু মানে? সম্রাট চাংকোকে তুমি দাদু বলছ?"

রফা করে দিয়ে বললুম, "দাদু, মন্দ না ইওর এক্সেলেন্সি! তবে সম্রাটদাদু বলাই উচিত।"

"ওক্কে! সম্রাটদাদু বলো।"

ভোঁদা বলল, "সম্রাটদাদু! মামাবাবু আর এই রিপোর্টারবাবুকে এক গ্লাস করে অমৃত দিন।"

সম্রাট চাংকো চমকে উঠে আমার দিকে তাকালেন, "তুমি রিপোর্টার নাকি হে ছোকরা? সর্বনাশ! আগে জানলে তো সাবধান হয়ে যেতুম। হুঁ, সবাইকে পৃথিবীতে ফেরার অনুমতি দেব। তোমাকে নয়।"

"কেন সম্রাটবাহাদুর?"

"ওরে বাবা! ফিরে গিয়ে তুমি কাগজে আমার কথা লিখবে আর ঝাঁকে-ঝাঁকে এখানে রিপোর্টার এসে জুটবে। আমাকে জেরবার করবে। আমি ওতে নেই। রিপোর্টাররা বড্ড ডিসটার্ব করে!"

"না, সম্রাটবাহাদুর! আজকাল রিপোর্টারদেরই যেচে-পড়ে সবাই খবর দেয়। পাবলিসিটি চায় কাগজে। সে-যুগ আর পৃথিবীতে নেই।"

"আমি পাবলিসিটি চাইনে।" গম্ভীর মুখে এ-কথা বলে এক গ্লাস অমৃত বের করলেন সম্রাট চাংকো, "নাও, খেয়ে ফেলো। পৃথিবীতে তোমাকে ফিরতে যখন দিচ্ছি না, তখন তুমি এটা খাও। এই মামা-ভদ্রলোকের লোহালক্কড়ের ব্যাবসা আছে। এখানে খামোকা পড়ে থাকলে ব্যাবসার লোকসান হবে। শুধু ওঁকে ফিরে যেতে দেব।"

অমৃতটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও খেয়ে দেখলুম, স্বাদটা মন্দ না। কতকটা বেলের শরবতের মতো স্বাদ। ভবেশবাবু করুণ মুখে বললেন, "অগত্যা এক গ্লাস জল পেলে হত। তেষ্টা পেয়েছে, এ-বয়সে এতক্ষণ দড়ি ধরে টানাটানি করে বড্ড টায়ার্ড হয়ে গেছি সম্রাটবাহাদুর!"

সম্রাট চাংকো ফিক করে হাসলেন, "ঠিক আছে। আপনাকে জলের বদলে অমৃতই দিচ্ছি। তবে ওই নোংরা গ্রহে ফিরলে অমৃতের গুণ টিকবে না। সাবধান মশাই! পৃথিবীতে ফিরে যেন নিজেকে অমর ভাববেন না।"

ভবেশবাবু সোফায় বসে তারিয়ে-তারিয়ে অমৃত খেতে থাকলেন। মুখে অমায়িক ভাব ফুটে উঠল। চাপা স্বরে বললেন, "লোহালক্কড়ের ব্যাবসাটা এখানে করতে পারলে মন্দ হত না। কিন্তু চলবে কি? ওই গোরিলা-মানুষগুলো কেনাকাটা-বিক্রিবাটা বোঝে বলে মনে হয় না। খালি হাম্বা-হাম্বা করে বেড়ায় গোরুর মতো!"

পালোয়ান-ভাগনে শুধরে দিল, "না মামাবাবু! হাম্বো হাম্বো!"

"ওই হল আর কি! তবে ভোঁদা, তুই কি সত্যি এখানে থাকবি ভেবেছিস?"

"হুঁউ।"

ভবেশবাবু বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললেন, "তোর নামে সম্পত্তি উইল করে দিতুম। আর নবডঙ্কাটিও পাবি না কিন্তু! ভেবে দেখ।"

ভোঁদা পালটা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, "নবডঙ্কাটি! আমি লোহালক্কড়ের মধ্যে থেকে আপনার মতো মরচে ধরে যাব নাকি?"

মামা-ভাগনের মধ্যে ঝগড়া বাধার উপক্রম হয়েছিল, সেই সময় ভিশনস্ক্রিনে একটা দৃশ্য ফুটে ওঠায় তা থেমে গেল। গোরিলা-মানুষদের সঙ্গে ধুন্ধুর যুদ্ধ বেধেছে। কুমড়ো-মানুষরাও দমাদ্দম গোরিলা-মানুষদের ওপর পড়ছে। আর গোয়েন্দা-হালদারমশাই ফাঁক বুঝে গোরিলা-মানুষদের টিকি থেকে লোহার বল খুলে ফেলছেন। অমনি তারা ভড়কে গিয়ে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে। সম্রাট চাংকো হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, "তবে রে ব্যাটা টিকটিকি!"

পাঁচ

এবার যুদ্ধটা দেখার মতো হত। কিন্তু সম্রাট চাংকো বেরিয়ে গেলেন। আমরাও বেরোলুম। উনি ব্যস্তভাবে হাতের একটা খুদে যন্ত্রের মাথায় বল কুড়িয়ে আটকে ট্রিগারে চাপ দিতে থাকলেন এবং বলগুলো উধাও হয়ে গেল। বুঝলুম, গোরিলাবাহিনীকে বল জোগাচ্ছেন। তা না হলে ওরা এই গ্রহে ফিরে বিপদে পড়বে। একটার-পর-একটা বল ছুঁড়ছিলেন সম্রাট চাংকো। সেই সময় ভবেশবাবু ফিসফিস করে বললেন, "জয়ন্তবাবু! এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। চলুন, পালিয়ে যাই!"

কথাটা মনে ধরল। ভোঁদাকে ইশারা করলুম। সে গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

তখন ভবেশবাবু তার কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে থাকলেন। সম্রাট চাংকো ক্রমশ বল ছুড়তে-ছুড়তে এগিয়ে চলেছেন। আমাদের লক্ষ করার সময় নেই ওঁর।

আজব পুরী থেকে বেরিয়ে পড়তে অসুবিধে হল না। কারণ সব প্রহরী গোরিলা-মানুষ তাদের সম্রাটের কাছে গিয়ে জুটেছে এবং হাম্বো হাম্বো করে সম্ভবত তাঁর জয়ধ্বনি দিচ্ছে। তা ছাড়া তারা তাদের বাহিনীর বিপদ টের পেয়েও থাকবে।

সোজা গিয়ে পৌঁছলুম। স্পেসশিপের কাছে। আশ্বস্ত হয়ে দেখলুম, কোনো গোরিলা-মানুষ ওটার কোনো ক্ষতি করেনি। আসলে জায়গাটা ওদের বসতি এলাকা থেকে দূরে।

স্পেসশিপে মামা-ভাগনেকে ঢুকতে বললুম। দু'জনে মুখ-তাকাতাকি করে অবশেষে ঢুকলেন। তারপর ভোঁদা বলল, "দাদা! এটা কী প্লেন? এমন প্লেন তো কখনও দেখিনি।"

বললুম, "এটা স্পেসশিপ। প্লিজ, চুপচাপ বসে থাকুন। সিটবেল্ট শক্ত করে বেঁধে নিন। আর বলগুলো বাইরে ফেলে দিন।"

স্পেসশিপটা চালানোর অভিজ্ঞতা খানিকটা হয়েছে। বলগুলো থাকলে আগের অবস্থা হত। তাই বলগুলো অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফেলতে হল। মামা-ভাগনে এতে আপত্তি করলেন না। ওঁরা পালাতে পারলে বাঁচেন বলেই মনে হচ্ছিল। ভোঁদা-পালোয়ান কিছুক্ষণ আগেই এই গ্রহে থাকতে জেদ ধরেছিল। এখন সে খ্যা-খ্যা করে হেসে বলল, "বাপস! এখানে মানুষ থাকে? ওদিকে আমার ক্লাবের অ্যানুয়াল ফাংশন পয়লা বোশেখ। কত্ত কাজ বাকি আছে।"

বোতাম টিপে স্পেসশিপে স্টার্ট দিলুম। এবার লক্ষ করলুম, প্রত্যেকটা বোতামে নির্দেশ লেখা আছে। কাজেই আর আমাকে পায় কে? স্পেসশিপ নিমেষে আকাশে উঠে গেল।

কিন্তু কুমড়ো-মানুষদের সেই কিটো গ্রহে যাব কী করে? খুঁজতে-খুঁজতে একটা বোতামে লেখা দেখলুম, "এনকোয়ারি।" সেটা টিপতেই ছোট্ট ভিশনস্ক্রিনে সবুজ হরফে ফুটে উঠল, "সামনে টাইপমেশিন। যেখানে যেতে চাও, সেই হরফগুলো টেপো। সাবধান! ভুল হরফে আঙুল পড়ে না যেন।"

টাইপমেশিনে কে. আই. টি. ও হরফগুলো টিপে দিলুম।

মিনিটখানেক পরে ভিশনস্ক্রিনে ফুটে উঠল, 'এসে গেছে। নামতে হলে ডাউন লেখা বোতাম টেপো।'

ব্যস! চিরবিকেলের দেশের বালিয়াড়িতে স্পেসশিপ নামল। ভোঁদা জানলা দিয়ে দেখে বলল, "এ কোথায় এলুম দাদা? রাজস্থানের মরুভূমি নাকি?"

বললুম, "না জগদীশবাবু! নামুন। কুমড়ো-মানুষদের দেশে এসে গেছি। এখন আমার সঙ্গীদের খোঁজে বেরোতে হবে।"

ভোঁদা নেমে গেল, আমিও নামলুম। ভবেশবাবু বললেন, "আমার মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে। আপনারা যা হয় করুন মশাই! আমি এখন ঘুমোব।"

এটা আগের জায়গা নয়। কুমড়ো-মানুষদের সেই বসতিটা থেকে কতদূর পৌঁছেছি কে জানে? বললুম, "আসুন জগদীশবাবু! এবার কিন্তু রীতিমতো একটা অভিযান হবে। সম্রাট চাংকোর ল্যাবে যে বসতিতে লড়াই দেখেছেন, সেটা খুঁজে বের করা দরকার।"

ভোঁদা চিন্তিতমুখে বলল, "চারদিকেই তো মরুভূমি!"

"চলুন। দেখা যাক। একটা বালির পাহাড় কোথায় আছে, আগে সেটাই খুঁজতে হবে।"

কিছুদূর চলার পর ভোঁদা বলল, "এক কাজ করা যাক দাদা! এখানে বালির ঢিবি করে চিহ্ন দিয়ে রাখি। তারপর আপনি যান ওই দিকে, আমি যাই এই দিকে। এক ঘণ্টার মধ্যে খুঁজে না পেলে ফিরে আসব এখানে। কেমন?"

"মন্দ বলেননি! ঠিক আছে। আপনি বাঁ দিকে যান, আমি ডান দিকে। পরের বার আমি সামনে, আপনি পেছনে। তবু যদি খুঁজে না পাই আমরা, তা হলে আবার উড়ে অন্য একখানে গিয়ে নামব।"

ভোঁদার ওজন ভারী। তাই তার চলার গতি কম। কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ করে মনে হল, ভুল জায়গায় নেমেছি। সেই ঝাঁ-ঝাঁ বাজনাটা তো শোনা যাচ্ছে না।

চলেছি তো চলেছি। দেখতে দেখতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে গেল। বালির নিচু টিলা আছে অনেক। কিন্তু সেইরকম কোনো উঁচু টিলা দেখতে পাচ্ছি না। দূরে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে খুঁজছি, হঠাৎ সামনে একটা বালির ঢিবি নড়তে শুরু করল। তারপর বেরিয়ে পড়ল দুটো জ্বলজ্বলে নীল চোখ এবং তারপর একটা প্রকাণ্ড কাঁকড়া—অবিকল কুমড়োর গড়ন। কিটো গ্রহের সব প্রাণীই দেখছি একই গড়নের।

ভীষণ চেহারার বিশাল কাঁকড়াটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকল। পিছু হটতে থাকলুম। কেন যে বুদ্ধি করে হাতে কিছু নিইনি! সেই স্ক্রু-ড্রাইভার দুটো কুমড়ো-মানুষদের বসতিতে পড়ে আছে কোথাও। প্রাণীটা আমাকে আক্রমণ করতেই আসছে। মরিয়া হয়ে দু'হাতে দু'মুঠো বালি তুলে ওটার চোখে ছুঁড়ে মারলুম। তাতে কিচ্ছু হল না।

কুমড়ো-কাঁকড়াটা আমাকে খপ করে ধরে তুলে নিজের পিঠে বসিয়ে নিল এবং নড়বড় করে চলতে শুরু করল। হাতির পিঠে চলার মতো অবস্থা। তার ওপর কাঁকড়াটা নাচতে-নাচতে চলেছে। ফলে আমিও প্রায় নাচছি। একটু পরে মনে হল, প্রাণীটা হিংস্র নয়। কুমড়ো-মানুষদের মতোই আমুদে দেন। দুটো দাঁড়া দিয়ে আমার কোমর আঁকড়ে রেখেছে। তাই পড়ে যাচ্ছি না। কিন্তু নাচতে হচ্ছেই।

তারপর তার গতি বাড়ল। যেন দ্রুতগামী ট্রাক।

সামনে অনেক বালির ঢিবি দেখা যাচ্ছিল। সেগুলো নড়তে নড়তে বেরিয়ে পড়ল আরও একদঙ্গল কুমড়ো-কাঁকড়া। সবাই ঘিরে ধরল। তারপর চারদিক থেকে দাড়া বের করে আমাকে টানাটানি শুরু করল তারা। আমার বাহক কিছুতেই আমাকে হাতছাড়া করবে না। এদিকে টানাটানির চোটে আমি অস্থির। এবার একটু করে খোঁচাও লাগছে। পোশাক ফর্দাফাঁই হয়ে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত কী ঘটত বলা যায় না, হঠাৎ আকাশে শনশন শব্দ শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি, একটা ঈগল-মানুষ নেমে আসছে।

অমনি কুমড়ো-কাঁকড়াগুলো ঝটপট বালিতে গা-ঢাকা দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। এই সুযোগে আমি লাফ দিয়ে নীচে নামলুম। ঈগল-মানুষটা একটা কুমড়ো-কাঁকড়াকে ধরে টানাটানি করছিল। সে বেচারা গা-ঢাকা দেবার সুযোগ পায়নি।

দেখে মায়া হল। প্রাণীগুলো পৃথিবীর একজন মানুষ নিয়ে একটু আমোদ করতে চেয়েছিল শুধু। শয়তান ঈগল-মানুষটাকে কীভাবে শায়েস্তা করা যায়? পালোয়ান থাকলে দেখার মতো একটা লড়াই বাধত সন্দেহ নেই।

আবার দু'খাবলা হাতে বালি তুলে নিলুম। এটাই এখন আমার অস্ত্র। ঈগল-মানুষটার চোখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলুম।

এতে কাজ হল। কাঁকড়াগুলো বালির প্রাণী। ঈগল-মানুষটা তা নয়। কাজেই বিকট ক্র্যা-ক্র্যা চিৎকার করে ডানা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে উড়ে পালাল। নির্ঘাত অন্ধ হয়ে গেছে শয়তানটা!

সে পালিয়ে যাওয়ার পর কাঁকড়াগুলো বেরোল। এবার তারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ। চারদিক ঘিরে অদ্ভুত শব্দ করতে থাকল তারা। আঃ! ভাষা জিনিসটার মাহাত্ম্য আবার হাড়ে-হাড়ে বুঝলুম। একটু পরে ইশারায় ওদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলুম, আমার মতো প্রাণী দেখেছে কি না। যদি দেখে থাকে, আমাকে যেন সোজা পৌঁছে দেয়।

অনেক অঙ্গভঙ্গি করার পর সেই প্রকাণ্ড কুমড়ো-কাঁকড়াটা এগিয়ে এসে খপ করে আমাকে ধরে পিঠে বসিয়ে নিল। তারপর দ্রুত ছুটে চলল। এবার যত যাচ্ছি, বালির ভেতর ঝাঁ-ঝাঁ বাজনা

শোনা যাচ্ছে। তা হলে সঠিক দিকেই যাচ্ছি আমরা। কিছুক্ষণ পরে আনন্দে দেখলুম, সেই বালির লম্বাটে পাহাড়টা সামনে দেখা যাচ্ছে। এবার কাঁকড়া-ভদ্রলোক সাবধানে এগোচ্ছিলেন। বুঝলুম, কাঁকড়া হওয়ার বিপদ এখানে পৃথিবীর চেয়ে কম নয়। কাঁকড়া কার না প্রিয় খাদ্য? চাপা স্বরে ওঁর পিঠে হাত বুলিয়ে সাহস দিচ্ছিলুম।

পাহাড়ের মাথার কাছাকাছি আমাকে নামিয়ে দিয়ে তিনি জোরে ছুটে পালিয়ে গেলেন। হাত নেড়ে তাঁর উদ্দেশে বললুম, "বিদায় বন্ধু! আবার দেখা হবে। আপনাদের সঙ্গে দেখা না করে এই গ্রহ ছেড়ে যাব না।"

নীচে সেই কুমড়ো-মানুষদের বসতি। কিন্তু খাঁ-খাঁ নিঝুম কেন? সাবধানে নেমে গেলুম সবুজ উপত্যকায়। তারপর দেখলুম, তিনটে গোরিলা-মানুষের মড়া ঝরনার জলে পাথরে আটকে আছে। দারুণ যুদ্ধ হয়ে গেছে তা হলে! আরও খানিকটা এগিয়ে দেখি, টিবিঘরের ভেতর থেকে প্যাটপ্যাট করে অনেকগুলো কুমড়ো-মানুষ আমাকে উঁকি মেরে দেখছে। হাত নাড়তে-নাড়তে এগিয়ে গেলুম। কিন্তু তারা দরজা বন্ধ করে দিল।

মনমরা হয়ে ঝরনার ধারে গেলুম। এবার কয়েকটা কুমড়ো-মানুষের থ্যাঁতলানো মড়া দেখে শিউরে উঠলুম। তা হলে আমার সঙ্গীদের ওরা বন্দী করে নিয়ে যেতে পেরেছে! স্পেসশিপের কাছে পৌঁছনো দরকার। আবার সম্রাট চাংকোর পুরীতে ফিরে যেতে হবে সেই আজব বলের গ্রহে। ওঁদের উদ্ধার করতেই হবে।

আনমনে বালির পাহাড়টার দিকে চলেছি, হঠাৎ কী এক গন্ধ ভেসে এল। গন্ধটা খুব চেনা। নাক উঁচু করে শুঁকতে শুঁকতে টের পেলুম, চুরুটের গন্ধ। কিটো গ্রহের কুমড়ো-মানুষেরা কি চুরুট খায়? তা ছাড়া চুরুট তো নেহাত পৃথিবীর জিনিস!

এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে খুঁজতে থাকলুম, কে চুরুট খাচ্ছে। তারপর ডান দিকে ঝরনাধারার বাঁকে একটা ঝোপের মাথায় চকমকে কিছু দেখা গেল। জিনিসটা নড়ছে।

তারপর চিনতে পারলুম, ওটা একটা টাক এবং পার্থিব মাথারই টাক। অমনি চেঁচিয়ে উঠলুম, "কর্নেল! কর্নেল!"

বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ ঘুরে দাঁড়ালেন। মুখটা গম্ভীর। দৌড়ে কাছে গিয়ে বললুম, "আপনাকে সম্রাট চাংকোর গোরিলা-বাহিনী ধরে নিয়ে যায়নি?"

"তা হলে খুশি হতে?" কর্নেল একটু হাসলেন, "খুশি অবশ্য আমিও হতুম। কিন্তু কে জানে কেন, ওরা আমার চাইতে আমার টুপিটাকেই বন্দী করতে ব্যস্ত হল। যাকগে, প্রচুর পাখি দেখা হল ততক্ষণ। প্রজাপতি দেখলুম না, শুধু পাখি। আশ্চর্য ডার্লিং, সব পাখিই কুমড়ো-মানুষগুলোর মতো দেখতে। পা নেই, ঠোঁট নেই। তবে শুধু দুটো ডানা আছে।"

"এখানে দেখলুম এতবড় একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে। আপনি তখন কী করছিলেন?"

কর্নেল শ্বাস ছেড়ে বললেন, "সে বড় অদ্ভুত যুদ্ধ, জয়ন্ত! আমার মতো একজন প্রাক্তন যোদ্ধা অমন বিচ্ছিরি যুদ্ধ কখনও দেখেনি। বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ বড্ড আদিম ধরনের ব্যাপার। আঁচড়ানো, কামড়ানো, কাতুকুতু...ছ্যা-ছ্যা!" বলে পোড়া চুরুটটা ঝরনার জলে ফেলে দিলেন, "তোমার খবর বলো!"

আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিলুম। শোনার পর কর্নেল বললেন, "চাংকোর কথা চন্দ্রকান্তবাবু বলছিলেন। তিনিও নাকি এক বিজ্ঞানী। তবে পৃথিবীতে ওঁর নামে হুলিয়া বের করেছে পুলিশ। ফিরলেই অ্যারেস্ট হয়ে জেল খাটতে হবে। তাই গ্রহান্তরে পালিয়ে এসেছেন।"

ব্যস্ত হয়ে বললুম, "চলুন! স্পেসশিপের সাহায্যে চন্দ্রকান্তবাবুদের উদ্ধার করতে হবে।"

প্রকৃতিবিদ যেন অনিচ্ছা-অনিচ্ছা করে পা বাড়িয়ে বললেন, "কিটো গ্রহ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। কী সুন্দর সব বৃক্ষলতা, কত আশ্চর্য রং-বেরঙের আজব পাখি! শুধু ষষ্ঠীর কথা ভেবেই মন কেমন করছে। চলো!"

হাঁটতে-হাঁটতে বললুম, "আশ্চর্য মানুষ আপনি! আজব বলের রহস্য ফাঁস করতে অভিযানে বেরোলেন, আর সেসব ছেড়ে এখন কিটো মুল্লুকের প্রকৃতির জন্য হা-হুতাশ করছেন!"

"না, মানে, এখানকার লোকগুলো বড় সজ্জন।" কর্নেল গম্ভীর মুখে মন্তব্য করলেন।

বালির পাহাড়টা ডিঙিয়ে কিছু দূর গেছি, সেই কাঁকড়া-ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মনে হল, উনি আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। হাত নাড়তেই এগিয়ে এসে আমাকে পিঠে চাপালেন। কর্নেলের সাদা দাড়ি একবার ছুঁয়ে শি-শি শব্দ করলেন। বোধ হয়, শি-শি মানে খি-খি হাসি!

দু'জনকে পিঠে বয়ে তরতর করে দৌড়লেন দৌড়বীর। স্পেসশিপের কাছে পৌঁছে দেখি, ভেতরে ভবেশবাবু ঘুমোচ্ছেন। ওঁর ভাগনের পাত্তা নেই। কাঁকড়া-ভদ্রলোক চলে গেলেন। বললেন, "ভবেশবাবুকে জাগিও না। ঘুমনো মানুষকে জাগাতে নেই। তা ছাড়া জেগে উঠলেই নিরুদ্দিষ্ট ভাগনের জন্য হইচই বাধাবেন। চলো, আমরা সম্রাট চাংকোর গ্রহে পাড়ি জমাই। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করা দরকার।"

"কিন্তু জগদীশবাবু কোনো বিপদে পড়েননি তো?" চিন্তিত হয়ে বললুম, "বালির ঢিবির কাছে ওঁর অপেক্ষা করার কথা। দেখলুম না তো!"

কর্নেল বাইনোকুলারে চারদিক দেখতে দেখতে বললেন, "বোধ হয় পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভোঁদা-পালোয়ান। তবে ভয় নেই, ডার্লিং! কিটো গ্রহ খুব নিরাপদ জায়গা।"

স্পেসশিপে ঢুকে স্টার্ট দিলুম। ঝাঁকুনির চোটে ঘুম ভেঙে গেল ভবেশবাবুর। রাঙা চোখে তাকিয়ে বললেন, "ইয়ার্কি হচ্ছে ভোঁদা? আমার ঘুম ভাঙিয়েছিস—তোকে এক পয়সার প্রপার্টি দেব না আর।"

কর্নেল পেছনে ঘুরে বললেন, "ভবেশবাবু! আমার মনে হচ্ছে, আপনার ঘুমটা এখনও ভাঙেনি।"

"অ্যাঁ!" বলে ভবেশবাবু চোখ কচলাতে থাকলেন। তারপর চারপাশ দেখে নিয়ে ফিক করে হাসলেন, "অ। তা হতচ্ছাড়া ভোঁদাটা কোথায়? কারও সঙ্গে কুস্তি লড়ছে নাকি?"

"তা বলা যায় না।" কর্নেল বললেন, "তবে ভাববেন না। ওকে কেউ এঁটে উঠতে পারবে না।"

"কিন্তু আমরা যাচ্ছিটা কোথায় বলুন তো?"

"সেই আজব বলের দেশে।"

ভবেশবাবু খুশি হলেন, "সম্রাট চাংকো লোকটা বাজে। ওর পাল্লায় পড়া ঠিক হবে না। তবে আমি স্যার এবার অন্তত একডজন বল কুড়োব। নিয়ে গিয়ে বেচতে পারলে প্রচুর লাভ হবে। সম্রাট চাংকোর কাছে শুনেছি, একটা বল থেকে পুরো একটা জাহাজের খোল বানানো যায়। শুধু একটাই সমস্যা, বলগুলোর ভেতর ভূতের বাস। তাই অমন সুড়ুত করে পালিয়ে যায়। ভূতের রোজা ডেকে ভূতটাকে তাড়াব। চাংকোবাবুর দেশে গিয়েই থাকবে ওরা।"

বললুম, "ভবেশবাবু! চাংকোবাবু বলবেন না। বললেই বিপদে পড়বেন।"

ভবেশবাবু গম্ভীর হলেন, "না, না। এখানে আপনাদের সামনে বলছি। ওঁর রাজ্যে গিয়ে বলব না।"

স্পেসশিপটা বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত এমনভাবে তৈরি করেছেন, আমার মতো আনাড়িরও চালাতে আর অসুবিধে হচ্ছিল না। সব নির্দেশ দেওয়া আছে। ক্রমশ সেগুলো বুঝতে পেরে গেছি। কর্নেল

আমার তারিফ করছিলেন বারবার। গোরিলা-মানুষদের দেশ, অর্থাৎ সম্রাট চাংকোর গ্রহে পৌঁছনোর জন্য বুদ্ধি খাটিয়ে টাইপরাইটারে যে ইংরেজি হরফগুলো টিপলুম, তার মানে দাঁড়ায়, 'যেখান থেকে কিছুক্ষণ আগে এসেছি, সেইখানে যেতে হবে।'

ভিশনস্ক্রিনে ফুটে উঠল, 'ওক্কে।'

সেই নীলাভ রোদের গ্রহে স্পেসশিপ নামল। প্রথমে দরজা খুলে আমি হেঁটমুণ্ডে নেমে একটা বল কুড়িয়ে পকেটে ভরে দুই ঠ্যাঙে সোজা হলুম। তারপর দুটো বল কুড়িয়ে কর্নেল এবং ভবেশবাবুকে দিলুম। ওঁরা বল পকেটস্থ করে নেমে এলেন। সমতল উপত্যকাতেই নেমেছি, যেখানে আগের বার নেমেছিলুম। এমন অদ্ভুত আলোয় বেশি দূর দৃষ্টি চলে না। সম্রাট চাংকোর পুরী কুয়াশার মতো আবছায়ায় লুকিয়ে আছে কোথায়।

কর্নেল বাইনোকুলার চোখে তুলে বললেন, "সামনে সোজা এগিয়ে গেলে সম্রাট চাংকোর বাড়ি। চত্বরে কী একটা হচ্ছে। রেস নাকি? গজকুমার সিংহের কীর্তি! গোরিলা-মানুষদের রেসে নামিয়েছেন। কিটো গ্রহেও কুমড়ো-মানুষদের নিয়ে রেস লড়িয়েছিলেন।"

বললুম, "এবার কিন্তু আমি লুকিয়ে যাব, কর্নেল! সম্রাটবাহাদুর আমার ওপর রেগে আছেন। আপনি আগে চলে যান বরং। আপনাকে পেলে খুশিই হবেন উনি।"

কর্নেল হনহন করে হেঁটে উধাও হয়ে গেলেন। ভবেশবাবু ব্যস্তভাবে বল কুড়িয়ে পকেট বোঝাই করতে থাকলেন। বললুম, "নিয়ে যাবেন কেমন করে? স্পেসশিপে নেওয়া যাবে না যে!"

ভবেশবাবু বললেন, "দেখা যাক, কী হয়। তবে মশাই, আমি ওখানে যাচ্ছি না। বল কুড়নো শেষ। এবার আমি গাড়ির ভেতর গিয়ে ঘুমোব। কী খাওয়াল অমৃত বলে, খালি ঘুম পাচ্ছে।"

তিনি স্পেসশিপে ঢুকে পড়লেন। আমি সাবধানে চলতে থাকলুম। কিছু দূর চলার পর সেই নদীটা দেখতে পেলুম। নদীর বাঁকের কাছে আবছায়ার ভেতর সম্রাট চাংকোর বাড়ি দেখা গেল। একটা চাপা হট্টগোলও কানে এল। কী করা উচিত ভাবছি, সেই-সময় মাথার ওপর শনশন শব্দ। তাকিয়ে আঁতকে উঠলুম। একটা ঈগল-মানুষ নেমে আসছে আমার দিকে।

একলাফে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লুম। তারপর দেখলুম, ঈগল-মানুষটার পিঠে কেউ বসে আছে এবং তার মাথার ঝুঁটি ধরে মোচড় দিচ্ছে। ঈগল-মানুষটা ক্র্যাঁ-ক্র্যাঁ বিকট চেঁচিয়ে শনশন শব্দে নীচে নামল। তারপর তার পিঠ থেকে নামল ভোঁদা-পালোয়ান।

নেমেই সে ঈগল-মানুষটার সঙ্গে যেন কানামাছি খেলতে শুরু করল। ঈগল-মানুষটা ঠোঁট হাঁ করে যেদিকে ঘুরছে, পালোয়ান একলাফে তার উলটো দিকে চলে যাচ্ছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, "জগদীশবাবু! জগদীশবাবু!"

পালোয়ান আমাকে দেখেই খ্যা-খ্যা করে হেসে বলল, "পাখিটা কানা দাদা! তাই ওর পিঠে চাপতে অসুবিধে হয়নি।" বলে সে লেজটা ধরে ফেলল এবং পালোয়ানের কাণ্ড, বাঁই-বাঁই করে চক্কর খাইয়ে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলল। ঝপাস শব্দে ঈগল-মানুষটা জলে পড়ে স্রোতের বেগে ভেসে গেল। ডানা ভিজে গেলে আর ওড়ার ক্ষমতা নেই। তা হলে কিটো গ্রহে এই ঈগল-মানুষটাকেই অন্ধ করে দিয়েছিলুম!

ভোঁদা-পালোয়ান খুব হেসে বলল, "খুব জব্দ। তা দাদা, মামাবাবুর খবর কী?"

"স্পেসশিপের ভেতর ঘুমোচ্ছেন।"

ভোঁদা বলল, "ঘুমোক। লোহালক্কড়ের ভেতর বসে মামাবাবুর ঘুমনো অভ্যেস। আর এ তো গাড়ির ভেতর নরম গদি!"

ছয়

আমার কাছে সব শোনার পর ভোঁদা-পালোয়ান তার হাফপ্যান্টের দুই পকেটে অনেকগুলো বল কুড়িয়ে ভরল। তারপর বলল, "এগুলো কেন নিলুম জানেন? গোরিলা-মানুষদের সঙ্গে দরকার হলে ফাইট দেব। আপনিও নিন দাদা। ধরতে এলেই ঠাঁই করে ছুঁড়বেন। ঠ্যাঙে ছুঁড়বেন, নয় তো নাকে। মানুষের বডির ঠ্যাঙ আর নাক, খুব ভাইটাল জায়গা।"

বুদ্ধিটা মনে ধরল। আমিও অনেক বল কুড়িয়ে পকেট বোঝাই করলুম। তারপর দু'জনে সম্রাট চাংকোর পুরীর দিকে সাবধানে এগিয়ে গেলুম।

বড়-বড় পাথরের আড়াল দিয়ে গেটের কাছে পৌঁছলুম আমরা। দু'জন প্রহরী গোরিলা-মানুষ পা ছড়িয়ে দু'ধারে বসে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তা হলে সম্রাট চাংকোর গ্রহে এটা নিশ্চয় রাত্রিবেলা। তাই আলো এত কম! ভোঁদা ফিসফিস করে বলল, "টিকিতে বাঁধা বল খুলে নিলেই এরা জব্দ। আকাশে ভেসে বেড়াবে। আপনি বাঁ দিকের সেন্ট্রির, আমি ডান দিকের সেন্ট্রির বল খুলে নেব। কাম অন, দাদা!"

দু'জন গুড়ি মেরে এগিয়ে কাছে গিয়ে দুই প্রহরীর টিকি থেকে বল খুলে ফেললুম। অমনি তারা আকাশে উঠে গেল। কিন্তু কী ঘুম রে বাবা! আকাশে ভেসেও নাক ডাকাতে থাকল। ভেতরে বিশাল প্রাঙ্গণে ভিড়। গোরিলা-মানুষেরা চক্কর দিয়ে দৌড়চ্ছে। গজকুমার সিং একটা মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন। তাঁর পেছনে সিংহাসনে সম্রাট চাংকো বসে আছেন। একপাশে বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তকে হাসিমুখে বসে থাকতে দেখলুম। কিন্তু গোয়েন্দা-হালদারমশাই কোথায়?

পাছে কারও চোখে পড়ি, আমরা বাঁ দিকের একটা ঘরে ঢুকে পড়লুম। সেই হলঘর। জনপ্রাণীটি নেই। হঠাৎ মাথার ওপর থেকে চিঁচিঁ করে কেউ বলল, "গেছি! এক্কেরে গেছি! ও জয়ন্তবাবু! আমারে লামান!"

মুখ তুলেই হালদারমশাইকে দেখতে পেলুম। সিলিং-এ টিকটিকির মতো সেঁটে আছেন। বুঝলুম সম্রাট চাংকো শাস্তি দিয়েছেন। চাপা গলায় বললুম, "বল কেড়ে নিয়েছে তো? ঠিক আছে। একটা বল ছুঁড়ে দিচ্ছি। ক্যাচ ধরুন।"

বারবার বল ছুড়ি, কিন্তু হালদারমশাই ধরতে পারেন না। ভোঁদা বিরক্ত হয়ে বলল, "আপনি কখনও ক্রিকেট খেলেননি। কী আপনি? আজকাল ক্রিকেট খেলে না, এমন কেউ আছে?"

হালদারমশাই করুণ মুখে বললেন, "ক্রিকেটবল দেখলেই ভয় করত যে! মনে হত, চোখে এসে পড়বে। জয়ন্তবাবু! ট্রাই এগেন।"

পাঁচবারের বার বলটা খপ করে ধরে ফেললেন গোয়েন্দাপ্রবর। তারপর ধপাস করে মেঝেয় নামলেন। বললুম, "বলটা পকেটে ঢোকান আগে।"

"হঃ!" বল পকেটে ঢুকিয়ে হালদারমশাই বললেন, "খবর কন শুনি।"

"খবর পরে হবে। কর্নেলকে দেখেছেন?"

"হঁউ! কর্নেল-স্যার আমাকে দেখেও দেখলেন না। ওই ঘরে ঢুকে গেলেন।"

তিনজনে সেই ঘরে ঢুকে গিয়ে দেখি, কর্নেল একটা ইজিচেয়ারে বসে আছেন। মুখে চুরুট, চোখ বন্ধ এবং নাক ডাকছে। ডাকলুম, "কর্নেল! কর্নেল!"

কর্নেল চোখ না খুলেই বললেন, "শুয়ে পড়ো ডার্লিং! অনেক রাত হয়েছে।"

হালদারমশাই বিরক্ত হয়ে বললেন, "এ কি ঘুমনোর সময় কর্নেল-স্যার?"

"চাংকোবাহাদুরের বেডরুম এটা। শুয়ে পড়ুন।" আবার কর্নেলের নাক-ডাকা শুরু হল।

সম্রাট চাংকোর রাজকীয় বিছানার দিকে তাকিয়ে হালদারমশাই বললেন, "হঃ!" তারপর হঠাৎ বিকট হাই তুলে সেদিকে এগিয়ে গেলেন এবং শুয়ে পড়লেন।

ভোঁদাই হাই তুলে বলল, "দাদা! বিচ্ছিরি ঘুম পাচ্ছে কেন বলুন তো? আমি শুই?"

বলে সে মেঝেতেই চিতপাত হল। তারপর টের পেলুম আমারও ঘুম পাচ্ছে। সম্রাট চাংকোর বেডরুমে কি ঘুমের ওষুধ ছড়ানো আছে?

একটা গদিআঁটা আসনে বসে হেলান দিলুম। তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি। কী একটা চ্যাঁচ্যামেচিতে সেই ঘুম যখন ভাঙল, তখন বুঝলুম আমাকে একটা গোরিলা-মানুষ কাতুকুতু দিচ্ছে। এক লাফে উঠে দাঁড়ালুম। গোরিলা-মানুষটা ক্ষান্ত হল সঙ্গে-সঙ্গে। সম্রাট চাংকো রাগে ফুঁসছেন। দাঁত কিড়মিড় করছেন। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত ফিক-ফিক করে হাসছেন কেন জানি না। ভোঁদা-পালোয়ান মেঝেয় বসে আছে। দুটো গোরিলা-মানুষ তাকে কাতুকুতু দিচ্ছে। কিন্তু তার পেশী ফুলে ঢোল। সুবিধে করতে পারছে না ওরা। যত কাতুকুতু দিচ্ছে, পালোয়ান তত পেশী ফোলাচ্ছে।

আর হালদারমশাইকে কাতুকুতু দিচ্ছে অন্তত একডজন গোরিলা-মানুষ। কিন্তু ওঁর ঘুম ভাঙছে না। তাই সম্রাট চাংকো হাত দুটো ছুঁড়ে খুব চ্যাঁচামেচি করছেন।

ঘরে কর্নেলকে দেখতে পেলুম না। গজকুমার সিংয়ের জন্য একটা চমৎকার বিছানা পাতা হয়েছে। তিনি ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু ওঁর ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করছে না কেউ। সম্রাট চাংকোর বন্ধুর নাতি। তাই কি এই খাতির?

সম্রাট চাংকো গর্জন করলেন, "ক্র্যাম্বো হ্র্যাম্বো ল্যাম্বো!"

গোরিলা-মানুষেরা হালদারমশাইকে এবার চ্যাংদোলা করে তুলল। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তকে ফিসফিস করে বললুম, "সর্বনাশ! একটা কিছু করা উচিত আমাদের।"

বিজ্ঞানী চোখের ইশারায় আমাকে চুপ করতে বললেন। সম্রাট চাংকো তাঁর বিছানা ঝেড়ে সাফ করে শুয়ে পড়লেন। তারপর জড়ানো গলায় বললেন, "ভ্রাম্বো লাম্বো নাম্বো।"

গোরিলা-মানুষেরা সঙ্গে-সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সম্রাট চাংকো নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে থাকলেন। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত বললেন, "এই চান্সের অপেক্ষায় ছিলুম। চলে আসুন, জয়ন্তবাবু! চাংকোর ল্যাবে যাই।"

ভোঁদা আমাদের সঙ্গ নিয়ে বলল, "ওই দাদা যে পড়ে রইলেন?"

চন্দ্রকান্ত ফিক করে হেসে বললেন, "আমাদের পৃথিবীর ভাষায় উনি মড়া—স্রেফ ডেড বডি।"

চমকে উঠে বললুম, "সর্বনাশ! তা হলে গজকুমার সিং নাম বলেছিলেন, সেটাই সত্যি!"

সেই ল্যাবে পৌঁছে চন্দ্রকান্ত জবাব দিলেন, "উনি একজন যথার্থ মৃত মানুষ। কাজেই ওঁকে নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই।"

অবাক হয়ে বললুম, "কী আশ্চর্য! আপনার নিশ্চয় কোনো ভুল হচ্ছে।"

"নাহ।" বলে চন্দ্রকান্ত ডাকলেন, "কর্নেল! আপনি কোথায়?"

কর্নেলের সাড়া এল যেন আমাদের পায়ের তলা থেকে, "চলে আসুন! পেয়ে গেছি।"

চন্দ্রকান্ত খুঁজছিলেন। মেঝের দিকে দৃষ্টি। একখানে একটা চৌকো গর্ত দেখতে পেয়ে বললেন, "এই যে!" সেই গর্তের ভেতর সিঁড়ি নেমে গেছে, নীল আলো জ্বলছে। আমরা তিনজনে নীচে নেমে গিয়ে দেখি, এ-ও আর-এক ল্যাব। সেখানে শ্রীমান ধুন্ধু চিত হয়ে শুয়ে আছে। বিজ্ঞানী তার কানে মোচড় দিয়ে ওঠালেন।

কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার চোখে পড়ল। সারবন্দী কাচের কফিনের ভেতর কী আর কে ভেসে আছে একটা করে মৃত মানুষ। কর্নেল বললেন, "চন্দ্রকান্তবাবু! চাংকোর কীর্তি দেখুন!"

চন্দ্রকান্ত সপ্রশংস ভঙ্গিতে বললেন, "জেনেটিক্সে চাংকোর মাথা বরাবরই ভালো খেলত। অপূর্ব! পৃথিবীর সব বেওয়ারিশ লাশ এক্সরে-ল্যাসোর সাহায্যে তুলে নিয়ে এসে প্রাণ দিচ্ছে। কিন্তু স্টেজগুলো লক্ষ করছেন কি?"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ। প্রাণ দিয়ে চাংকো তাকে পৃথিবীর প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষে পরিণত করছেন। আমরা যেসব গোরিলা-মানুষ দেখলুম, তারা ক্রোম্যাগনন প্রজাতির। বিবর্তনতত্ত্বকে নিয়ে চাংকো খেলা করছেন। অসাধারণ প্রতিভাধর বিজ্ঞানী!"

"গজকুমারবাবুকেও গোরিলা-মানুষ করবে চাংকো।" বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত দুঃখিতমুখে বললেন, "আমার বড্ড খারাপ লাগছে ভাবতে।"

কর্নেল হাসলেন, "খারাপ লাগলেও কী আর করা যাবে, বলুন! পৃথিবীর নিয়ম হল, সেখানে যে মরে যাবে, সে চিরমৃত। এই গ্রহে সে জীবিত হচ্ছে, এটা মন্দ না। আহা, প্রাণ জিনিসটা বড় সুন্দর। তা একেবারে হারিয়ে যাওয়ার চাইতে এ তো ভালোই!"

বিজ্ঞানী দাড়ি চুলকে বললেন, "এ আমার সাবজেক্ট নয়। আমি অ্যাস্ট্রো-ফিজিসিস্ট। কাজেই বায়োলজি, ফিজিওলজি বা জেনেটিক্সে আমার মাথাব্যথা নেই। চলুন, ফেরা যাক। ধুন্ধু, ট্রাও ট্রাও!"

ভোঁদা বলে উঠল, "ডিটেকটিভ ভদ্রলোককে মেরে গোরিলা-মানুষ করবে না তো? ওঁকে কোথায় নিয়ে গেল, দেখা উচিত স্যার।"

চন্দ্রকান্ত নড়ে উঠলেন, "তাই তো! কর্নেল শিগগির চলুন! ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের কথা একবারে ভুলে গেছি। ধুন্ধু! বড্ড শব্দ করছ! ট্রুও ট্রুও ট্রুও।"

কিছুক্ষণ পরে আমরা চত্বরে বেরিয়ে দেখি, হালদারমশাইকে গোরিলা-মানুষেরা একটা পাথরের স্তম্ভে বেঁধেছে এবং বড়-বড় পাথরের চাঁই ছুঁড়ছে। আঁতকে উঠেছিলুম। কিন্তু পাথরগুলো হালদারমশাইয়ের গায়ে লেগে ঝুরঝুর করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। হুঁ, মাধ্যাকর্ষণ কম। তাই এখানকার পদার্থের ওজন কম। শুধু এই বলগুলো ছাড়া। যদি গোরিলা-মানুষেরা বল ছুঁড়ে মারে? চন্দ্রকান্তকে ফিসফিস করে কথাটা বলতেই উনি ধুন্ধুকে লেলিয়ে দিলেন। কিন্তু তাকে ওরা গ্রাহ্য করল না। কর্নেল ডাকলেন, "হালদারমশাই! হালদারমশাই!"

কোনো সাড়া নেই। আপাদমস্তক বাঁধা অবস্থায় উনি বেঘোরে ঘুমোচ্ছেন। আসলে পাথর ছুড়ে-ছুড়ে গোরিলা-মানুষগুলো নেতিয়ে পড়েছে ক্রমশ। বুঝলুম, এরা ক্রোম্যাগনন প্রজাতির মানুষ। তাই পাথর ছাড়া অন্য অস্ত্রের কথা জানে না। জানলে এতক্ষণ হালদারমশাই বেঘোরে মারা পড়তেন। ওদিকে ধুন্ধু এবার বেদম থাপ্পড় চালাতে শুরু করেছে। কর্নেল হঠাৎ বলে উঠলেন, "নস্যি, হালদারমশাই! নস্যি!"

অমনি উনি চোখ খুললেন। বললেন, "কী! কী! ওঃ! অনেকক্ষণ নস্যি লই নাই। নাকটা কেমন করতাছে!" তারপর টের পেলেন সব। খাপ্পা হয়ে চ্যাঁচালেন, "আমারে বাঁধল কেডা? এই ভূতগুলি? তবে রে!"

কর্নেল এগিয়ে গিয়ে বাঁধন খুলে দিলেন। গোরিলা-মানুষেরা বাধা দিল না। আসলে তারা ধুন্ধুর থাপ্পড় খেয়ে বড্ড ক্লান্ত। কর্নেল তাদের দিকে ঘুরে বললেন, "ভ্রাম্বো! থাম্বো! নাম্বো!"

অমনি তারা চলে গেল। বোধ হয়, ঘুমোতেই গেল। বললুম, "আপনি ওদের ভাষা বোঝেন, কর্নেল?"

কর্নেল বললেন, "কানে শুনে-শুনে একটুখানি শিখে নিয়েছি।"

হালদারমশাই শ্বাস ছেড়ে বললেন, "কই নস্যি?"

কর্নেল পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করে দিয়ে বললেন, "কুমড়ো-মানুষদের ঘরে ফেলে এসেছিলেন। দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে রেখেছিলুম।"

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের এতক্ষণে স্পেসশিপের কথা মনে পড়ল। বললেন, "কিন্তু আমার স্পেসশিপ? পৃথিবীতে ফিরব কী করে আমরা?" তিনি দাড়ি চুলকোতে থাকলেন উদ্বিগ্নমুখে।

বললুম, "স্পেসশিপ ইনট্যাক্ট আছে। চলুন, সেখানে নিয়ে যাই।"

স্পেসশিপের কাছে গিয়ে আর-এক দৃশ্য দেখে ভড়কে গেলুম। ভবেশবাবুর সঙ্গে একদঙ্গল গোরিলা-মানুষের লড়াই বেধেছে। ওরা ওঁকে পাথর ছুড়ে মারছে। পালটা উনি ছুড়ছেন সেই আজব বল। বলের ধাক্কায় ওরা কুপোকাত হচ্ছে। চন্দ্রকান্ত বললেন, "কী বিপদ! এবার ওরা যদি বল ছোঁড়ে?"

ভোঁদা বলল, "তবে রে!" তারপর দৌঁড়ে গেল। সে গোরিলা-মানুষদের টিকি থেকে বল খুলে নিতে শুরু করল। ফলে ওরা আকাশে ভেসে হাত-পা ছোড়াছুড়ি শুরু করল।

ভবেশবাবু আমাদের দেখে বললেন, "বনমানুষগুলোর বড্ড বাজে স্বভাব। বেশ ঘুমোচ্ছি। হঠাৎ দরজা খুলে কাতুকুতু দিতে শুরু করেছে। তবে আশ্চর্য ব্যাপার, অত বড়-বড় পাথর আমার গায়ে পড়ে ছাতু হয়ে গেল কেন বলুন তো? আমি তো ভোঁদার মতো পালোয়ান নই!"

কর্নেল বললেন, "পরে বুঝিয়ে বলব। ঢুকুন ভবেশবাবু! পৃথিবীতে ফেরা যাক। আমার চুরুটের স্টক শেষ।"

ভোঁদা বলল, "গোরিলা-মানুষগুলোর জন্য দুঃখ হচ্ছে, বল কেড়ে নিলুম বটে! ওরা নামবে কী করে? এক মিনিট। বলগুলো ওদের দিকে ছুঁড়ে দিই। তারপর ভোঁ-কাট্টা করব।" সে বলগুলোকে কুড়িয়ে ছুড়তে শুরু করল। গোরিলা-মানুষেরা লুফে নিল এবং নামল। কিন্তু আর আক্রমণ করতে এল না। দল বেঁধে করুণ মুখে তাকিয়ে রইল। ধুন্ধু থাপ্পড় তুলে কী জানি কেন হাত নামাল। মানুষের সঙ্গগুণে তার মানুষ-ভাব এসেছে।

আমরা স্পেসশিপে ঢোকার পর হালদারমশাই বললেন, "আরে কী কাণ্ড! আরও সব গোরিলা-মানুষ আসছে অ্যাটাক করতে। কুইক সায়েন্টিস্টমশাই!"

জানলা দিয়ে দেখি, উপত্যকা জুড়ে হাজার-হাজার গোরিলা-মানুষ আসছে। কিন্তু মারমুখী বলে মনে হচ্ছে না। নীলাভ আলোয় প্রতিটি মুখে বিষণ্ণতার স্পষ্ট ছাপ। ওরা হাত নেড়ে আমাদের কি বিদায় জানাচ্ছে? একদা ওরা আমাদের পৃথিবীরই মানুষ ছিল। সেই স্মৃতি কি ওদের অবচেতনা থেকে জেগে উঠেছে? মনটা খারাপ হয়ে গেল। পৃথিবীতে ওরা মৃত। এখানে ওরা জীবিত।

আমাদের মহাকাশযানের চারদিক ঘিরে গোরিলা-মানুষেরা হাত নাড়ছিল। আমরাও ভেতর থেকে হাত নাড়লুম। সম্রাট চাংকো এখন তাঁর ঘুমঘরে ঘুমোচ্ছেন। তিনি জানতে পারছেন না, তাঁর প্রজারা কী করছে এখন। নীল আশ্চর্য সুন্দর আলোয় হাজার-হাজার বিষণ্ণ আদিম মুখ।

আমরা পাঁচজন মানুষ আকাশে ভেসে যেতে-যেতে নীচে তাদের শেষবারের মতো দেখে নিলুম।

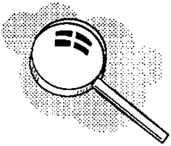

পোড়ো খনির প্রেতিনী

চিৎপুরে প্রচণ্ড ট্রাফিকজটে আমার গাড়ি আটকে গিয়েছিল। কেন যে ... শর্টকাট করার জন্য এই ঘিঞ্জি রাস্তায় ঢোকার দুর্বুদ্ধি হল, তাই ভেবে নিজের ওপর খাপ্পা হয়ে উঠছিলুম ক্রমশ। হঠাৎ চোখে পড়ল, ডানদিকের একটা দোকান থেকে লম্বাচওড়া এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখে আমার অতিপরিচিত ঋষিসুলভ সাদা দাড়ি। তিনি পা বাড়াতেই ফুটপাথের একটা ব্যস্তবাগীশ লোকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাথার ছাইরঙা টুপিটা পড়ে গেল। টুপি কুড়োবার সময় তাঁর বিখ্যাত টাকও দেখতে পেলুম। আমি চেঁচিয়ে ডাকলুম,—কর্নেল!

আমার বৃদ্ধ বন্ধু শুনতেই পেলেন না। ভিড়ের ভেতর মিশে গেলেন। এবার সেই দোকানের সাইনবোর্ডে চোখ পড়তেই চমক লাগল।

টি এন গুপ্ত অ্যান্ড কোং
সুলভে যাত্রা-থিয়েটারের পোশাক
ভাড়া পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

উত্তর কলকাতার এক প্রাচীন মন্দির থেকে কয়েক লক্ষ টাকার সোনাদানা চুরির খবর আনতে গিয়েছিলুম। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার জন্য। বেলা পড়ে এসেছিল। তাই খুব তাড়া ছিল। পত্রিকার অফিসে ফিরে খবরটা লেখার পর ফোন করলুম কর্নেলকে। ভেবেছিলুম, এতক্ষণে নিশ্চয় বাড়ি ফিরেছেন।

ওঁর ভৃত্য ষষ্ঠীচরণ ফোন ধরেছিল। বলল,—বাবামশাই সেই কখন বেইরেছেন, এখনও ফেরেননি দাদাবাবু। বলে গেছেন, ফিরতে অনেকটা রাত্তির হবে।

মনে একটা চাপা উত্তেজনা রয়ে গেল। বাড়ি ফিরে রাত দশটা নাগাদ আবার ফোন করতেই যথারীতি ষষ্ঠীচরণের সাড়া পেলুম। সে খিকখিক করে হেসে বলল,—কাগুজে দাদাবাবু নাকি? ইদিকে এক কাণ্ড!

কী কাণ্ড, ষষ্ঠী! কর্নেল ফেরেননি!

ফিরেছেন আজ্ঞে। কিন্তু বললুম না—ইদিকে এক কাণ্ড হয়েছে!

কী মুশকিল! কাণ্ডটা কী?

আজ্ঞে, কাটামুণ্ডু।

কাটামুণ্ডু! তার মানে? কার কাটামুণ্ডু?

আবার কার? বাবামশাইয়ের। খি খি খি ...।

ভড়কে গেলুম। কর্নেলের কাটামুণ্ডু মানেটা কী? আর ষষ্ঠী এমন হাসছে কেন? শিউরে উঠলাম। কর্নেলের কাটামুণ্ডু ... ষষ্ঠীর অমন পাগলাটে হাসি!

সর্বনাশ! তাহলে কি কর্নেলকে কেউ খুন করে গেছে আর তাই দেখে ষষ্ঠী পাগল হয়ে গেছে?

তক্ষুনি ফোন রেখে ঝটপট বেরিয়ে পড়লুম। রাস্তায় গিয়ে মনে হল, থানায় খবর দেওয়া উচিত হবে কি না। কিন্তু কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের মতো ধুরন্ধর এবং শক্তিমান মানুষ খুন হবেন, কিংবা গলায় নির্বিবাদে কাউকে কোপ বসাতে দেবেন, ভাবাই যায় না। আগে ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখা দরকার।

কিন্তু ইলিয়ট রোডে কর্নেলের বাড়ির সামনে কোনো ভিড় নেই। রাস্তা সুনসান খাঁ-খাঁ। হন্তদন্ত তেতালায় উঠে কলিং বেলের স্যুইচ টিপলুম। আমার হাত কাঁপছিল। শরীর ভারী হয়ে উঠেছিল। দরজা খুলে গেলে ষষ্ঠীচরণের মুখ দেখতে পেলুম। আমাকে দেখে সে চাপা খিকখিক হেসে ফিসফিস করে বলল,—ভারি মজার কাণ্ড, দাদাবাবু। দেখুন গে না।

তাকে ঠেলে হন্তদন্ত ঢুকে পড়লুম। ড্রইংরুমের পর্দা তুলেই থমকে দাঁড়াতে হল। টেবিলের ওপর সত্যি সত্যি একটা কাটামুণ্ডু রয়েছে এবং সেটা কর্নেলেরই বটে। টাক এবং সাদা দাড়ি সবই ঠিকঠাক আছে। কিন্তু সেই কাটামুণ্ডের সামনে যিনি ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন, তিনি সম্ভবত কর্নেলের ভূত নন। কারণ তিনি চোখ তুলে আমাকে দেখলেন এবং মৃদুহাস্যে যথারীতি সম্ভাষণ করলেন, হ্যাল্লো ডার্লিং!

পাশে বসে আমি হো হো করে হেসে উঠলুম। তারপর বললুম,—আপনার ষষ্ঠীচরণটি এক অপূর্ব জিনিস! বলে কী, বাবামশাইয়ের কাটামুণ্ডু ...

কর্নেল কথা কেড়ে বললেন,—ষষ্ঠী যে ভুল বলেনি, তা তো দেখতেই পাচ্ছ, জয়ন্ত! এখন বলো তো মুণ্ডুটা দেখে আমার বলে মনে হচ্ছে কি না?

আপনার ছাড়া আর কার? মুণ্ডুটা দেখতে দেখতে বললুম। একেবারে অবিকল। ওটা যদি রাস্তায় পড়ে থাকে, কেউ সন্দেহ করবে না যে ওটা নকল মুণ্ডু। এমনকি পোস্টমর্টেমের টেবিলে ডাক্তার যতক্ষণ না ছুরি চালাচ্ছেন, ততক্ষণ তিনিও ধরতে পারবেন না কিছু! তাছাড়া টাকটিও নিখুঁত হয়েছে।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে সহাস্যে বললেন,—ঠিক এমনটিই চেয়েছিলুম।

বললুম,—এটা কি চিৎপুরের টি এন গুপ্ত কোং থেকে অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছেন?

কর্নেল আমার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা দোলালেন। তুমি আজ বিকেলে চিৎপুরে ট্রাফিকজটে আটকে গিয়েছিলে এবং আমাকে ডেকেছিলে, ঠিকই। কিন্তু তখন আমার বেজায় তাড়া ছিল। আশা করি, তুমি কুমোরটুলির প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী দেবেন পালের নাম শুনেছ। দেবেনবাবু ইদানীং পোশাকের দোকানের জন্য ডামি তৈরিতে খুব নাম করেছেন। চৌরঙ্গি এলাকার বহু পোশাকের দোকানে লাইফসাইজ মূর্তিগুলো ওঁরই তৈরি। আগে এসব জিনিস বিদেশ থেকে আনা হত। তবে সেসব মূর্তি অবশ্য সায়েব-মেমদের। এ যুগে সায়েব-মেম চলে না।

আপনার এই কাটামুণ্ডুটা কি মাটির?

মোটেও না। প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে তৈরি। দোকানের ডামিগুলোও তাই। মাটির মূর্তি ভেঙে যাবার চান্স থাকে।

কিন্তু ব্যাপারটা কী খুলে বলুন তো! গুপ্ত কোম্পানিতে কি আপনি পরচুলো কিনতে ঢুকেছিলেন? আর এই কাটামুণ্ডুরই বা উদ্দেশ্য কী?

কর্নেল টাকে হাত বুলিয়ে বললেন,—পরচুলো জিনিসটা বরাবর আমার চক্ষুশূল। বিশেষ করে যাত্রা-থিয়েটারের জন্য যে সব পরচুলো ভাড়া দেওয়া হয়, তাতে অসংখ্য উকুন থাকা সম্ভব। আর জয়ন্ত, সত্যি বলতে কি, টাক মানুষের চেহারায় জ্ঞানীর ব্যক্তিত্ব এনে দেয়। আমার টাক আমার বড় গর্বের জিনিস। তবে কাটামুণ্ডুর কথা জিজ্ঞেস করছ, এটা আমাকে ভালোবেসে উপহার দিয়েছেন কুমোরটুলির দেবেনবাবু। পুরো প্রতিমূর্তি গড়ে দিতে চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলুম,—অত পরিশ্রমের দরকার নেই। বরং আমার মাথাটা উপহার দিলেই আমি খুশি।

বুঝলাম। কিন্তু টি এন গুপ্তের দোকানে তাহলে কেন ঢুকেছিলেন?

কর্নেল সে-কথার জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ চুরুট টানলেন। তারপর বললেন,—কাল থেকে দিন-চারেকের ছুটি নিতে পারবে জয়ন্ত?

পারব। কেন?

আমরা বেড়াতে যাব একজায়গায়।

কোথায়?

কর্নেল চোখ বুজে গল্প বলার সুরে বললেন,—ধানবাদের ওদিকে ভৈরবগড় নামে একটা জায়গা আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ওই এলাকায় অনেক খনি ছিল। এখন সবই পোড়ো হয়ে গেছে—যাকে বলে অ্যাবান্ডান্ড্ মাইন। অর্থাৎ ভূগর্ভ থেকে তোলার মতো কোনো জিনিস আর নেই। নিয়ম হল, পোড়োখনির মুখ সিল করে দিতে হয়। কিন্তু কজনই বা নিয়ম মানে? অনেক খনির মুখ সিল করা হয়নি। কোনোটাতে জল জমে আছে, কোনোটায় গভীর গর্ত। ঝোপজঙ্গল গজিয়ে গেছে। গত শীতে খোলা খনিমুখগুলো থেকে জন্তু জানোয়ার বেরুতে দেখেছিলুম। তবে শেষ পর্যন্ত একটা দারুণ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

ষষ্ঠীচরণ কফির ট্রে রেখে গেল। পেয়ালায় কফি ঢালতে ঢালতে বললুম,—হুঁ। বলুন।

কর্নেল একটু হাসলেন। জয়ন্ত, তুমি কি কখনও এমন অদ্ভুত প্রাণীর কথা শুনেছ—যার পায়ের পাতা উলটো, চোখ দুটো সাপের মতো নিষ্পলক, যার চিৎকার শুনলে দুঃসাহসীরও শরীর আতঙ্কে হিম হয়ে যায়?

জোরে মাথা নেড়ে বললুম,—না।

বলছি বটে প্রাণী, কিন্তু দেহাতি লোকেরা বলে পেত্নি। তুমি বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ হিমাচলের যেখানেই যাবে, দেহাতি লোকেদের কাছে এই সাংঘাতিক পেত্নির কথা শুনতে পাবে। উলটো দিকে পায়ের পাতা বলে এই পেত্নিকে মনে হবে পিছু হেঁটে তোমার দিকে ক্রমাগত এগিয়ে আসছে। চোখে পলক পড়ে না। ঠাণ্ডা-হিম সেই চোখে তাকিয়ে তোমার দিকে আসতে আসতে হঠাৎ সে বিকট চেঁচিয়ে উঠবে। সেই রক্ত-হিম-করা চিৎকার শুনলে তুমি তক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। তখন পেত্নি তোমার মুণ্ডুটি মুচড়ে ছিঁড়ে নিয়ে রক্ত চুষে খাবে।

রাত সাড়ে দশটার কলকাতায় এই বিবরণ শুনতে শুনতে হেসেই ফেলতুম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লোডশেডিং হয়ে গেল। অন্ধকারে মনে হল আমার খুব কাছেই পেত্নিটা দাঁড়িয়ে আছে। ঝটপট লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত হলুম। একটু চুপ করে থাকার পর কর্নেল বললেন,—কিন্তু তার চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, পোড়োখনি এলাকায় জটাজুটধারী এক সাধুবাবাও নাকি থাকেন। যাই হোক, ভৈরবগড়ের পোড়োখনির ভেতর থেকে পেত্নিটা যদি আজ রাতে বেরিয়েও থাকে, কলকাতা পৌঁছুতে তার ভোর হয়ে যাবে। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, ডার্লিং।

হৈ-চৈ করে বললুম,—কী যা-তা বলেন! আমি কি ভয় পেয়েছি নাকি?

ষষ্ঠীচরণ একটা বাতি রেখে গেল। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—বিহার থেকে হিমাচল পর্যন্ত এই পেত্নির খুব নামডাক। ওরা বলে চুরাইল। কোথাও চুড়ৈলও বলে। বাংলার গ্রামে যাকে বলে শাঁখচুন্নি, সে আসলে ওই চুরাইলেরই বাঙালি রূপ। পেত্নির হাতে থাকে শাঁখের চুড়ি। তাই ওই নাম। বাংলায় শাঁখের চুড়ি-পরা পেত্নি অপভ্রংশে শাঁখচুন্নি হয়ে গেছে।

ভৈরবগড়ে আপনি তাহলে চুরাইল দেখেছিলেন?

হ্যাঁ। জ্যোৎস্না ছিল। স্পষ্ট দেখতে পাইনি তার চোখ দুটো নিষ্পলক কিনা, কিংবা তার পায়ের পাতা সত্যি উলটো দিকে ফেরানো কি না। তবে তার চিৎকারটা শুনেছিলুম। চেরা গলার সেই চিৎকার টেনে-টেনে হিঁপিয়ে কখনও কান্নার মতো, কখনও তীব্র বিপদজ্ঞাপক সাইরেনের মতো। আমি ভীষণ হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। ব্যস্ততার মধ্যে টর্চটাও বিগড়ে গিয়েছিল। যখন আবার জ্বলল, তখন সে অদৃশ্য।

কিন্তু এতদিন পরে চুরাইল-রহস্য উদ্ধারে বেরুনোর কারণ কী? পেত্নিটা কি কারুর মুণ্ডু ছিঁড়ে রক্তপান করেছে?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—করেছে। তারপর উঠে গিয়ে কোণার টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ইনল্যান্ড লেটার এনে বললেন,—পড়ে দেখো।

আলোর দিকে ঝুঁকে চিঠিটাতে চোখ রাখলুম। তাড়াহুড়ো করে লেখা। হরফগুলো বাঁকাচোরা।

প্রিয় কর্নেল,

ভৈরবগড়ে আবার চুরাইলের আবির্ভাব ঘটেছে। আগে মাঝেমাঝে যেমনটি দেখা গেছে, এবারও তেমনটি। দুজনের কাটামুণ্ডু আর ধড় পাওয়া গেছে। একফোঁটা রক্ত ছিল না। পুলিশ বলছে ডাকাতের কীর্তি। কিন্তু আমি জানি তা নয়। গত রাতে আমাদের পেছনের বাগানে চুরাইলের ডাক শুনেছি। তখন রাত প্রায় একটা। আমার অনিদ্রার কথা তো জানেন। ডাক শুনেই জানালা খুলে উঁকি দিয়েছিলুম। বন্দুক ছিল হাতে। কিন্তু লোডশেডিং চলছিল তখন। টর্চের আলোয় একপলক তার চেহারা দেখলুম। বুক কেঁপে উঠল। বন্দুক ছুঁড়তে পর্যন্ত পারলুম না ভয়ের চোটে। জানালা বন্ধ করে দিলুম। আমার খুব ভয় হচ্ছে, ওই দুজনের বাড়ির পেছনেও এমনি করে সে এসেছিল। দয়া করে আপনি শিগগির আসুন। ইতি,

যদুনারায়ণ দেব।

কর্নেলের কাছ থেকে যখন বেরোলুম, তখন রাত প্রায় এগারোটা বেজেছে। তখনও ওই এলাকা জুড়ে লোডশেডিং। গাড়ির হেডলাইটের ছটায় অসংখ্য চুরাইল ভেসে উঠছিল যেন। আলোকিত এলাকায় পৌঁছে দেখি, ঘন কুয়াশা জমেছে। মার্চেও এবার শীত পিছু ফিরে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে প্রচুর কুয়াশা। কুয়াশার ভেতর পেত্নিটা যেন আমাকে অনুসরণ করছিল। নিষ্পলক চোখে পিছু হেঁটে হেঁটে সে এগোচ্ছিল। গাড়ির গতি বাড়িয়েও তাকে যেন ফেলে যেতে পারছিলুম না। বাড়ি পৌঁছে গাড়ি গ্যারেজে ঢুকিয়ে যখন বেরুচ্ছি। তখনও মনে হল সে গেটের বাইরে নিষ্পলক ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে গিয়ে ঘরে ঢোকার পর কতক্ষণ কান পেতে থাকলুম, কিন্তু তার ডাক শুনতে পেলুম না। তখন নিজের মিথ্যে ভয়ের কথা ভেবে খুব লজ্জা হল। ...

দুই

খনি এলাকা যতটা রুক্ষ দেখায়, ভৈরবগড় ততটা রুক্ষ নয়। শহর আর গ্রামে মেশানো একটা জনপদ। খনিগুলো অ্যাবান্ডান্ড্ হয়ে ভৈরবগড়ের জৌলুস পড়ে গেছে কবে। রেলস্টেশন আছে বটে, তার চেহারাও খাঁ খাঁ। ঢেউখেলানো মাটি, ছোটবড় আর পাহাড়, বনজঙ্গল নিয়ে কেমন একটা আদিম পরিবেশ।

যদুনারায়ণ দেবের বাড়িটা বেশ পুরনো। তিনপুরুষ আগে ওঁরা বাংলা থেকে এ মুল্লুকে এসেছিলেন খনি-ব্যবসা করতে। এখন অবস্থা আগের মতো জমকালো নয়। বাড়িতে আছেন যদুনারায়ণ, তাঁর ছোটভাই রুদ্রনারায়ণ, যদুবাবুর সাত-আট বছর বয়সী মেয়ে পিঙ্কি, আর যদুবাবুর মা করুণাময়ী। যদুবাবুর স্ত্রী বেঁচে নেই। রুদ্রবাবু এখনও বিয়ে করেন নি। ধানবাদে একটা কোম্পানিতে চাকরি করেন। রোজ ট্রেনে যাতায়াত করেন।

পেছনে বাগানের দিকের একটা ঘরে আমরা উঠেছি, বাগান অবশ্য নামেই। তিন একর জায়গা জুড়ে গাছপালা ঝোপঝাড় গজিয়ে আছে। একটা প্রকাণ্ড আর চ্যাপটা টিলার মাথায় বাড়িটা। বাগানের শেষ প্রান্তে দাঁড়ালে অনেক দূর দেখা যায়। ওই দিকটায় সেইসব পোড়োখনি আছে।

কর্নেল যদুবাবুকে নিয়ে বেরিয়েছেন কোথায়। রাত জেগে ট্রেনে এসেছি। ক্লান্তিও বটে, চোখ দুটোও জ্বালা করছে। তাই ওঁদের সঙ্গে যাইনি। বাগানের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে বেড়া ডিঙিয়ে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে একটা পাথরে বসে ছিলুম।

দিন-দুপুরে পেত্নির ভয় থাকার কথা নয়। কিন্তু পোড়োখনি এলাকার দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি হচ্ছিল। সেইসময় কোত্থেকে সাদা রঙের একটা ছোট্ট কুকুর দৌড়ে এসে আমার পা শুঁকে জ্বলজ্বল চোখে আমাকে দেখতে থাকল। অবাক হয়ে ভাবছি, কুকুরটা কার, এমন সময় ওপাশের ঝোপ থেকে যদুবাবুর মেয়ে পিঙ্কি ডাক দিল,—কুকি! কুকি!

কুকুরটার সারা গায়ে লোম। গা ঝাড়া দিয়ে সে মুখ ঘোরাল। পিঙ্কি তার কাছে এসে ধমক দিল,—কী? কথা কানে যাচ্ছে না বুঝি? চাঁটি খাবি বলে দিচ্ছি? চলে আয়!

বললুম,—তোমার কুকুর বুঝি? ভারি সুন্দর তো কুকুরটা!

পিঙ্কি আমার কথায় কান দিল না। সে কুকুরটাকে দুহাতে তুলে নিয়ে ঢাল বেয়ে দৌড়তে শুরু করল। তারপর নীচের সমতলে গিয়ে কুকুরটাকে নামিয়ে দিল। দেখলুম, এবার কুকুরটা অর্থাৎ কুকি তার পেছন-পেছন হাঁটছে। একটু পরে পিঙ্কি ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেয়েটা তো বড্ড সাহসী দেখছি! এসেই শুনেছি, চুরাইলের আতঙ্কে লোকে সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ঢুকে পড়ে। বাজার-এলাকা শিগগির নিশুতি সুনসান হয়ে যায়। এমনকি দিনের বেলাতেও কেউ একাদোকা মাঠেঘাটে পা বাড়ায় না। আর অতটুকু মেয়েটা দিব্যি একা ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই এলাকায়!

কিছুক্ষণ পরে উঁচু একটা জায়গায় ফ্রক পরা পিঙ্কির মূর্তি ভেসে উঠল। তার পায়ের কাছে কুকি। দুজনে খুব মন দিয়ে কী যেন দেখছে।

তারপর কুকিকে লাফাতে লাফাতে ওপাশে চলে যেতে দেখলুম। পিঙ্কিও তার পেছনে ছুটল। সিগারেট ধরিয়ে ওদের গতিবিধি লক্ষ করতে থাকলুম। কখনও ওরা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার ওদের দেখতে পাচ্ছি। তারপর কতক্ষণ আর দুটিকে দেখতেই পেলুম না।

কেমন একটা অস্বস্তি লাগল। লম্বা পায়ে ঢাল বেয়ে নেমে গেলুম। ওদের শেষবার যেখানে দেখেছি, সেইদিকে হাঁটতে থাকলুম। জায়গাটা উঁচুনিচু, এবড়ো খেবড়ো। অজস্র খানাখন্দ, কোথাও গভীর গর্ত, নানা গড়নের পাথর পড়ে রয়েছে। মধ্যে-মধ্যে ঝোপঝাড় বা কিছু গাছ। এপাশে-ওপাশে টিলা। একটা পাথরে উঠে ওদের খুঁজলুম। তারপর দেখলুম, একখানে দাঁড়িয়ে পিঙ্কি একটু ঝুঁকে কী করছে। কুকিকে দেখতে পেলুম না।

চেঁচিয়ে ডাকলুম,—পিঙ্কি! পিঙ্কি!

পিঙ্কি আমার দিকে ঘুরে হাত নেড়ে কী বলল। তখন দৌড়ে ওর কাছে চলে গেলুম। গিয়ে দেখি, পিঙ্কির সামনে একটা স্তূপের কিনারায় গুহার দরজার মতো প্রকাণ্ড একটা খোঁদল। সেইদিকে হাত বাড়িয়ে পিঙ্কি কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল,—কুকি ওর ভেতর ঢুকে গেল। আর বেরুচ্ছে না—এত ডাকছি!

খোঁদলের কাছে গিয়ে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলুম। ফুট-চারেক গভীর একটা গর্ত—তারপর সুড়ঙ্গের মতো ভেতরে চলে গেছে খোঁদলটার। গর্তে ঘাস আর সামান্য ঝোপঝাড় গজিয়ে আছে। পিঙ্কি ব্যাকুলভাবে ডাকছিল,— কুকি! কুকি! সে শাসাচ্ছিল। আমিও 'কুকি' বলে ডাকাডাকি করলুম। কিন্তু কুকুরটার পাত্তা নেই।

এইসব গর্তের ভেতর নেকড়ে, চিতাবাঘ বা হায়না থাকাও সম্ভব। তাদের পাল্লায় পড়ল না তো বোকা কুকুরটা? বললুম,—দেখো তো কী বিপদ হল! ওকে নিয়ে কেন এখানে এসেছিলে!

পিঙ্কি চোখ মুছতে মুছতে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল,—রোজই তো আসি। কুকির সঙ্গে লুকোচুরি খেলি।

কুকি ওখানে ঢুকতে গেল কেন?

পিঙ্কি মাথা নেড়ে বলল,—জানি না। হঠাৎ ঢুকে গেল।

খোঁদলটাতে মানুষের পক্ষেও ঢোকা সম্ভব। নিশ্চয় একটা পোড়োখনির মুখ এটা। ভেতরে ঘন অন্ধকার থমথম করছে। টর্চ থাকলে ঢুকতে পারতুম। তাই বললুম,—তুমি এক কাজ করো বরং। দৌড়ে গিয়ে বাড়ি থেকে একটা টর্চ নিয়ে এসো। তোমার কুকিকে উদ্ধার করা যাবে।

পিঙ্কি তখুনি দৌড়ল। আমি পাশের একটা ঝোপ থেকে লাঠির মতো একটা ডাল ভেঙে নিলুম। সঙ্গে রিভলবারটা নেই। থাকলে ভালো হত। অগত্যা লাঠি ভরসা করেই ঢুকতে হবে।

লাঠিটা হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে লোক খুঁজছিলুম, যদি দৈবাৎ কোনো দেহাতি লোক পেয়ে যাই, সেও মন্দ হবে না। পয়সার লোভে তাকে ওই খোঁদলে ঢুকিয়ে কুকিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা যায়। নাহলে অগত্যা নিজেকেই ঢুকতে হবে।

হঠাৎ একটু দূরে উঁচু পাথরের আড়াল থেকে কাউকে বেরুতে দেখলুম। সে ফাঁকায় পৌঁছুলে অবাক হয়ে দেখি, লাল কাপড়পরা এক সন্ন্যাসী। চেঁচিয়ে ডাকলুম,—সাধুবাবা! সাধুবাবা!

সাধুবাবা ঘুরে দাঁড়াল। তারপর আমাকে দেখেই সাঁৎ করে আবার উঁচু পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিল। তারপর আর তাকে দেখতে পেলুম না। ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত তো! কর্নেল এই সাধুবাবার কথা বলেছিলেন না?

একটু পরে হাঁপাতে হাঁপাতে পিঙ্কি ফিরে এল। টর্চ এনেছে। ওর সঙ্গে ওদের চাকর দশরথও এসেছে। দশরথের সঙ্গে সকালে আলাপ হয়েছে। লোকটার বয়স হয়েছে বটে, এখনও চেহারাটি শক্তসমর্থ। হাসতে হাসতে বলল,—কুকি কেন ঢুকেছে, হামার মালুম হয়েছে স্যার! ভৈরবগড়ের কুত্তাদের কাছে কুকি শুনেছে কী, ইয়ে সব গুহার অন্দরে করাড়ি রোটি মিলতে পারে।

জিজ্ঞেস করলুম,—করাড়ি রোটি কী দশরথ?

দশরথ বলল,—ইয়ে সব গুহার অন্দরে ভালুকের ডেরা আছে। ভালুক মৌচাক ভেঙে মধু খায়। ঔর জঙ্গলের ফলভি খায়। খেয়ে সেইসব চিজ উগরে দেয়। যখন শুখা হয়, তখন তা রোটি হয়ে যায়। আদমিলোগভি ওহি রোটি পছন্দ করে। হামিভি এর্কদফা খায়া স্যার! বহুত মিঠা।

তা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু ভেতরে ভালুক থাকলে যে বিপদ!

দশরথ হাসল। ভালুক অন্দরে আছে কিনা কুত্তার মালুম আছে, স্যার! ভালুক থাকলে কুত্তা অন্দরে ঘুসবে না।

ঠিক এইসময় খোঁদল থেকে একলাফে কুকি বেরিয়ে এল। মুখে একটুকরো কালচে রঙের পাঁউরুটির মতো জিনিস। দশরথ লাফিয়ে উঠল,—দেখিয়ে, দেখিয়ে! হাম ঠিক বোলা কি না!

পিঙ্কি কুকিকে কোলে তুলে নিয়ে আলতো দুটো চাঁটি মারল। তারপর তার মুখ থেকে করাড়ি রোটির টুকরোটা কেড়ে ছুঁড়ে ফেলল। দশরথ সেই টুকরোটা তুলে নিয়ে বলল,—ফেকো মাত্ দিদি। ইয়ে রোটি যে খাবে, সে তাকতওয়ালা পালোয়ান হয়ে যাবে।

দশরথ আমাকে অবাক করে কুকুরের এঁটো সেই বিচিত্র বস্তুটি মাথায় ঠেকাল প্রসাদের মতো। তারপর ঝেড়েমুছে পকেটে ঢোকাল। তার মুখে খুশি উপচে উঠছিল।

হাঁটতে-হাঁটতে দশরথকে বললুম,—আচ্ছা দশরথ, ওখানে একজন সাধুবাবাকে দেখলুম। কিন্তু যেই আমি ওঁকে ডেকেছি, উনি লুকিয়ে পড়লেন কোথায়। ব্যাপারটা কী?

দশরথ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আমার মুখের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,—সাচ্?

হ্যাঁ। একজন সাধুবাবাকে সত্যি দেখেছি, দশরথ।

দশরথের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল,—আপনি বহত্ পুণ্যবান স্যার, তাই দেখা পেলেন। ওখানে একজন সাধুবাবা থাকেন। লেকিন কেউ তাঁর দেখা পায় না। যারা পায়, তারা বহুত পুর্ণবান আদমি।

তুমি কখনও দেখা পাওনি?

না স্যার! শুনা কি, সাধুবাবার ওমর দোশো বরষ আছে।

বলো কী? দুশো বছর বয়স!

জি হাঁ। ভৈরবগড়ে যাকে পুছ করবেন, সে বলবে।

তাহলে দশরথ, সেই চুরাইলটা কি সাধুবাবার পোষ্য পেত্নি?

আমি হাসতে হাসতে বললুম কথাটা। দশরথ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠে দু-কানে আঙুল ঢুকিয়ে বলল,—রাম রাম! এই মুলুকে যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ উও নাম মুখে লিবেন না স্যার!

বলে সে চলার গতি বাড়িয়ে দিল। তার চেহারায় আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল।

কর্নেল ও যদুবাবু বাগানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। দশরথ কুকির কীর্তি বর্ণনা করল এবং ফতুয়ার পকেট থেকে ভালুকের বানানো রুটির টুকরোটাও দেখাল। যদুবাবু পিঙ্কিকে একটু বকাবকি করলেন। তারপ বললেন,—ওকে নিয়ে এই সমস্যা। যতক্ষণ স্কুলে থাকে, চিন্তা করি না। কিন্তু বাড়িতে থাকলেই কুকুর নিয়ে পোড়োখনির ওদিকে চলে যাবে। অথচ ইদানীং ভুলেও ভৈরবগড়ের লোকেরা ওদিকে পা বাড়ায় না।

কর্নেল দশরথের কাছ থেকে করাড়ি রোটির টুকরো নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। ফেরত দিয়ে বললেন,—করাড়ি রোটির কথা দক্ষিণ ভারতের জঙ্গল এলাকায় গিয়ে শুনেছিলুম। এবার স্বচক্ষে দেখলুম।

যদুবাবু বললেন,—করাড়ি কেন বলে কে জানে!

কর্নেল বললেন,—তামিল ভাষায় ভালুককে বলে করাড়ি!

দশরথ সবার মুখের দিকে তাকিয়ে উসখুস করছিল। চাপা গলায় যদুবাবুর উদ্দেশে বলল,—বড়বাবু, এই কলকাতার স্যারকে খনির সাধুবাবা দর্শন দিয়েছেন।

যদুবাবু চমকে উঠে বললেন,—তাই নাকি জয়ন্তবাবু?

বললুম,—হ্যাঁ। কয়েক সেকেন্ডের জন্য লাল কাপড় পরা জটাধারী এক সাধুবাবাকে দেখেছি।

যদুবাবু কর্নেলকে বললেন,—আপনি কথাটা আমল দিচ্ছিলেন না কর্নেল। তাহলে দেখুন, যা রটে তা সত্যি বটে।

কর্নেল একটু হাসলেন। আমল দিইনি, তা নয়। বলছিলুম,—বিশ্বাস করা যায় এমন একজন প্রত্যক্ষদর্শী কাউকে পেলে ভালো হয়। যাই হোক, জয়ন্ত যখন দেখেছে, তখন গুজবটা সত্য প্রমাণিত হল।

কর্নেলের বুকে বাইনোকুলার ঝুলছিল। কথাটা বলার পর বাইনোকুলারটা চোখে রেখে পোড়োখনি এলাকার দিকে কী যেন দেখতে থাকলেন। যদুবাবু খুব আগ্রহে চাপা গলায় বলে উঠলেন,—কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি কর্নেল?

কর্নেল বললেন,—লাল ঘুঘু।

লাল ঘুঘু মানে? যদুবাবুর গলায় নৈরাশ্য ফুটে উঠল। আমি ভাবলুম বুঝি সাধুবাবাকে দেখতে পেয়েছেন!

কর্নেল বললেন,—এই লাল ঘুঘুপাখির ঝাঁক সচরাচর দেখা যায় না। এরা ঊষর মরু অঞ্চলের বাসিন্দা। শীতের শেষদিকে চলে আসে উর্বর এলাকায়। বর্ষা পর্যন্ত কাটিয়ে আবার ফিরে যায়। বলে কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে এক-পা এক-পা করে হাঁটতে শুরু করলেন। বুঝলুম এবেলার মতো উধাও হতে চলেছেন। যদুবাবু একটু হেসে বললেন,—যার যা হবি! আসুন, জয়ন্তবাবু। আমরা ঘরে বসে গল্পগুজব করি ততক্ষণ।

যে ঘরে উঠেছি, সেই ঘরে গিয়ে বসলুম দুজনে। দশরথ চা আনতে গেল। পিঙ্কি তার কুকুর নিয়ে বাগানে খেলে বেড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছিলুম। যদুবাবু বললেন,—জয়ন্তবাবু, আপনি তো খবরের কাগজের লোক। এমন ঘটনা কখনও ঘটতে দেখেছেন?

কী ঘটনা বলুন তো?

ভূতপ্রেতের হাতে মানুষ খুন! যদুবাবুর কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক ফুটে উঠল। পুলিশ বলছে স্রেফ ডাকাতি। কিন্তু বলুন তো মশাই, ডাকাত কি মানুষের মুণ্ডু কেটে রক্ত খায়?

তা খায় না বটে।

যদুবাবু জানালার বাইরেটা দেখিয়ে বললেন,—আজ রবিবার। গত বুধবার রাত একটায় ওইখানে স্পষ্ট দেখেছি চুরাইল দাঁড়িয়ে আছে। শাড়ি পরা কালো চেহারা। হাতে শাঁখা পরা, চোখ দুটো নীল। টর্চের আলোয় কয়েক সেকেন্ডের জন্য হলেও তাকে স্পষ্ট দেখে নিয়েছি। মুখের চেহারা দেখলে রক্ত হিম হয়ে যাবে, মশাই! এই দেখুন না, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!

চুরাইলের পায়ের পাতা নাকি উলটো দিকে থাকে?

হুঁ। ঠিক তাই। টর্চের আলো ছিল খুব জোরালো। পা-দুটোও দেখে নিয়েছি না?

যে দুজন লোক চুরাইলের হাতে মার পড়েছে, তারা কে?

যদুবাবু হতাশভাবে একটু হাসলেন। তাদের বাড়িতে তো নিয়ে গিয়েছিলুম কর্নেলকে। একজনের নাম মাধব পাণ্ডে। বাজারের সেরা ব্যবসাদার ছিলেন পাণ্ডেজি। মহাজনি কারবারও ছিল। সুদে টাকা ধার দিতেন অভাবী লোককে। দ্বিতীয়জন হলেন রামনাথ মিশ্র। লোকে বলত মিছিরজি। উনি ছিলেন বড্ড ভালোমানুষ। পাণ্ডেজিরই কর্মচারী উনি।

ওঁরা খুন হয়েছেন কীভাবে?

বোঝা যাচ্ছে না, কেন পাণ্ডেজি অত রাতে বেরিয়েছিলেন। ঘরের দরজা খোলা ছিল। ভোরবেলা স্টেশনের কাছে মুণ্ডুকাটা লাশ পাওয়া যায়। তবে রাতে বাড়ির লোকে তো বটেই, পাশের বাড়ির লোকেরাও চুরাইলের ডাক শুনেছিল। মিছিরজি খুন হন তার পরের রাতে। মিছিরজিও স্টেশনের কাছে একটা বস্তিতে থাকতেন। তাঁরও ঘরের দরজা বাইরে থেকে আটকানো ছিল। পেছনের জঙ্গলে তাঁর মুণ্ডুকাটা লাশ পাওয়া গেছে। তাছাড়া সে-রাতেও ওই বস্তির লোকেরা চুরাইলের ডাক শুনেছিল।

কর্নেল কী বলছেন?

কিছু বলেননি এখনও। ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন। লাশ পড়ে থাকা জায়গাটাও দেখলেন। তারপর বললেন,—চলুন ফেরা যাক।

বুঝলুম যদুবাবু খুব হতাশ হয়ে গেছেন কর্নেলের হাবভাব দেখে।

তিন

লাল ঘুঘুর পেছনে সারা দুপুর ঘোরাঘুরি করে কর্নেল ফিরে এলেন বেলা গড়িয়ে। আমার খাওয়াদাওয়া সারা। অবেলায় কর্নেল খেতে বসলেন। বললুম, —এরকম অনিয়ম করলে কিন্তু বেঘোরে মারা পড়বেন। আপনি কি ভাবছেন এখনও বুড়ো হননি?

কর্নেল সহাস্যে বললেন,—বৎস, সাদা দাড়ি মোটেও বার্ধক্যের লক্ষণ নয়। তোমার মতো অনেক যুবকেরও চুলদাড়ি সাদা হয়ে যেতে দেখেছি। ভেবো না; জীবনে দু-একটা দিন দেরি করে খেলে স্বাস্থ্যমশাই তত বেশি চটেন না। যাই হোক, তুমি তৈরি হয়ে নাও। বেরুব।

যদুবাবুর অনিদ্রার রোগ আছে। রাতে ঘুম হয় না বলে দিনে ঘুমোবার চেষ্টা করেন। দশরথ খাবার এনেছিল। যদুবাবুর মা করুণাময়ী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একবার তদারক করে চলে গেছেন। খাওয়ার পর কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—আচ্ছা দশরথ, তোমাদের ছোটবাবু কোথায় গেলেন? আজ ছুটির দিনে তো তাঁর বাড়ি থাকার কথা!

দশরথ বলল,— ছোটবাবুর খোবর ছোটবাবুরই মালুম আছে স্যার! উন্‌হি ওই রোকম আছেন।

কী রকম?

দশরথ এদিক-ওদিক তাকিয়ে চাপা গলায় বলল,—রাতমে বড়বাবুর সঙ্গে বহুত কাজিয়া কোরেছিলেন। সুবেমে চাও-উও পিয়ে চলে গেলেন তো আভিতক আসলেন না। মাইজির সঙ্গেভি কাজিয়া কোরেন ছোটবাবু!

কেন বল তো?

দশরথ হাসল। রুপেয়াকে লিয়ে। হরঘড়ি রুপেয়া চাইলে কেত্তো রুপেয়া দেবেন বড়বাবু? মাইজিই বা কোথা রুপেয়া পাবেন বলুন স্যার?

রুদ্রবাবু তো চাকরি করেন। মাইনের টাকাতেও কুলোয় না নাকি?

দশরথ মুখ বেজার করে বলল,—ছোড়িয়ে দিন স্যার! ছোটবাবু জুয়াড়ি হোয়ে গেছেন।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন,—তাই বল! জুয়া খেললে মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি আর থাকে না। কই, এসো জয়ন্ত। আমরা বেরোই।

যদুবাবুর ভাই রুদ্রবাবুর সঙ্গে সকালে আমাদের সৌজন্যমূলক পরিচয় হয়নি। তবে ওঁকে দেখেছিলুম। রোগা গড়নের যুবক। রাগী চেহারা। গায়ে লাল রঙের গেঞ্জি, পরনে ছিল নেভি-ব্লু প্যান্ট। হাতে স্টিলের বালা। গলায় সরু চেনও দেখেছিলুম।

পোড়োখনি এলাকার দিকে পা বাড়িয়ে কর্নেল বললেন,—যদি রাত্রি পর্যন্ত এদিকে কাটাই, আমার বিশ্বাস চুরাইলের দর্শন পাব। কিন্তু তুমি ভয় পাবে না তো জয়ন্ত?

অবাক হয়ে বললুম,—আপনি কি চুরাইল দেখতেই বেরুলেন?

কর্নেল আস্তে বললেন,—বলা যায় না, যদি দৈবাৎ তার দেখা পেয়ে যাই গতবারের মতো।

মার্চ মাসের এমন সুন্দর বিকেলে চুরাইলের ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। সত্যি বলতে কী, ভূতপ্রেতে আমার কস্মিনকালে বিশ্বাস নেই, যদিও ভূতের ভয় আমার আছে। কিন্তু কর্নেল গতবছর স্বচক্ষে পোড়োখনির পেত্নিটাকে দেখেছেন বলছিলেন। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যায় না।

কর্নেল মাঝেমাঝে বাইনোকুলার তুলে এদিকে-ওদিকে কী দেখছেন। এখনও দিনের আলো আছে। কাজেই নিশ্চয় লালঘুঘুর ঝাঁক দেখছেন। একখানে হঠাৎ থেমে বললেন,—জয়ন্ত, করাড়ি রোটি কোন গুহায় ছিল চিনতে পারবে কী?

বললুম,—মনে হচ্ছে, বাঁদিকে যেতে হবে। ওই যে ঝোপগুলো দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত তার কাছাকাছি।

কয়েক পা এগিয়ে যেতেই দেখলুম, পিঙ্কি হাতে একটা প্রকাণ্ড রঙিন বল নিয়ে একটা ঢিবির ওপর উঠে দাঁড়াল। তারপর বলটা ছুড়ে দিল। তখন ওর কুকুরটাকেও দেখতে পেলুম। অবাক হয়ে গেলুম ওর সাহস দেখে। কুকি বলটাকে কামড়ে ধরে ওর কাছে বয়ে আনার চেষ্টা করছে। বলটা বারবার মুখ থেকে পড়ে যাচ্ছে। কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন,—মেয়েটি সত্যি খুব সাহসী।

ডাকলুম, 'পিঙ্কি! পিঙ্কি!'

পিঙ্কি একবার ঘুরে দেখল। তারপর একহাতে বল, অন্যহাতে কুকুরটাকে তুলে নিয়ে দৌড়তে শুরু করল। একটু পরে দুজনেই কোথাও উধাও হয়ে গেল। বললুম,—মেয়েটির জন্য আমার ভাবনা হচ্ছে, কর্নেল! কখন না কোন্ বিপদে পড়ে!

কর্নেল সেকথায় কান না দিয়ে বললেন,—করাড়ি রোটির গুহাটা খুঁজে বের করো, জয়ন্ত!

খুঁজে পেতে দেরি হল না। কর্নেল পকেট থেকে টর্চ বের করে বললেন,—তুমি এখানে বসে অপেক্ষা করো জয়ন্ত। আমি ভেতরটা দেখে আসি।

আঁতকে উঠে বললুম,—সে কী! আপনি ওর ভেতর ঢুকে কী করবেন?

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন,—করাড়ি রোটি খেলে মানুষ পালোয়ান হয়ে যায়, ডার্লিং!

কিন্তু ভেতরে যদি ভালুকটা থাকে?

তার সঙ্গে ভাব জমাবার মন্ত্র আমার জানা আছে। এই বলে কর্নেল কুয়োর মতো গর্তটাতে নেমে গেলেন। তারপর টর্চ বাগিয়ে সুড়ঙ্গের ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলেন।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা হচ্ছে, এক্ষুনি হয়তো দেখব কর্নেল ভালুকের আঁচড় খেয়ে রক্তারক্তি হয়ে এবং কোনোমতে প্রাণ নিয়ে ফিরেছেন। না, ভালুকের হাতে ওঁর মারা পড়ার কথা ভাবছি না। কারণ ওঁর কাছে রিভলবার আছে। কিন্তু ভালুকমশাই রুটিচোরকে একটু শিক্ষা না দিয়ে কি ছাড়বে?

তারপর আর কর্নেলের ফেরার নাম নেই। বেলা পড়ে এল। টিলাগুলোর ওধারে সূর্য অস্ত গেল। কুয়াশা ঘনিয়ে এল চারদিকে। ক্রমে আঁধার জমল। কর্নেল ফিরছেন না। অস্বস্তিতে বুক কাঁপছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে পিঙ্কিকে খুঁজলুম। কোথাও দেখলুম না। নিশ্চয় মেয়েটা এতক্ষণ তার কুকুরটাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। দুরুদুরু বুকে ভাবছি কী করব। আমার সঙ্গেও টর্চ, রিভলবার আছে। ঢুকব নাকি ভেতরে? কিন্তু ঠিক তখনই বাঁদিকে খুব কাছেই এক বিকট চিৎকার শুনতে পেলুম।

ঘুরে কিছু দেখতে পেলুম না। অন্ধকারে কেউ ওই বিদ্‌ঘুটে আর্তনাদ করে চলেছে। কাঁপাকাঁপা একটানা চেরা গলার চিৎকার—বিপদজ্ঞাপক সাইরনের মতো। অমনি শরীর হিম হয়ে গেল। এ তো চুরাইলেরই চিৎকার! কর্নেল ঠিক এমনি একটা বর্ণনা দিয়েছিলেন।

আড়ষ্ট হাতে টর্চের বোতাম টিপলুম। একঝলক আলো ছড়িয়ে গেল। তারপর দেখতে পেলুম পোড়োখনির পেত্নিটাকে। কালো কুচকুচে গড়ন। মানুষের মতো—কিংবা আদতে মানুষের মতো নয়ই, আমার চোখের ভুল হতেও পারে। কী হিংস্র তার মুখ আর নিষ্পলক নীলচে দুটো চোখ! তার পায়ের পাতা সত্যি উলটো ঘোরানো কিনা দেখার চেষ্টা করতেই সে আবার চেঁচিয়ে উঠল —আঁ আঁ আঁ আঁ .... ইঁ ইঁ ইঁ ইঁক! এমন অমানুষিক চিৎকার কোনো প্রাণীর নয়, তা আমি হলফ করে বলতে পারি।

টর্চের আলোয় তাকে এগিয়ে আসতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে রিভলবার বের করলুম। তার দিকে তাক করে ট্রিগারে চাপ দিলুম। রিভলবারটা অটোমেটিক। কিন্তু আশ্চর্য গুলি বেরুল না। ঘাবড়ে গিয়ে আবার ট্রিগারে চাপ দিলুম। এবারও গুলি বেরুল না। অমনি মনে পড়ল, অটোমেটিক বলে রিভলবারে গুলি ভরে রাখিনি। কারণ দৈবাৎ গুলি ছুটে যাবার ভয় থাকে।

ততক্ষণে চুরাইলটা কাছাকাছি এসে পড়েছে। পকেট থেকে গুলি বের করতে গিয়ে তাড়াতাড়িতে টর্চটা হাত থেকে পড়ে গেল এবং নিবে গেল। এবার মনে হল অন্ধকারে ডুবে গেছি। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে গুলিগুলো ভরে ট্রিগারে চাপ দিলুম। এবার রিভলবারটা গর্জে উঠল। পর পর দুটো গুলি ছোড়ার পর চুরাইলের চিৎকার থেমে গেল। মারা পড়েছে ভেবে সাহসী হয়ে পা বাড়াচ্ছি, কেউ শিস দিল কোথাও। সেই সময় আমার পিছনে কর্নেলের ডাক শুনতে পেলুম, —জয়ন্ত! জয়ন্ত!

চেঁচিয়ে বললুম,—টর্চ জ্বালুন শিগ্‌গির। পেত্নিটাকে আমি গুলি করে মেরেছি।

কর্নেলের হাসি শোনা গেল। পেত্নিকে কখনও গুলি করে মারা যায় না ডার্লিং!

আঃ! টর্চ জ্বালুন না কেন?

তোমার টর্চ কী হল?

কোথায় পড়ে গেছে।

আমার টর্চটা কেউ খনিগুহার ভেতর কেড়ে নিয়েছে।

কর্নেল কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললুম,—সে কী! কেড়ে নিয়েছে মানে?

কর্নেল চুরুট ধরালেন লাইটার জ্বেলে। তারপর বললেন,—খনিটা ছিল ডলোমাইটের। ভেতরটা বেশ চওড়া। এপাশে-ওপাশেও অনেক খোঁদল আছে। করাড়ি রোটি খুঁজছি, হঠাৎ কে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে আমাকে ফেলে দিল। টর্চটা ছিটকে পড়ে নিবে গেল। উঠে আর খুঁজেই পেলুম না। লাইটারের আলোয় কোনোরকমে বেরিয়ে এলুম। এসে দেখি, চুরাইলের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ চলছে।

আমিও সিগারেট ধরালুম। তারপর লাইটারের আলোয় কয়েক পা এগিয়ে টর্চটা খুঁজে পেলুম। টর্চের আলোয় নিরাশ হয়ে দেখলুম কোথাও গুলিবিদ্ধ চুরাইল পড়ে নেই। একফোঁটা রক্তও নেই। ভূতপেত্নিদের হয়তো রক্ত থাকার কথা নয়। গুলি তাদের গায়ে লাগারও কথা নয়। তবে আওয়াজে তারা ভয় পেতেও পারে। বললুম,—ব্যাপারটা কী হতে পারে বলুন তো কর্নেল?

কোন্ ব্যাপারটা?

চুরাইল?

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন,—নিছক পেত্নি ছাড়া কিছু নয়, সে তো বুঝতেই পারছ।

কিন্তু আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে, ভূতপেত্নি বলে সত্যি কিছু থাকতে পারে।

স্বচক্ষে দেখেও? কর্নেল হঠাৎ গলাটা নামিয়ে বললেন,—যাই হোক, বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের এ-তল্লাটে ঘোরাঘুরি করাতে চুরাইলের ভীষণ আপত্তি আছে। তাই সে ভয় দেখাতে এসেছিল।

চারদিকে ভয়ে-ভয়ে আলো ফেলে আমরা হাঁটছিলুম। হাতে রিভলবারও তৈরি। কর্নেলের কথার জবাবে কী বলব ভেবে পাচ্ছিলুম না।

কর্নেল টর্চের আলোয় একটুকরো লাল রঙের ছেঁড়া কাপড় দেখিয়ে বললেন,—আমাকে ধাক্কা মারতেই আমিও তাকে ধরার চেষ্টা করেছিলুম। তার পরনের কাপড়ের এই টুকরোটা আমার হাতে থেকে গেছে। তুমি বলেছিলে, সাধুবাবার পরনে লাল কাপড় দেখেছ। কাজেই সে সেই সাধু ছাড়া আর কে হতে পারে? সম্ভবত অন্য কোনো সুড়ঙ্গ দিয়ে ওখানে যাওয়া যায়। সে আমাকে ফলো করেছিল অন্যদিক থেকে।

আমার মাথায় চমক খেলে গেল। বললুম,—কর্নেল! অনেক তান্ত্রিক সাধু প্রেতসিদ্ধ হন শুনেছি। তাঁদের নাকি পোষা ভূতপ্রেত থাকে। চুরাইল বা শাঁখচুন্নিটা ওই সাধুর পোষা নয় তো?

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন,—তাহলে এতদিনে তুমি স্বীকার করলে যে ভূতপ্রেত সত্যি আছে?

কী জানি! কিন্তু আপনিও তো ওসবে বিশ্বাস করেন না!

কর্নেল হঠাৎ গলা চড়িয়ে বললেন,—আলবাত করি। কে বলল করি না?

তারপর ডানদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তেমনি চড়া গলায় বলে উঠলেন, কী রুদ্রবাবু! এখানে কী করছেন—অন্ধকারে?

টর্চের আলো সেদিকে ফেলে দেখি,যদুবাবুর ছোটভাই রুদ্রনারায়ণ একটা পাথরের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। খেঁকিয়ে উঠলেন একেবারে,—আঃ! আলো নেবান তো মশাই!

টর্চ নিবিয়ে দিলুম। কর্নেল বললেন,—আসুন! বাড়ি যাবেন না?

না।

আহা! খামোকা বাড়ির লোকের ওপর রাগ করে আর কী হবে রুদ্রবাবু? তাছাড়া এখানে অন্ধকারে বসে থাকাও তো বিপজ্জনক। একটু আগে আপনি কি চুরাইলের ডাক শোনেননি?

রুদ্রবাবু আরও খেঁকিয়ে উঠলেন,—যান মশাই! আপনাদের আর ভালোমানুষি করতে হবে না! আমাকে চুরাইল দেখাচ্ছেন! নিজেদের মাথা বাঁচান আগে—তারপর কথা বলতে আসবেন!

কর্নেল আর কথা বাড়ালেন না। বললেন,—চলো জয়ন্ত! রুদ্রবাবু ভীষণ চটে আছেন মনে হচ্ছে।

ওঁদের বাগানের কাছাকাছি যেতেই লণ্ঠন হাতে দশরথকে দেখা গেল। আমাদের দেখে সে আশ্বস্ত হল। তার হাতে একটা বল্লমও দেখতে পাচ্ছিলুম। বলল,—বড়বাবু আপনাদের লিয়ে বহত্ শোচ করছেন স্যার। পিঙ্কিদিদি বলল কী, কর্নিল স্যারদের খনির অন্দরে ঘুসতে দেখেছে। ঔর আপনারা এত্তা দেরি করলেন!

বুঝলুম, দশরথের ইচ্ছে ছিল না আমাদের খুঁজতে যাওয়ার। কর্তাবাবুর চাপে পড়ে তাকে বেরুতে হয়েছে। সে যে ভীষণ ভীতু মানুষ, তাতে সন্দেহ নেই।

যদুবাবু অপেক্ষা করছিলেন ব্যস্তভাবে। বললেন,—খুব ভাবছিলুম কর্নেল! এদিকে এক কাণ্ড হয়েছে শুনুন। মায়ের আলমারি থেকে একটা পুরনো দলিল চুরি গেছে। আপনি আমার বাবার খনির দলিল দেখতে চেয়েছিলেন। ওই দলিলটাও তার মধ্যে ছিল। মা বলছেন, এ নিশ্চয় রুদ্রের কাজ। রুদ্রের সঙ্গে এ-নিয়ে আমারও একচোট হয়ে গেল। বাবু রাগ করে বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল বললেন,—রুদ্রবাবুকে মাঠে বসে থাকতে দেখে এলুম।

যদুবাবু বাঁকা মুখে বললেন,—চুরাইলের পাল্লায় পড়লেই বাছাধন টের পাবে! তারপর দশরথকে চায়ের হুকুম দিয়ে কর্নেলের মুখোমুখি বসলেন।

কর্নেল বললেন,—ও দলিল রুদ্রবাবু কী করবেন?

যদুবাবু চাপা গলায় বললেন,—আপনাকে বলেছিলুম, ওই দলিলটা আনরেজিস্টার্ড। নন্দলাল ওঝা নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন বাবার খনিব্যবসার পার্টনার। নন্দবাবু নিজের একার নামে একটা পোড়োখনি কিনেছিলেন আরেকজনের কাছে। কেন কিনেছিলেন জানি না। পরে যখন সব খনি অ্যাবান্ডান্ড্ হয়ে গেল, বাবার মাথায় কেন কে জানে ঝোঁক চাপল, নন্দবাবুর কেনা সেই প্রাচীন অ্যাবান্ডান্ড্ খনিটা কিনতে চাইলেন। নন্দবাবু কিছুতেই বেচতে রাজি নন। বাবাও ছাড়বেন না। অবশেষে পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম হাঁকলেন নন্দবাবু। বাবা তাই দিলেন। ব্যাপারটা আমার কাছে আজও রহস্য। যাই হোক, পরদিন রেজেস্ট্রি হওয়ার কথা। রাতে হঠাৎ নন্দবাবু ভেদবমি হয়ে মারা গেলেন। দলিল আর রেজেস্ট্রি করা হল না। কিন্তু এ দলিল চুরি যে রুদ্রই করেছে, তাতে ভুল নেই। সে বরাবর মায়ের ওই দলিলটা চাইত। বলত, তার দরকার আছে। কী দরকার সেই জানে। আমার সঙ্গে তো ভালো করে কথাবার্তাই বলে না।

নন্দবাবুর ছেলেপুলে আছে কি?

নন্দবাবু ছিলেন উড়নচণ্ডী স্বভাবের লোক। বেশি বয়সে বিয়ে করেছিলেন। ওঁর মৃত্যুর পর সেই ভদ্রমহিলা কলকাতায় দাদার কাছে চলে যান। যতদূর জানি, তাঁর কোনো ছেলেপুলে নেই।

নন্দবাবুর আর কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না ভৈরবগড়ে?

এক পিসতুতো না মাসতুতো দাদা ছিলেন। তিনি তো বছর আষ্টেক আগে নিরুদ্দেশ।

কী নাম ছিল ভদ্রলোকের?

যদুবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন,—পান্নাবাবু।

কর্নেল বললেন,—সেই পোড়োখনিটা কোথায় আপনি কি জানেন?

যদুবাবু মাথা দোলালেন,—না। বাবার এক উদ্ভট খেয়াল ছাড়া আর কী বলব? নিজেদের সব খনি অ্যাবন্ডান্ড্ হয়ে গেল। আবার একটা অ্যাবান্ডান্ড্ খনি কিনে বসলেন পঞ্চাশ হাজার টাকায়। কী অদ্ভুত ব্যাপার, না?

খনিটা কোথায়, দলিলটা দেখতে পেলে জানা যেত। কর্নেল চিন্তিতভাবে বললেন। সমস্যা হল যে দলিলটা আনরেজিস্টার্ড। কাজেই রেজেস্ট্রি অফিসে তার কপি মিলবে না।

এতক্ষণে বললুম,—পোড়োখনির ভেতর কোনো দামি জিনিস—ধরুন গুপ্তধন লুকোনো ছিল না তো?

যদুবাবু নড়ে বসলেন। ঠিক, ঠিক। কী আশ্চর্য! এ-কথাটা তো আমার মাথায় আসেনি! আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন জয়ন্তবাবু! ইশ্, কেন যে দলিল থেকে ওই পোড়োখনির সীমানা-চৌহদ্দি টুকে রাখিনি!

দশরথ চা এনে দিল। তারপর গাল চুলকে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বলল,—করাড়ি রোটি মিলা হ্যায় স্যার?

কর্নেল প্যান্টের পকেট থেকে সত্যি সত্যি একটুকরো করাড়ি রোটি বের করে ওকে দিলেন। দশরথ সেটা ভক্তিভরে দুহাতে নিয়ে মাথায় ঠেকাল। তারপর খুশি হয়ে বেরিয়ে গেল। যদুবাবু বললেন,—এখানকার লোকের এই এক অদ্ভুত বিশ্বাস! ওই কুৎসিত পদার্থটা খেলে নাকি বুড়োরাও যুবকের শক্তি ফিরে পায়। তবে দশরথ করাড়ি রোটি খেলে কী হবে? গাঁজা খায় যে! গাঁজা ওটার সব গুণ নষ্ট করে দেবে।

দশরথ বাইরে থেকে প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলল,—রামজির কিরিয়া বড়বাবু! হামি কভি গাঁজা পিই না।

যদুবাবু ধমক দিয়ে বললেন,—খাস না! তাই রাতে ডাকলে তোর সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না!

একটু পরে চা খেতে খেতে বললুম,—কর্নেল, নন্দবাবুর সেই পোড়োখনিটাতে গুপ্তধন থাকার ব্যাপারে আপনার কী মতামত, এখনও বলেননি কিন্তু!

কর্নেল কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিলেন, সেই সময় বাইরে পায়ের ধুপধাপ শব্দ শোনা গেল। তারপর কেউ দৌড়ে বারান্দায় উঠল। যদুবাবু বললেন,—কে? কে? বাইরের লোকটা সশব্দে আছাড় খেল যেন। কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। এই সময় দশরথের চাপা আর্তনাদ শোনা গেল, হায় রাম! এত্তা খুন!

বাইরের আলোটা মিটমিটে। আমরা হন্তদন্ত বেরিয়ে দেখি, বারান্দায় রুদ্রবাবু পড়ে আছেন। তাঁর গলার কাছে ক্ষতচিহ্ন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে। যদুবাবু হুমড়ি খেয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, রুদ্র! রুদ্র! কে তোর এ দশা করল রে? তারপর হাঁউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন ছেলেমানুষের মতো।

কর্নেল রুদ্রবাবুর দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, রুদ্রবাবু! কে আপনাকে মেরেছে?

রুদ্রবাবু অতিকষ্টে বললেন,—বিশ্বাসঘাতক! তারপর তাঁর শরীর স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে স্থির হয়ে গেল। বুঝলুম, বেচারার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। আর ঠিক তখনই বাগানের গাছপালার ওদিকে কোথাও সেই চুরাইলের ডাক শোনা গেল ... আঁ—আঁ—আঁ—ইঁ—ইঁ—ইঁক!

একটা প্রচণ্ড বিভীষিকার রক্ত-হিম-করা আতঙ্ক আমাদের কয়েক মুহূর্তের জন্য নিঃসাড় করে ফেলল।

চার

রাতে ভালো ঘুম হয়নি। পুলিশ এসে প্রাথমিক তদন্ত করে মর্গে লাশ চালান দিয়েছিল। পুলিশের হাবভাবে বুঝেছিলাম, দায়সারা করে চোর-ডাকাতের ওপরই ব্যাপারটা চাপাতে চায়। কর্নেলকে মোটেও পাত্তা দেয়নি পুলিশ। সকালে দশরথ চা এনে যখন আমার ঘুম ভাঙাল, তখন আটটা বেজে গেছে। উঠে দেখলুম, কর্নেল নেই। দশরথ বলল,—কর্নেল স্যার সুবেসে বেরিয়েছেন। কুছু বোলেননি।

কর্নেল ফিরলেন ঘণ্টাখানেক পরে। জিজ্ঞেস করলে বললেন,—মর্গে গিয়েছিলুম। মর্গের ডাক্তারের মতে, পাণ্ডেজি আর মিছিরজির মতো কেউ রুদ্রবাবুর মুণ্ডু কাটার চেষ্টা করেছিল।

বললুম,—রুদ্রবাবু মৃত্যুর আগে 'বিশ্বাসঘাতক' বলেছেন কর্নেল। ব্যাপারটা রহস্যময় নয়?

কর্নেল সায় দিয়ে বললেন,—তা তো বটেই! তবে পুলিশ বলছে, খুনী রুদ্রবাবুর পরিচিত লোক। আর খুনের উদ্দেশ্য হল ছিনতাই।

অবাক হয়ে বললুম,—ছিনতাই! উনি কি ওই মাঠে টাকাকড়ি নিয়ে বসেছিলেন?

হ্যাঁ। কারণ আজ ভোরে পুলিশ ইন্সপেক্টর পরমজিৎ সিং পোড়োখনির ওখানে কোথায় রক্তমাখা একশো টাকার নোটের বান্ডিল কুড়িয়ে পেয়েছেন। ছিনতাই করে পালাবার সময় খুনীর হাত থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে।

অত টাকা নিয়ে ওখানে কী করছিলেন রুদ্রবাবু? পেলেনই বা কোথায় অত টাকা?

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—এমনও তো হতে পারে, খুনীরই টাকা ওগুলো। অর্থাৎ রুদ্রবাবু সেই দলিলটা চুরি করে তাকেই বেচতে গিয়েছিলেন। দলিল হাতিয়ে এবং টাকা মিটিয়ে হঠাৎ খুনী তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। রুদ্রবাবু আহত অবস্থায় কোনোরকমে পালিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু টাকার বান্ডিলটা পড়ে যায়।

তাও হতে পারে বৈকি।

কর্নেল কিছুক্ষণ গুম হয়ে সাদা দাড়ি টানতে শুরু করলেন। বুঝলুম, সূত্র হাতড়াচ্ছেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—এসো জয়ন্ত, আমরা একবার পাণ্ডেজির গদি থেকে ঘুরে আসি।

রাস্তায় যেতে যেতে বললুম,—কিন্তু একটা রহস্য কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না। রুদ্রবাবুর পিছন পিছন চুরাইল বা শাঁখচুন্নিটাও ছুটে এসেছিল। তার চিৎকার আমরা শুনতে পেয়েছিলুম। এখন কথা হল ...

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—আরও জট পাকিয়ে যাবে, ডার্লিং! এখন সবচেয়ে দরকারি কাজ হল মাথা ঠাণ্ডা রাখা। চুরাইল-রহস্য নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আপাতত শুধু হত্যাকাণ্ডের দিকে লক্ষ্য রেখে এগোতে চাই।

ভিড়ে ভরা বাজার এলাকা ছাড়িয়ে আমরা স্টেশনে পৌঁছলুম। পাণ্ডেজির গদি স্টেশনের ওধারের। ওদিকটায় চুন-সুরকির আড়ত, কাঠগোলা, ছোট কলকারখানা। আর কিছু চা-সিগারেটের দোকান আছে। একখানে প্রকাণ্ড তরাজুতে খন্দের বস্তা বোঝাই হচ্ছে। কর্নেলকে দেখতে পেয়ে একজন ফর্সা সুশ্রী চেহারার ভদ্রলোক উঁচু তক্তপোশ থেকে নেমে এসে নমস্কার করলেন। কর্নেল পরিচয় করিয়ে দিলেন, পাণ্ডেজির জামাই মোহনবাবু। মোহনবাবু পরিষ্কার বাংলা বলেন। খুব খাতির করে বসালেন। চা-সন্দেশ এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

কর্নেল বললেন,—মোহনজি, আপনাকে পুরনো খাতাপত্র দেখতে বলেছিলুম গতকাল। দেখেছেন কি?

মোহনজি পেছনের তাক থেকে একটা প্রকাণ্ড পুরনো খাতা নামিয়ে বললেন,—দেখেছি কনের্ল। শ্বশুরমশাই নিজে এই খাতাটা লিখতেন। এটা ওঁর মহাজনি কারবারের খাতা। এই দেখুন, এই পাঁচজন খাতকের নাম আমি খুঁজে বের করেছি। এঁরা প্রত্যেকেই মোটা টাকা ধার নিয়েছিলেন। এখনও কারুর কারুর বাকি আছে।

খাতার ভেতর থেকে একটা চিরকুট বের করে দিলেন মোহনজি। কর্নেল সেটা দেখতে থাকলেন। উঁকি মেরে দেখলুম, নামগুলো ইংরেজিতে লেখা। সাত নম্বর নামটা দেখে চমকে উঠলুম। রুদ্রনারায়ণ দেব—তিন হাজার টাকা। সুদের হার শতকরা মাসে তিরিশ টাকা। পুরোটাই বাকি।

কর্নেল বললেন,—হ্যান্ডনোটগুলো পেয়েছেন মোহনজি?

মোহনবাবু বললেন,—হ্যাঁ। ছখানা পেয়েছি। একখানা পাইনি। মনে পড়ছে, ওই হ্যান্ডনোটখানার জন্য শ্বশুরমশাই মিছরজিকে খুব বকাবকি করছিলেন। মিছরজিকে উনি খুব বিশ্বাস করতেন তো! আলমারির চাবি অনেক সময় মিছিরজির কাছেও থাকত।

কর্নেলের চোখ দুটো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। বললেন,—কবে বকাবকি করছিলেন মনে আছে?

এই তো—যে-রাতে শ্বশুরমশাই খুন হলেন, তার আগের দিন।

মিছিরজি খুন হল তার পরের রাতে। তাই না?

হ্যাঁ। মোহনবাবু একটু অবাক হলেন যেন। বললেন,—আপনি কি মনে করছেন হ্যান্ডনোট হারানোর সঙ্গে ওঁদের খুন হওয়ার সম্পর্ক আছে?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

মোহনবাবুকে উত্তেজিত দেখাল। কিন্তু আমিও যে সে-রাতে চুরাইলের ডাক শুনেছিলাম, কর্নেল! কাল রাতে যদুবাবুর ভাইয়ের বেলাতেও শুনলুম নাকি চুরাইল ডেকেছিল!

হ্যাঁ। ডেকেছিল। আমিও শুনেছি।

মোহনবাবু আরও উত্তেজিতভাবে চাপা গলায় বললেন,—তাছাড়া শ্বশুরমশাইয়ের ডেডবডিতে যেমন, তেমনি মিছিরজির ডেডবডিতেও একফোঁটা রক্ত ছিল না। মর্গের রিপোর্টেও সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি স্থানীয় বুড়োবুড়িদের জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন, চুরাইল নাকি মানুষের মুণ্ডু ছিঁড়ে গলা থেকে রক্ত চুষে খায়। রুদ্রবাবুর বেলায় অবশ্য মুণ্ডু ছিঁড়ে রক্তচোষার সুযোগ পায়নি শুনেছি। তবে গলায় নখ বসিয়ে মুণ্ডু ছিঁড়তে চেষ্টা করেছিল। তাই কিনা বলুন?

কর্নেল আস্তে বললেন,—ও নিয়ে পরে ভাবা যাবে। এবার বলুন, এই তালিকার কোন্ খাতকের হ্যান্ডনোট পাওয়া যায়নি।

মোহনবাবু তালিকার একটা নামে ডটপেনের চিহ্ন দিয়ে বললেন,—এঁর। কিন্তু সমস্যা হল, ইনি পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়েছেন বছর-দশেক আগে। সুদে-আসলে এখন দাঁড়িয়েছে ... মাই গুডনেস! হিসেবে ভুল হয়নি তো?

কর্নেল দেখে নিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন,—না। মাসেই যদি শতকরা তিরিশ টাকা সুদ হয়, তাহলে একমাসে পাঁচ হাজার টাকার সুদ হবে পনেরো'শ টাকা। বছরে আঠারো হাজার টাকা। দশ বছরে দাঁড়াবে একলক্ষ আশি হাজার টাকা। সুদসহ ১,৮৫,০০০ টাকা। সহজ হিসেব।

মোহনবাবু হতাশ মুখে হাসলেন। কিন্তু খাতক ভদ্রলোকই তো সেই থেকে নিরুদ্দেশ।

আমার মাথায় গতরাতে যদুবাবুর কাছে শোনা একটা নাম ঝিলিক দিল। বলে ফেললুম,—সেই খনিমালিক নন্দনবাবুর পিসতুতো না মাসতুতো দাদা পান্নাবাবু নন তো?

মোহনবাবু বললেন,—ঠিক, ঠিক। পান্নালাল ওঝা। আমি তাঁকে কখনও দেখিনি। কারণ আমার বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক আগে। তাছাড়া থাকতুম ধানবাদে। গতবছর শ্বশুরমশাইয়ের অনুরোধে ওঁর ব্যবসার দেখাশুনা করতে এসেছি।

ওপাশে একজন বৃদ্ধ কর্মচারী খাতা লিখতে-লিখতে আমাদের কথা শুনছিলেন। বললেন, —পান্নাবাবুর কন্ট্রাক্টারি কারবার ছিল। লেবার সাপ্লাই করতেন। সেবার কারবারে লস খেয়ে বিপদে পড়েছিলেন। পাণ্ডেজি সেদিন ওঁকে পাঁচ হাজার টাকা না দিলে লেবাররা ওঁকে মেরে ফেলত। মজুরি মেটাতে পারছিলেন না।

কর্নেল বললেন,—পান্নাবাবুর চেহারা কেমন ছিল?

বৃদ্ধ কর্মচারীটি বাঙালি। বললেন,—রোগা, ঢ্যাঙা মতো। রঙটা বেশ ফর্সা। চোখ দুটো ছিল খয়রা—যাকে বলে বেড়ালচোখো।

কর্নেল মোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন,—পাণ্ডেজি টাকা আদায়ের জন্য মামলা করেননি?

সেই বাঙালি কর্মচারী ভদ্রলোক বললেন,—জামাইবাবু জানেন না। মামলা করেছিলেন পাণ্ডেজি। দেওয়ানি মামলা, তাতে অন্যপক্ষ গরহাজির। শেষে পাণ্ডেজি প্রতারণার মামলা করেছিলেন। পান্নাবাবুর নামে হুলিয়া জারি হয়েছিল। কিন্তু ওঁকে পুলিশ খুঁজে পায়নি।

মোহনবাবু বললেন,—আশ্চর্য, শ্বশুরমশাই এ-কথাটা তো বলেননি!

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—চলি মোহনজি! দরকার হলে আবার আসব।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসে কর্নেল বললেন,—এসো তো জয়ন্ত, আমরা রেললাইন ধরে পোড়োখনি এলাকায় যাই। দিনদুপুরে আশা করি চুরাইলটার আবির্ভাব ঘটবে না।

পোড়োখনির উত্তর-পূর্বে জঙ্গল আর টিলার ভেতর দিয়ে রেললাইনটা ঘুরে গেছে ধানবাদের দিকে। কিছুক্ষণ পরে আমরা রেললাইন থেকে নেমে একটা টিলার পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকলুম। এদিকটায় অজস্র খানাখন্দ, বড়-বড় পাথর, লালমাটির ঢিবি আর ঝোপঝাড়। এক জায়গায় গিয়ে কর্নেল হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। বললাম,—কী?

কর্নেলকে উত্তেজিত মনে হল। চাপা গলায় বললেন, —আরে! সাধুবাবা যে!

চমকে উঠে বললুম—কই, কই?

কর্নেল আচমকা হ্যাঁচকা টানে আমাকে বসিয়ে দিলেন এবং নিজেও বসলেন। ফিসফিস করে বললেন,—এসো, আমরা গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যাই। সাবধান, যেন সাধুবাবা দেখতে না পায়।

সাধুবাবাকে আমি দেখতে পাইনি। কর্নেলের পেছনে-পেছনে ছোটবড় পাথর, ঝোপঝাড় আর ঢিবির আড়ালে অন্ধের মতো প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। প্রকাণ্ড একটা পাথর দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পাথরটার একপাশে ঘন ঝোপঝাড়। সেখানে হাঁটু দুমড়ে বসে কর্নেল ঝোপের ভেতর উঁকি দিলেন। দেখাদেখি আমিও উঁকি দিলুম। একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল।

লাল-কাপড়-পরা সেই সাধুবাবা যেন পিঙ্কির কুকুর কুকির সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন। কিন্তু ধারেকাছে কোথাও পিঙ্কি নেই।

পিঙ্কি নেই। অথচ কুকি আছে। ব্যাপারটা আমার গোলমেলে মনে হল। কিন্তু ওকি সত্যি লুকোচুরি খেলা? কুকি পাথরের আড়ালে লুকোতেই সাধুবাবা একটুকরো পাথর তুলে ছুড়ে মারলেন। কুকি আবার আরেকটা পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিল। সাধুবাবার মুখের চেহারা দেখে চমকে উঠলুম। রাগে খেপে গেছেন যেন। আবার পাথর কুড়িয়ে ছুড়ে মারলেন। অল্পের জন্য কুকি বেঁচে গেল। এবার সে আমাদের দিকে দৌড়তে শুরু করল। সাধুবাবা তাড়া করে আসতেই একটা খাদে আছাড় খেয়ে পড়লেন। খাদটা গভীর বলে মনে হল। ততক্ষণে কুকি যেন আমাদের অস্তিত্ব টের পেয়েছে। সে সোজা এসে ঝোপে ঢুকল। কর্নেল মৃদু শিস দিলেন। কুকি থমকে দাঁড়াল। এতক্ষণে দেখলুম, তার মুখে একটা ছোট্ট হ্যান্ডব্যাগ রয়েছে। কর্নেল আবার শিস দিলে সে কাছে চলে এল। কর্নেল তাকে কোলে তুলে নিয়ে তার মুখের হ্যান্ডব্যাগটা ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন, —শিগগির জয়ন্ত! সাধুবাবাকে এখনই ধরে ফেলতে হবে!

ঝোপ থেকে বেরিয়ে গেলুম। কর্নেল আমার পিছনে। তাঁর কোলে কুকি। সাধুবাবা এতক্ষণে গর্ত থেকে উঠেছেন। কিন্তু আমাদের দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। আমি রিভলবার বের করে চেঁচিয়ে বললুম,—খবরদার সাধুবাবা! পালাবার চেষ্টা করলে গুলি ছুঁড়ব।

সাধুবাবা অমনি দৌড়ে গিয়ে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন। আমিও দৌড়লুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে আর তাঁর পাত্তা পেলুম না। আশেপাশে খোঁজাখুঁজি করে হন্যে হয়ে কর্নেলকে ডাকলুম। একটু তফাতে কর্নেল কোনো অদৃশ্য জায়গা থেকে সাড়া দিয়ে বললেন,—এখানে চলে এসো জয়ন্ত!

একটা পোড়োখনির মুখই হবে। বিরাট গর্ত। সেই গর্তে কি কর্নেল সাধুবাবার মতো পা হড়কে পড়ে গেছেন? কাছে গিয়ে দেখি, আরও অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটেছে। গর্তের ভেতর বেচারি পিঙ্কির মুখ একটুকরো লাল কাপড়ে বাঁধা। দু'হাত এবং পা-দুটো লতা দিয়ে বাঁধা। কুকি তার দিকে যেন অবাক চোখে তাকিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেল তার বাঁধন কেটে দিচ্ছেন ছুরি দিয়ে।

কর্নেল বললেন,—আমরা না এসে পড়লে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হত, ভেবে শিউরে উঠছি জয়ন্ত!

পিঙ্কি কিন্তু মোটেও ঘাবড়ে যায়নি। দিব্যি উঠে দাঁড়াল। তারপর কুকিকে কোলে নিয়ে দুবার তার গালে চড় মারল,—আর যদি কখনও গুহায় ঢুকিস, তোকে মেরে ফেলব বলে দিচ্ছি!

কর্নেল তাকে ওপরে তুলে ধরলেন। আমি টেনে নিলুম। তারপর কর্নেলকে উঠতে সাহায্য করলুম। কর্নেল পিঙ্কির কাঁধে হাত রেখে বললেন,—তোমাকে সাধুবাবা কেন বেঁধে রেখেছিল, পিঙ্কি?

পিঙ্কি বলল,—কুকি সাধুবাবার ব্যাগ নিয়ে এসেছিল গুহার ভেতর থেকে। সাধুবাবা ওর পেছন-পেছন এসে আমাকে বলল, পিঙ্কি, তোর কুকুর আমার ব্যাগ চুরি করেছে। পিঙ্কি হাসতে লাগল। আমি বললুম, সাধুবাবা! তুমি পারো তো ওর কাছে চেয়ে নাও। তখন সাধুবাবা রেগে গেল। গিয়ে চোখ কটমট করে বলল—তোকে চুরাইল দিয়ে খাওয়াব। তারপর আমার মুখ বেঁধে দিল।

তুমি বাধা দাওনি?

পিঙ্কি খিলখিল করে হাসল। কেন? সাধুবাবার সঙ্গে আমার খুব ভাব যে! রোজ দেখা হয়। কত গল্প বলে। আমার সঙ্গে তো জোক করেছে সাধুবাবা!

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—জোক্ নয়, পিঙ্কি! সাধুবাবা তোমাকে সত্যি চুরাইলের সমানে ঠেলে দিত। আর কখনো সাধুবাবার কাছে এসো না।

পিঙ্কি মুখে অবিশ্বাস ফুটিয়ে বলল,—যাঃ!

কর্নেল বললেন,—সাধুবাবা কোন গুহায় থাকেন তুমি জানো?

পিঙ্কি মাথা দুলিয়ে বলল,—হুঁ। বলে সে চেঁচিয়ে ডাকল, সাধুবাবা! সাধুবাবা! কোথায় তুমি?

অমনি আমাদের সামনে একটা পাথর এসে পড়ল। কর্নেল বললেন,—শিগগির এখান থেকে কেটে পড়াই ভালো, জয়ন্ত। পিঙ্কি, চলো! সাধুবাবা পাথর ছুঁড়তে শুরু করেছে।

পিঙ্কিকে টানতে টানতে কর্নেল দৌড়লেন। কুকি তার কোল থেকে লাফিয়ে পড়ার জন্য ছটফট করছিল। কিন্তু পিঙ্কি কুকিকে ছাড়ল না। এদিকে দুমদাম করে পাথর এসে পড়ছে ঢিবির আড়াল থেকে। ফাঁকা মোটামুটি সমতল একটা জায়গায় পৌঁছে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে এবার পিঙ্কিদের বাড়ির পথ ধরলুম। কর্নেল বললেন,—পিঙ্কি, ওবেলা তোমাকে নিয়ে আসব। তখন সাধুবাবার গুহাটা দেখিয়ে দেবে। এখন সাধুবাবা বড় চটে গেছে। পিঙ্কি মাথা দুলিয়ে সায় দিল ...

পাঁচ

সাধুবাবার হ্যান্ডব্যাগটার দশা জরাজীর্ণ। খুলতেই আমার চক্ষু চড়কগাছ। প্রথমে বেরুল নন্দবাবুর সেই পোড়োখনি বিক্রির আন রেজিস্টার্ড দলিল। দলিলে রক্তের ছোপ লেগে আছে। কাল রাতে, রুদ্রবাবুর কাছ থেকে এটা নেওয়া হয়েছিল।

তারপর বেরুল পাণ্ডেজির হারানো হ্যান্ডনোট। পান্নালাল ওঝার সই করা। পাঁচ হাজার টাকা কর্জ নিচ্ছেন পান্নাবাবু শতকরা মাসিক তিরিশ টাকা সুদে। আর বেরুল কিছু কাগজপত্র। বললুম, —তাহলে পোড়োখনির সাধুবাবাই দেখছি পান্নালাল ওঝা।

কর্নেল বললেন,—আবার কে? দেনা আর প্রতারণার মামলায় ফেরার হয়ে পান্নালাল পোড়োখনির ভেতর কোনো গুহায় আত্মগোপন করেছিল,আমার ধারণা ...

কথায় বাধা পড়ল। যদুবাবা আর মোহনজি এলেন। মোহনজি ঘরে ঢুকে বললেন,—শ্বশুরমশাইয়ের একটা নোটবইয়ের ভেতর এই চিঠিটা হঠাৎ পেয়ে গেলুম। চিঠিটা পড়ে মনে হল, এটা একটা ক্লু হতে পারে। দেখুন তো কর্নেল।

কর্নেল চিঠিটা পড়ে বললেন,—হ্যাঁ, ঠিক। এমনটি অনুমান করেছিলুম। চিঠিতে পান্নাবাবু ইংরেজিতে লিখেছেন, ৫ মার্চ রাত বারোটা নাগাদ স্টেশনে পাণ্ডেজি গেলে পান্নাবাবু তাঁকে দলিলটা দেবেন।

যদুবাবু চমকে উঠে বললেন,—কীসের দিলল?

নন্দবাবুর দলিল। অথচ আমরা জানি, তখনও দলিল আপনার মায়ের আলমারিতে ছিল। মাত্র গতকাল সেটা রুদ্রবাবু চুরি করেছিলেন। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, পাণ্ডেজিকে মিথ্যা লোভ দেখিয়ে অত রাতে বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন পান্নাবাবু। উদ্দেশ্য হল, তাঁকে খুন করা।

মোহনজি মৃদু স্বরে বললেন,—কীসের দলিল?

কর্নেল বললেন,—যদুবাবুর কাছে শুনবেন। তবে বোঝা যাচ্ছে, পাণ্ডেজিরও দলিলটার ওপর লোভ ছিল। প্রচণ্ড লোভই বলব। নইলে অত রাতে বাড়ি ছেড়ে যাবেন কেন? তাছাড়া দলিলের বদলে নিশ্চয় পান্নাবাবু কিছু দাবি করেছিলেন। কী দাবি হতে পারে সেটা? নিশ্চয় কর্জ শোধ। এক লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকার বদলে ওই দলিলটা খুব দামি মনে হয়েছিল পাণ্ডেজির কাছে। কেন, বুঝতে পারছ কি জয়ন্ত?

আমি কিছু বলার আগেই যদুবাবু বলে উঠলেন,—পোড়োখনির ঠিকানা দলিলেই ছিল। দেখা যাচ্ছে, পাণ্ডেজিও জানতে পেরেছিলেন, নন্দবাবুর ওই পোড়োখনির ভেতর বহুমূল্য কিছু জিনিস আছে। ভারি আশ্চর্য তো!

কর্নেল বললেন,—মিছিরজিকে দিয়ে পান্নাবাবুই হ্যান্ডনোটটা চুরি করিয়েছিলেন বোঝা যায়। ওটা না থাকলে পাণ্ডেজি বা তাঁর জামাই কেউই পান্নাবাবুর কাছে আইনত টাকা দাবি করতে পারছেন না। পান্নালাল ওঝা অতি ধূর্ত লোক দেখা যাচ্ছে।

মোহনজি বললেন,—কিন্তু মিছিরজিকে কেন খুন করবেন পান্নাবাবু!

যে উদ্দেশ্যে রুদ্রবাবুকে খুন করেছেন, সেই উদ্দেশ্যেই অর্থাৎ জিনিস হাতিয়ে নিয়েছেন যে টাকা দিয়ে, সেই টাকা আবার পান্নাবাবুর পকেটে ফিরে আসতে পারে—যদি ওঁদের তিনি খুন করেন। নির্বোধ মিছিরজি টাকার লোভে পান্নাবাবুকে হ্যান্ডনোট ফেরত দিতে গেলেন। টাকাও পেলেন। কিন্তু তাঁকে খুন করে সেই টাকাগুলো কেড়ে নিলেন পান্নাবাবু। রুদ্রবাবুর বেলাতেও একই ব্যাপার।

বলে কর্নেল একটু হাসলেন। যদুবাবু, আপনাদের হারানো দলিল আমার হাতে ফিরে এসেছে।

যদুবাবু লাফিয়ে উঠলেন। বলেন কী। কোথায় পেলেন?

সময়ে জানতে পারবেন। তবে একটা কথা, আপনার মেয়ে পিঙ্কির কি স্কুলের ছুটি আজ?

না তো। বাড়িতে অমন একটা ঘটনা ঘটল, তাই ওকে স্কুল যেতে দিইনি। কেন?

পিঙ্কি যেন একা কোনোভাবে বাড়ির বাইরে না যেতে পারে। খুব সাবধান। বিকেলে আমি একবার অবশ্য ওকে নিয়ে বেরুব। কিন্তু একা যেন ও না বেরোয়।

যদুবাবু উদ্বিগ্নমুখে বললেন,—ঠিক আছে, কিন্তু কেন?

কর্নেল হাসলেন। বললুম তো। সময়ে সবই জানতে পারবেন।

মোহনজি বললেন,—সবই ধাঁধা থেকে গেল, কর্নেল। আপনি বলছেন, পান্নাবাবুই খুনী। কিন্তু ওরকম বীভৎসভাবে খুন—মুণ্ডু কাটা এবং রক্তহীন বডি। আর এই ভয়ঙ্কর চিৎকার।

যদুবাবু বললেন,—ঠিক ঠিক। চুরাইলের ব্যাপারটা তাহলে কী?

কর্নেল হাই তুলে বললেন,—আশা করি, আজ রাতেই চুরাইলের রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে।

যদুবাবু ও মোহনজি বেরিয়ে গেলেন। ঘড়ি দেখলাম, সাড়ে বারোটা বাজে প্রায়। কর্নেল আরামকেদারায় চিত হয়ে চোখ বুজে চুরুট টানতে থাকলেন।

একটু পরে বললুম,—আচ্ছা কর্নেল, নন্দবাবুর পোড়োখনির ঠিকানা তো পাওয়া গেছে। ওর ভেতর যদি সত্যি গুপ্তধন থাকে, তাহলে যদুবাবুই তো তার মালিক হবেন?

কর্নেল চোখ বুজে ছিলেন। চোখ খুলে বললেন,—না জয়ন্ত! তুমি ভাবছ, ওখানে সোনাদানা হিরে-জহরত লুকনো আছে। সাধুবাবা ওরফে পান্নাবাবুর হ্যান্ডব্যাগে বিদেশের এক কোম্পানির লেখা একটা চিঠি আছে। একপলক চোখ বুলিয়েই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। পান্নাবাবু গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল করে বেড়াচ্ছিলেন। না—সোনাদানা লুকনো নেই। ওটা আসলে একটা ইউরেনিয়ামের খনি। পান্নাবাবু ওই বিদেশি কোম্পানিকে গোপনে ইউরেনিয়াম বেচতে চেয়েছিলেন। কোম্পানি তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে চেয়েছে। তাই পান্নাবাবু হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

অবাক হয়ে বললুম—তাহলে আইনত সরকার এর মালিক হবেন, তাই না?

হ্যাঁ। খনিটা ছিল ব্রিটিশ আমলের কোন্ সায়েবের। নিছক অভ্রের খনি। অভ্র তোলা শেষ হলে দৈবাৎ ইউরেনিয়ামের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল নীচের স্তরে। কিন্তু সেই সায়েবকে কোনো কারণে দেশে ফিরতে হয়। যাবার সময় নন্দবাবুকে বেচে দিয়েছিলেন। কর্নেল তাঁর প্রকাণ্ড ব্যাগের দিকে আঙুল তুলে ফের বললেন,—ওই ব্যাগে একটা বই আছে। পড়ে দেখো। ওতে নন্দবাবুর কথা নেই। কিন্তু এদেশের খনির ইতিহাস আছে। প্রচুর তথ্য আছে। ভৈরবগড়ের খনির কথাও আছে। ব্রিটিশ আমলে খনিবিজ্ঞানীরা ভৈরবগড় অঞ্চলে ইউরেনিয়াম থাকার সম্ভাবনা স্বীকার করেছিলেন।

ব্যাগ থেকে বইটা বের করে পাতা উলটে বললুম,—এসব পড়ার ধৈর্য আমার নেই। কিন্তু আপনার ব্যাগের ভেতর প্যাকেট-করা প্রকাণ্ড বস্তুটি কী?

কর্নেল হাসলেন। কুমোরটুলির ভাস্কর দেবেন পালের আশ্চর্য ভাস্কর্য।

আপনার সেই কাটামুণ্ডু! সঙ্গে নিয়ে এসেছেন দেখছি! ব্যাপার কী?

কর্নেল চোখ বুজে বললেন,—আজ রাতে ম্যাজিক দেখাব, ডার্লিং! কাটামুণ্ডু কথা বলবে।

ছয়

দুপুরে আমার চিরদিন বাঙালির প্রিয় ভাতঘুমের অভ্যাস। গতকাল ভাতঘুমের সুযোগ পাইনি। আজ আমাকে সে লম্বা করিয়ে ছাড়ল। দশরথের ডাকে উঠে দেখি, পাঁচটা বাজে! চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলুম, কর্নেল কোথায় গেলেন?

দশরথ বলল,—কর্নিল স্যার পিঙ্কিদিদিকি সাথ ঘুমতে গেছেন।

মনে পড়ল, সাধুবাবার গুহা দেখাতে নিয়ে যাবার কথা ছিল পিঙ্কির। চা খেয়ে বাগানের শেষপ্রান্তে গিয়ে পোড়োখনি এলাকার দিকে কর্নেল ও পিঙ্কিকে খুঁজলুম। কিছুক্ষণ পরে দুজনকে দেখতে পেলুম। কুকি কর্নেলের কাঁধে চেপেছে। পিঙ্কি হাত নেড়ে কথা বলতে বলতে আসছে। কর্নেল তার কাঁধে একটা হাত রেখে হেঁটে আসছেন।

মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে মুখোমুখি হলুম ওঁদের। কর্নেল বললেন,—তুমি ঘুমোচ্ছ বলে ডাকিনি ডার্লিং! আশা করি, তোমার রাতের ঘুমটা পুষিয়ে গেছে।

বললুম,—সাধুবাবার আস্তানায় ঢুকেছিলেন নাকি?

কুকিকে পাঠিয়েছিলুম ওঁর হ্যান্ডব্যাগ ফেরত দিতে।

সে কী!

হ্যাঁ। দলিল, হ্যান্ডনোট, যা কিছু ছিল, সব ফেরত দিয়েছি।

পিঙ্কি কুকিকে নিয়ে বাগানে খেলতে ব্যস্ত হয়েছে। সেইসময় যদুবাবু বেরিয়ে এসে ওকে টানতে-টানতে বাড়ি নিয়ে গেলেন।

বললুম,—এগুলো তো পান্নাবাবুর কীর্তির প্রমাণ। ওগুলো ফেরত দিলেন কেন?

পুলিশ ওঁকে যাতে বমাল ধরতে পারে, তার জন্য। কারণ ওগুলো আমার কাছে থাকলে পান্নাবাবু ধরা পড়ার পর আদালতে বলতেই পারেন, ওগুলো যে তাঁর কাছে ছিল, তার প্রমাণ কী? অর্থাৎ উনি হ্যান্ডনোটটা মিছিরজির কাছে হাতিয়েছিলেন, কিংবা দলিলটা রুদ্রবাবুর কাছে, এর তো প্রমাণ নেই। আদালতে কুকুরের প্রমাণ গ্রাহ্য হবে না। বেচারা কুকি তো আর বলতে পারবে না যে সে সাধুবাবার ডেরা থেকে করাড়ি রোটি ভেবে হ্যান্ডনোটটা কামড়ে নিয়ে এসেছিল! আর পিঙ্কি তো দেখেনি এর ভেতর কী আছে। হ্যাঁ—বলবে হ্যান্ডব্যাগটা সে দেখেছিল কুকির মুখে। কিন্তু ওটা যে পান্নাবাবুর, তা তো প্রমাণ করা যাবে না।

কেন? বিদেশি কোম্পানির সেই চিঠিটা?

কর্নেল হাসলেন। লোকটা মহা ধড়িবাজ। চিঠিতে যে নাম ঠিকানা আছে, তা পান্নাবাবুর নয়। জনৈক এম এম বোসের নাম-ঠিকানা। তাও কলকাতার। পান্নাবাবু কলকাতার ওই ঠিকানায় নাম ভাঁড়িয়ে কিছুদিন ছিলেন সম্ভবত। যাক্‌গে, এসো ডার্লিং! এবার রাতের জন্য প্রস্তুত হওয়া যাক।

এরপর কর্নেল যা সব করলেন, তার মাথামুণ্ডু খুঁজে পেলুম না। যদুবাবুর সঙ্গে চুপিচুপি কী কথাবার্তা বললেন। তারপর দেখলুম, যদুবাবু দশরথকে ডেকে তেমনি চুপিচুপি কী সব বললেন। দশরথ বেরিয়ে গেল। আমার প্রশ্নের জবাবে কর্নেল শুধু বললেন,—একটু পরই বুঝবে জয়ন্ত! ধৈর্য ধরো।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দশরথ ফিরে এল একবোঝা খড় নিয়ে। যদুবাবু ভাইয়ের শোকে মুহ্যমান। অথচ তাঁর মুখেও একটু হাসির রেখা দেখা যাচ্ছিল। দশরথ ঘড়ে দড়ি জড়িয়ে একটা কিছু বানাচ্ছিল। একটু পরেই বুঝলুম, সে একটা মানুষ তৈরি করছে।

চুপচাপ দেখতে থাকলুম। মুণ্ডুকাটা একটা মানুষের আদল তৈরি হলে দশরথ তাতে ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ তাগড়াই করে ফেলল। এবার কর্নেল তাঁর ব্যাগ থেকে নিজের প্যান্ট-শার্ট বের করে মূর্তিটাকে পরালেন। তারপর গলার ওপর সেই কাটামুণ্ডুটা চেপে বসিয়ে দিতেই মূর্তিটা একেবারে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারে পরিণত হল।

সন্ধ্যা সাতটায় কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। বললেন,—এক্ষুনি ফিরে আসছি।

যদুবাবু ও দশরথের মুখে উত্তেজনা দেখা যাচ্ছিল। কর্নেলের ডামি তৈরি করে কাকে ফাঁদে ফেলার আয়োজন হচ্ছে, কে জানে! পান্নালাল ওঝা যদি অত ধূর্ত লোক হন, এই ফাঁদে কি তিনি পা দেবেন? যদুবাবু যেন আমার মনের কথা আঁচ করে মাথা নেড়ে বললেন,—খামোকা চেষ্টা করা। লোকটা খুব ঘড়েল বলে মনে হয় না জয়ন্তবাবু?

সায় দিলুম। দশরথ বলল,—হামার বহুত্‌ ডর বাজছে বড়বাবু! আমার না কুছ গড়বড় হয়ে যায়।...

কর্নেল আধঘণ্টা পরে ফিরে এসে বললেন,—দশরথ! ডামিটা ওঠাও। বাগানে নিয়ে চলো। যদুবাবু, আপনি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। বেরুবেন না যেন।

যদুবাবু চলে গেলেন। মনে হল ভয় পেয়েছেন খুব। দশরথ ডামিটা নিয়ে চলল। বাগানে অন্ধকার জমে আছে। কিন্তু টর্চ জ্বালতে বারণ করলেন কর্নেল। শেষপ্রান্তে গিয়ে ডামিটা একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা হল। কর্নেল ফিসফিস করে বললেন,—দশরথ, তুমি বাড়িতে গিয়ে দরজা আটকে দাও। আর শোনো, বাইরের দিকের সব আলো নিবিয়ে দাও এখুনি।

দশরথ পালিয়ে বাঁচল। কর্নেল আমার হাত ধরে একটা ঝোপের কাছে নিয়ে গেলেন। তারপর টেনে বসিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বললেন,—যে-কোনো মুহূর্তে চুরাইলের আবির্ভাব হবে। যেন ভয় পেও না।

কোনো কথা বললুম না। উত্তেজনায় এবং অজানা আতঙ্কে আমার অবশ্য বুক কাঁপছিল। রিভলবার আর টর্চ নিয়ে বসে রইলুম। কর্নেলের চাপা শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনছিলুম। বুঝতে পারছিলুম, উনিও খুব উত্তেজিত।

বাড়ির বাইরের আলোগুলো নিবে গেল। অন্ধকার আরও জমাট মনে হল এবার। কৃষ্ণপক্ষ শুরু হয়েছে বলে চাঁদ উঠতে দেরি হবে। দৃষ্টি একটু স্বচ্ছ হলে মিটার কুড়ি দূরে কর্নেলের ডামিটা অস্পষ্টভাবে টের পাওয়া গেল। বাতাসও কেন কে জানে, বইছে না আর। অন্ধকার রাতটা ক্রমশ বিভীষিকার আসন্ন আবির্ভাবে ঝিম মেরে যাচ্ছে। যদুবাবুর বাড়ির সব জানালা বন্ধ। অন্ধকারে বাড়িটা কালো হয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর কুকির ডাক শুনলুম। কেউ তাকে থামানোর চেষ্টা করছিল।

তারপরই চুরাইলের চিৎকার শুনতে পেলুম। আগের সন্ধ্যায়ও পোড়োখনিতে তার চিৎকার শুনেছিলুম। কিন্তু আজকের চিৎকার তার চেয়ে ভয়াবহ। যেন পোড়োখনির রক্তচোষা প্রেতিনী রক্তের গন্ধ পেয়ে খেপে গেছে। ভয়ঙ্কর আর অমানুষিক ওই চিৎকারে বুকের স্পন্দন যেন থেমে যাবে। তাকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু টের পাচ্ছি সে উল্‌টো পায়ে পিছু হেঁটে ক্রমশ এগিয়ে আসছে আর এগিয়ে আসছে। তার সাপের মতো চোখে পলক পড়ে না। একটানা বিকট চিৎকার করে চলেছে সে।

চিৎকারটা থেমে গেল হঠাৎ। তারপর কার কাশির শব্দ শুনলুম। তারপর কেউ অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে ইংরেজিতে বলল,—আসুন। আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

যে গাছে কর্নেলের ডামি দাঁড় করানো, তার কাছে মাটির ওপর টর্চের আলো পড়ল। আবছা আলোয় কর্নেলের ডামিটা দেখে মনে হল, অবিকল কর্নেল দাঁড়িয়ে আছেন।

লোকটা টর্চ নিবিয়ে চাপা গলায় ইংরেজিতে বলল,—তাহলে আপনি ব্র্যাগবো কোম্পানির প্রতিনিধি?

হ্যাঁ। আশা করি, আমার চিঠি পেয়েছেন।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতকার শাস্তি মৃত্যু, জানেন তো?

সে কী! ও কথার মানে?

মানে এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি! তারপর লোকটা বাংলায় বলে উঠল, তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি। চুরাইল তোমার মুণ্ডু ছেঁড়ার আগে সেকথা জেনে যাও। বলে সে তিনবার শিস দিল।

অমনি চুরাইলটা আবার বিকট চিৎকার করে উঠল। তারপর ধপাস করে একটা শব্দ হল। কর্নেল আমাকে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং টর্চ জ্বাললেন। আমিও টর্চ জ্বাললুম। বাগানের অন্যদিক থেকেও কয়েকটা টর্চ জ্বলে উঠল।

সেই আলোয় দেখলুম, কাল পোড়োখনিতে দেখা সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটা অথবা প্রেতিনী কর্নেলের ধরাশায়ী ডামির ওপর ঝুঁকে গলায় কামড় বসিয়েছে এবং লাল কাপড়-পরা সেই সাধু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রেতিনীর মাথায় মেয়েদের মতো চুল, হাতে শাঁখা!

সাধু পালাবার চেষ্টা করতেই বুটের শব্দ তুলে পুলিশ অফিসার আর কনস্টেবলরা দৌড়ে এলেন। তাকে ধরে ফেললেন।

এদিকে পোড়োখনির প্রেতিনী তখন ফড়ফড় করে খড় আর কাপড় ছিঁড়ছে। রক্ত না পেয়ে খেপে গেছে যেন। মুহূর্মুহু বিকট চিৎকার করে সে ডামিটা ফর্দাফাঁই করে ফেলছিল। কর্নেল এগিয়ে গিয়ে তার মুখে টর্চ ফেললেন। তখন সে মুখ তুলল। নীল জ্বলজ্বলে নিষ্পলক হিংস্র চোখ তার। মাথায় বড় বড় চুল। শাঁখা পরা হাতে ধারালো বাঁকানো নখ। বিকট গর্জন করে উঠে দাঁড়াতেই কর্নেল পর পর দুবার গুলি ছুড়লেন। প্রেতিনী নেতিয়ে পড়ে গেল। আমি দৌড়ে গেলুম কর্নেলের কাছে।

কর্নেল চুরাইলের মাথার চুল ধরে টান দিতেই উপড়ে গেল। কর্নেল হো হো করে হেসে বললেন,—স্ত্রীলোকবেশী এবং হাতে শাঁখা-পরা এই প্রাণীটিকে আশা করি, চিনতে পেরেছ জয়ন্ত!

কী আশ্চর্য! এটা একটা ভালুক না?

হ্যাঁ। ভালুকই বটে। তবে খুব শিক্ষিত ভালুক। ওকে পান্নাবাবু মানুষের রক্ত খাইয়ে রক্তলোভী করে তুলেছিলেন। কর্নেল একজন পুলিশ অফিসারকে বললেন,—মিঃ সিং! তাহলে আসামীকে আপনারা নিয়ে যান। আমি একটু পরে যাচ্ছি থানায়।

পুলিশ অফিসার হাসতে হাসতে কর্নেলের কাটামুণ্ডুটা কুড়িয়ে বললেন,—আপনার কাটামুণ্ডু কিন্তু চমৎকার কথা বলছিল। আপনি যে এত চমৎকার ভেন্ট্রিলোকুইজম্ জানেন, ভাবতে পারিনি। নিন আপনার কাটামুণ্ডু।

কর্নেল তাঁর কাটামুণ্ডু দেখে নিয়ে বললেন,—একটু রং চটে গেছে মাত্র। আবার কুমোরটুলি গিয়ে পালমশাইকে দেব।

ততক্ষণে বাড়ির বাইরের আলোগুলো আবার জ্বলে উঠেছে। যদুবাবু, দশরথ, পিঙ্কি আর তার কুকুর বেরিয়ে এল। পুলিশ সাধুবাবা ওরফে পান্নালাল ওঝাকে থানায় নিয়ে গেল। সর্বনাশা মরা ভালুকটা বাগানে পড়ে রইল। কুকি বারান্দা থেকে সেইদিকে লক্ষ্য করে খুব ধমক দিতে থাকল। পিঙ্কি কিছু বুঝতে না পেরে তাকে তুলে নিয়ে চাঁটি মেরে বলল,—খুব হয়েছে!

কিন্তু চুরাইল-রহস্য এভাবে ফাঁস হওয়াতে দশরথ খুশি হয়নি বুঝি। একপ্রস্থ চা এনে দিয়ে বলল,—লেকিন করাড়ি রোটি ইয়ে বদমাস ভালুর না আছে, রামজির কিরিয়া। যো ভালু খুন পিতা, উও কভি রোটি বানানে নেহি জানতা। রোটি ঔর কৈ ভালু বানিয়েছে।

অতএব করাড়ি রোটি খেয়ে তার ক্ষতি হবে না। কর্নেল আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হেসে বললেন,—কী ডার্লিং, কাটামুণ্ডুর কথা বলার ম্যাজিক দেখালুম কি না বলো?

ভেন্ট্রিলোকুইজম্ কবে শিখলেন?

সম্প্রতি কলকাতার বিখ্যাত এক হরবোলার কাছে শিখতে হয়েছে। তোমার পাশে বসে দিব্যি কথা বলছিলুম সাধুবাবার সঙ্গে। সাধুবাবা ভেবেছিল, গাছে হেলান দিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছি। তবে মহাধড়িবাজ লোক। বিকেলে হ্যান্ডব্যাগ ফেরত পাঠানোর সময় সেই বিদেশি কোম্পানির নামে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলুম। লিখেছিলুম,—আমিই ব্যুগবো কোম্পানির প্রতিনিধি। রাত ন'টা নাগাদ যদুবাবুর বাগানে এসে দেখা করুন। সাধুবাবা চালাকিটা ধরে ফেলেছিল। আমিও জানতুম, সে আমার চালটুকু ধরে ফেলবে। কিন্তু তাহলেও সে আসবে। আমাকে খতম করার জন্য তাকে 'চুরাইল' নিয়ে আসতেই হবে। আমি তার সব প্ল্যান ভেস্তে দিতে চলেছি কি না।

হুঁ, বুঝলুম। কিন্তু চিৎপুরে গুপ্ত কোম্পানিতে যাওয়ার রহস্যটা কী?

কর্নেল হাসলেন। তোমার মনে পড়ল তাহলে? হ্যাঁ—তুমি শুধু আমাকে গুপ্ত কোম্পানির দোকানে ঢুকতে দেখেছিলে। কিন্তু আমাকে ওদিন অন্তত সারা চিৎপুর এলাকার অসংখ্য দোকানে ঢুকতে হয়েছিল।

কেন?

দুটো জিনিসের তদন্তে। জটাজুট আর অস্বাভাবিক গড়নের একটা পরচুলো সম্প্রতি এক বছরে একইসঙ্গে কেউ কিনেছে কিনা। গত শীতে ভৈরবগড়ে গিয়ে 'চুরাইল'টাকে দেখামাত্র ভালুক বলে সন্দেহ হয়েছিল। তুমি কি ভালুকের মাথা লক্ষ্য করেছ, জয়ন্ত? ওই মাথায় স্ত্রীলোকের পরচুলো আটকাতে হলে বিশেষ অর্ডার দিয়ে পরচুলো বানাতে হবে। যাই হোক, খোঁজ পেয়ে গেলুম শেষপর্যন্ত। এক পরচুলা ব্যবসায়ী কথায়-কথায় বলে ফেলল,—এক ভালুকওয়ালার অদ্ভুত অর্ডার পেয়েছিল। সে নাকি নিজে জটাজুটধারী সাধু সাজবে এবং তার ভালুককে স্ত্রীলোক সাজিয়ে শাড়ি-শাঁখা পরিয়ে খেলা দেখাবে। তাই ....

বাধা দিয়ে বললুম,—ভালুকটার হাতে শাঁখা দেখেছি। পরনে শাড়িও আছে নাকি?

আছে। গণ্ডগোল এবং আতঙ্কের চোটে লক্ষ্য করো নি। এখন গিয়ে দেখে এসো, লালপেড়ে শাড়িও আছে।

দেখে আসার জন্য তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালুম বটে, কিন্তু অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে পা বাড়াতে অস্বস্তি হল। সত্যিকার শাঁখচুন্নি যে নেই, তা কে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারে?

আমাকে বসে পড়তে দেখে কর্নেল হো-হো করে হেসে উঠলেন। পিঙ্কিও ব্যাপারটা টের পেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। এবার কুকি সুযোগ পেয়ে তাকে ধমক দিল নিজের ভাষায়। পিঙ্কি গম্ভীর হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে।

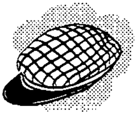

নীলপুরের নীলারহস্য

বৃষ্টিসন্ধ্যার চিঠি

শ্রাবণ মাসের সন্ধ্যা। টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছিল। কর্নেলের ড্রয়িংরুমে বসে কফি খেতে খেতে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার—আমাদের প্রিয় হালদার মশাইয়ের পুলিশ জীবনের গল্প শুনছিলুম। রোমাঞ্চকর সব গল্প। হালদারমশাই বলছিলেন,—বৃষ্টিবাদলার রাত্তিরে চোরগো চুরি করনের খুব সুবিধা। ক্যান? না—ঠাণ্ডা ওয়েদারে লোকেরা হেভি ঘুম ঘুমায়। ... তো তখন আমি রাজশাহি জেলার চণ্ডীপুরে থানার অফিসার-ইন-চার্জ। লোকে তখন কইত বড়বাবু। এক বর্ষার রাত্তিরে—

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন। হঠাৎ বললেন, —হালদারমশাই! ঠাণ্ডা ওয়েদারে বড়বাবুদের ঘুম আরও হেভি হওয়ার কথা!

হালদারমশাই মাথা নেড়ে বললেন,—কী যে কন কর্নেলস্যার! তখন ব্রিটিশ আমল।

গল্পে বাধা পড়ায় বিরক্ত হয়ে বললুম,—এক বর্ষার রাতে কী হয়েছিল, তা-ই বলুন শুনি।

ঠিক এইসময় আরও রসভঙ্গ করে ডোরবেল বাজল এবং কর্নেল হাঁকলেন,—ষষ্ঠী!

একটু পরে একজন ধুতিপাঞ্জাবিপরা নাদুস-নুদুস গড়নের প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন,—চিনতে পারছেন তো স্যার? আমি নীলপুরের অঘোর অধিকারী। তা মনে করুন, চারপাঁচ বছর আগের কথা। সেই যে রায়মশাইয়ের বাড়িতে আমাকে দেখেছেন। তারপর মনে করুন হঠাৎই এসে পড়তে হল।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—বলুন অঘোরবাবু।

অঘোরবাবু সোফায় বসে বললেন,—তা মনে করুন, তিনটে পঁচিশের ট্রেনে চেপেছি। দমদমে একটা ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল। শেয়ালদা পৌঁছুতে মনে করুন সাড়ে ছটা।

বুঝলুম, 'মনে করুন' বলাটা ভদ্রলোকের মুদ্রাদোষ। উনি ব্যস্তভাবে কাঁধের ব্যাগটা কোলে টেনে হাত ভরলেন। তারপর একটা চশমার খাপ বের করলেন। ভাবলুম চশমা পরবেন। কিন্তু আমাকে অবাক করে চশমার তলা থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করে উনি কর্নেলকে দিলেন।

কর্নেল কাগজটার ভাঁজ খুলতে খুলতে বললেন,—রায়মশাইয়ের চিঠি?

অঘোর অধিকারী বললেন,—তা মনে করুন রায়মশাই নিজেই আসতেন। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে আসবেন কী করে? যা অবস্থা! তাই চিঠি লিখে মনে করুন আমাকেই পাঠালেন। এদিকে ফেরার ট্রেন রাত আটটা পাঁচে। সব ট্রেন তো নীলপুর স্টেশনে দাঁড়ায় না। তারপর মনে করুন আমি রাতবিরেতে রায়মশাইয়ের কাছে না থাকলেও চলে না।

কর্নেল চিঠিটা ততক্ষণে পড়ে ফেলেছেন। বললেন,—চিঠিটা আপনি চশমার খাপে ঢুকিয়ে রেখেছিলেন কেন অঘোরবাবু?

অঘোরবাবু বিষণ্ণ মুখে বললেন,—আজকাল মনে করুন কী যেন হয়েছে। কিছু মনে থাকে না। চশমার খাপের ভেতর চিঠিটা রাখলে মনে থাকবে। কেন জানেন স্যার? সঙ্গে একটা বই এনেছি।

ট্রেনজার্নিতে সময় কাটাতে বইয়ের মতো জিনিস নেই। এদিকে মনে করুন, সারাক্ষণ চোখে চশমা পরে থাকতে পারি না। নতুন চশমা নিয়েছি তো! তাই মনে করুন—

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—ছাতি আনেননি দেখছি! আসবার সময় ট্যাক্সি পেয়েছিলেন। এখন না পেতেও পারেন।

—ঠিক বলেছেন স্যার। কিন্তু মনে করুন ছাতি এনেছিলাম। ওই যে বললুম কিছু মনে থাকে না। ট্রেনে ফেলে নেমে এসেছি। তারপর মনে করুন ট্যাক্সির লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় মনে পড়ল! এখনই উঠছি স্যার! শেয়ালদার কাছাকাছি ছাতার দোকান আছে। একটা কিনে নেব'খন।

বলে পা বাড়িয়ে অঘোরবাবু হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন,—ওই যাঃ! বলতে ভুলে গেছি। আমি যে মনে করুন আপনাকে রায়মশাইয়ের চিঠি দিলুম, তার প্রমাণ আনতে বলেছেন উনি। আমারও ভুলো মন। আর রায়মশাইও মনে করুন কাকেও আজকাল বিশ্বাস করেন না। আমাকেও না। তাই মনে করুন চিঠি যে পেলেন, তা একটুখানি প্রমাণ—

কর্নেল তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন,—দিচ্ছি। তারপর টেবিলের ড্রয়ার থেকে তাঁর একটা নেমকার্ড বের করে উল্টোপিঠে কিছু লিখে দিলেন।

কার্ডটা অঘোরবাবু যথারীতি চশমার খাপে ভরে নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন।

হালদারমশাই হাসলেন,—খালি কয় মনে করুন। কী কাণ্ড!

বললুম,—তা মনে করুন, ভুলো মনের মানুষ। তাই মনে করুন অর্থাৎ স্মরণ করুন বলেন।

হালদারমশাই আরও হেসে অস্থির হলেন। কর্নেল চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—জয়ন্ত ঠিকই ধরেছে। তবে মনে করুন বলেও সবকিছু ঠিকঠাক মনে পড়ে না। নীলপুর কৃষ্ণনগরের কাছে। ওখানকার সরপুরিয়া বিখ্যাত। রায়মশাই আমার জন্য একপ্যাকেট সরপুরিয়া পাঠিয়েছিলেন। অঘোরবাবুর ব্যাগে সেটা থেকে গেছে।

হালদারমশাই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন,—ওনারে রাস্তায় গিয়ে ধরব নাকি? সরপুরিয়া কত খাইছি! বলে জিভে জল টানার ভঙ্গি করলেন তিনি। তারপর দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

অমনি আবার ডোরবেল বাজল। কর্নেল হাঁক দিলেন,—ষষ্ঠী!

একটু পরেই আবার অঘোর অধিকারীর আবির্ভাব ঘটল। কাঁচুমাচু মুখে তিনি ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করে বললেন,—ভুলো মনের এই এক জ্বালা! রায়মশাই মনে করুন স্যারের জন্য সরপুরিয়া পাঠিয়েছেন। দিতে ভুলে গেছি।

মিষ্টান্নের প্যাকেটটা হলদে পলিব্যাগে মোড়া ছিল। দুহাতে কর্নেলকে এগিয়ে দিয়ে অঘোরবাবু চলে যাচ্ছিলেন। হালদারমশাই সকৌতুকে বললেন,—মনে করুন আর কিছু আছে নাকি?

আজ্ঞে না। —অমায়িক হাসলেন অঘোরবাবু : এবার মনে করুন বিদায় নিই। ট্রেন ফেল হবে।

কর্নেল স্মরণ করিয়ে দিলেন,—অঘোরবাবু! ছাতা! রাস্তার ছাতা কিনতে ভুলবেন না।

—তা মনে করুন বৌবাজারের মোড়ে কিনে ফেলব। বৃষ্টি পড়ছে। এবার আর ভুল হবে না। বলে নমস্কার করে অঘোরবাবু সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল বললেন,—বৃষ্টির সন্ধ্যায় সরপুরিয়া খেতে মন্দ লাগবে না। আরেক দফা কফিও খাওয়া যাবে।

বলে তিনি ষষ্ঠীচরণকে ডেকে তিনটে প্লেট আর তিনটে চামচ আনতে বললেন। ষষ্ঠী তক্ষুনি প্লেট আর চামচ এনে দিল। কর্নেল প্যাকেট খুলে সরপুরিয়া চামচে তুলে একটা প্লেটে নিজের জন্য

একটুখানি রাখলেন। তারপর হালদারমশাই এবং আমার প্লেটে অনেকখানি তুলে দিলেন। বাকিটা ষষ্ঠীর জন্য রাখলেন। ষষ্ঠী ততক্ষণে কফির জল গরম করতে গেছে।

হঠাৎ দেখি, কর্নেল প্যাকেটটার তলার কাগজ সরিয়ে একটা মুখআঁটা খাম বের করছেন। হালদারমশাই খাওয়া বন্ধ করে গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললুম,—এ কী! অদ্ভুত তো!

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—হ্যাঁ। অদ্ভুত! নীলপুরের শিবশম্ভু রায়ের এই চিঠিটাই আসল চিঠি। অঘোরবাবু বললেন : আজকাল রায়মশাই তাঁকেও বিশ্বাস করেন না। তাই খোলাচিঠিতে আমাকে শুধু ওঁর বাড়িতে শিগগির একবার যেতে বলেছেন। কোথায় নাকি আশ্চর্য প্রজাতির পরগাছা দেখেছেন ইত্যাদি। তারপর একপ্যাকেট সরপুরিয়া পাঠানোর কথা লিখে আন্ডারলাইন করে দিয়েছেন। কিন্তু আমি অঘোরবাবুকে ইচ্ছে করেই সরপুরিয়ার প্যাকেটের কথা মনে করিয়ে দিইনি।

গোয়ান্দাপ্রবর অবাক হয়ে শুনছিলেন। বললেন,—দ্যাননি ক্যান?

পরীক্ষা করতে চেয়েছিলুম সত্যি উনি ভুলো মনের মানুষ কি না।— বলে কর্নেল খামটা টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দিয়ে রাখলেন। তারপর সরপুরিয়াটুকু তারিয়ে তারিয়ে খেলেন।

হালদারমশাই বললেন,—বহু বৎসর সরপুরিয়া খাই নাই। জয়ন্তবাবুরে কই, মিষ্টান্ন খাইয়া জল খাইবেন না য্যান। অ্যাসিডিটি হইতে পারে।

কর্নেল সায় দিলেন,—ঠিক বলেছেন। জলের বদলে কফি নিরাপদ।

খামের ভেতর গোপন চিঠিতে নীলপুরের রায়মশাই কী লিখেছেন, তা জানার জন্য খুব আগ্রহ হচ্ছিল। কিন্তু কর্নেলের কোনো তাড়া লক্ষ্য করছি না। ষষ্ঠীচরণ ট্রেতে কফি আনল। কর্নেল তাকে বাকি সরপুরিয়াভর্তি প্যাকেটটা দিলে সে খুশি হয়ে নিল এবং একগাল হেসে বলল,—বাবামশাই একবার ঠিক এইরকম সন্দেশ এনেছিলেন।

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন,—সরপুরিয়া।

আজ্ঞে। মনে পড়েছে বটে!—বলে ষষ্ঠী চলে গেল।

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—নীলপুর নামের ইতিহাস আছে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ওখানে নীলের চাষ হতো। একটা নীলকুঠি ছিল। তা ভেঙেচুরে কবে জঙ্গল গজিয়েছিল। নদীর ধারে সেই জঙ্গলে একসময় বাঘ থাকত। চারবছর আগে সেই জঙ্গলে নির্ভয়ে ঘোরাঘুরি করেছিলুম। ওখানে একটা শ্মশান আছে। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা রাতবিরেতে সেই শ্মশানে মড়া পোড়াতে গেলে ধুন্ধুমার বাধায়।

হালদারমশাই বললেন,—ধুন্ধুমার? তার মানে?

—কয়েকটা ডেলাইট জ্বেলে লাঠিসড়কিবন্দুক নিয়ে ঢাকঢোল বাজাতে বাজাতে শ্মশানে যায়।

—ক্যান?

—নীলকুঠির জঙ্গলে নাকি একটা মড়াখেকো পিশাচ আছে।

—পিচাশ? কন কী!

হালদারমশাই পিশাচকে 'পিচাশ' বলে তা জানি। কিন্তু আমি রায়মশাইয়ের গোপন চিঠির জন্য উসখুস করছিলুম। বললুম,—কর্নেল! চিঠিতে পিশাচের খবর আছে নিশ্চয়ই!

কর্নেল এবার খামের মুখ ছিঁড়ে বললেন,—থাকতেও পারে। সেবার ওখানে গিয়ে রায়মশাইয়ের বাড়ির দোতলা থেকে দুপুর রাতে একটা অমানুষিক গর্জন শুনতে পেয়েছিলুম।

গর্জনটা ভেসে এসেছিল জঙ্গলের দিক থেকে। কিন্তু আগেই বলেছি, দিনের বেলায় জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করে কোনো পিশাচ দেখিনি।

গোয়ান্দাপ্রবর বলে উঠলেন,—গর্জন শুনছিলেন! কিসের গর্জন?

জানি না—বলে কর্নেল চিঠিটা পড়তে থাকলেন। পড়ার পর তিনি চিঠিটা হালদারমশাইকে দিয়ে বললেন : দেখুন। রায়মশাইয়ের হারানিধি উদ্ধার করতে পারেন নাকি।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ চিঠিটা পড়ছিলেন। তাঁর গোঁফটা উত্তেজনায় তিরতির করে কাঁপছিল। উঁকি মেরে দেখলুম, চিঠিতে শুধু লেখা আছে :

আমার মহা সর্বনাশ হয়েছে। পূর্বপুরুষের সযত্নে রক্ষিত
রত্ন নীলা হারিয়ে গেছে। এ বাজারে দশ লক্ষ টাকা দাম।
দয়া করে শীঘ্র এসে উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন।

কর্নেল বললেন,—নীলাটা আমাকে দেখিয়েছিলেন রায়মশাই। প্রায় মুরগির ডিমের সাইজ। রত্নটার নীল রঙে আলো পড়লে চোখ ঝলসে যায়। কিন্তু ওটা হারাল কী করে, তা লেখেন নি।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে.কে. হালদার উত্তেজিতভাবে বললেন,—নীলপুরে যাওয়া দরকার। কর্নেলস্যার কখন যাইবেন, কন। আমি আপনার লগে লগে যামু। নাকি আমি একা যামু? যামু কিসে?

কর্নেল বললেন,—তাই যান। ভোরে এসপ্ল্যানেড থেকে বাস ছাড়ে। ট্রেনের চেয়ে বাসই ভালো। তবে একটু হাঁটতে হবে এই যা। ....

রাতের উপদ্রব এবং বন্দুক

নীলপুরকে নেহাত পাড়াগাঁ ভেবেছিলুম। পরদিন দুপুরে সেখানে পৌঁছে দেখলুম, জমজমাট বাজার আর একতলা-দোতলা প্রচুর বাড়ি আছে। বিদ্যুৎ আছে। শিবশম্ভু রায়ের বাড়ি নীলপুরের শেষপ্রান্তে নদীর ধারে। উঁচু পাঁচিলঘেরা সেকেলে গড়নের দোতলা বাড়ি। তবে পাঁচিল এবং বাড়ির অবস্থা জরাজীর্ণ। এদিকটায় আমবাগান আর এখানে-ওখানে ঝোপ-জঙ্গল গজিয়ে আছে। বাড়ির গেটের অবস্থাও শোচনীয়।

কর্নেল বললেন,— চার বছর আগে রায় ভবনের অবস্থা এমন ছিল না। বোঝা যাচ্ছে, রায়মশাই আর বাড়ি মেরামতে মন দেননি। দিয়েই বা কী করবেন? এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে থাকে আমেরিকায়। মেয়ে বাঙ্গালোরে।

গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই অঘোরবাবু বেরিয়ে এলেন। একগাল হেসে বললেন,—এসে গেছেন স্যার? তা এলেন কিসে? মনে করুন বাসে বেজায় ভিড়। তারপর মনে করুন রাস্তা একেবারে খানাখন্দে ভরা।

কর্নেল বললেন,—আমরা বাসে এসেছি অঘোরবাবু!

অঘোরবাবু জিভ কেটে বললেন,—কী সর্বনাশ! ট্রেনে এলে মনে করুন আরামে আসতেন। বলে বাড়ির দিকটা দেখে নিয়ে চাপা স্বরে ফের বললেন,—একটা অনুরোধ স্যার। রায়মশাইকে যেন দয়া করে বলবেন না আমি কাল সন্ধ্যাবেলা আপনার কাছে গেছি। আজ্ঞে মনে করুন, আমি দুপুরেই গেছি।

—কেন বলুন তো?

অঘোরবাবু কাঁচুমাচু মুখে বললেন,—রায়মশাই মনে করুন আমাকে সক্কালেই পাঠিয়েছিলেন। স্টেশনে যাবার সময় শুনলুম, ফরেস্ট অফিস থেকে নানারকম গাছের চারা বিলি হচ্ছে। আমার মনে করুন বাগান করার খুব সখ। ওপাশে রায়মশাইয়ের পোড়ো জমিতে মনে করুন গাছের চারাগুলো পুঁতব। রায়মশাই বাড়ির ভেতর মনে করুন—

কর্নেল হাসলেন,—বুঝেছি। সাপের ভয়ে বাড়ির ভেতরে গাছপালা ঝোপঝাড় গজাতে দেন না। তা আপনাদের কাছে কাল সন্ধ্যায় তো গাছের চারা দেখিনি?

—স্টেশনে ওগুলো হরির কাছে রেখে গিয়েছিলুম। আজ্ঞে হরির মনে করুন চায়ের দোকান আছে। খুব ভালো লোক স্যার। তারপর মনে করুন কাল রাত্রে ফেরার সময় চারাগুলো নিয়ে এসেছি।

—রায়মশাই আপনার এত দেরি করার কারণ জিজ্ঞেস করেন নি?

—তা আবার করবেন না? মনে করুন ওঁকে বলেছি, রেল অবরোধ হয়েছিল।

এই সময় দোতলার জানলা থেকে কারও ডাক ভেসে এল,—অঘোর! ও অঘোর!

অঘোরবাবু চেঁচিয়ে বললেন,—রায়মশাই! মনে করুন কর্নেলসায়েব এসে গিয়েছেন! তারপর গেটের দিকে ঘুরে হন্তদন্ত পা বাড়ালেন। একবার ঘুরে আমরা ওঁকে অনুসরণ করছি কি না দেখেও নিলেন।

বাড়ির ভেতর ঢুকে দেখলুম, লম্বাচওড়া চৌকো সেকেলে লাইম কংক্রিটের উঠোন। ডানদিকের পাঁচিলের একপাশে সমান্তরাল কিছু দেশি ফুলের গাছ আছে। কিন্তু গাছগুলোর তলা পরিষ্কার। একটা টিউবয়েল আছে। ফ্রকপরা এক কিশোরী বালতিতে জল ভরছিল। বাঁদিকের পাঁচিল ঘেঁষে একটা চালাঘর। টালির চাল। সেখানে গরু থাকে, তা বুঝতে পারলুম।

নীচের বারান্দায় রায়মশাইকে দেখা গেল। লম্বা শীর্ণ এক বৃদ্ধ মানুষ। গায়ে ফতুয়া। এবং হাঁটুঅব্দি তোলা ধুতি। তাঁর হাতে একটা ছড়ি। মুখে পাকা গোঁফ। মাথার চুল কিন্তু কাঁচাপাকা এবং মধ্যিখানে সিঁথি। চেহারায় আভিজাত্য। কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন,—আসুন কর্নেলসায়েব। আপনি না এসে পারবেন না এই বিশ্বাস অবশ্য ছিল। কারণ ইংরিজিতে ও. কে. লিখে কার্ড পাঠিয়েছেন। অঘোর যে কার্ডখানা এনেছে, এই যথেষ্ট। ওর আজকাল কিছুই নাকি মনে থাকে না।

কর্নেল আমার সঙ্গে রায়মশাইয়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন। রায়মশাই বললেন,—বাবাজীবন, আমার ছেলের বয়সী। কাজেই তুমি বলব।

বললুম,—নিশ্চয়ই বলবেন।

অঘোরবাবু নীচের তলায় একটা ঘরের তালা খুলছিলেন। রায়মশাই বললেন,—এখন ওঘরে নয়। কর্নেলসায়েব আগে আমার ঘরে যাবেন। অঘোর! কিনুঠাকুরকে বলে এখনই কর্নেলসায়েবের জন্য কফির ব্যবস্থা করো। দেরি কোরো না।

দোতলায় উঠে চওড়া বারান্দা দিয়ে হেঁটে শিবশম্ভু রায় মাঝখানের একটা ঘরে তালা খুললেন। চাবি তাঁর পৈতেয় বাঁধা ছিল। ঘরের জানালাগুলো বড়ো এবং খোলা। পর্দা একপাশে গুটোনো আছে। পর্দার অবস্থা দেখে বুঝলুম, বাড়িটার মতোই জীর্ণ এবং বিবর্ণ।

উঁচু মেহগিনি পালঙ্ক একপাশে এবং অন্যপাশে গদিআঁটা কয়েকটা চেয়ার। একটা প্রকাণ্ড টেবিল। টেবিলে কীসব কাগজপত্র, ফাইল, একটা অ্যালার্মঘড়ি এবং একটা ছোট্ট বাক্স। হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স মনে হল। তার পাশে দুটো মোটা অভিধানের মতো বই। নিশ্চয়ই হোমিও মেটিরিয়া মেডিকা।

ফ্যান চালিয়ে দিয়ে রায়মশাই বললেন,—বসুন আপনারা। আমি আসছি।

চেয়ারে বসে টুপি খুলে কর্নেল তাঁর পিঠে আটকানো কিটব্যাগটা নীচে রাখলেন। বাইনোকুলার আর ক্যামেরা তাঁর কোলে বসল। আমার কাঁধের ব্যাগটা আমিও নামিয়ে রাখলুম। রায়মশাই পাশের ঘরে ঢুকেছেন ততক্ষণে।

পালঙ্কের কাছাকাছি ঘরের এককোণে পাশাপাশি দুটো কাঠের বন্ধ আলমারি চোখে পড়ল। তার পাশে দেওয়ালে বসানো একটা আয়রন চেস্ট। বলতে যাচ্ছিলুম,—দশ লক্ষ টাকা দামের নীলা কি আয়রন চেস্টে ছিল? বলা হল না। রায়মশাই ফিরে এলেন দোনলা বন্দুক নিয়ে।

কর্নেল বললেন,—বন্দুক কেন রায়মশাই?

রায়মশাই চাপা স্বরে বললেন,—আপনারা আসার একটু আগে ও-ঘরের জানালায় বন্দুকহাতে বসে ছিলুম। একটা লোক আমবাগানের কাছে ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। দুবার লোকটাকে সন্দেহজনকভাবে উঁকিঝুকি দিতে দেখেছি। বন্দুকের নল দেখামাত্র লুকিয়ে পড়েছে। তাই অঘোরকে ডাকছিলুম।

—কেমন চেহারা লোকটার?

—শুধু মাথাটা দেখেছি। মাথায় ছাইরঙা টুপি। মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাইনি। অঘোর আসুক। ওকে ওদিকে লক্ষ্য রাখতে বলব।

কর্নেলের দিকে তাকালুম। চোখের ইশারায় ওঁকে বলতে চেয়েছিলুম, লোকটা নিশ্চয়ই আমাদের প্রিয় হালদারমশাই। কিন্তু কর্নেল আমার দিকে তাকালেন না। বললেন,—আপনাকে সেবার বলেছিলুম জিনিসটা সাবধানে রাখবেন।

শিবশম্ভু রায় চাপাস্বরে বললেন,—সাবধানেই তো রেখেছিলুম। আগে কফি খেয়ে নিন।

অঘোরবাবু নিজেই কফি আনলেন ট্রেতে। বললেন, —রায়মশাই! কিনুদাকে সায়েবদের জন্য মনে করুন স্পেশাল রান্না করতে বলেছি। ওবেলা বরং বাজার থেকে স্পেশাল মাছ-মাংস আনব। ততক্ষণে মনে করুন আমি গিয়ে দেখি, ভুলু কতটা জায়গা পরিষ্কার করল। বিকেলে মনে করুন গাছের চারাগুলো পুঁততেই হবে।

রায়মশাই বাঁকা হেসে বললেন,— বাবুর বাগান করার সখ হয়েছে। বুঝলেন কর্নেলসায়েব? একগুচ্ছের কীসব গাছের চারা এনে রেখেছে।

কর্নেল হাসলেন,—ভালো তো! এখন তো বৃক্ষরোপণ উৎসব চলেছে সবখানে। অঘোরবাবু সেই উৎসব পালন করবেন।

রায়মশাই বললেন,—মনমেজাজ ভালো থাকলে বলতুম, আপনি ওর বৃক্ষরোপণ উৎসব উদ্বোধন করবেন।

অঘোরবাবু কাঁচুমাচু মুখে বললেন,—আজ্ঞে মনে করুন গোটা দশবারো চারা! কিসের গাছ তা-ও জানি না। বিনিপয়সায় বিলি করছিল। তাই মনে করুন আমিও গিয়ে লাইন দিয়েছিলুম।

রায়মশাই তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—অঘোর! ওসব কথা ছাড়ো! সকাল থেকে দেখছি, আমবাগানের পাশে ঝোপের ভেতর থেকে একটা লোক উঁকিঝুকি দিচ্ছে। তোমাকে ডেকে সাড়া পাইনি। আমি বন্দুক বাগিয়ে বসে ছিলুম। এবার দেখলেই গুলি ছুঁড়তুম।

অঘোরবাবু আঁতকে উঠে বললেন,—সর্বনাশ! তাহলে মনে করুন রাতবিরেতে কি ওই লোকটাই বাড়িতে ঢিল ছুঁড়ে আমাদের ভয় দেখাত? দিন তো আমাকে বন্দুকটা। ব্যাটাচ্ছেলেকে মনে করুন তাড়া করে গুলি ছুঁড়ে মনে করুন—

রায়মশাই ওঁর হাতে সত্যিই বন্দুকটা দিলেন। বন্দুক কাঁধে নিয়ে অঘোরবাবু সবেগে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। রায়মশাই বললেন,—অঘোর! সাবধান! লোকটাকে সত্যি সত্যি গুলি করবি নে। তার মাথার ওপর গুলি ছুঁড়ে ভয় দেখাবি। দেখেছিস্ তো? সে-রাতে যেই গুলি ছুঁড়লুম, ঢিল পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

অঘোরবাবু ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। মুচকি হেসে বললেন,—আমার মাথা খারাপ? সত্যি সত্যি কারও ঠ্যাংয়ে গুলি ছুঁড়লে মনে করুন উল্টে খুনের দায়ে ফেঁসে যাব না?

কর্নেল বললেন,—রাতবিরেতে বাড়িতে ঢিল পড়ত বুঝি?

রায়মশাই বললেন,—হ্যাঁ। কফি খান। বলছি সে-সব কথা।

আমি বললুম,—অঘোরবাবুকে বন্দুক দিলেন। উনি বন্দুক চালাতে জানেন তো?

—সরকার আইন করে শিকার নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু একসময় আমি অঘোরকে সঙ্গে নিয়ে নীলকুঠির জঙ্গলে হরিয়াল মারতে যেতুম। আমার সঙ্গী ছিল অঘোর। মাঝেমাঝে তাকেও গুলি ছোঁড়ার ট্রেনিং দিতুম। আসলে অঘোর আমার ঠাকুর্দার নায়েবের নাতি। ঠাকুর্দা ছিলেন জমিদার। জমিদারি উঠে যাওয়ার পর তাঁর নায়েব সদানন্দবাবু বৃদ্ধ বয়সে এবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে রমাকান্ত—মানে অঘোরের বাবা কেষ্টনগরে স্কুলমাস্টারি করতেন। রমাকান্তকাকা হঠাৎ মারা গেলে। অঘোরকে নিয়ে তাঁর বিধবা স্ত্রী সুধাময়ী আমাদের বাড়িতে এসে আশ্রয় নেন। সুধাকাকিমা বাড়ির কাজকর্ম করতেন। সে অনেক বছর আগের কথা। সুধাকাকিমা মারা গেলেন। অঘোর এবাড়িতেই থেকে গেল। বিয়ে করেনি। মাঝেমাঝে কোথায় উধাও হয়ে যেত। আবার ফিরে আসত। এখন বয়স হয়েছে। এদিকে আমিও একা মানুষ। অল্প কিছু জমিজমা আছে। অঘোরই দেখাশুনা করে। —বলে রায়মশাই করুণ হাসলেন : কর্নেলসায়েব এসব কথা জানেন।

কর্নেল বললেন,—রাত্রে বাড়িতে ঢিল পড়ার ব্যাপারটা বলুন।

—গত সপ্তাহে একদিন মাঝরাত্রে নীচে অঘোরের চ্যাঁচামেচি শুনে ঘুম ভেঙে গেল। বারান্দায় বন্দুক হাতে গিয়ে টর্চের আলো জ্বেলে জিজ্ঞেস করলুম, কী হয়েছে? অঘোর বলল, বাড়ির ভেতর কোনো বদমাস ঢিল ছুঁড়ছিল।

—তখন বাড়িতে কি বিদ্যুৎ ছিল না?

—না। লোডশেডিং ছিল। নীলপুরের বিদ্যুতের হাল শোচনীয়। তো তারপর যে-রাতে লোডশেডিং হয়েছে, সেই রাতে ঢিল। সকালে দেখেছি, উঠোনে ইটপাটকেল ভর্তি। তারপর খেয়াল হল, হাতে বন্দুক থাকতে চুপ করে থাকা উচিত হচ্ছে না। পরশু রাতে তৈরি হয়েই ছিলুম। অঘোরের চ্যাঁচানি শুনে বারান্দা থেকে পরপর দুটো ফায়ার করলুম। ঢিলপড়া বন্ধ হল। তারপর সকালে আবিষ্কার করলুম নীলা চুরি গেছে।

—কোথায় রেখেছিলেন?

ঠিক এই সময় বাইরে কোথাও বন্দুকের গুলির শব্দ হল এবং অঘোরবাবুর চিৎকার শোনা গেল,—ধর! ধর! ভুলু! ভুলু! ...

বটতলায় একটা নৌকোড়

রায়মশাই সেই পাশের ঘরে ঢুকে জানালা থেকে চিৎকার করছিলেন,—অঘোর! অঘোর!

কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরালেন। তাঁর কোনো চাঞ্চল্য দেখলুম না। বললুম,—নীচে গিয়ে ব্যাপারটা দেখা উচিত ছিল। হালদারমশাই উঁকি দিতে এসে বিপদে পড়লেন নাকি?

কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানতে থাকলেন। একটু পরে রায়মশাই এ ঘরে এসে বললেন,—অঘোর খামোকা একটা কার্তুজ নষ্ট করল। ওদিকটায় বঁনবাদাড়। আর ভুলু লোকটা ভীতুর শিরোমণি! দিনদুপুরে ভূত দেখতে পায়।

জিজ্ঞেস করলুম,—ভুলুই কি আপনার বাড়িতে থাকে?

—না। ভুলু একজন দিনমজুর। অঘোরের বাগানের সাধ হয়েছে। তাই ওকে দুপুর পর্যন্ত কাজে লাগিয়েছে। জঙ্গল কেটে মাটিতে গর্ত করে রাখবে। ব্যস্।

কর্নেল চোখ খুলে বললেন,—অঘোরবাবুকে কোথায় দেখে এলেন?

—ও এক আস্ত গবেট। ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভুলুকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে, লোকটা কোন্‌দিকে পালিয়েছে।

—এবার বলুন নীলা কোথায় রেখেছিলেন?

রায়মশাই কপালে থাপ্পড় মেরে বললেন,—আমারই দুর্বুদ্ধি! আপনাকে দেখিয়ে ছিলুম, রত্নটা আয়রন চেস্টে থাকত। ঠাকুর্দার বাবার আমলের আয়রন চেস্ট। গতবছর চাবি ঢুকিয়ে ঘোরাতেই চাবি ভেঙে গেল। অঘোরকে দিয়ে কামার ডেকে এনে কোনোক্রমে খোলা তো হল। কিন্তু চাবির ভাঙা অংশটা কামার অনেক চেষ্টাতেও বের করতে পারল না। সে বলল,—কলকাতা থেকে মিস্তিরি আনতে হবে। অঘোর কলকাতা থেকে মিস্তিরি এনেছিল। বললে,—দেওয়াল ভেঙে আয়রন চেস্ট বের করে তার সঙ্গে কলকাতা পাঠাতে হবে। তা না হলে চাবি বের করা যাবে না। নতুন লক তৈরি করে লাগাতে হবে। সে এক হাঙ্গামা! তাই মিস্তিরিকে যাতায়াতের ভাড়া আর কিঞ্চিৎ বকশিস দিয়ে বিদেয় করলুম।

—তা হলে এখন আয়রন চেস্টের অবস্থা কী?

—কপাট ঠেলে আটকে রেখেছি। ভেতরকার জিনিস অন্যত্র সরিয়েছি।

—রত্নটা?

শিবশম্ভু রায় চাপা স্বরে বললেন,—ওটা কিছুদিন কাঠের আলমারিতে লুকিয়ে রেখেছিলুম। তারপর ভাবলুম, নিরিবিলি জায়গায় বাড়ি। ডাকাত পড়লে আলমারি ভাঙবে সোনাদানার লোভে। তাই মাঝেমাঝে ঠাঁইবদল করে রাখতুম। কখনও পাশের ঘরের কুলুঙ্গিতে গণেশের তলায়। কাগজে মুড়েই রাখতুম। কখনও ওই পালঙ্কে গদির তলায়। আমার দুর্মতি। গত সপ্তাহে ওটা এই হোমিওপ্যাথির বাক্সের ভেতর একটা খোপে ঢুকিয়ে রাখলুম। ভাবলুম, এর ভেতর এমন দামি রত্ন আছে কেউ ভাবতেও পারবে না।

—ওটা হোমিওপ্যাথির বাক্স থেকেই চুরি গেছে?

রায়মশাই করুণ মুখে বললেন,—হ্যাঁ।

—আপনি হঠাৎ হোমিওপ্যাথির দিকে মন দিয়েছিলেন কেন?

—ও! আপনি তো জানেন সে কথা। মধ্যে বছর দুয়েক পা আর কোমের বাত হয়েছিল। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় সারেনি। তারপর নীলপুরের হোমিওপ্যাথির ডাক্তার অমর মুখুজ্যের চিকিৎসায় সেরে গেল। তখন নিজেই বইপত্তর পড়েটড়ে হোমিওপ্যাথির নেশায় পড়ে গেলুম। অঘোর, কিনু ঠাকুর, তার বউ মানদা, কিনুর মেয়ে কাকলি সব্বাই অসুখবিসুখে আমার ওষুধ খায়। বললে বিশ্বাস করবেন না, ম্যাজিক!

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ঠিক বলেছেন। ম্যাজিক। কিন্তু এই বাক্সটা কি এখানেই থাকে? নাকি মাঝেমাঝে নীচে নিয়ে গিয়ে অন্য রোগীদের চিকিৎসা করেন?

রায়মশাই বিমর্ষ ভাবে বললেন,—তা করি—মানে, কখনও-সখনও করেছি।

—গত একসপ্তাহের মধ্যে বাক্সটা নীচে নিয়ে গিয়ে কাকেও ওষুধ দিয়েছেন কি?

না—!—রায়মশাই জোরে মাথা নাড়লেন,—তবে একদিন ভুলুর বউ তার বাচ্চার জন্য ওষুধ নিতে এসেছিল। তখন আমি শুধু ওষুধ নিয়ে নীচে গিয়েছিলুম। ওই সময় যদি কেউ এ ঘরে ঢুকে থাকে—বলেই তিনি আবার মাথা নাড়লেন,—বাইরের লোকের ঢোকার প্রশ্নই ওঠে না। বাড়ির কেউ ঢুকতে অবশ্য পারে। কিন্তু যে-ই ঢুকুক, সে কেমন করে জানবে এই বাক্সতে দামি রত্ন লুকোনো আছে?

—রত্নটার কথা বাড়ির কেউ কি জানে?

শিবশম্ভু রায় জোরে মাথা নেড়ে বললেন,—নাহ্! আমি কাকেও বলিনি। জানবার মধ্যে জানে শুধু আমার ছেলে অমলকান্তি। সে থাকে আমেরিকার ডালাসে। মেয়ে নন্দিতা থাকে বাঙ্গালোরে। আমার জামাই ওখানে টাউন প্ল্যানিংয়ের হর্তাকর্তা। বছরে মেয়ে-জামাই একবার আসে পুজোর সময়।

—তাহলে আপনার জামাইও জানেন?

—সুপ্রকাশের না জানার কারণ নেই।

এই সময় অঘোরবাবু বন্দুক কাঁধে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকলেন,— তা মনে করুন মানুষ না ভূত বোঝা গেল না। দেখলুম, ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে মনে করুন একটা টুপি ভাসতে ভাসতে ভ্যানিশ হয়ে গেল। তন্নতন্ন খুঁজে পেলুম না। এদিকে ভুলুও মনে করুন—

রায়মশাই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বাধা দিয়ে বললেন,—বন্দুক দাও। খামোকা একটা কার্তুজ খরচ করে এলে।

—তা মনে করুন, আপনিই গুলি ছুঁড়তে বলেছিলেন।

—খুব হয়েছে। কর্নেলসায়েবদের নিয়ে যাও। চান-টানের ব্যবস্থা করে খাইয়ে দাও। আমি যাচ্ছি।

একটু পরে নীচের একটা সাজানো-গোছানো ঘরে আমাদের ঢুকিয়ে দিয়ে অঘোরবাবু বললেন, —কাকলিকে স্নানের জল ভর্তি করতে বলি। স্নান করলে মনে করুন শরীর ফ্রেশ হয়ে যাবে।

কর্নেল বললেন,—আমি স্নান করব না অঘোরবাবু!

অঘোরবাবু বললেন,—তাহলে মনে করুন আমি ভুলুর কাছে গিয়ে কতগুলো গর্ত করেছে দেখে আসি। তলায় মনে করুন গোবর-সার ফেলে জল ঢালতে হবে। —বলে বারান্দায় গিয়ে তিনি ডাকলেন : কিনুদা! আমি এখনই আসছি। সায়েবদের খাওয়া রেডি করো। ...

খাওয়া-দাওয়া করে কর্নেল জানালার কাছে বসে চুরুট টানছিলেন। আমি বিছানায় অভ্যাসবশে গড়িয়ে নিচ্ছিলুম। একটু পরে কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত! উঠে পড়ো। বেরুব।

—কোথায় বেরুবেন? হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে কেলেঙ্কারি!

—বৃষ্টির লক্ষণ দেখছি না। জোরে বাতাস বইছে। ওঠো! নীলকুঠির জঙ্গলে যদি দৈবাৎ পিশাচটার দেখা পাই!

কর্নেলের তাগিদে বেরুতে হল। গেট ভেজানো ছিল। বাইরে গিয়ে কর্নেল বললেন, —অঘোরবাবুর বাগান দেখে আসি।

বললুম,—বাগান তো এখনও হয়নি!

ভবিষ্যতে হবে। —বলে কর্নেল বাড়ির পূর্বদিকে গেলেন। তারপর বললেন : বাঃ! অনেকটা জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে। গাছের চারা বসানোর গর্তও হয়ে গেছে।

কর্নেল এগিয়ে গিয়ে গর্তগুলো গুনলেন। তারপর ওপাশে একটা ঘাসে ঢাকা জমিতে গিয়ে বাইনোকুলারে সম্ভবত পাখি খুঁজতে থাকলেন।

একটু পরেই তিনি হন্তদন্ত এগিয়ে গেলেন। অনুসরণ করতে হল। এখানে একা দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। একটা ছোট্ট নালা ডিঙিয়ে ঝোপজঙ্গলের ভেতর পায়েচলা পথ পাওয়া গেল। সেই পথ ধরে কিছুদূর যাওয়ার পর একটা প্রকাণ্ড বটগাছ এবং নীচে নদী দেখতে পেলুম।

বটতলায় গিয়ে কর্নেল একটু কাশলেন। অমনি অবাক হয়ে দেখলুম, গাছটার অন্য পাশে ঝুরির আড়াল থেকে আবির্ভূত হলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার। আমাদের দেখে তিনি ফিক করে হাসলেন। তারপর বললেন,—ইরিগেশন বাংলার চৌকিদারের ম্যানেজ করছি। অসুবিধা হয় নাই। আপনারা আইলেন কি না খরব লইবার জন্য রায়মশায়ের বাড়ির পিছনে গিছলাম। কী কাণ্ড! অঘোরবাবু সাংঘাতিক লোক। বন্দুক লইয়া তাড়া করছিল। একখান গুলিও ছুঁড়ছিল।

কর্নেল বললেন,—আপনি তাড়া খেয়ে কি সেচবাংলোয় চলে গিয়েছিলেন?

—হঃ। লাঞ্চ খাইয়া এখানে ওয়েট করছিলাম।

—আমাদের জন্য?

নাহ্। আমি ক্যামনে জানব আপনারা এখানে আইবেন? —হালদারমশাই চারদিক দেখে নিয়ে চুপিচুপি বললেন : রায়মশায়ের বাড়ির কাছে অঘোরবাবুর তাড়া খাইয়া এখানে আইয়া পড়ছি, হঠাৎ দেখি একখান নাও ওখানে বান্ধা আছে। আমারে অরা দেখে নাই। মাঝি বিড়ি টানছিল। আর একজন প্যান্টশার্টপরা লোক নাওয়ের থিকা নাইম্যা মাঝিরে কইল, তুমি এখন যাও! চাইর-সাড়ে চাইর বাজলে এখানে আইয়া ওয়েট করবা।

কর্নের্ল দ্রুত বাইনোকুলারে যেদিক থেকে এসেছি, সেই দিকটা খুঁটিয়ে দেখে বললেন,—বাঃ! তাহলে অন্তত একজন সন্দেহজনক লোককে আবিষ্কার করেছেন।

গোয়েন্দাপ্রবর মিটিমিটি হেসে বললেন,—নাওখান যদি আগেই আইয়া পড়ে, মাঝির লগে আলাপ করুম। কী কন?

—কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বাংলোয় ফিরতে তো আপনার সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

—সঙ্গে টর্চ আছে। ফায়ার আর্মস আছে।

—পিশাচের পাল্লায় পড়লে রিভলভার দিয়ে আত্মরক্ষা করা যাবে না হালদারমশাই।

হালদারমশাই একচোট হেসে বললেন,—পিচাশ? বাংলো চৌকিদারও কইছিল, নীলকুঠির জঙ্গলে পিচাশ আছে। কর্নেলস্যার! চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি। কত রাত্রে বনেজঙ্গলে ঘুরছি। পিচাশ দেখি নাই। তবে আপনার লগে যাইয়া দুইবার নকল পিচাশ দেখছিলাম!

এখানকার পিশাচ নকল না হতেও পারে। —বলে কর্নেল বাইনোকুলারে নদী দেখতে থাকলেন। একটু পরে বললেন : একটা ছইঢাকা নৌকো আসছে।

হালদারমশাই বললেন,—যন্তরখান একবার দ্যান কর্নেলস্যার!

কর্নেল ওঁকে বাইনোকুলার দিলেন। গোয়েন্দাপ্রবর কিছুক্ষণ দেখার পর বললেন,—হ্যাঁঃ।

নৌকোটা কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়ল। হালদারমশাইয়ের ইচ্ছে ছিল একা গিয়ে আলাপ জমাবেন। কিন্তু কর্নেল এগিয়ে গিয়ে বললেন,—এই যে মাঝিভাই! আমাদের একটু বেড়াতে নিয়ে যাবে? ভাড়ার অসুবিধে হবে না। কত চাও?

মাঝি নৌকো বেঁধে বলল,—না স্যার। হরিপুরের বিশুবাবুর ভাড়া করা নৌকো। বাবু নীলপুরে শ্বশুরবাড়িতে আছেন। বাবু আর বাবুর বউ পাঁচটা নাগাদ এসে পড়বেন। কটা বাজছে স্যার?

হালদারমশাইয়ের মুখ দেখে মনে হল, কথাটা তিনি বিশ্বাস করেননি। ...

একটুখানি ছাই এবং বিশুবাবু

হালদারমশাই মাঝির সঙ্গে আলাপ করলেন। বোঝা গেল, তিনি আমাদের সঙ্গী হতে চান না। বরাবর দেখে আসছি, ওঁর মনে কোনো খটকা বাধলে, উনি তার হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বেন না। কোন্ হরিপুরের জনৈক বিশুবাবু সম্পর্কে ওঁর কেন খটকা বেধেছে, তা আপাতত জানা যাবে না।

ততক্ষণে কর্নেল হাঁটতে শুরু করেছেন। তাঁকে অনুসরণ করে বললুম, —এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

নীলকুঠির জঙ্গলে।

কর্নেল বাইনোকুলারে পূর্বদিকে জঙ্গলের শীর্ষে সম্ভবত পাখি-টাখি দেখে নিলেন। তারপর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে হন্তদন্ত হাঁটতে শুরু করলেন। মধ্যে মধ্যে ফাঁকা ঘাসজমি। তারপর জমাট ঝোপের মধ্যে উঁচু-নিচু গাছগুলো এলোমেলো বাতাসে দুলছে। চারদিকে অদ্ভুত শোঁ শোঁ শনশন শব্দ।

এদিকে আমি প্রতিমুহূর্তে সাপের ছোবল খাওয়ার আশঙ্কায় বিপন্ন বোধ করছি। তবে কর্নেল আমার আগে আছেন। সাপ ফোঁস করে উঠলে প্রথমে তিনিই টের পাবেন। কিছুক্ষণ পরে ইটের চাবড়া দেখতে পেলুম। তা হলে এটাই নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ। এখানে গাছের তলা মোটামুটি ফাঁকা এবং এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড সব লাইম-কংক্রিটের স্তূপ।

কর্নেল আরও কিছুটা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর আমাকে ইশারায় দাঁড়াতে বলে একটা উঁচু প্রকাণ্ড স্তূপের দিকে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন। তিনি জঙ্গলে ঢাকা স্তূপটার কাছাকাছি গেছেন, অমনি ধুপধুপ্ শব্দে কেউ যেন দৌড়ে পালিয়ে গেল। কর্নেল ততক্ষণে স্তূপের ওপাশে চলে গেছেন।

আচমকা এরকম ধুপধুপ দৌড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। কর্নেল স্তূপের আড়ালে অদৃশ্য হতেই ডাকলুম,—কর্নেল। কর্নেল!

কর্নেলের সাড়া এল,—এখানে এসো জয়ন্ত!

স্তূপের ওপাশে গিয়ে দেখি, কর্নেল খানিকটা ছাইয়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—কী দেখছেন?

কর্নেল হাসলেন,—যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তা-ই, পাইলে পাইতে পারো অমূল্য রতন। এই পদ্যটা তুমি নিশ্চয় পড়েছ। লক্ষ্য করো, ছাইটুকু থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে।

—কেউ এখানে সবে আগুন জ্বেলেছিল মনে হচ্ছে। পালিয়ে গেল কেন?

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—ইস্-স্। আর দু-তিন মিনিট আগে আসতে পারলে লোকটাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলতুম। বাইনোকুলারে ওকে জঙ্গলে ঢুকতে দেখে সন্দেহ হয়েছিল বটে, কিন্তু অনুমান করতে পারিনি ওর উদ্দেশ্য কী। এখন বোঝা গেল।

—ওটা কীসের ছাই?

তুমিই পরীক্ষা করে বলো এটুকু ছাই কিসের হতে পারে!—কর্নেল কয়েক পা এগিয়ে ঘাসের ভেতর থেকে একটা দেশলাই কুড়িয়ে নিলেন। বললেন : লোকটা দেশলাই ফেলে পালিয়েছে দেখছি! তার মানে সে যা পোড়াচ্ছিল, তা গোপন কিছু!

ছাইটুকু লক্ষ্য করে বললুম,—কাগজপোড়া মনে হচ্ছে।

—ঠিক ধরেছ।

—কিন্তু লোকটাকে পালানোর সময় দেখতে পাননি?

—কাছেই এই ঝোপটা দেখছো, এর ভেতর ঢুকে গিয়ে সামনে স্তূপের আড়াল হওয়া সোজা।

—তার পালিয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেয়েছি।

কর্নেল আতসকাচ বের করে ছাইটুকু পরীক্ষা করে বললেন,—মনে হচ্ছে একটা চিঠি।

অবাক হয়ে বললুম,—একটা চিঠি পুড়িয়ে ফেলার জন্যে এই জঙ্গলে ঢোকার কী দরকার ছিল?

কর্নেল হাসলেন,—লোকটা যে-ই হোক, বেশি সাবধানী। রায়মশাইয়ের বাড়ির দোতলা বা ওঁর ঘরের জানালা থেকে চারপাশটা দেখা যায়। খোলামেলা জায়গা। কাজেই চিঠিটা নীলকুঠির জঙ্গলে পোড়ানো নিরাপদ। চলো! ফেরা যাক্।

জঙ্গল পেরিয়ে পোড়ো ঘাসে ঢাকা মাঠ এবং সেই নালা পেরিয়ে গিয়ে বললুম,—চিঠি পোড়ানোর ব্যাপরটা মাথায় ঢুকছে না। কেউ কোনো গোপনীয় চিঠি পোড়াতে চাইলে আমরা এখানে আসবার আগেই পুড়িয়ে ফেলতে পারত। হঠাৎ আজ বিকেলে কেন পোড়াল?

কর্নেল বললেন,—যত ভাববে, মাথার ঘিলু বিগড়ে যাবে। ছেড়ে দাও।

রায়মশাইয়ের বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দেখলুম, অঘোরবাবু গাছের চারাগুলো গর্তে বসিয়ে ঝারি থেকে জল ঢালছেন। আমাদের দেখতে পেয়ে একগাল হেসে বললেন,—তা মনে করুন, চারাগুলো তাজা। একবছরেই ঝাঁকড়া হয়ে বেড়ে উঠবে।

কর্নেল চোখ বুলিয়ে চারাগুলো দেখে বললেন,—কিন্তু বেড়া না দিলে গরুছাগলে মুড়িয়ে ফেলবে অঘোরবাবু!

—তা কি দেব না ভাবছেন স্যার? ওই দেখুন রায়মশাইয়ের বাঁশঝাড়। পারমিশন নিয়ে নিয়েছি। কাল ভোরে ভুলু কাটারি নিয়ে আসবে। আমি বাজার থেকে দড়ি কিনে আনব।

—বাঃ! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, চারাগুলো একজাতের গাছের হলে ভালো হত। এটা মনে হচ্ছে আকাশমণি। পরেরটা শিরিষ। কী আশ্চর্য! এটা মনে হচ্ছে অর্জুন গাছ। আর ওটা সম্ভবত ইউক্যালিপ্টাস!

অঘোর অধিকারী বললেন,—হোক্ না! বিনিপয়সায় পেয়েছি।

—কিন্তু এত ঘন করে লাগানো ঠিক হয়নি। গাছগুলো বেড়ে উঠলে ঠাসাঠাসি হয়ে যাবে।

—আজ্ঞে স্যার! মনে করুন গাছ দেখতে ভালোবাসি। তারপর মনে করুন এগুলো হবে আমার নিজের গাছ। বুড়ো বয়সে এখানে কুটির তৈরি করে মনে করুন মুনিঋষির মতো বসে থাকব। রায়মশাই মনে করুন যখন স্বর্গধামে, তখন তো আমার ও বাড়িতে ঠাঁই হবে না। ওঁর ছেলে বা মেয়েজামাই বাড়ি বেচে দেবেন। সেইসব ভেবেই মনে করুন এই প্ল্যান মাথায় এসেছিল।

—চমৎকার প্ল্যান! আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করি অঘোরবাবু।

অঘোরবাবু হাসতে হাসতে বললেন,—আজ্ঞে স্যার। আমার যে বড্ড ভুলো মন। তাই আগেভাগেই মনে করুন নিজের আশ্রম পত্তন করে রাখলুম।

অঘোরবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন। আমরা রায়বাড়িতে গিয়ে ঢুকলুম। রায়মশাই উঠোনের শেষপ্রান্তে গরুর চালাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন। বললেন,—নীলকুঠির জঙ্গলে ঢুকেছিলেন নাকি?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। জয়ন্তকে নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়ে আনলুম।

বর্ষার সময় জঙ্গলে ঢোকা উচিত হয় নি। সাপ থাকতে পারে। —বলে রায়মশাই হাঁক দিলেন : কিনু! সায়েবদের কফি তৈরি করে আনো। অঘোর বোধ করি গাছের চারা পুঁতছে। পাগল একটা!

অমাদের থাকার ঘরের তালা আঁটা ছিল। খাপ্পা হয়ে রায়মশাই বললেন,—চাবি অঘোরের কাছে। কাকলি! এ ঘরের চাবি নিয়ে আয়। অঘোরের কাছে আছে।

কিনু ঠাকুরের মেয়ে কাকলি দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

কর্নেল আস্তে বললেন,—আচ্ছা রায়মশাই! আপনি হরিপুরের বিশুবাবু নামে কাউকে চেনেন—নীলপুরে তাঁর শ্বশুরবাড়ি?

রায়মশাই ভুরু কুঁচকে বললেন,—তাকে চেনেন নাকি?

—না। নদীর ঘাটে নৌকো রেখে বিশুবাবু নাকি শ্বশুরবাড়ি বউকে আনতে গেছেন। নৌকোর মাঝি বলল। ওটা নাকি ছোট ঘাট। নতুন তৈরি হয়েছে।

রায়মশাই চাপা স্বরে বললেন,—ঠক! জোচ্চোর। চিটিংবাজ। আগে তো নীলপুরেই থাকত। ঘরজামাই ছিল। হরেন দত্তর আড়ত আছে। একটিমাত্র মেয়ে। তাই বিশুকে আড়তে বসিয়েছিল। বদমাস বিশু এরিয়ার চোরডাকাতদের চোরাই মাল কিনত আর কলকাতায় বেচে আসত। শেষে পুলিশ ওকে ধরেছিল। হনের টাকাকড়ি খরচ করে জামাইকে ছাড়িয়ে এনেছিল। কিন্তু বিশু কোন্ মুখে আর শ্বশুরবাড়িতে থাকবে? কদিন আগে হরেন বলছিল, তার মেয়ে রাগ করে চলে এসেছে। তাই বুঝি বিশু শ্বশুরবাড়ি এল। কিন্তু অমন চোরাপথে কেন? মাঝি বুঝি আপনাদের বলল ছোট ঘাট? নতুন ঘাট? বোগাস! ওখানে ঘাট নেই।

—বিশুবাবু কি আপনার বাড়িতে কখনও এসেছেন?

—নাহ্। আমার কাছে ওর কী কাজ থাকতে পারে? এলে বাড়ি ঢুকতেই বা কেন দেব?

অঘোরবাবু দৌড়ে এলেন,—ইস্! কর্নেলসায়েবদের দেখেও মনে করুন চাবির কথা মনে পড়েনি। আমার ভুলো মন! ছ্যা ছ্যা ছ্যা!

বলে তিনি তালা খুলে দিলেন। রায়মশাই বললেন,—চাবিটা আমাকে দাও অঘোর। তোমার ভুলো মন নিয়ে আমার সব সময় প্রব্লেম। দাও!

চাবিটা রায়মশাইকে দিয়ে অঘোরবাবু টিউবয়েলে হাত-পা ধুতে গেলেন। দেখলুম, কাকলি হাতল টিপে দিচ্ছে।

ঘরে বসে কফি খেতে খেতে শাঁখ বাজল। সম্ভবত কিনু ঠাকুরের স্ত্রী মানদা শাঁখে ফুঁ দিচ্ছেন। রায়মশাই বললেন,—সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে আসি। আপনারা রেস্ট নিন। বলে তিনি স্যুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলেন। ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কফি খাওয়ার পর কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—বিশুবাবুর যা পরিচয় পেলুম, হালদারমশাই না বিপদে পড়েন।

বললুম,—হালদারমশাইয়ের কাছে রিভলভার আছে।

কর্নেল কী বলতে যাচ্ছিলেন, অঘোরবাবু চায়ের কাপ হাতে ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসলেন। বললেন,—তা মনে করুন আজ শান্তিতে ঘুমুতে পারব।

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। নিজের আশ্রমের শিলান্যাস করলেন!

—আজ্ঞে না, না! সে কথা বলছি না। আপনি এসেছেন তাই মনে করুন বাড়িতে আর ঢিল পড়বে না রাতবিরেতে।

ঢিলপড়া নাকি গতরাত থেকে বন্ধ হয়েছে?

অঘোরবাবু চাপা স্বরে বললেন,—গতরাতেও মনে করুন ঢিল পড়েছিল। রায়মশাইকে কিছু জানতে দিইনি আমরা। কিনুদাকে জিজ্ঞেস করুন। জানলে গুলি খরচ করতেন। কার্তুজের যা দাম মনে করুন!

—আচ্ছা অঘোরবাবু, আপনি নীলপুরের হরেন দত্তর জামাই বিশুবাবুকে চেনেন?

অঘোরবাবু নড়ে বসলেন,—খুব চিনি। তাকে মনে করুন কোথায় দেখলেন?

—নদীর ঘাটে নৌকো থেকে নেমে গ্রামে ঢুকেছেন।

ব্যাটাচ্ছেলের কাছে মনে করুন আমি পনেরো টাকা পাব। ধার করেছিল। শোধ দেয়নি। রাতের আঁধার মনে করুন কখন কেটে পড়বে। এক্ষুনি গিয়ে ওকে মনে করুন ধরে ফেলতেই হবে। —বলে অঘোরবাবু দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। ...

স্বপ্নের বাগান

একটু পরে কর্নেল জানালায় উঁকি মেরে বললেন,—অঘোরবাবু টর্চ জ্বেলে টাট্টুঘোড়ার মতো দৌড়ে গেলেন।

বললুম,—কিন্তু হরিপুরের বিশুবাবুকে কি আর উনি শ্বশুরবাড়িতে পাবেন? নৌকোর মাঝি বলছিল বিকেল পাঁচটা নাগাদ উনি সস্ত্রীক নৌকোয় উঠবেন। আপনি অঘোরবাবুকে কথাটা বললেই পারতেন।

কর্নেল বললেন,—তাই তো! আমারও দেখছি বড্ড ভুলো মন। বেচারা অকারণ হয়রান হয়ে ফিরে আসবেন। কিংবা বলা যায় না, নদীর দিকে দৌড়বেন। কিন্তু তোমারও কি ভুলো মন জয়ন্ত? তুমি ওঁকে বললে না কেন?

একটু হেসে বললুম,—তা মনে করুন একটু ভুলো মন হয়ে পড়েছি। হালদারমশাই আমাকে অন্যমনস্ক করেছেন।

সাবধান জয়ন্ত! অঘোরবাবুর কথা নকল করতে গিয়ে তুমিও মুদ্রাদোষের কবলে পড়বে। —বলে কর্নেল দরজার কাছে গেলেন : হালদারমশাইয়ের জন্য আমিও উদ্বিগ্ন। আমার এখনই নদীর ধারে যাওয়া উচিত।

—আমিও যাব আপনার সঙ্গে।

কর্নেল বললেন,—থাক্। আর তোমাকে সন্ধ্যাবেলায় বনবাদাড়ে হাঁটতে হবে না। আমার পায়ে হান্টিং বুট আছে। সাপের দাঁত বিঁধবে না। তুমি অপেক্ষা করো। আমি বেরুচ্ছি। পথে বরং গাছের ডাল কেটে একটা লাঠি বানিয়ে নেব।

কর্নেল তাঁর কিটব্যাগটা পিঠে এঁটে বেরিয়ে গেলেন। বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা নিলেন না। কিটব্যাগে জঙ্গলকাটা কাটারি আছে, তা আমি জানি।

কিছুক্ষণ পরে রায়মশাইয়ের সাড়া পাওয়া গেল। ডাকলেন,—অঘোর। অঘোর!

বারান্দায় কাকলি দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল,—ছোটবাবু টর্চ নিয়ে কোথায় বেরিয়েছেন।

রায়মশাই বললেন,—টর্চ নিয়ে? তার মানে বাজারে আড্ডা দিতে গেছে! আবার আড্ডাবাজ হয়েছে অঘোর। কাল অত রাতে ফিরল। বলল ট্রেন লেট। মিথ্যা কথা। পরশু রাতেও ফিরল দশটার পর। আসুক! মজা দেখাচ্ছি।

বলে উনি আমাদের ঘরে ঢুকলেন। জিজ্ঞেস করলেন,—কর্নেলসায়েবকে অঘোর সঙ্গে নিয়ে গেছে বুঝি?

বললুম,—না। কর্নেল সেচবাংলোয় ওঁর একজন বন্ধুর কাছে গেছেন।

রায়মশাই একটা চেয়ার টেনে বসে চাপা স্বরে বললেন,—আপনি তো কর্নেলসায়েবের কাছের মানুষ। আমার জিনিসটার ব্যাপারে তদন্ত-টদন্ত কতদূর করলেন জানেন?

বললুম,—মনে হচ্ছে, তদন্ত করতেই বেরিয়েছেন। কারণ সেচবাংলোয় ওঁর সেই বন্ধু একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আগেই ওই ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কর্নেল।

রায়মশাই খুশি হয়ে বললেন,—কর্নেলসায়েবের ওপর আমার ভরসা আছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আগেরবার এখানে উনি এসে নীলকুঠির জঙ্গলের পিশাচ রহস্য ফর্দাফাঁই করেছিলেন।

—বলেন কী? আমি জানি না তো! কর্নেল শুধু বলেছেন, ওই জঙ্গলে রাতদুপুরে অমানুষিক গর্জন শুনেছিলেন।

রায়মশাই হাসলেন,—ওটা ছিল চোরাচালানিদের ঘাঁটি। শ্মশানে রাতবিরেতে শবযাত্রীরা গেলে ওদের নৌকো চোখে পড়ে সন্দেহ হতেই পারে। তা পিশাচের গপ্পো রটিয়েছিল ব্যাটাচ্ছেলেরা। আর ওই অমানুষিক গর্জন ব্যাপারটা মাইক্রোফোনে বিকট চিৎকার। কর্নেল দলটাকে পুলিশ দিয়ে পাকড়াও করিয়েছিলেন। তবে এই গোপন ব্যাপার বাইরের লোকেরা তো জানে না। তাই এখনও রাতবিরেতে শ্মশানযাত্রীরা ডেলাইট জ্বেলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঢাকঢোল বাজায়।

রায়মশাই এবার ঘটনাটা বিস্তারিত শুনিয়ে ছাড়লেন। তার কিছুক্ষণ পরে কর্নেল এসে গেলেন। বারান্দার নীচে থেকে বললেন,—জঙ্গলে জলকাদায় আছাড় খেয়েছি রায়মশাই। শর্টকাটে আসতে গিয়ে এই বিপদ। এক বালতি জল চাই।

রায়মশাই উঠে গেলেন,—কাকলি! এখানেই জল এনে দে। ইহ্ : হাতে আর জুতোয় কত কাদা লেগে গেছে!

কাদা ধুয়ে কর্নেল ঘরে ঢুকলেন। জিজ্ঞেস করলুম,— হালদারমশাইয়ের খবর কী?

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। তোয়ালেতে হাত মুছে জুতো খুলে চটি পরলেন। তারপর বললেন,—রায়মশাই! কফি খাব।

নিশ্চয়ই খাবেন। কিনু! সায়েবকে কফি দাও—বলে চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন : খবর আছে কিছু?

—আছে। কফি খেয়ে আপনার ঘরে গিয়ে বলব।

রায়মশাই অস্থির হয়ে বললেন,—তাহলে বরং আমার ঘরেই চলুন। সেখানেই কফি পাঠাতে বলছি।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ঠিক আছে! তাই চলুন। জয়ন্ত! তুমিও এসো। ...

দোতলায় রায়মশাইয়ের ঘরে গিয়ে বসার পর কিছুক্ষণের মধ্যে কিনুঠাকুর কফি আর পাঁপরভাজা দিয়ে গেলেন। কর্নেল বললেন,—রায়মশাই! সিঁড়ির দরজাটা ভেতর থেকে আটকে দিয়ে আসুন।

রায়মশাই এ কাজে দেরি করলেন না। খবর শোনার জন্য আমিও উদ্‌গ্রীব। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে চাপা স্বরে বললেন,—সুখবর। কিন্তু আগে বলুন, জিনিসটা কিসের ভেতর রেখেছিলেন?

—ওটা ছিল একটা রুপোর কৌটোর মধ্যে। আমি রুপোর কৌটো ওই আলমারিতে রেখে হোমিওপ্যাথি ওষুধ যে সাদা কাগজে দিই, তার মধ্যে মুড়ে রেখেছিলুম—যাতে চোরডাকাতের সন্দেহ না হয়।

কর্নেল প্যান্টের পকেট থেকে একটা ছোট্ট কৌটো বের করলেন। সেটা অ্যালুমিনিয়ামের। এ ধরনের কোটোয় লোকেরা দোক্তা খায় দেখেছি। কর্নেল বললেন,—এই কৌটোটা কার চিনতে পারছেন কি?

—না তো!

কৌটোটা নতুন কেনা। —বলে কৌটোর মুখ খুলে কর্নেল প্রায় মুর্গির ডিমের গড়ন একটা নীল পাথর টেবিলে রাখলেন। পাথরটাতে আলোর ছটা পড়ে ঝলমল করছিল।

রায়মশাই দুহাতে নীলাটা নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বললেন,—ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

রায়মশাইয়ের চোখ জলে ভিজে গেল।

অবাক হয়ে বললুম,—এটা কার কাছে কোথায় হঠাৎ উদ্ধার করলেন?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—ওই কথাটা আমার বলা বারণ। রায়মশাই, রত্নটা এবার যত্ন করে ভালো জায়গায় রাখুন। কাঠের আলমারি নিরাপদ নয়। আপনার ঘরে গতবারে একটা ছোট সিন্দুক দেখেছিলুম। সেটা কোথায়?

রায়মশাই বললেন,—খাটের তলায় পড়ে আছে। বহুদিন ব্যবহার হয় না।

—ওটা ঐ সিন্দুকের মধ্যে রাখুন। কিন্তু সাবধান। ওঘরে আপনার অগোচরে কেউ যেন না ঢুকতে পারে। ...

সে রাতে কর্নেলকে অনেক প্রশ্ন করেও জানতে পারলুম না, এত সহজে কী করে তিনি দশ লক্ষ টাকা দামের নীলা উদ্ধার করলেন।

সকালে উঠে দেখি, কর্নেল যথারীতি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। আজও আকাশে বৃষ্টিমেঘ ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন শরৎকাল। আমি ঘুম থেকে উঠে কফির বদলে চা খাই। চা খাওয়ার পর বেরিয়ে গেলুম। অঘোরবাবুর হাঁকডাক শোনা যাচ্ছিল। বাড়ির পূর্বদিকে গিয়ে দেখলুম, সেই ভুলু বাঁশ কেটে এনেছে এবং বেড়ার আয়োজন চলেছে। আমাকে দেখে অঘোরবাবু হাসলেন,—এতক্ষণে উঠলেন বুঝি? কর্নেলসায়েবকে মনে করুন একবার নীলকুঠির জঙ্গলে দেখলুম।

বললুম,—অঘোরবাবু! কাল সন্ধ্যায় বিশুবাবুর দেখা পেয়েছিলেন?

অঘোরবাবু বেজার মুখে বললেন,—না। মনে করুন সে বিকেলেই কেটে পড়েছিল।

চারাগুলো একরাত্রেই সতেজ হয়ে উঠেছে। দেখতে দেখতে বললুম,—চারাগুলোর ডালে দড়ি বাঁধা আছে। কেটে ফেলা উচিত।

—হ্যাঁ। কেটে ফেলব। আর মনে করুন দুতিনটে দিন যাক্।

একটা চারার দুটো ডালে সাদা সুতো বাঁধা এবং একটা চিরকুট আটকানো দেখে বললুম,—এটা আবার কী?

—তা মনে করুন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের স্লিপ। গাছের নাম লেখা আছে। কিছুক্ষণ বেড়াবাঁধার কাজ দেখার পর বাড়ির ভেতর গেলুম। দেখলমু, কখন কর্নেল বাড়ির পশ্চিমদিক ঘুরে বাড়ি ঢুকেছেন। বললুম,—হালদারমশাই কেমন আছেন? যাননি সেচবাংলোয়?

কর্নেল ঘরে ঢুকে বললেন,—হালদারমশাই এতক্ষণ নীলপুর বাসস্টপে। সেচবাংলোয় গিয়ে দেখা করেছি। এ যাত্রা উনি অক্ষত শরীরে আছেন। তবে হরিপুরের বিশু যেতে দেরি করেছিল! রাত নটায় নৌকোয় হালদারমশাইকে দেখে সে খাপ্পা হয়েছিল। হালদারমশাই কিছু বলার আগে বিশু তাঁকে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিয়েছিল। ওখানে অবশ্য হাঁটু পর্যন্ত জল। হালদারমশাই পাড়ের ঝোপ আঁকড়ে না ধরলে কী ঘটত বলা যায় না। যাই হোক্, ব্রেকফাস্ট করে আমরাও বাসস্টপে যাব। উনি অপেক্ষা করবেন আমাদের জন্য। ...

ব্রেকফাস্ট করে রায়মশাইয়ের কাছে বিদায় নিয়ে বেরুচ্ছিলুম। অঘোরবাবু এসে বললেন,—তা মনে করুন কোথায় চললেন স্যার?

কর্নেল বললেন,—কলকাতা ফিরতে হচ্ছে। চলি অঘোরবাবু! পরে আপনার বাগান দেখতে আসব।

অঘোরবাবু বললেন,—আজ্ঞে আসবেন বৈকি। তা মনে করুন বাগান আমার স্বপ্ন। ...

শর্টকাটে বাসস্টপ যাবার পথে বললুম,—কর্নেল! নীলা উদ্ধারের রহস্যটা এবার না বললে মনে করুন—

সাবধান জয়ন্ত! —কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন : ওই মনে করুন বড় সাংঘাতিক জিনিস। বাইনোকুলারে দূর থেকে দেখছিলুম, তুমি অঘোর অধিকারীর স্বপ্নের বাগানে দাঁড়িয়ে ছিলে। চারাগুলোর মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য তোমার চোখে পড়েনি?

একটু ভেবে বললুম,—চারাগুলোর ডালে দড়ি বাঁধা ছিল। আর একটা চারার ডালে সাদা সুতোয় বাঁধা ছিল বনবিভাগের চিরকুট।

কর্নেল বললেন,—দোক্তার কৌটোয় নীলা ভরে অঘোর অধিকারী ওই চারাটার তলায় পুঁতে রেখেছিল। বিশুর সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা হয়েছে। অঘোর এখনও জানে না তার চোরাইমালে বাটপাড়ি হয়েছে। তাই আহ্লাদে আছে। আসলে এটা আমার অঙ্ক, জয়ন্ত! এতকাল পরে হঠাৎ অঘোর অধিকারীর বাগান করার সখ হয়েছে! কতকগুলো চারা জোগাড় করেছে। কাল সন্ধ্যায় বেরিয়ে চিরকুটবাঁধা চারাটা ওপড়াতেই কৌটোটো টর্চের আলোয় চকচক করে উঠেছিল। ডার্লিং! এটা নিছক অঙ্ক। আজ জঙ্গলে অঘোরবাবু ভুলুকে একটা চিঠি পোড়াতে পাঠিয়েছিল। চিঠিটা রায়মশাই মেয়েকে লিখেছিলেন। অঘোর অধিকারী নিশ্চয়ই সব চিঠি খুলে পড়ে ফের আঠা এঁটে ডাকবাক্সে ফেলত। এভাবেই সে নীলাটার কথা জেনেছিল। যে চিঠিটা ভুলুকে দিয়ে সে গোপনে পোড়াতে পাঠিয়েছিল, ওতে রায়মশাই লিখেছিলেন, নীলাটা তিনি বুদ্ধি করে হোমিওপ্যাথির বাক্সে লুকিয়ে রেখেছেন। বয়স হয়েছে। হঠাৎ স্ট্রোকে মারা পড়লে তাঁর মেয়ে যেন এসে নীলাটা খুঁজে পায়। অঘোর এই চিঠি পড়েই স্বর্গ হাতে পেয়েছিল।

—এ-ও কি আপনার অঙ্ক?

—আজ ভোরে বেরুনো সময় কৌশলে রায়মশাইকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, সম্প্রতি কোনো চিঠি তিনি ছেলে বা মেয়েকে লিখেছিলেন কি না এবং তাতে কী লিখেছিলেন? রায়মশাই জানিয়ে দিলেন। অঘোর অধিকারীকে দিয়েই সব চিঠি ডাকঘরে পাঠান উনি। কাজেই অঙ্কটা মিলে গেল।

—ঢিল পড়ত কেন?

—ওটাই অঘোরের বদমায়েসি। ভুতুড়ে আবহাওয়া তৈরি করতে চেয়েছিল বাড়িতে। রায়মশাই মুখে যা-ই বলুন, আমি খুব ভালো জানি, উনি ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী। যদি নীলা চুরি ভূতের ঘাড়ে চাপানো যায়!

বলে কর্নেল বাইনোকুলারে সম্ভবত পাখি দেখে নিয়ে আবার হাঁটতে থাকলেন। ...

*   *   *

একটু পরিশিষ্ট আছে। তা বলা দরকার। আমরা কলকাতা ফিরে যাওয়ার কিছুদিন পরে কর্নেল রায়মশাইয়ের একটা চিঠি পেয়েছিলেন। তাতে উনি লিখেছিলেন :

সম্প্রতি অঘোর বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। সংসারে তার আর মন নেই। সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে যাবে। হতভাগা কেন সন্ন্যাসী হবে, এটা আমার কাছে রহস্য। তবে এ রহস্য নিয়ে আমার মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আপনাকেও এ বিষয়ে মাথা ঘামাতে বলছি না। আর একটা কথা। যাবার আগে সে তার বাগানের চারাগাছগুলো উপড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। ...

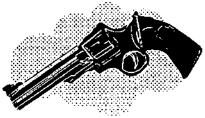

হায়েনার গুহা

খুদে-মানুষ মিনিহুন

গায়ে পড়ে আলাপ করতে আমেরিকানদের জুড়ি নেই। লস এঞ্জেলিস থেকে প্লেনে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হনলুলু যাবার সময় এই মারকিন খুড়ো-ভাইপোর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল। খুড়োর নাম জন নর্থব্রুক। ভাইপোর নাম রবার্ট ওরফে বব। খুড়োর বয়স ষাটের কাছাকাছি। গায়ে গতরে সাদা হাতি বলা যায়। ভাইপোটি তার উল্টো। কতকটা আমার মতো রোগাটে। মাথাতেও প্রায় সমান-সমান। কথায়-কথায় ফিকফিক করে হাসে। ভারি আমুদে-ছোকরা।

ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের মাঝারি গড়নের প্লেন। জনা ষাটেক যাত্রী ধরে। মাঝবরাবর করিডোরের মতো যাতায়াতের পথ আছে এবং প্রতিসারে একদিকে তিনটে, অন্যদিকে দুটো করে আসন। তিনটে আসনের দিকে জানলার ধারে আসনটা আমার। বাকি দুটোয় সেই খুড়ো-ভাইপো।

জনখুড়ো আমার গায়ে। তিনিই গায়ে পড়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মাফ করবেন। মশাই কি দক্ষিণদেশীয়? স্প্যানিশ, পর্তুগিজ?

আমেরিকানরা যখন 'দক্ষিণদেশীয়' বলে তখন বুঝতে হবে ওরা দক্ষিণ আমেরিকার কথা বলছে। এই ক'মাসে টের পেয়েছি, কী জানি কেন সবখানেই ওরা আমাকে স্প্যানিশ বা পর্তুগিজ ভাবে। ডেনভারে একজন আমাকে ইন্দোনেশিয়ার লোক ভেবেছিল। আসলে দক্ষিণ আমেরিকার কিছু দেশে স্প্যানিশ বা পর্তুগিজদের গায়ের রঙ মোটেও ফর্সা নয়, রোদপোড়া তামাটে। বংশানুক্রমে ওদের পিতৃ-পুরুষদের ইউরোপীয় সাদা চামড়া নষ্ট হয়ে গেছে দক্ষিণ আমেরিকার জলহাওয়ায় এবং কড়া রোদ্দুরে। তা ছাড়া সেখানে ভীষণ দারিদ্র্য। অপুষ্টিতে তাগড়াই গতর আমার মতো প্যাকাটি হয়ে গেছে অনেকের।

জনখুড়োর প্রশ্নের জবাবে যখন নিজের পরিচয় দিলাম, তখন উনি ভারি অপ্রস্তুত হলেন। বললেন, আমার এ ভুলের জন্যে দুঃখিত মিস্টার। তা হলে আপনি ক্যালকুট্টার লোক? আমার এক দাদা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্যালকুট্টাতে ছিলেন। ওঃ! সে কত অদ্ভুত সব গল্প শুনেছি।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের ভাব হয়ে গেল। বিদেশ-বিভুঁয়ে—বিশেষ করে পথে যেতে যেতে কারুর সঙ্গে আলাপ হলে ভালোই লাগে। পথের ক্লান্তি টের পাওয়া যায় না। জন নর্থব্রুক নিজের পরিচয় দিলেন। উনি লস এঞ্জেলিসে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। এমন পণ্ডিত লোকের সঙ্গে পরিচয় হওয়া খুব আনন্দের। ওঁর ভাইপো বব আমার মতোই পেশায় সাংবাদিক। এখন নভেম্বরের শেষাশেষি আমেরিকায় থ্যাংকস-গিভিং ডে'র উৎসব। তাই দিনতিনেক ছুটি। খুড়ো ভাইপো ছুটি কাটাতে যাচ্ছেন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে।

জনখুড়ো বললেন,—আর আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা হনলুলুতে নামছি। তা আপনি কি হনলুলুতেই থাকছেন?

বললাম,—আমার ইচ্ছে, বিখ্যাত সমুদ্রতট ওয়াইকিকিতেই কোথাও থাকব।

জন হাসলেন। ওয়াইকিকি খুব সুন্দর জায়গা। সবাই ওখানেই যায়। কিন্তু আমি বলি কি, যদি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সত্যিকার সৌন্দর্য উপভোগ করতে চান, তাহলে চলুন আমাদের সঙ্গে কাউয়াই দ্বীপে।

বব গম্ভীর মুখে বলল,—আমরা সেখানে 'মিনিহুন' দেখতে যাচ্ছি।

বললাম,—মিনিহুন? সে আবার কী?

জন হাসতে হাসতে বললেন,—বব সব সময় তামাশা করে। মিনিহুন নিছক কল্পনা। আপনি নিশ্চয় বিখ্যাত বই গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়েছেন? তাতে লিলিপুট নামে খুদে মানুষদের কথা আছে। এই 'মিনিহুন' হল সেই রকম লিলিপুট মানুষ। আশ্চর্য, ক্যাপ্টেন টমাস কুক ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কাউয়াই দ্বীপে এসেছিলেন—তিনিও স্বচক্ষে ওদের দেখেছেন বলে লিখে গেছেন। তারপর দুশো বছর ধরে এই গুজব সমানে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা মিনিহুন কেউ ধরে ফেলা তো দূরের কথা, ফটো পর্যন্ত তুলে দেখাতে পারে নি। কাজেই এটা নিছক গুলতাপ্পি। আসলে কথাটা এসেছে সম্ভবত মিনি থেকে। মিনি মানে খুদে। আর হুন হল সেই বর্বর ইউরোপীয় জাতের লোকের—যাদের নেতা ছিল অ্যাটিলা। হুনদের শরীব ছিল পেশীবহুল। গায়ে প্রচণ্ড জোর। আমাদের সেরা পালোয়ানকেও একজন মিনিহুন নাকি তুলে আছাড় মারতে পারে।

বব তেমনি গম্ভীর মুখে বলল,—আমি কিন্তু এবার যাচ্ছি মিনিহুনদের ছবি তুলব এবং আমার খবরের কাগজে তাদের কথা লিখব। চাউড্রি (চৌধুরী), তুমিও কাগজের লোক। আমার সঙ্গী হও।

জন রাগ করে বললেন,—আবার তুমি একটা বিপদ না বাধিয়ে ছাড়বে না বাপু! সেবারকার মতো আর তোমাকে আমি খুঁজতে বেরুব না বলে দিচ্ছি। হায়েনার গুহায় মরে পড়ে থাকবে।

অবাক হয়ে বললাম,—হায়েনার গুহা মানে?

জন বললেন,—কাউয়াই দ্বীপের উত্তর উপকূলে একটা এলাকার নাম হায়না। ওখানে সমুদ্রের খাড়ির মাথায় অসংখ্য গুহা আছে। আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি মিঃ জয়ন্ত চৌধুরী, কক্ষণও ববের কথায় ভুলে ওর পাল্লায় পড়বেন না।

বব আমার দিকে চোখ টিপল। ঠোঁটের কোণায় হাসি। বললাম,—আচ্ছা অধ্যাপকমশাই, মিনিহুন যদি সত্যি না থাকে, এমন গুজব রটল কেন? আমাদের বাংলার প্রবাদ হল—যা রটে, তা কিছু-কিছু সত্যি বটে।

জন বললেন,—আমার ধারণা, আফ্রিকার পিগমিদের মতো বেঁটে একজাতের আদিম অধিবাসী ছিল হাওয়াই এলাকায়। কয়েকশ বছর আগে তারা লুপ্ত হয়ে গেছে। গল্পটা তাই রটে আসছে। যদি আমাদের সঙ্গে যান কাউয়াই দ্বীপে, গিয়েই শুনবেন মিনিহুন নিয়ে লোকেরা গল্প করছে। এমন কী, গাইডগুলো পর্যন্ত হলফ করে আপনাকে 'মিনিহুন' দেখাতে নিয়ে যাবে। দেখবেন তো নবডংকাটি, খামোকা একগাদা পয়সা গচ্চা যাবে। গাইড আপনাকে সমুদ্রের খাড়ির মাথায় বসিয়ে রেখে বলবে, আপনি ওইখানটায় লক্ষ রাখুন—খুদে মানুষ দেখতে পাবেন। সময়মতো আপনাকে এসে নিয়ে যাব। আপনি তো বসে রইলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ব্যাটা কতক্ষণ পরে এসে বলবে, কী দেখতে পান নি? তা হলে আজ ওরা বেরোয়নি গুহা থেকে। আপনার বরাত। কালকে চেষ্টা করবেন। অনেকসময় হাজার ফুট নীচে পাথরের ওপর একরকম সমুদ্র শকুন দেখিয়ে গাইড বলবে, ওই দেখুন! আপনি যদি বলেন, ওগুলো তো পাখি—তখন গাইডব্যাটা একগাল হেসে বলবে, মশায়ের চোখ খারাপ। পাখি হলে উড়ত না?

বব মিটিমিটি হেসে বলল,—কী জায়েন্টো চাউড্রি? যাচ্ছ তো আমাদের সঙ্গে।

বললাম,—হায়েনার গুহায় তোমার সঙ্গে ঢুকতে বেজায় লোভ হচ্ছে বব। কিন্তু আমার নামটা তুমি ভুল উচ্চারণ করছ। আমি জয়ন্ত চৌধুরী।

বব বিড়বিড় করে নামটা আওড়াতে থাকল। জানলায় দেখি প্রশান্ত মহাসাগরের নীল ঢেউ। আমাদের প্লেন সবুজ দ্বীপের ওপর চক্কর দিচ্ছে। হনলুলু এয়ারপোর্ট এসে গেল দেখতে-দেখতে।

সিগারেট কেসের রহস্য

খুড়ো ভাইপোর সঙ্গে আধঘণ্টা পরে ফের প্লেনে উঠলাম। কাউয়াই দ্বীপে পৌঁছতে মোটে সাতাশ মিনিট লাগল। এই এয়ারপোর্টের নাম লিহিউ। চারদিকে আখের ক্ষেত, মধ্যিখানে বিমান-বন্দর। গেট পেরিয়ে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলাম তিনজনে। জনখুড়ো ট্যাকসি চালককে বললেন,—হায়েনা টাউনশিপ।

কাউয়াইকে বলা হয় উদ্যানদ্বীপ। সবুজ গাছে ভরা। দূরে হাজার পাঁচেক উঁচু পাহাড় 'মাউন্ট ওয়াইয়ালেয়ালে।' আসলে দ্বীপটার চারদিকেই উঁচু পাহাড়। খাড়িগুলো বিপজ্জনক। কাউয়াইদ্বীপে তাই জাহাজ ভেড়ার জায়গা নেই। কয়েক মাইল দূরে জাহাজ রেখে ছোট ছোট বোটে দুঃসাহসীরা খাড়িতে যদি বা ঢুকতে পারে, তীরে ওঠা অসম্ভব। খাড়া পাহাড়। তাই এ দ্বীপের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ শুধু প্লেনে। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে টমাস কুক এ দ্বীপে নামতেই পারেননি।

ছোটবড় গোটা আষ্টেক দ্বীপ নিয়ে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ। আমেরিকার শাসনে রয়েছে। তাই আমেরিকায় ঘুরে যেমনটি দেখেছি, এখানেও তাই। সুন্দর সুন্দর চকচকে রাস্তাঘাটে পায়ে হাঁটা লোক নেই। এই কাউয়াই দ্বীপকে সত্যি একটা বাগানের মতো সাজিয়ে রেখেছে। হায়েনা উপনগরী পাহাড়ি টিলার গায়ে। উত্তর-পশ্চিম জুড়ে প্রশান্ত মহাসাগর। প্রায় হাজার ফুট নীচে সমুদ্রের জল গর্জন করছে। সাদা ফেনা দুলছে। ঝাঁকে-ঝাঁকে সমুদ্রপাখি উড়ছে। শব্দে কান পাতা দায়।

ততক্ষণে লিহিউতে নেমেই জনখুড়ো ফোন করে হোটেল বুক করেছেন। হোটেলের নাম কোকো পাম হোটেল। দোতলা হোটেল। ওপরতলায় আমি একটা সিঙ্গল স্যুট, খুড়োভাইপো একটা ডাবল স্যুট ভাড়া করেছেন। এ হোটেলেও যা রাজকীয় বিলাস আর আরামের ব্যবস্থা, আমাদের দেশের সেরা হোটেলেও তা কল্পনা করা যায় না। জানলা দিয়ে খাড়ির নীচে সমুদ্র চোখে পড়ছিল। বিকেল-চারটে বেজে গেছে। পাশের ঘর থেকে ফোন করলেন জনখুড়ো। কফি খেতে ডাকলেন।

গিয়ে দেখি, নিজেরাই কফি তৈরি করেছেন। প্রতি ঘরে কফি তৈরির ব্যবস্থা আছে। কফি খেতে খেতে জন বললেন,—কী মনে হচ্ছে? কাউয়াই স্বর্গোদ্যান না?

স্বীকার করলাম। ... অবশ্যই মিঃ নর্থধ্রুব। এমন জায়গা থাকতে পারে, ভাবিনি। তা ছাড়া ...

কথা কেড়ে বব বলল,—তুমিও আমার মতো ওঁকে আংকল জন বা জনখুড়ো বলতে পার জায়েন্টো! তাতে উনি রাগ করবেন না।

জনখুড়ো হাসিমুখে বললেন,—মোটেও রাগ করব না। তুমিও আমার ভাইপোর বয়সি জয়ন্ত!

বললাম,—আপনি তো দিব্যি জয়ন্ত উচ্চারণ করতে পারছেন, কিন্তু বব অমাকে জায়েন্টো বানিয়ে ছাড়ল। অথচ আমি জায়েন্টো বা দৈত্যের এক শতাংশও নই।

এই সময় দেখলাম বব সিগারেটের প্যাকেট বের করে খুড়োর দিকে বাড়িয়ে দিল। আমার চোখে এটা দৃষ্টিকটু। গুরুজনদের সিগারেট দেওয়া তো দূরের কথা, তাদের সামনেও আমরা ভারতীয়রা সিগারেট খাই না। কিন্তু সায়েবদের রীতিনীতি আলাদা। জন সিগারেট নিলেন, বব আমার দিকে এগিয়ে দিল প্যাকেট। বললাম,—ধন্যবাদ বব। আমি আলাদা ব্রান্ডের সিগারেট খাই। আমার কড়া সিগারেট পছন্দ।

বলে পকেট থেকে আমার সিগারেটকেস বের করলাম।

জনখুড়ো আমা সিগারেটকেসটার দিকে তাকিয়েই কেমন যেন চমকে উঠলেন। তারপর খপ করে ওটা প্রায় কেড়ে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে থাকলেন। আমি তো হতভম্ব। বব মিটিমিটি হেসে বলল,—দেখছ কী জায়েন্টো! খুড়োর তোমার সিগারেটকেসটির মধ্যে নিশ্চয় হাজার-হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাসের গন্ধ পেয়ে গেছেন। খুড়োমশাই প্রাচীন ইতিহাসের দিগগজ পণ্ডিত

কি না। দেখবে, হয়তো তোমার সিগারেটকেস নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার বক্তৃতা দিতে দৌড়ুবেন।

ভাইপোর তামাশার দিকে মন নেই জনখুড়োর। সিগারেটকেসটা খুলে উনি সিগারেটগুলো বের করে টেবিলে রাখলেন। তারপর জানলার কাছে গিয়ে ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে বললেন,—হুম! জয়ন্ত, এ জিনিস তুমি কোথায় পেলে? নিশ্চয় লস এঞ্জেলিসের কোনো কিউরিও শপে?

বললাম,—না খুড়োমশাই। কিউরিও শপের জিনিসের দাম দেবার পয়সা কোথায় আমার? সিগারেটকেসটা আমি পয়সা দিয়ে কিনিনি। ওটা আমার এক বাল্যবন্ধুর উপহার।

জনখুড়ো উত্তেজিতভাবে বললেন,—বাল্যবন্ধু! কে সে বাল্যবন্ধু?

বললে কি চিনবেন? —হাসতে-হাসতে বললাম : সে থাকে পশ্চিমবঙ্গের এক অজ পাড়াগাঁয়ে। নিছক চাষাভুষো মানুষ। গাঁয়ের পাঠশালায় আমার সঙ্গে দিনকতক অ আ ক খ শিখেছিল। তারপর পড়া ছেড়ে বাবার সঙ্গে জমি চষতে গিয়েছিল। আর পড়াশোনা হয়নি তার। বছর দুই আগে কলকাতা থেকে গাঁয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম—তখন সে এটা উপহার দিয়েছে।

জন নর্থব্রুক আমার মুখোমুখি বসে তেমনি উত্তেজনায় প্রশ্ন করলেন,—আশ্চর্য! সে কোথায় পেল এ জিনিস?

মাঠে জমি চাষ করতে গিয়ে লাঙলের ফালে এটা মাটির তলা থেকে উঠে এসেছিল। —এবার একটু গম্ভীর হয়েই জবাব দিলাম। আমার বিস্ময়টা বেড়ে যাচ্ছিল, তাই।

জনখুড়ো চিন্তিতভাবে বললেন,—এ বড় আশ্চর্য জয়ন্ত! এখন আমার মনে হচ্ছে, যেন তোমার এই কাউয়াই দ্বীপের হায়েনা উপনগরীতে ছুটে আসার মধ্যে নিয়তির অনিবার্য টান টের পাচ্ছি। জয়ন্ত, এই সিগারেটকেস এখানকারই পলিনেশীয় জাতির লোকেরা তৈরি করে। এই দেখো, খুদে হরফে লেখা আছে 'মেড ইন হায়েনা'। কিন্তু তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, এর গায়ে প্রাচীন পলিনেশীয় ভাষায় লেখা কয়েকটা কথা। 'আহোয়ায়ালোয়া'। তার পাশে দেখতে পাচ্ছ এই চিহ্নটা? একটা ত্রিভুজের মাথায় যেন চন্দ্রকলা আঁকা। বড় রহস্যময় ব্যাপার জয়ন্ত! আমি মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

খুড়ো মুঠোয় সিগারেটকেসটা আঁকড়ে ধরে চোখ বুজে কী যেন ভাবতে লাগলেন। বব আমার দিকে চোখ টিপে কী ইশারা করল এবং মিটিমিটি হাসতে লাগল।

চোখ খুলে জনখুড়ো বললেন,—কাছিমজাতীয় একরকম সামুদ্রিক প্রাণীর খোলা থেকে এসব সিগারেটকেস তৈরি করে ওরা। আমার চোখে পড়েছিল ওই ত্রিভুজের মাথায় চন্দ্রকলা চিহ্নটা। এটা এই দ্বীপের আদিম রাজার প্রতীকচিহ্ন। আর 'আহোয়ায়ালোয়া' কথাটার মানে 'এর ভেতরে গোপন বৃত্তান্ত আছে।' আমি বুঝতে পারছি না, এটা ভারতের একটা গ্রামের মাঠে চাষের জমিতে কীভাবে গেল?

আমিও ব্যাপারটা ভাবছিলাম। এতক্ষণে হদিস মিলে গেল। বললাম,—জনখুড়ো! একটা যোগাযোগ খুঁজে পেয়েছি মনে হচ্ছে। আমাদের গ্রামের যে মাঠে জিনিসটা আমার চাষীবন্ধু কুড়িয়ে পেয়েছিল, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে সেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটা সামরিক বিমানঘাঁটি বানানো হয়েছিল। তখন আমি নেহাত বাচ্চা। শুনেছি, একদিন একটা ছোট্ট প্লেন কীভাবে সেখানে আছড়ে পড়েছিল নামবার সময়। প্লেনটায় আগুন ধরে যায়। পাইলট বা তার সঙ্গীরা কেউ বাঁচেনি। এখন মনে হচ্ছে, এই সিগারেটকেসটা তাদেরই কারুর কাছে ছিল। যেভাবে হোক, ওটা ধ্বংসস্তূপে টিকে গিয়েছিল। তারপর বিমানঘাঁটিটা যুদ্ধের শেষে উঠে যায়। অনেকবছর পরে জমিতে চাষ পড়ে। তখন সিগারেটকেসটা বেরিয়ে আসে লাঙলের ফলায়।

জন সায় দিয়ে বললেন,—ঠিক ঠিক। বোঝা গেল সব। এ নিশ্চয় কোনো আমেরিকানের কাছে

ছিল। কিন্তু জয়ন্ত, আবার বলছি—যেন তুমি নিয়তির টানেই ছুটে এসেছ হায়েনাতে। কারণ হায়েনার আদিম রাজার প্রতীক-চিহ্ন আঁকা সিগারেটকেস তোমার কাছে!

ভয় পেয়ে বললাম,—ওরে বাবা! নিয়তি-টিয়তি শুনলে বুক টিপ-টিপ করে কাঁপে যে!

বব বলল,—খুড়ো! ওই হোয়া হোয়াহোয়া ব্যাপারটা কী বলছিলেন যেন?

জন বললেন,—তামাশা নয় বব! কথাটার মানে এর ভেতরে গোপন বৃত্তান্ত আছে। তার মানে এই সিগারেটকেসটার ভেতর আদিম রাজা হোলাহুয়া সংক্রান্ত কোনো গোপন বিবরণ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা প্লেন দুর্ঘটনার সময় নষ্ট হয়ে গেছে। কিংবা ...

বাধা দিয়ে বললাম,—জনখুড়ো! আমার চাষীবন্ধু বলেছিল এর ভেতর দলাপাকানো শক্ত কিছু জিনিস ছিল। সেগুলো সে ধুয়ে সাফ করেছিল।

জন বললেন,—হুঁ। যা ভেবেছি, তাই।

বব বলল,—দলাপাকানো শক্ত জিনিসগুলো সিগারেট ছাড়া কিছু নয়।

জন ভাইপোর দিকে তাকিয়ে বললেন,—হ্যাঁ-হ্যাঁ। তা হতে পারে জয়ন্ত, জিনিসটা আমি ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে চাই। তোমার কি আপত্তি আছে?

আমি বলার আগেই বব বলে উঠল,—জায়েন্টো খুব ভালো ছেলে। ওর কোনো আপত্তি নেই। আপনি ওটা নিয়ে গবেষণায় লেগে যান। ততক্ষণ আমি জায়েন্টোকে নিয়ে একবার চক্কর দিয়ে আসি।

জনখুড়ো গম্ভীর মুখে বললেন,—যেখানে যাবে যাও, গুহা-টুহায় যেন ঢুকো না। সাবধান। আর জয়ন্ত, ও যদি কোনো গুহায় ঢুকতে চায়, তুমি ওর চুপ খামচে ধরে ঠেকাবে। বব চুলে জব্দ।

বব তার মাথায় লম্বা মেয়েলি চুলগুলো দুহাতে ঢেকে বলল,—জায়েন্টো, আমার চুলে কিন্তু বিদ্যুৎ আছে। শক মারবে। ছুঁয়ো না।

বলে সে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে বাইরে নিয়ে গেল। ...

আংকল ড্রাম

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের নভেম্বর-শেষের আবহাওয়া ভারি মনোরম। কলকাতারই নভেম্বরের মতো। কিন্তু হুট করতেই বৃষ্টির বড় উপদ্রব। বেরুলাম যখন তখন চারদিকে ঝলমল করছে বিকেলের গোলাপি রোদ্দুর। সমুদ্রের দিকটা অবশ্য ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে। পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে চড়াই-উৎরাই রাস্তা। রেলিংঘেরা ফুটপাথের ধারে নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। ফুলে-ফুলে ছয়লাপ, যেদিকে তাকাই। নীচের উপত্যকায় ঘন নারকোলবন। চোখ জুড়িয়ে যায়। রাস্তায় পায়ে হাঁটা লোক কিছু-কিছু চোখে পড়ছিল। পৃথিবীর নানা দেশের পর্যটক ওরা। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন অধিবাসী পলিনেশীয়রা খুব সেজেগুজে ঘুরছে। ওদের মেয়েদের গায়ে ফুলের পোশাক। চওড়া ফুটপাতে বা কোথাও ছোট্ট পার্কে ওরা নাচছে-গাইছে। পুরুষরা বাজনা বাজাচ্ছে। ভিড় জমে আছে। যেতে যেতে হঠাৎ কোত্থেকে বৃষ্টি এসে গেল। দেখলাম বৃষ্টিতে ভিজতে সবাই ভালোবাসে। আমি আর বব বাদে।

বব আমার হাত ধরে টানতে-টানতে দৌড়ুল। একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকলাম। ঢোকার সময় অবাক হয়ে দেখলাম, কয়েকটা ভাষার সঙ্গে বাংলাতেও বড় বড় হরফে লেখা আছে : ঢাকুচাচার রেস্তোরাঁ। পাশে ইংরেজিতে : আংকল ড্রামস রেস্তোরাঁ।

বললাম,—বব! বব! এটা বাঙালি রেস্তোরাঁ দেখছি।

বব বলল,—তাই বুঝি?

ভেতরে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড ভুঁড়িওলা বেঁটে একটা লোক তম্বি করছিলেন ইংরাজিতে। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মাথায় বিশাল টাক। দেখামাত্র আমার প্রিয়তম বন্ধু সেই প্রখ্যাত 'বুড়োঘুঘু' কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের কথা মনে পড়ে মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। হায় কর্নেল! তুমি কোথায়, আর তোমার চিরনেওটা জয়ন্তই বা কোথায়? মাঝখানে দু-দুটো মহাসাগরের ব্যবধান—প্রশান্ত মহাসাগর আর ভারত মহাসাগর।

বব ফিসফিস করে বলল,—এ দেখছি আরেক আংলক। আমার আংকল জন. আর তোমার তা হলে এই বাঙালি আংকল ড্রাম। সত্যি ড্রাম বটে। ড্রামের মতো গমগম করে বাজছে শোনো!

প্রকাণ্ড পিপে-মানুষটা আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন কাউন্টার থেকে। পায়ের চাপে মাটি কাঁপার কথা। কিন্তু মেঝেয় পুরু নরম কার্পেট। কোণার দিকে ছোট্ট মঞ্চে বাজনাপার্টি বসে আছে সেজেগুজে। অবাক হয়ে দেখলাম, মাইকের সামনে একটা শাড়িপরা বাঙালি মেয়ে এসে দাঁড়াল। তারপর মিঠে গলায় বাংলায় ভাটিয়ালি গেয়ে উঠল। তন্ময় হয়ে গেলাম। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে এসে বাংলার ভাটিয়ালি শুনব কে ভেবেছিল?

পিপেমানুষটা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। পা থেকে মাথা অব্দি গমগমে গলায় এবং বিরাট হাসি মিশিয়ে বলে উঠলেন,—ঢাকা না কইলকাত্তা?

কলকাতা।

প্রকাণ্ড দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন,—হঃ। গন্ধ পাইয়াই বুজছি। আহা রে, কতকাল বাদে ভাইপোডারে পাইলাম। আয়েন, আয়েন। আর শোনেন, আমারে চাচা কইবেন। ঢাকুচাচা।

তারপর ববকে দেখিয়ে বললেন,—এ হালারে জোটাইলেন ক্যান? মাইয়ামাইনষের লাখন চুল রাখছে মাথায়। হালা বুত না প্যারত? মারকিনগুলান, বোঝলেন? ব্যাবাক জংলি।

বব কিছু আঁচ করছিল। ঢাকুচাচা এবার তার হাত নিয়ে জোরালো হ্যান্ডশেক করে নিজস্ব ইংরেজিতে বললেন,—হ্যালো হ্যালো হ্যালো! আই অ্যাম ইওর আংকল ড্রাম!

বব মুচকি হেসে বলল,—আমার একজন আংকল আছে। তবে জোড়া আংকলে আপত্তি নেই।

কাচের দেওয়ালের পাশে আমাদের বসিয়ে ঢাকুচাচা গল্প করতে লাগলেন। তাঁর নাম মুঝঃফর হোসেন। ডাক নাম তার ঢাকু মিয়া। বাড়ি বাংলাদেশের ঢাকা শহরে। সতেরো বছর ধরে নানা ঘাটের জল খেয়ে এই হায়েনাতে এসে জুটেছেন। পয়সাকড়ি হয়েছে। মা-মরা মেয়ে জ্যোৎস্নাকে এনেছেন গত বছর। ঢাকায় মামার কাছে থাকত এতদিন জ্যোৎস্না ভালো গাইতে পারে। এই এক বছরে নানাভাষায় গান শিখেছে সে। যে দেশের গান গায়, সেই দেশের পোশাক পরে। ঢাকুচাচা বললেন,—জ্যোৎস্না আইয়া আমার রেস্তোরাঁর বিক্রিবাটা খুব বাড়ছে। হঃ। আর আমার চিন্তা নাই। মাইয়াডার হাতেও রেস্তোরাঁর ভার দিয়া বাইরে ঘোরনের ফুরসত পাই। কাইল সকালে আসেন ভাইপো। আপনারে লইয়া বাইরামু।

চারমাস পরে বাংলায় মন খুলে কথা বলতে পেরে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল। একটু পরে চাচা তাঁর মেয়েকে ডেকে এনে আলাপ করিয়ে দিলেন। জ্যোৎস্না ফুটফুটে সুন্দরী। মাথার চুল ববছাঁট। ভারি মিষ্টিস্বভাবের মেয়ে। এক সময় সে আমাকে অবাক করে বলে উঠল,—আচ্ছা। এবার বলুন, আপনি একা কেন কাউয়াই দ্বীপে? সঙ্গে আপনার কর্নেল নেই কেন?

হাঁ করে আছি দেখে সে বলল,—বারে! জয়ন্ত চৌধুরী আর কর্নেলের অ্যাডভেঞ্চার আমি পড়িনি বুঝি? কলকাতায় আমার মাসির বাড়ি। যখন গেছি, একগাদা করে বই কিনে নিয়ে গেছি ঢাকায়। আমি অ্যাডভেঞ্চার আর গোয়েন্দা-কাহিনির পোকা।

প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপে পাঠিকা পেয়ে যাওয়া আমার পক্ষে খুব আনন্দের। ববকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে সে প্রশংসার চোখে আমাকে দেখতে লাগল, চাচা কাউন্টারে চলে গেছেন।

রেস্তোরাঁয় ভিড় বাড়ছে ডিনার খেতে। এখানে লোকের ছটার মধ্যে ডিনার খাওয়া অভ্যাস। বব উসখুস করছে দেখলাম।

জ্যোৎস্না বলল,—আপনাকে জয়ন্তদা বলছি। রাগ করবেন না তো?

জ্যোৎস্না চোখে হেসে রহস্যময় ভঙ্গি করে চাপা গলায় বলল,—নিশ্চয় হায়েনার কোনও গুহায় গুপ্তধনের সূত্র পেয়ে পাড়ি জমিয়েছেন। এবং যেখানে জয়ন্ত চৌধুরী, সেখানেই কর্নেল। কাজেই বুঝতে পারছি, কর্নেল একা কিছু তদন্ত করতে বেরিয়েছেন।

না জ্যোৎস্না! সত্যি বলছি, উনি আসেন নি।

জানি, গোয়েন্দাদের সব কথা গোপন রাখার নিয়ম। তবে জয়ন্তদা আমাকে সঙ্গে নিতে হবে কিন্তু। আমি জানি ... বলে সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে শেষে ববের দিকে তাকালো। ইংরেজিতে বলল,—মিঃ বব। আশা করি কিছুক্ষণ মাতৃভাষায় আমাদের আলাপে তোমার অসুবিধে হচ্ছে না। জরুরি কথাটা সেরে নিয়ে আমরা সবাই এবার ইংরেজিতেই বলব। আমরা বন্ধুর মতো। কেমন?

বব ফিক করে হেসে বলল,—ওক্কে-ওক্কে বেবি! তোমরা জরুরি কথাটা সেরে নাও। আমি আমার জনখুড়োকে ফোনে জানিয়ে দিয়ে আসি আমরা ডিনারটা এখানেই সেরে নিচ্ছি। উনি যেন নিজেরটা, কোথাও সেরে নেন।

বব ফোনের দিকে এগিয়ে গেল। জ্যোৎস্না বলল,—যা বলছিলাম জয়ন্তদা। এখানে একবছর আছি। মিনিহুন নামে খুদে মানুষের কথা শুনেছি। তারা নাকি গুহার ভেতর থাকে। খুব দুর্গম সে-সব গুহা। ওরা সমুদ্রের মাছের মতো ঘুরতে পারে নাকি। তাই সমুদ্রের তলা থেকে দামি মণিমুক্তা কুড়িয়ে এনে গুহার ভেতর লুকিয়ে রাখে। বছরের পর বছর জমানো সেইসব রত্নের নাকি পাহাড় জমিয়ে রেখেছে ওরা গুহার ভেতর পাতালপুরীতে। রত্নগুলো সূর্যের মতে আলো ছড়ায় সেখানে। পাতালপুরীতে তাই একটুও অন্ধকার নেই। সারাক্ষণ ঝকমকে রোদ্দুর।

হাসতে হাসতে বললাম,—রূপকথা বলছ জ্যোৎস্না!

জ্যোৎস্না মাথা নেড়ে বলল,—মোটেও না। এখানকার পলিনেশীয়রা এসব দারুণ বিশ্বাস করে। আমাদের তিনজন পলিনেশীয় পরিচারক আছে—দুজন মেয়ে, একজন ছেলে। ওই যে ওরা। দেখছেন তো? ওদের কাছে শুনেছি, কাউয়াই দ্বীপের এক রাজা ছিল। একমাত্র তাকেই নাকি মিনিহুনরা খাতির করত। রাজাকে একবার ওরা নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়েছিল পাতালপুরীতে।

বললাম,—ঠিক আছে। যদি সেই পাতালপুরীর খোঁজে বেরোই, তোমাকেও ডাকব। তবে আপাতত আমাকে মাছের ঝোল আর ভাত খাওয়াও তো লক্ষ্মী মেয়ে! চারমাস আমি অখাদ্য খেয়ে কাটাচ্ছি।

জ্যোৎস্না নেচে উঠল! ... এক্ষুনি। আমাদের নিজেদের জন্যে ইলিশ মাছের ঝোল আর ভাত আছে।

ইলিশ! বলো কী? প্রশান্ত মহাসাগরের ইলিশ নাকি?

উঁহু খাঁটি পদ্মার ইলিশ। মাসে একবার আসে চট্টগ্রাম থেকে। ... বলে জ্যোৎস্না প্রায় দৌড়ে চলে গেল। আমার নোলায় জল ঝরার অবস্থা। শুধু চিন্তা, বব বাঙালি খাদ্য খেতে পারবে তো?

দুটি রহস্যময় গুহা

কোকো পাম হোটেলে পৌঁছুতে আরেকদফা ভিজে গেলাম বৃষ্টিতে। চাচা বলছিলেন, শীতকালটা বেজায় বৃষ্টি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে। তাই এখন পর্যটকদের ভিড় বছরের অন্য সময়ের তুলনায় কম।

নিজের ঘরে ঢুকে জামাকাপড় বদলে নিলাম। তারপর ববদের ঘরের দরজায় নক করলাম। ববও পোশাক বদলেছে। ভিজে চুল এমন করে ঘষেছে যে আলুথালু ভয়ংকর দেখাচ্ছে। সে চিরুনি

হাতে বাথরুমে ঢুকে গেল। জনখুড়ো টেবিলের সামনে বসে ধ্যান করছিলেন যেন। আমার সাড়া পেয়ে বিড়বিড় করে দুটো শব্দ আওড়ালেন। ওয়েইকাপালি! ওয়েইকানালোয়া!

তারপর ঘুরে একটু হাসলেন।... বসো জয়ন্ত। 'আহোয়ায়ালোয়া'র রহস্য কিছুটা ভেদ করতে পেরেছি মনে হচ্ছে। পলিনেশীয় ভাষা আমি অল্পস্বল্প জানি। হুম্, তোমার সিগারেটকেসের ভেতরে দুদিকে অনেক কিছু লেখা আছে। তোমার চাষীবন্ধু এটা সাফ করার জন্য এমন ঘষা ঘষেছিল যে অনেক জায়গায় খোদাই করা লেখা মুছে গেছে। আহা, সব যদি অক্ষত থাকত, পুরোটা পড়তে পারতাম। যাক্ গে, যা হবার হয়েছে। যেটুকু পড়া যাচ্ছে, তার সূত্র ধরে এগোলে আমরা দারুণ কিছু আবিষ্কার করতে পারব।

বললাম,—একটু আগে কী দুটো শব্দ উচ্চারণ করলেন জনখুড়ো?

হুম্। ওয়েইকাপালি। ওয়েইকানালোয়া।

এর মানে কী?

হায়েনার দুটো গুহার নাম। নামদুটো সিগারেটকেসের ভেতর লেখা আছে। কিন্তু তার চেয়ে কাজের কথা হচ্ছে, রাজা হোলোহুয়ার বংশের কেউ এখন এখানে আছে কি না খুঁজে বের করতে হবে।

ঢাকুচাচার মেয়ে জ্যোৎস্নার মুখে যে পাতালপুরীর কথা শুনেছি, জনখুড়োকে বললাম। খুড়ো এ কিংবদন্তির কথা সবাই জানেন। বললেন,—ওটা নিছক কিংবদন্তি। মিনিহুন বা রত্নপুরী কোনোটাই আমি বিশ্বাস করি না বাপু।

তাহলে সিগারেটকেসে কীসের গোপন বৃত্তান্ত থাকতে পারে? কী লেখা আছে দেখলেন?

খুড়ো হাসলেন। যা লেখা আছে, তা ততকিছু প্রাচীন ব্যাপার নয়। যদিও ভাষা এবং হরফগুলো প্রাচীন পলিনেশীয়। কী লেখা আছে, তা আমি অবিকল অনুবাদ করেছি। এই দেখো।

জনখুড়ো একটা কাগজ দিলেন। তাতে লেখা আছে :

টিহো বিশ্বাসী। টিহো রাজবংশীয়। যদি আমরা মারা যাই, টিহো এবং মারি হায়েনা ... ওয়েইকাপালি ওয়েইকানালোয়া ... দক্ষিণ সাত গজ পূর্ব দু ফুট বাঁদিকে কবচ ... অসবোর্ন এবং পিটার ওলসন এফ এফ আর ৫০৩৭ ... জি ২২১৩ ...

পড়ার পর বললাম,—শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি, অসবোর্ন আর ওলসন নামে সম্ভবত দুজন মিলিটারি পাইলটের এই সিগারেটকেস। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের মাঠে বিমানঘাঁটিতে তাদের প্লেনটাই ধ্বংস হয়ে থাকবে।

তুমি বুদ্ধিমান জয়ন্ত! জনখুড়ো প্রশংসার চোখে তাকিয়ে বললেন। ঠিকই ধরেছ। কালই আমি ওয়াশিংটনের সামরিক রেকর্ড দফতরে ফোন করে অসবোর্ন এবং ওলসনের খোঁজ করব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সব সামরিক দলিল ওখানে রয়েছে। আমার ধারণা, হায়েনার দুটো গুহায় ওরা কিছু লুকিয়ে রেখেছিল। তখন ভীষণ যুদ্ধ চলেছে। যে কোনো সময় ওরা মারা পড়তে পারে। তাই সিগারেট কৌটোয় পলিনেশীয় ভাষায় গোপন হদিস খোদাই করে রেখেছিল।

বললাম,—রাজবংশীয় জনৈক টিহোর কথা আছে ওতে। কেন?

জন বললেন,—এই টিহো ওদের সঙ্গী ছিল সম্ভবত। অর্থাৎ টিহো ব্যাপারটা জানত। ওদের নিশ্চয় ইচ্ছে ছিল, টিহোকে সিগারেটকেসটা দেবে। ওরা যুদ্ধে মারা পড়লে টিহো ...

জন হঠাৎ থামলেন। চিন্তিতমুখে ফের বললেন,—বাকি কথাটা অস্পষ্ট। শুধু বলা যায়, ওরা মারা পড়লে টিহো কাউকে সিগারেটকেসটা পাঠিয়ে দেবে এমন নির্দেশ ছিল। কিন্তু যে কোনো কারণে হোক, টিহোকে ওরা জিনিসটা দিয়ে যেতে পারেনি।

মনে একটা মতলব এঁটে বললাম,—খুড়োমশাই! আপনার অনুবাদটার একটা কপি পাব কি? আমি ওটা নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করতে চাই।

আলবৎ আলবাৎ। —জনখুড়ো বললেন। ... সিগারেটকেসটা তো তোমার সম্পত্তি।

বব কথা শুনছিল বাথরুমে। মুখ বাড়িয়ে বলল,—খুড়ো! জায়েন্টো ছদ্মনামে গোয়েন্দাকাহিনি লেখে জানেন? অসংখ্য বই লিখেছে। ক্যালকুট্টা থেকে ডেক্কা পর্যন্ত ওর নাম।

বলো কী জয়ন্ত? —জন নড়ে উঠলেন।

বললাম,—হ্যাঁ খুড়োমশাই গোয়েন্দাগপ্প আর অ্যাডভেঞ্চার লিখতে লিখতে এমন অভ্যাস হয়েছে, সুযোগ পেলে সত্যিকার রহস্যেও মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে।

খুব ভালো কথা। খুব ভালো কথা। জনখুড়ো একটা কাগজে ওঁর অনুবাদ কপি করলেন। সেটা আমাকে দিয়ে বললেন,—অসবোর্ন আর ওলসন ভারি এলেমদার লোক ছিল, বুঝলে? যে হরফে ওরা লিখেছে, তা কবে লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন রোমান হরফে পলিনেশীয় ভাষা লেখা হয়। তুমি শুনলে অবাক হবে, এই আদিম পলিনেশীয়লিপি হচ্ছে চিত্রলিপি। ছবির রেখায় কথা বোঝানো। তোমাদের সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে এর আশ্চর্য মিল আছে। তার আগে প্রাচীন পলিনেশীয় সভ্যতা সম্পর্কে তোমার জানা দরকার।

বব মুখ বাড়িয়ে চোখ টিপল আমাকে। বুঝলাম, সাবধান করে দিচ্ছে, কারণ ওর অধ্যাপক খুড়ো আমার কান ঝালাপালা করে দেবেন বুঝতে পেরেছে। আমিও কি বুঝিনি? বেরসিকের মতো উঠে দাঁড়িয়ে বললাম,—খুড়োমশাই! কিছু মনে না করেন তো বলি, আমার বেজায় ঘুম পাচ্ছে। কাল সব শুনব বরং।

খুড়ো মনমরা হয়ে বললেন, আচ্ছা।

মিহিহুনের রসিকতা

আমেরিকানদের টেলিফোন ব্যবস্থা খাসা। কাউয়াই দ্বীপেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পনেরো মিনিটের মধ্যে কলকাতার লাইনে পেয়ে গেলাম। তারপর সুপরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কান জুড়িয়ে গেল।

সেই আগস্টমাসে আমেরিকা এসেছি। তারপর বারতিনেক ট্রাংকলে বুড়ো ঘুঘুমশাইয়ের খবর নিয়েছি। উনি পাখি-প্রজাপতি-পোকামাকড় ক্যাকটাস নিয়ে মেতে আছেন আগের মতো। ইদানীং খুনখারাপি বা রহস্যে টান নেই। ওঁর মতে, পৃথিবী দিনেদিনে রহস্যহীন হয়ে পড়েছে। আজকাল খুনিরা সবার সামনে খুনখারাপি করে। আগের দিনে খুনিরা ছিল ভীষণ ভীতু। কত সাবধানে খুন করত। তাদের খুঁজে বের করা কঠিন হত। আজকালকার খুনি ড্যামকেয়ার। কাজেই রহস্য-টহস্য নেই এসব জিনিসে। এদিকে অ্যাডভেঞ্চারও বিজ্ঞানের দৌলতে সস্তা হয়ে গেছে। দুর্গম বলে কোনো জায়গা নেই। আর গুপ্তধন? কর্নেলের ধারণা, সব গুপ্তধন মানুষ হাতিয়ে নিয়েছে দিনে-দিনে। গুপ্তধন বলতে এখন করফাঁকি দিয়ে জমানো কালো টাকা। এসব কাজ আয়কর দফতরের লোকেরাই করে। কাজেই ওসব ছেড়ে কর্নেল প্রকৃতির রহস্যভেদে মন দিয়েছেন।

কর্নেল ফোনে মিঠে গলায় বললেন,—সুখবর আছে ডার্লিং! তোমার পাঠানো আরিজোনা অঞ্চলের মরু ক্যাকটাসে কুঁড়ি গজিয়েছে। তুমি ফিনিক্সে ফের গেলে আরও একটা ক্যাকটাস পাঠাবে।

বললাম,—তিনমিনিট পরে লাইন কেটে দেবে। ঝটপট লিখে নিন, যা বলছি। কাগজ কলম নিন। নিয়েছেন? লিখুন : 'টিহো বিশ্বাসী। টিহো রাজবংশীয় ... '

পুরোটা বললাম। তারপর কর্নেল আমাকে অবাক করে বললেন,—প্রশান্ত মহাসাগরের জলকল্লোল কানে আসছে, ডার্লিং। তুমি কি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে?

হ্যাঁ হাওয়াই দ্বীপে। ম্যাপে দেখে নিন। হায়েনা উপনগরীর কোকোপাম হোটেলে আছি।

জানতো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হায়েনায় আমি একসপ্তাহ ছিলাম। জাপানি বোমার আহত হয়ে ...

আপনি সর্বচর। শুনুন, যা লিখে নিয়েছেন, তাতে সাংঘাতিক রহস্য আছে। ফোনে সব জানানো সম্ভব নয়। আপনি ....

ডার্লিং, হায়েনাতে যখন আছ, তখন আশা করি মেনেহিউন বা মিনিহুন দেখতে ভুলো না। তিনফুট উঁচু, বানরাকৃতি মানুষ। কুচকুচে কালো। অথচ ওদের নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি আছে। জয়ন্ত! শুনতে পাচ্ছ তো?

আমি বিছানায় বসে ফোন করছিলাম। হঠাৎ কেউ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাতে আমার প্যান্টসুদ্ধ ডান পা চেপে ধরল। দেখি কালো ছোট্ট একটা হাত—অতি কদর্য সেই হাত। শিরা ফুলে আছে। এমন ঠাণ্ডা যে প্যান্ট ও গরম মোজাও বরফ করে ফেলেছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আরে! একি!

ফোন তখনও কানে। কর্নেল বললেন,—কী হল ডার্লিং? মিনিহুন নাকি?

আর কথা বলার ফুরসত পেলাম না। আমার ঠ্যাং ধরেক হ্যাঁচকা টান মারল কালো খুদে হাতটা। ফোন পড়ে গেল বিছানায়। আমি গড়িয়ে মেঝের কার্পেটে পড়লাম। তারপর চেঁচিয়ে উঠলাম, —বব! বব!

ঘরে টেবিলবাতির আলো শুধু। মেঝেতে পড়ে থাকতে থাকতে দেখলাম, কী একটা কালো বাঁদরজাতীয় প্রাণী দুপায়ে দৌড়ে গিয়ে বাথরুমের দরজা খুলল—অবিকল মানুষ যেমন খোলে। তারপর ভেতরে ঢুকে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে উঠে গিয়ে বাথরুমের দরজার হাতল ঘুরিয়ে লক করে দিলাম। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে জনখুড়োকে ধাক্কা দিলাম।

খুড়ো-ভাইপো আমার ধাক্কার চোটে একসঙ্গে মুণ্ডু বের করে বললেন,—কী হয়েছে, কী হয়েছে?

দম আটকানো গলায় বললাম,—মিনিহুন কিংবা মেনেহিউন। আমার ঘরে।

বব হিহি করে হেসে উঠল। জনখুড়ো বেরিয়ে বললেন,—তুমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছিলে জয়ন্ত!

বব বলল,—দুঃস্বপ্ন।

ব্যস্তভাবে বললাম,—শিগগির আমার সঙ্গে আসুন! বিদঘুটে জীবটাকে বাথরুমে বন্দী করে ফেলেছি।

ওরা দুজনে তখুনি আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। বাথরুমের দরজার সামনে দুধারে খুড়ো-ভাইপো আস্তিন গুটিয়ে জীবটাকে পাকড়াও করার জন্য হুমড়ি খেয়ে বসলেন। আমি, যা থাকে বরাতে বলে দরজার লকটা ঘুরিয়ে খুলে ফেললাম। তারপর দরজার পাশের সুইচ টিপে দিলাম।

বাথরুম উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল। কিন্তু হতচ্ছাড়াটা গেল কোথায়? বাথরুমের মেঝেতে পুরু কার্পেট। সামনে প্রকাণ্ড বেসিন ও আয়না। একধারে কোমোড, অন্যধারে ঝকমকে বাথটাব। বাথটাবের পর্দাটা যথারীতি গোটানো রয়েছে। মিনিহুন হোক আর যেই হোক, একটা আরশোলারও লুকোবার জায়গা নেই বাথরুমে। তা হলে ব্যাপারটা কী হল?

খুড়ো-ভাইপো এবার খ্যা খ্যা করে বেজায় হাসতে লাগল। লজ্জায় পড়ে গেলাম।

জন বললেন,—মাই গুডনেস! বুঝতে পেরেছি তুমি কেন গোয়েন্দা গল্প আর অ্যাডভেঞ্চার লেখো! জয়ন্ত, তুমি সত্যি বড় কল্পনাপ্রবণ।

বব আমাকে একহাত জিভ দেখালো অর্থাৎ ভেংচি কাটল। হতভম্ব হয়ে বললাম,—কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি কলকাতায় ট্রাংকল করছিলাম, জন্তুটা ঠাণ্ডা হাতে আমার পা খামচে ধরে হ্যাঁচকা টান মেরেছিল। দেখতে পাচ্ছেন না ফোনটা এখনও বিছানায় উল্টে পড়ে রয়েছে?

জন ভুরু কুঁচকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বব আগের মতো গম্ভীর মুখে বলল, দুঃস্বপ্ন।

হঠাৎ জন কান খাড়া করলেন। তারপর ঘুরে দেয়ালের ওপর দিকে তাকালেন। তারপর একটু হেসে বললেন,—হুম! জয়ন্ত কি বাথরুমে ঢুকে সমুদ্র গর্জন শুনতে ভালোবাসে?

আমি চমকে উঠলাম। সত্যি তো, পেছনের খাড়ি থেকে গম্ভীর সমুদ্রগর্জন শোনা যাচ্ছে। হাজার ফুট নীচে পাথরের দেয়ালে ধাক্কা মেরে প্রশান্ত মহাসাগর মুহুর্মুহু গর্জন করছে।

ওপরে তাকিয়ে দেখি, দেয়াল ও ছাদের মাঝামাঝি জায়গায় তিনফুট লম্বা দুফুট চওড়া কাঁচের লিন্টেল খোলা রয়েছে। জনখুড়ো বললেন,—প্রাণীটা ওই পথেই পালিয়েছে, যদি তোমার স্বপ্ন না হয়।

বললাম,—কিন্তু আমি তো ওটা খুলিনি!

বব ফিক করে হেসে শিস দিতে দিতে তাদের ঘরে ফিরে গেল। জনখুড়ো বললেন,—ওটা আটকে লক করে দাও। খোলা থাকলে তোমার ঘরের হিটিং সিস্টেম কাজ করবে না! প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে যাবে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে গিয়ে ফোনটা তুলে কানে রাখলাম! লাইন কখন কেটে গেছে। ফোনটা যথাস্থানে রেখে বললাম,—তা হলে কি সত্যি আমার ঘরে মিনিহুন হানা দিয়েছিল? কিন্তু এ কী ধরনের রসিকতা ব্যাটাচ্ছেলের বলুন তো খুড়োমশাই? আর বেছে বেছে আমার ঘরেই ঢুকল শেষে?

জন গম্ভীর মুখে বললেন,—নিয়তি জয়ন্ত। এ নাম নিয়তি। নিয়তির টানেই তোমাকে ছুটে আসতে হয়েছে হায়েনায়। কারণ তোমার কাছে আছে রাজা হোলাহুয়ার প্রতীকচিহ্ন আঁকা সিগারেটকেস।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা এবং হন্তদন্ত ববের প্রবেশ।

বব বলল,—শিগগির আসুন খুড়ো! ঘরে চোর ঢুকেছিল। আমাকে ঘুষি মেরে প্রায় দুমিনিট অজ্ঞান করে ফেলেছিল! জ্ঞান হতেই দেখি চোর ব্যাটা হাওয়া হয়ে গেছে।

জনখুড়ো তাঁর ঘরের দিকে ছুটলেন। আমি এবার আমার ঘরের দরজা বাইরে থেকে লক করে ওদের ঘরে গেলাম।

ঢুকে দেখি, জনখুড়োর মাথায় হাত। বললেন,—জয়ন্ত! সর্বনাশ হয়ে গেছে। তোমার সিগারেটকেসটা টেবিলে রেখে আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিলাম। সেটা নেই।

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। বব ফিক করে হেসে বলে উঠল,—ওঃ হো! এতক্ষণে বোঝা গেল, এঘরে চোর ঢুকবে বলেই জায়েন্টোর ঘরে মিনিহুন পাঠিয়েছিল! ধন্য ধন্য হে চোর চূড়ামণি! তোমার খুরে খুরে দণ্ডবৎ হই। ধন্য তোমার বুদ্ধিকৌশল। আঃ! কী ব্যথা কী ব্যথা!

বলে সে তার কালো ছোপ পড়া চোয়ালে হাত রেখে বাথরুমে ঢুকল।...

রাজবংশীয় টিহোর অন্তর্ধান

রাতের ঘুমটা ভালো হয়নি। শোবার আগে খাটের তলা ভালো করে দেখে নিয়েছিলাম। বাথরুমের ভেতরটাও। রাত দেড়টা অব্দি ফের কর্নেলকে ট্রাংকল করার চেষ্টা করেছিলাম। লাইন পাইনি। যতবার ওভারসিজ কল অফিসে করি, টেপরেকর্ডারে বেজে ওঠে : 'দুঃখিত মশাই। সমুদ্রপারের লাইন এখন ব্যস্ত। আবার চেষ্টা করুন।'

সকালে ঢাকুচাচার মেয়ে জ্যোৎস্না এসে হাজির। এখন আর চেনাই যায় না, পুরো মেমসায়েবটি। সাদা শার্ট আর জিনিসের প্যান্ট পরেছে। মাথায় হাওয়াই দ্বীপের হলুদ টুপি।

রাতের ঘটনা শুনে সে আঁতকে উঠল। বলল,—এ যে সত্যিকার রহস্যকাহিনি জয়ন্তদা! কিন্তু এবার প্রমাণ হল তো সত্যি মিনিহুন আছে?

বললাম,—মিনিহুন কিনা কে জানে! আমার তো মনে হল বাঁদর।

জ্যোৎস্না বলল,—যাঃ! বাঁদর কালো হয় নাকি? তা ছাড়া বললেন ভীষণ ঠাণ্ডা হাত। হবেই তো। মিনিহুন সমুদ্রেও মাছের মতো ঘুরে বেড়ায় কিনা। এখন নভেম্বরে সমুদ্রের জল ঠাণ্ডা না?

গল্প করতে করতে কফির অর্ডার দিলাম ফোনে। সেইসময় বব ফুলবাবু সেজে ঘরে ঢুকল। নকশাকাটা ঘিয়ে রঙের ঢিলে কুর্তা আর আঁটো জিনস পরা। জ্যোৎস্নাকে দেখে বলল,—হাই!

জ্যোৎস্না বলল,—হাই!

এই হল মারকিন সম্ভাষণ। বব বলল,—খুড়োমশাই পুলিশ দফতরে গেলেন। হোটেলের ম্যানেজার খুব ভয় পেয়ে গেছে। কোকো পামে এই প্রথম চুরি বিশবছর পর। বিশ বছর আগে একবার এক পর্যটকের জুতো চুরি গিয়েছিল এক পাটি কেডস! যাই হোক, বাইরে রোদ্দুরের ফুল ফুটছে। ঘরে বসে থাকার মানেটা কী?

বললাম,—বসো। কফি আসছে। খেয়ে বেরুব। তারপর বাংলায় জ্যোৎস্নাকে বললাম, —জ্যোৎস্না, তোমার সময় হবে তো?

জ্যোৎস্না বলল,—অঢেল সময়। আপনাকে নিয়ে ঘুরে সব দেখাব বলেই তো এসেছি।

বব ভুরু কুঁচকে বলল,—তোমরা মাতৃভাষায় আমাকে গাল দিচ্ছ কি?

বললাম,—সরি বব! ভুল হয়েছে। আমরা তোমার সামনে বাংলা বলব না। কারণ সেটা অভদ্রতা হয়।

একটু পরে পলিনেশীয় পরিচারিকা কফি নিয়ে এল। কফির সঙ্গে প্রকাণ্ড এক প্লেট বাদাম ফাউ হিসেবে। এ বাদাম, জ্যোৎস্না জানালো, এ স্বর্গোদ্যানেরই ফসল। চিবুলে ছানার স্বাদ পাওয়া যায়। আমার জিভে নারকোল মনে হল। পরিচারিকাটি পলিনেশীয়দের মতোই বেঁটেখাটো মোটাসোটা। গায়ের রঙ উজ্জ্বল বাদামি। চ্যাপটা মুখ এবং নাকটা সরু। হঠাৎ দেখলে জাপানি মনে হতে পারে। তবে কাল থেকে পথঘাটে অনেক খাড়ানাকওয়ালী মেমসায়েবের মতো মেয়েও দেখেছি—তারাও পলিনেশীয়। কারুর গায়ের রঙ কালোও। কিন্তু সবসময় মুখে হাসিটি লেগে আছে।

জ্যোৎস্না আমাদের অবাক করে পলিনেশীয় ভাষায় ওর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। মেয়েটি চলে গেলে বললাম,—বাঃ জ্যোৎস্না! তুমি ওদের ভাষা শিখে ফেলেছ দেখছি?

জ্যোৎস্না বলল,—অল্পস্বল্প। জয়ন্তদা, ওকে জিজ্ঞেস করলাম টিহো নামে কাকেও চেনো নাকি—আদিম রাজার বংশধর টিহো? ও বলল,—টিহো এখানেই চাকরি করে। এ হোটেলের বেল ক্যাপ্টেন সে। অর্থাৎ পোর্টারদের সর্দার। হোটেলে লোক এলে তার নির্দেশে মেলম্যানরা ব্যাগেজপত্তর ঘরে পৌঁছে দেয়। হোটেল ছাড়লে ঘর থেকে ব্যাগেজ নিয়ে গিয়ে গাড়িতে ওঠায়। এসব ওদের দায়িত্ব।

বললাম,—জানি। টিহোর কথা কী বলল বলো।

জ্যোৎস্না বলল,—টিহোকে সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বব এবং আমি একসঙ্গে বলে উঠলাম,—সে কী!

হ্যাঁ। মেয়েটির নাম ওলালা। ওর ধারণা, টিহো সানফ্রান্সিসকোতে তার মারকিন বউটার কাছে ফিরে গেছে। টিহোবুড়োর সংসারটি বেজায় বড় সেখানে। একগাদা নাতিপুতিও আছে। সবাই একসঙ্গে থাকে।

বললাম,—টিহো বয়সে বুড়ো নাকি?

জ্যোৎস্না বলল,—হ্যাঁ-তাই তো বলল ওলালা।

বব বলল,—ওঃ হো! মনে পড়েছে। রিসেপশানে গম্ভীর চেহারার এক বুড়ো পলিনেশীয়কে দেখেছিলাম। ওহে জায়েন্টো, আমার এ কথাও মনে পড়েছে এতক্ষণে —তুমি রিসেপশানের সামনে দাঁড়িয়ে তোমার রহস্যময় সিগারেট কৌটোটা বের করেছিলে এবং সিগারেট টানছিলে।

জ্যোৎস্না চোখ বড় করে বলল,—তাহলেই সব রহস্য ফাঁস হয়ে গেল জয়ন্তদা। টিহোবুড়ো তখনই জিনিসটা দেখে চমকে উঠেছিল। তারপর ...

সে হঠাৎ থেমে কী ভাবতে লাগল। তারপর ফের বলল,—দেখুন জয়ন্তদা! কাল বলছিলাম না আপনাকে? মিনিহুনরা রাজা হোলাহুয়াকে খুব খ্যাতি করত বলে কিংবদন্তি আছে। আমার মনে হচ্ছে, টিহোর সঙ্গে মিনিহুনদের যোগাযোগ থাকা সম্ভব। একজন মিনিহুনকে সে ডেকে এনেছিল হোটেলে।

বব হাসতে হাসতে বলল,—তোমরা বাঙালিরা বড় কল্পনাপ্রবণ জাত। যাক্‌গে বাইরে কত রোদ্দুর। ঘরের ভেতর বসে বিদঘুটে আলোচনা করে লাভটা কী? চলো, বেরিয়ে পড়ি।

ওয়েই কাপালির ভেতরে

ঝলমলে রোদ্দুরের দিন। তাই খাড়ির মাথায়, পার্কে, কিংবা খাড়ির নীচে যেখানে নেমে যাওয়ার পথ আছে এবং পাথরের চওড়া চাতালে সমুদ্রের জল লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে, সেখানে নাচগানের আসর জমে উঠেছে। প্রতি আসরে ফুলের পোশাক পরা পলিনেশীয় মেয়েরা তো আছেই— পৃথিবীর নানা দেশের লোকেরাও রঙিন পলিনেশী পোশাক পরে নাচছে। আঁতকে উঠলাম দেখে, তোলপাড় করা জলেও লম্বাটে ছিপনৌকোর মতো ক্যানো ভাসিয়েছে দুঃসাহসীরা।

ববের মারকিন রক্ত লাফিয়ে উঠল সেই দৃশ্যে। বলল,—হাই জোস্না। চলো আমরা নীচে নেমে যাই। তারপর একটি ক্যানো ভাড়া করে নাকানিচুবানি খেয়ে আসি।

জ্যোৎস্না বলল,—দারুণ জমবে। চলুন জয়ন্তদা।

আমি আঁতকেই ছিলাম। মিনমিনে গলায় বললাম,—দ্যাখো জ্যোৎস্না, আমি পশ্চিমবঙ্গের ঘটি। পাহাড়জঙ্গল যদিবা চষে বেড়াতে পটু, জল দেখলেই আমি বেড়ালের মতো ভয় পাই। তমি বাঙাল মেয়ে। জলের দেশের জলকন্যা। তোমার পক্ষে যা সম্ভব, আমার পক্ষে তা অসম্ভব।

বব খপ করে আমার হাত ধরে বলল,—এসো। তোমাকে আমরা সাঁতার শেখাবো।

জ্যোৎস্না খিলখিল করে হেসে উঠল। বব একটা প্রায় খাড়া ফাটল দিয়ে আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। মাধ্যাকর্ষণেরও টান আছে। তাই নীচের একটা চাতালে পৌঁছতে মিনিট দুইয়ের বেশি লাগল না। অথচ চাতালটা প্রায় হাজার ফুট নীচে।

চাতালের কিনারায় সমুদ্রের জল এসে ফণা তুলছে। ছড়িয়ে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে। কেমন একটা আঁশটে গন্ধ জলের। অসংখ্য সমুদ্রপাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। ডাকাডাকি করছে। জলের গর্জন, পাখির ডাক, তার ওপর হাওয়াইয়ান নাচগান ও বাজনার চোটে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। খাড়িটা প্রায় সিকি কিলোমিটার চওড়া। সামনে তুলকালাম জলে চাপচাপ সাদা ফেনা দুলছে। তার তলায় পাথর আছে। নৌকোর তলা এক ধাক্কায় ফুটো হবার সম্ভাবনা; তার মধ্যে পলিনেশীয় মাঝির হাঁটু অব্দি নাগাদের মতো রঙিন লুঙি জাতীয় পোশাক এবং মাথায় হলুদ টুপি পরে বৈঠা চালাচ্ছে। ওদের নৌকো চালানোর দক্ষতা দেখে তাক লাগছিল।

জ্যোৎস্না এক ফুলওয়ালীর কাছে একগুচ্ছ ফুল কিনল। তারপর ফুলগুলো মাথায় এবং কোমরে চমৎকার গুঁজে নিল। তখন ওকে মনে হল বাঙাল মেয়েটা এবার পলিনেশীয় মেয়ে হয়ে উঠেছে। বব ক্যানো নৌকা ভাড়া করছিল। দরাদরি করে ঘণ্টায় দশডলারে রফা হল। তার মানে প্রায় আশি

টাকা। আমার ইচ্ছে করছিল এবার ভোঁ দৌড় করে পালিয়ে যাই। কিন্তু হাজার ফুট খাড়া চড়াই ভেঙে ওঠা সহজ কথা নয়।

ক্যানোটা জলের ধাক্কায় প্রচণ্ড দুলছে। দুজন পলিনেশীয় মাঝি সামনে পেছনে বসেছে। প্রথমে জ্যোৎস্না নামল। তারপর সে হাত বাড়াল আমার দিকে। বব আমাকে পেছন থেকে এমন ধাক্কা মারল যে আর একটু হলেই জলে পড়তাম। জ্যোৎস্না ধরে ফেলল। তখন টের পেলাম, বাঙাল মেয়েটার গায়ে তো অসম্ভব জোর। রোসো, আমিও খাঁটি ঘটি। তোমার প্রতাপ জলে, আমার ডাঙায়। সময় এলে বুঝিয়ে দেব, এই জয়ন্ত চৌধুরী কী জিনিস।

ক্যানো নৌকার ভেতর প্রাণ হাতে করে বসে রইলাম। উথাল-পাথাল জলে ক্যানো বেজায় টলমল করছিল। জল গর্জন করে ছুটে আসছে তীরের দিকে। তাই সোজাসুজি এগোনো কঠিন। মাঝিরা তীর বরাবর আশ্চর্য কৌশলে এগোল। তারপর এখানে জলের মধ্যে বড় বড় পাথর থাকায় ভেতরে জল অনেকটা মেজাজ বদলে ভালোমানুষ হয়েছে। সেখানে পৌঁছে জ্যোৎস্না পলিনেশীয় ভাষায় মাঝিদের কিছু বলল। তার মধ্যে শুধু 'ওয়েইকাপালি' কথাটা বুঝতে পারলাম।

জলের ঝাপটায় ততক্ষণে আমরা সবাই ভিজে গেছি। ক্রমাগত ভিজছি। ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে। বললাম,—জ্যোৎস্না ওয়েইকাপালি গুহার কথা বললে নাকি ওদের?

জ্যোৎস্না হাসল। হ্যাঁ, জয়ন্তদা। ওই যে পুবের দেয়ালমতো জায়গা দেখছেন, ওখানেই ওয়েইকাপালির গুহা। বললাম ওদের রাজা হোলাহুয়ার পুজো দিতে যাচ্ছি। ওরা তাই খুব খুশি। তবে বাড়তি দু ডলার লাগবে।

বব বলল,—দেবো।

অনেক পাথরের গলিঘুঁজির ভেতর দিয়ে এগিয়ে এক সময় মাঝিরা আমাদের আরেকটা ছোট্ট চাতালমতো জায়গার সামনে পৌঁছে দিল। একে-একে আমরা উঠে গেলাম। মাঝিরা ক্যানোতে অপেক্ষা করতে থাকল।

বললাম,—জ্যোৎস্না, তুমি কি আগে এ গুহায় এসেছো কখনও?

জ্যোৎস্না বলল,—আমাদের রেস্তোরাঁর পরিচারক জুহুর সঙ্গে একবার এসেছিলাম। জুহু এখানে মানত করতে এসেছিল। তবে ভেতরে বেশি দূরে ঢুকিনি। ভীষণ অন্ধকার। তাছাড়া একগাদা মড়ার খুলি আর হাড়গোড় পড়ে থাকতে দেখেছি।

বব মুচকি হেসে বলল,—তাহলে নিশ্চয় ভূত আাছে ভেতরে।

আমার শার্টের পকেটে ভাগ্যিস জনখুড়োর সেই অনুবাদের কাগজটা রয়ে গেছে। বললাম,—জ্যোৎস্না। এসেই পড়লাম যখন, তখন 'দক্ষিণ সাত গজ পূর্ব দুফুট বাঁদিকে কবচ' ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখতে চাই। কাগজটা আমার সঙ্গেই আছে।

জ্যোৎস্না চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে চাপা গলায় বলল,—কিন্তু যদি মিনিহুনের পাল্লায় পড়ি।

বব আস্তিন গুটিয়ে বলল,—আমি ক্যারাটের প্যাঁচ জানি। ভেবো না।

প্রচণ্ড হাওয়ার ঝাপটানিতে এবং রোদ্দুরে আমাদের পোশাক একটুতেই শুকিয়ে গেছে। এখন হাওয়াটা তত ঠাণ্ডা না, এই রক্ষে। জ্যোৎস্না চাতাল থেকে পা বাড়িয়ে বলল,—সাবধানে আসুন।

অজস্র জোটবড় পাথর পড়ে আছে। কিছুটা ঢালু খাড়া দেওয়ালের মতো জায়গায়। পাথরগুলো কোন যুগে ওপর থেকে ভেঙে গড়িয়ে এসে খাড়ির গায়ে আটকে রয়েছে। তার ভেতর সাবধানে প্রায় তিনশ ফুট ওঠার পর একটা ফাটল দেখতে পেলাম। ফাটলটা চওড়াতে একগজ, লম্বায় দুগজ। জ্যোৎস্না বলল,—এই হচ্ছে ওয়েইকাপালি গুহার মুখ। ভেতরে কিন্তু হলঘরের মতো চওড়া।

বব বলল,—আহা! বুদ্ধি করে একটা টর্চ আনলে কত ভালো হত।

জ্যোৎস্না পকেট থেকে একটা খুদে টর্চ বের করে বলল,—সে কি আনিনি? আমি আপনাদের নিয়ে এখানে আসব বলেই বেরিয়েছিলাম।

দুষ্টু মেয়ে। তোমার মতলবের কথাটা আগে বললে তৈরি হয়েই আসতাম।

আমার কথা শুনে বব বলল,—বেশি তৈরি হওয়া ঠিক না আমি বরাবর দেখেছি, তৈরি হয়ে কিছু করতে গেলে ফল হয় না। চলো, ঢুকে পড়া যাক্।

বললাম,—একমিনিট। জ্যোৎস্না, এটা ওয়েইকাপালি। কিন্তু ওয়েইকোনালোয়া গুহাটা কোথায়?

জ্যোৎস্না বলল,—সেটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। বাঁদিকে একটু ওপরে। সেখানে কেউ যায় না। যাওয়াও খুব কষ্টসাধ্য। তবে আমাদের পরিচারক জুহুর কাছ থেকে শুনেছি, দুটো গুহার মধ্যে যোগাযোগ আছে। কোথায় নাকি একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে।

গুহার ফাটল দিয়ে আগে ঢুকল জ্যোৎস্না,—কারণ সে আগে একবার এসেছে। তার পেছনে বব। শেষে আমি। ঢুকতেই একটা বিটকেল গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠল। নাকে রুমাল চাপা দিলাম তিনজনেই।

ভেতরটা সত্যি প্রকাণ্ড হলঘরের মতো। বাইরের আলোর ছটায় সামান্য কয়েক গজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। তার ওধারে ঘন কালো আঁধার। জ্যোৎস্নার খুদে টর্চের আলো কিন্তু দারুণ জোরালো। ইলেকট্রনিক বাতি আসলে সেই আলোয় যা দেখলাম, ভীষণ চমকে উঠলাম।

দুধারে জড়ো করা আছে অসংখ্য মানুষের মাথার খুলি আর হাড়গোড়। এই রহস্যময় গুহার ভেতর যেন রাক্ষস-খোক্কসের বাস। মানুষ ধরে খেয়েছে এখানে। গা ছমছম করতে থাকল। বব একটা খুলি তুলে নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে থাকল, হাই ম্যান! হাউ আর ইউ?

হঠাৎ জ্যোৎস্না বলল,—চুপ! কী একটা শব্দ পাচ্ছি যেন।

সে আলো নেবালো। অন্ধকারে দূরে কারা চাপা গলায় কথাবার্তা বলছে যেন। কারা ওরা?

বব ফিসফিস করে বলল,—জ্যোৎস্না টর্চ দাও। আমি একটু এগিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কী?

জ্যোৎস্না টর্চ দিয়ে বলল,—বেশি দূরে যেও না। আর সাবধান, দরকার না হলে টর্চ জ্বেলো না।

বব অন্ধকারে এগিয়ে গেল। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। নাকে রুমাল চেপেই রেখেছি—সরালে দুর্গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উগরে আসছে।

ববের ফেরার নাম নেই। আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছি ক্রমশ। সেই কথাবার্তার আওয়াজ কিন্তু সমানে শোনা যাচ্ছে।

কতক্ষণ পরে বব অন্ধকার থেকে ছিটকে এসে পড়ল। ব্যস্তভাবে বলল,— কোকো পাম হোটেলের বেলক্যাপ্টেন সেই টিহোব্যাটাকে দেখলাম মনে হল। তার সঙ্গে জনাতিনেক লোক আছে। গুহার ভেতরটা বাঁদিকে ঘুরে গেছে, তাই ওদের আলো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাছাড়া বাঁকের মুখে প্রকাণ্ড বেদীতে একটা মূর্তি আছে। ওরা মূর্তির পেছনে গজ-ফিতে দিয়ে মেঝেয় মাপছে। কিন্তু তার চেয়ে অবাক কাণ্ড, টিহোর কাঁধে সম্ভবত একটা মিনিহুন বসে আছে দেখলাম। কালো কুচকুচে বাঁদরের মতো। দেখবে এসো।

অন্ধকারে ববের পেছনে দেয়াল ধরে-ধরে আমরা এগোলাম। অনেকটা এগিয়ে বব ফিসফিস করে বলল,—এবার বাঁদিকে।

বাঁদিকে ঘুরতেই প্রথমে চোখে পড়ল দূরে আলোর ঝলক। একটা মার্কারি ল্যাম্প জ্বলছে। ছায়ার মতো কয়েকটা লোক কীসব করছে টরছে। সামনের বেদির ওপর একটা বিশাল মূর্তি। তার পাশ দিয়ে গেছে করিডোরের মতো গুহা-পথ। আমরা বেদির পেছনে গিয়ে উঁকি মেরে ওদের ব্যাপার-স্যাপার দেখতে থাকলাম।

হোয়া-হোয়া-হোয়া আ-আ!

ওরা চারজনে ফিতে ধরে একবার মেঝে, একবার দেয়ালের এপাশ-ওপাশ মাপামাপি করছে আর চাপা গলায় কী সব কথাবার্তা বলছে। জ্যোৎস্নার পক্ষে বোঝা সম্ভব। কিন্তু আমাদের মুখ খোলা বিপজ্জনক। ওরা টের পেয়ে যাবে।

একটু পরে একজন বেঁটে মোটাসোটা লোক এদিকে ঘুরে মার্কারি বাতির কাছে এল। বাতিটা কীসের ওপর বসানো। নিশ্চয় ব্যাটারির বাক্সে। খুব জোগাড়যন্ত্র করে গুহায় ঢুকেছে তা হলে।

বব আমাকে খুঁচিয়ে দিল। বুঝলাম এই তাহলে রাজবংশীয় টিহো। গায়ের রঙটা ঘোর বাদামি। পেল্লায় গোঁফ মুখে। নাকটা প্রকাণ্ড এবং একটু থ্যাবড়া। মাথায় কাঁচাপাকা ছোট চুল। কিন্তু গোঁফ একেবারে সাদা।

সে আলোর সামনে ঝুঁকে (ও হরি! এ যে আমার সেই সিগারেট কেস!) সিগারেট কেসের ভেতরটা পড়বার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বুদ্ধি আছে বটে। একটা আতসকাচও এনেছে। আতসকাচের সাহায্যে পড়ার চেষ্টা করছে।

রাগে আমার ভেতরটা গরগর করতে থাকল। আমার বাল্যবন্ধুর উপহার দেওয়া ওই সিগারেটকেসটা আমার কতকালের সঙ্গী। সবসময় ওটা ব্যবহার করতাম না। কদাচিৎ ইচ্ছে হলে তবে এবার আমেরিকা বেড়াতে আসার সময় কী খেয়ালে ওটা সঙ্গে এনেছিলাম।

নাকি জনখুড়ো যা বলেছেন তাই ঠিক? নিয়তি আমাকে টেনে এনেছে এখানে। সিগারেটকেসটা যেখানকার জিনিস, সেখানে ফিরে আসতে চেয়েছিল যেন।

এইসব কথা ভেবেও আমার কেমন একটা অস্বস্তি হতে থাকল। তাই ভাবলাম, চুলোয় যাক। সিগারেটকেস যার হাতে পৌঁছানোর কথা, পৌঁছে গেছে। তবে শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা দেখে যাওয়া যাক্। আমার এই বিদঘুটে স্বভাব—রহস্যভেদী এক বুড়ো ঘুঘুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে স্বভাবটা বাগে পেয়েছে, যেখানে রহস্যের গন্ধ পাই নাক গলাতে ইচ্ছে করে।

টিহো সিগারেটকেসের ভেতরটা আতসকাচের সাহায্যে ফের দেখে নিয়ে সঙ্গীদের কিছু বলল। তখনই চোখে পড়ল সেই আজব কদর্য প্রাণীটাকে।

প্রাণীটা ব্যাটারিবাকসেতে হেলান দিয়ে কলা খাচ্ছিল। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর কলা ফলে। এই হাওয়াই দ্বীপে কাল লিহিউ বিমানঘাঁটি থেকে আসতে আসতে অজস্র কলাবাগান দেখেছি। এককেটা কলা প্রায় দেড় ফুট পর্যন্ত লম্বা এবং গাঢ় হলুদ রঙ। এসব কলা আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে প্রচুর বিক্রি হয়। কাজেই এর মধুর স্বাদের সঙ্গে আমার চেনাজানা হয়ে গেছে। বানরজাতীয় জীবটি যদি সত্যি সেই মেনেহিউন বা মিনিহুন হয়, তা হলে বলতে হবে কলাই তার প্রধান খাদ্য। কারণ তার সামনে প্রায় এক কাঁদি কলা রয়েছে।

একটা লোক মার্কারি বাতি ও ব্যাটারি যন্ত্রটা তুলে কাঁধে নিল। তখন খুদে প্রাণীটা দুপায়ে উঠে দাঁড়াল। তার এক হাতে কলার কাঁদি। কালো হাতটায় দাগড়া দাগড়া পেশীর ওপর আলো ঠিকরোচ্ছে। তার মুখটা স্পষ্ট নজরে পড়ল। অবিকল মানুষের মতো। কিন্তু আকারে একটা বড় সাইজের মোসাম্বি লেবুর মতো গোলাকার। কান দুটো বেশ বড়। গায়ে একটুও লোম নেই। সব মিলিয়ে আস্ত একটি মানুষ-চামচিকে বলা যায়—শুধু ডানার বদলে দুটো হাত আছে।

ওরা এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে একটা ফাটলে ঢুকে গেল। ক্রমশ আলোর ছটাও মিলিয়ে গেল। আবার গাঢ় অন্ধকারে ভরে গেল ওয়েইকাপালি গুহা। জ্যোৎস্না ফিসফিস করে বলল,—ওরা সঠিক জায়গাটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওয়েইকানালেয়া গুহার যে সুড়ঙ্গ পথ এগুহায় এসেছে, সেটাই খুঁজতে গেল ওরা। শুনেছি দুই গুহার মধ্যেকার এ সুড়ঙ্গ পথ আজ পর্যন্ত কেউ খুঁজে পায়নি।

বব উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—চলো। ওদের পেছন পেছন যাই।

জ্যোৎস্না বলল,—আমি একটা কথা ভাবছি। আমাদের বড্ড বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে না? মাঝির যদি রাগ করে ক্যানো নিয়ে চলে যায়, খুব বিপদে পড়ে যাব।

বব বলল,—তা হলে তোমরা এখানে অপেক্ষা করো। আমি ঝটপট ওদের বলে আসি, মানত দিতে আমাদের একটু দেরি হবে। প্রার্থনা করব কিনা? তিনজনের প্রার্থনা একটু লম্বা চওড়া হবেই।

জ্যোৎস্না বলল,—তাই যাও বব। যদি আরও দুডলার বেশি চায় দেরি হবার জন্য। রাজি হয়ো।

বব গুহার মেঝেয় সাবধানে টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে চলে গেল।

বললাম,—জ্যোৎস্না! এই মূর্তিটা নিশ্চয় কোনো দেবতার?

জ্যোৎস্না বলল,—হ্যাঁ। পলিনেশীয় জাতির আদিম যুগের এই দেবতার নাম কন-টিকি।

কন-টিকি? অবাক হয়ে বললাম। এ তো খুব চেনা শব্দ মনে হচ্ছে! হ্যাঁ— বিখ্যাত অভিযাত্রী থর হেয়ারডাল কন-টিকি নামে একটা ভেলায় প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন।

জ্যোৎস্না বলল,—কন-টিকি আসলে সূর্যদেবতা। আদিমযুগে প্রশান্ত মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপে এই সূর্যদেবতার পুজো হত। এখন পলিনেশীয়রা প্রায় সবাই খ্রিস্টান হয়ে গেছে। তাই আর কন-টিকির পুজো হয় না। হায়েনায় এসে শুনেছি, পলিনেশীয়রা এখনও কেউ কেউ কন-টিকির পুজো করে। তবে এ পুজো মানে নেহাত রোগ বা বিপদ আপদে মানত করা। তাও ওরা লুকিয়ে চুরিয়ে মানত করতে আসে। পাদ্রীরা জানতে পারলে জরিমানা করে যে! কিন্তু জানেন জয়ন্তদা বিদেশিরা মানত দিত এলে পলিনেশীয়রা ভারি খুশি হয়। তবে ভয়ে কেউ এতদূর আসতে পারে না। গুহার দরজার মুখে কিছু ফুল রেখে চলে যায়। কারণ নিশ্চয় বুঝতে পারছেন—ওই সব মড়ার মাথার খুলি হাড় কংকাল! ভূতের ভয়ে এদিকটায় ক্যানো নিয়ে আসতে চায় না। নেহাত টাকার লোভে কেউ আসে।

তুমিও তা হলে এই মূর্তিটার কাছে আসো নি?

মোটেই না। এতদূর আসব, কী দরকার মুখেই যা বিচ্ছিরি গন্ধ।

আমরা ফিসফিস করে কথা বলছিলাম। ইচ্ছে হল, বেদিতে উঠে মূর্তিটাকে ছুঁয়ে দেখি কী দিয়ে তৈরি। তাই বললাম,—জ্যোৎস্না! আমি বেদিতে উঠে মূর্তিটা ছুঁয়ে দেখি। ইচ্ছে করলে তুমিও উঠতে পারো। উঠবে নাকি?

জ্যোৎস্নার কোনো সাড়া পেলাম না। তাই ফের ডাকলাম,—জ্যোৎস্না। আসবে নাকি?

তবু কোনো সাড়া নেই। একটু জোরে ডাকলাম,—জ্যোৎস্না গেলে কোথায়?

আশ্চর্য জ্যোৎস্না কি অন্ধকারে তামাশা করছে আমার সঙ্গে? এ কি তামাশার সময়?

রাগ করে বললাম,—জ্যোৎস্না! সাড়া দিচ্ছো না কেন?

মেয়েটা ডানপিটে এবং গায়ে জোর আছে। তাই বলে এ ভূতুড়ে গুহায় আমার সঙ্গে এমন ফাজলেমি করা কি উচিত হচ্ছে? আমি হাত বাড়িয়ে ওকে খুঁজলাম। পেলাম না। তখন বেদি থেকে অন্ধের মতো দুহাত বাড়িয়ে কানামাছি খেলতে থাকলাম অন্ধকারে। দেয়ালে ধাক্কা লাগতেই আরও চটে গিয়ে গলা চড়িয়ে বললাম,—হচ্ছেটা কী? জ্যোৎস্না! জ্যোৎস্না?

ঠিক সেই সময় অন্ধকারে দূরে আচমকা বীভৎস একটা চেচাঁমেচি শুনতে পেলাম। হোয়া হোয়া—আ—আ? হোয়া হোয়া হোয়া—আ—আ। হোয়া হোয়া হোয়া —আ—আ!

অনেকগুলো রাক্ষুসে মানুষের চিৎকার যেন। বিদেশি ফিল্মে জংলিদের চিৎকারের মতো। হোয়া হোয়া হোয়া—আ—আ! হোয়া হোয়া হোয়া—আ—আ।

অমানুষিক চিৎকার করতে করতে কারা এগিয়ে আসছে এদিকে।

মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলাম না। অন্ধকারে অন্ধের মতো দৌড়তে চেষ্টা করলাম। কোনদিকে দরজা—কোনপথে এসেছি, তা ঠিক করতে পারলাম না। বার বার আছাড় খেলাম। জান্তব চিৎকারটা খুব কাছে বলে মনে হল। তারপর যেই পা ফেলেছি, হড়াৎ করে একটা গর্তে পড়ে গেলাম।

পড়লাম একেবারে কনকনে ঠাণ্ডা জলে। জলে পড়ায় আঘাত লাগল না। কিন্তু কী তীব্র স্রোত! আমাকে টেনে নিয়ে চলল খড়ের খুটোর মতো।

কতক্ষণ অসহায় ভেসে থাকার পর একখানে স্রোতটা হঠাৎ কমে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার তো! তারপর জলটা আমাকে উল্টোদিকে ঠেলতে থাকল। সঙ্গে সঙ্গে টের পেলাম সমুদ্রের জল গুহার তলার সুড়ঙ্গে একবার করে প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে আসছে, আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। তাই এরকম দুমুখো টান জলে। হাত বাড়িয়ে শক্ত কিছু খুঁজলাম। হাতে দেয়াল ঠেকল। কিন্তু জলের ধাক্কায় মসৃণ দেয়াল ধরার উপায় নেই। আবার এক হ্যাঁচকা টানে স্রোতের মুখে ভাসলাম। হাত দুটো অসহায়ভাবে ওপরে বাড়াতেই ছাদে ঠেকল। তারপব ছাদটা, ঢালু হয়ে জলে ডুবেছে টের পেলাম। সর্বনাশ! এবার জলের তলায় দম আটকে মারা পড়তে হবে যে! কিন্তু না ডুবে উপায় নেই। মাথা ভেঙে যাবে।

প্রচণ্ড বেগে জল আমাকে টেনে নিয়ে চলল। দম বন্ধ হয়ে আসছে। আঃ বাতাস! মাথা তোলার জন্য একটুখানি আকাশ।

বুক ফেটে যাবে বুঝি। জলের টান যেন গভীর পাতালে নিয়ে চলেছে। একসময় আর সহ্য করতে পারলাম না। নিঃশ্বাস নেবার জন্য ঠেলে মাথা তুললাম। মাথায় কিন্তু ছাদের ধাক্কা লাগল না। আঃ। আবার একটুকরো আকাশ পেয়েছি। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে থাকলাম। এখানে স্রোতটা কমেছে। জলটা ঘুরপাক খাচ্ছে। বাঁদিকে একটু সরলে আবার তীব্র স্রোত পেলাম। তারপর সামনেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল ক্রমশ।

একটা ফাটল দিয়ে রোদ্দুর ঢুকেছে। বরফগলা জলে শরীর নিঃসাড়। কিন্তু রোদ্দুর দেখে বাঁচার তাগিদ জোরালো হয়ে উঠেছে। ফাটলের কাছে পৌঁছতেই আঁকড়ে ধরলাম একটা পাথরের খাঁজ।

ফাটলটা প্রায় হাত দেড়েক চওড়া। অনেক কষ্টে সেখান দিয়ে ওপরে উঠতে থাকলাম। ...

অগ্নিদেবী পিলির ভক্তবৃন্দ

চারদিক খুঁটিয়ে দেখে বুঝতে পেরেছি আমার অবস্থা হয়েছে রবিনসন ক্রুশোর মতো। যেখানে বসে আছি, তার নীচে হ্রদ। হ্রদের একটা দিক সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত। বাকি তিনদিকে পাহাড়। খাড়া দেওয়ালের মতো পাহাড়। হ্রদের জলে হাজার-হাজার পাখি ভেসে বেড়াচ্ছে। সমুদ্রের সঙ্গে একটা চওড়া নালা দিয়ে হ্রদের যোগাযোগ রয়েছে। সেখানে জলটা প্রচণ্ড ফুঁসছে। কিন্তু হ্রদের ভেতর তত ঢেউ নেই। মাঝে মাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে আসছে। জলে বসছে। আবার তুমুল চেঁচামেচি করতে করতে উড়ে যাচ্ছে।

পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট্ট চাতালে বসে থাকতে থাকতে আমার ভিজে পোশাক শুকিয়ে গেছে। এখন বেলা প্রায় বারোটা বাজে। হ্রদের ওপর দিয়ে একটু আগে একটি হেলিকপ্টার উড়ে গেছে। আমি চিৎকার করেছিলাম—কিন্তু ওরা লক্ষ করেনি। খুব দমে গেছি। আমার ওপর দিকে পাহাড় এত খাড়া, ওদিক দিয়ে ওঠা অসম্ভব। অথচ একটা কিছু করতেই হবে।

বসে থাকতে থাকতে চোখে পড়ল, চাতালটার নীচে যে ফাটল দিয়ে আমি উঠেছি, তার ভেতর একস্থানে একটা প্রকাণ্ড গর্ত রয়েছে। গর্তটা কালো দেখাচ্ছে। ওর ভেতর ঢুকলে আবার সুড়ঙ্গ নদীতে পড়ব কিনা কে জানে! তবু চেষ্টা করা যেতে পারে।

সাবধানে নেমে গর্তটার কাছে গেলাম। পা রাখার জায়গা গর্তের বাইরে কোথাও নেই। তাই পাথরের খাঁজ আঁকড়ে ধরে গর্তের ভেতর ঢুকে পড়লাম। এতক্ষণে মনে পড়ল আমার পকেটে একটা গ্যাস লাইটার আছে। গর্তটা প্রায় একগজ চওড়া, গজ দুই উঁচু। দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে। লাইটার জ্বেলে যেটুকু দেখতে পেলাম তাতে প্রমাণ পাওয়া গেল একসময় এখানে মানুষ এসেছিল। কারণ এক কুচি কাগজ আর কয়েকটা পোড়া সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে। (আশায় নেচে উঠলাম। মানুষ এখানে যদি এসে থাকতে পারে, যাওয়ার পথও নিশ্চয় আছে)।

লাইটার নিভিয়ে যা থাকে বরাতে ভেবে সাবধানে এগিয়ে গেলাম। কিছুটা যাওয়ার পর ফের লাইটার জ্বালি আর দেখে নিই। আবার কিছুটা এগিয়ে যাই। এমনি করে অনেকটা গিয়ে টের পেলাম এটাও একটা গুহা। ক্রমশ ভেতরটা হলঘরের মতো চওড়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওয়েইকাপালির মতো কোনো দুর্গন্ধ টের পাচ্ছি না। বরং কী একটা মিঠে গন্ধ মাঝে মাঝে আবছাভাবে নাকে ভেসে আসছে। গন্ধটা কীসের হতে পারে? এমন মিঠে গন্ধ আমার অচেনা।

তাহলে কি এটাই হায়েনার তিননম্বর গুহা 'মানিনিহোলা'? এই গুহাটার কথা জনখুড়োর কাছে শুনেছিলাম। এটার নাম শুকনো গুহা। কারণ কী? তলায় সুড়ঙ্গ নদী নেই বলে? জনখুড়ো বলতে পারেনি। শুধু বলেছিলেন, পলিনেশীয় ভাষায় একে বলা হয় শুকনো গুহা।

যে জন্যেই শুকনো গুহা বলা হোক, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর মেজাজ নেই। আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে, এটাই আসল কথা। নইলে রবিনসন ক্রুশোর মতো জীবন কাটাতে হবে।

লাইটারের গ্যাস ফুরিয়ে আসছে। তাই অন্ধকারে দেয়াল ছুঁয়ে হাঁটছিলাম। একখানে দেয়ালটা বাঁদিকে বেঁকে গেছে। সেখানে বাধ্য হয়ে লাইটার জ্বালালাম। চোখে পড়ল, ওয়েইকাপালির মতো এখানেও উঁচু বেদির ওপর একটা মূর্তি রয়েছে। বেদির ওপর মূর্তির পায়ের কাছে একগাদা শুকনো ফুল। আবার লাইটার জ্বেলে মূর্তিটা দেখতে গিয়ে অবাক হলাম। এটা 'কন-টিকির' মতো কালো নয়, হলুদ রঙের পাথরে তৈরি। তা ছাড়া এটা দেবীমূর্তি। কিন্তু কী হিংস্র চেহারা! লাইটারের গ্যাস হঠাৎ এসময়ে পুড়ে শেষ হয়ে গেল।

আবার দেয়ালের দিকে পা বাড়িয়েছি, অমনি অন্ধকারে ঠাণ্ডা কিছু আমার কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং মুখ চেপে ধরল। ঠাণ্ডা হিম দুটো ছোট্ট হাত। চেঁচিয়ে ওঠারও সুযোগ পেলাম না।

কিন্তু তখুনি টের পেলাম, মিনিহুনের খপ্পরে পড়েছি। ওয়েইকাপালিতে জ্যোৎস্নাও তা হলে ঠিক এইভাবে ব্যাটাচ্ছেলের পাল্লায় পড়েছিল।

একটা দুটো নয়, মনে হচ্ছিল একপাল মিনিহুন আমার ওপর নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং আমাকে তারা চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলল অন্ধকারে। আমার কাঁধের মিনিহুন মুখটা শক্ত করে ধরে রইল। মনে হল, বাধা দিলে ও আবার হাড় গুঁড়ো করে ফেলবে।

কিন্তু আশ্চর্য, নাকটা খোলা থাকায় সেই মিঠে গন্ধটা ক্রমশ তীব্র হয়ে ভেসে আসছিল। এত তীব্র যে গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করতে থাকল। তারপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। ...

যখন জ্ঞান হল, তখন দেখলাম একটা চারকোণা ঘরের মেঝের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছি। আমার হাতপা বাঁধা হয়নি। কিন্তু গায়ে এতটুকু জোর নেই যে উঠে দাঁড়াই। ঘরের দেয়ালে অসংখ্য দেবীমূর্তির চুলগুলো সাপের মতো ফণাতোলা এবং দুচোখে রাগ ঠিকরে পড়ছে। সামনে একটা সোনালি রঙের সিংহাসন। সিংহাসনে কেউ নেই। সিংহাসনের মাথার ওপর রাজছত্র থেকে হলদু রঙের আলো ছড়াচ্ছে। ঘরের ভেতর একেবারে ফাঁকা। বিদঘুটে প্রাণীগুলো গেল কোথায়?

অতিকষ্টে দেওয়ালে ভর করে উঠে দাঁড়ালাম। মেঝেয় কোন কালের পুরোনো কার্পেট পাতা রয়েছে। ছাদেও সেই রকম দেবীমূর্তি-আঁকা। চারদিক থেকে হিংস্রদৃষ্টিতে মূর্তিটা আমাকে যেন গিলে ফেলতে চাইছে।

সিংহাসনের ওপর রাজছত্রের আলোটা স্থির। কাছে গিয়ে মনে হল, ওটা সাধারণ কোনো আলো নয়। সম্ভবত কোনোরকম রত্নপাথর। তা থেকে আলো ছড়াচ্ছে।

ঘরের দেয়াল একেবারে নিরেট। কোথাও দরজার চিহ্নটি নেই। ভারি অদ্ভুত তো!

চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখে নিচ্ছি, হঠাৎ সিংহাসনের পেছনের দেয়ালের একটা অংশ ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর আঁতকে উঠে দেখলাম, দুটো কালো কদর্য বাঁদরজাতীয় খুদে মানুষ—হ্যাঁ সেই মিনিহুন ওরা—ঘরে ঢুকল। তাদের দুজনের হাতে দুকাঁদি কলা।

আমি পিছিয়ে এসে দেওয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়েছি। ওরা কলার কাঁটি দুটো আমার সামনে রেখে একসঙ্গে কালোমুখের সাদা দাঁত বের করে বলল—হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ উঁয়া উঁয়া।

অবিকল এইসব শব্দ। নিশ্চয় এটাই ওদের ভাষা। আমাকে কি অতগুলো কলা খেতে বলছে ব্যাটাচ্ছেলেরা? ওই কলা একটা খেলেই আমার পেট পিপের মতো ফুলে উঠবে যে।

ভয়ে ভয়ে হুকুম মেনে একটা কলা ভেঙে নিলাম। খিদেও প্রচণ্ডরকম। কলাটা খুব সুস্বাদু, স্বীকার না করলে পাপ হবে। দুই মিনিহুন গম্ভীর মুখে আমার খাওয়া দেখলে কিছুক্ষণ। তারপর সেইরকম বিদঘুটে হুঁ হুঁ করে চলে গেল। দরজাটা আবার দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল।

তাহলে এদের যতটা খারাপ ভেবেছিলাম, ততটা মোটেও নয়। বরং ভদ্র বলেই মনে হচ্ছে। আমি ক্ষুধার্ত টের পেয়ে খাদ্য দিয়ে গেল যখন।

কিন্তু জলতেষ্টা পেয়েছে যে। এবার যদি এককাঁদি ডাব দিয়ে যেত, কী সুখের না হত। এসব দ্বীপে নারকোল গাছের জঙ্গল হয়ে আছে। লোকের বাগান থেকে এ ব্যাটারা নিশ্চয় কলাগুলো চুরি করে আনে। ডাব পেড়ে আনে না কেন?

কী কাণ্ড। ওরা কি মনের কথা টের পায়? দরজাটা খুলে গেল। তারপর সত্যি সত্যি দুটো মিনিহুন। (এরা নিশ্চয় আগের দুজনই) এক কাঁদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডাব এনে বলল,—হুঁ হুঁ হুঁ, হিঁ হিঁ হিঁ উঁয়া উঁয়া।

মুখে মিঠে হাসি রেখে বললাম,—খেতে তো বলছ। কিন্তু ডাব কাটার অস্তর চাই যে। ছুরিটুরি নেই তোমাদের।

ইশারায় ব্যাপারটা বুঝিয়েও দিলাম। ওরা মুখ তাকাতাকি করল। তারপর দুজনে একটা করে ডাব পটাপট ছেঁড়ে আর বোঁটার দিকটা হ্যাঁচকা দিকটা হ্যাঁচকা টানে ওপড়ায়। জল ছলকে পড়ে। কী দারুণ জোর ওদের গায়ে!

প্রাণভরে ডাবের জল খেলাম—পর পর তিনটে। পেট ফুলে ঢোল হল। হাত নেড়ে বললাম, —থাক্ থাক্। এই যথেষ্ট হয়েছে বন্ধুরা।

ওরা এবার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ভুতুড়ে হেসে উঠল, হিঁ হিঁ হিঁ। পিলে চমকানো হাসিরে বাবা। বললাম,—থাক্। থাক্। আর হাসে না।

ওরা পিটপিটে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

বললাম,—হ্যাঁ—অসংখ্য ধন্যবাদ আমার খুদে বন্ধুরা। এবার দয়া করে আমাকে বাইরে পৌঁছে দাও দিকি।

কে জানে কেন, ওরা আমাকে জিভ ভ্যাংচাতে শুরু করল। দেখে তো বেজায় ভড়কে গেলাম। কাঁচুমাচু মুখ করে বললাম,—আচ্ছা আচ্ছা। আর বেরুবার নাম করব না। দোহাই বাবা, আর অমন বিচ্ছিরি ভেংচি কাটে না।

ওরা এবার আমাকে বুড়ো আঙুল দেখাতে শুরু করল। আমেরিকায় বুড়ো আঙুল দেখানোর খুব আনন্দের এবং বন্ধুতার ব্যাপার। আমি ওদের বুড়ো আঙুল দেখাতে থাকলাম। তখন ওরা সাদা দাঁত বের করে ফের হেসে উঠল, হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ।

এক সময় দরজা খুলে গেল এবং তুম্বো চেহারার এক মিনিহুন ঢুকে হুঁ হুঁ করে কিছু বলল। তখন আমার খুদে বন্ধুদ্বয় আমার দুহাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল।

করিডোরে সুন্দর একফালি পথ। সেইরকম আলো জ্বলছে। তলায় তেমনি কার্পেট বিছানো রয়েছে। কিছুদূর চলার পর সামনের দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে দেখি প্রকাণ্ড হলঘরের মধ্যে প্রায় শ'খানেক মিনিহুন গম্ভীরমুখে বসে রয়েছে। উঁচু বেদির ওপর যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাকে দেখে চমকে উঠলাম।

অবিকল সেই দেবীমূর্তির মতো চেহারাও। গায়ের রঙ উজ্জ্বল সোনালি। কোঁকড়ানো লাল একরাশ চুল মাথায়। পরনে ঝলমলে হলুদ রঙের আলখাল্লার মতো পোশাক।

আমাকে বেদির সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে মিনিহুনদ্বয় সরে গিয়ে ভিতে বসে পড়ল। বেদির মহিলাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই বুঝতে পারলাম স্বর্গের কোনো দেবী টেবী নন মোটেও মেমসাহেব না হয়ে যান না।

আমার অনুমান সত্যি হল তখনি। মহিলাটি আমেরিকান উচ্চারণের ইংরাজিতে বলে উঠলেন, —আই অ্যাম দা ফায়ার-গডেস পিলি। আমি অগ্নিদেবী পিলি। সারা প্রশান্ত মহাসাগরের পলিনেশীয় দ্বীপগুলোতে এক সময় আমার স্বামী সূর্যদেব কনটিকি এবং আমার পুজো হত। বর্বর ইউরোপীয় জাতির লোক আমাদের পুজো বন্ধ করে দিয়েছে। তাই ওদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। আমার হিংস্র হায়েনার দল ওদের সামনে পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। টুকরো-টুকরো করে খেয়ে ফেলে। ওয়েইকাপালির দরজায় খুলি এবং হাড়ের পাহাড় গড়ে তুলেছি। দেখে যেন ওদের শিক্ষা হয়।

আঁতকে উঠে বলে ফেললাম,—মাননীয় মহোদয়া! আমি মোটেও ইউরোপীয় নই। আমি একজন ভারতীয়। আমার চেহারা আর গায়ের রঙ দেখুন।

কথাগুলো 'অগ্নিদেবী' কানে নিলেন বলে মনে হল না। হেসে উঠলেন। বড় হিংস্র হাসি। আর তাঁর কালো কুচকুচে খুদে ভক্তবৃন্দও একসঙ্গে বিকট ভূতুড়ে হাসি হাসতে লাগল— হিঁ হঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ ...

শয়তানের কবলে

কিন্তু ততক্ষণে আমার মাথায় অনেক প্রশ্ন জেগেছে। কে এই 'অগ্নিদেবী পিলি'? বুঝতে পারছি, ইনি একজন মেমসাহেব তো বটেই, এবং আমেরিকান। কারণ মারকিন মহিলাদের মতো নাকিসুরে ইংরেজি উচ্চারণ করছেন। তা ছাড়া ওই ইংরেজিও আমেরিকান ইংরেজি। প্রায় মাসচারেক আমেরিকায় থেকে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, ব্রিটেন কানাডা আর আমেরিকা তিনটি দেশেই ইংরেজি ভাষায় লোকেরা কথা বললেও বেশ খানিকটা তফাত আছে। ভাষায় উচ্চারণ বাচনভঙ্গিতে অনেক অমিল।

তারপরের প্রশ্ন, জ্যোৎস্নাকেও নিশ্চয় মিনিহুনরা তখন আমার মতো করে পাকড়াও করেছিল। তাকে কোথায় রেখেছে? আমাদের ধরে আনার উদ্দেশ্যই বা কী?

অপোগণ্ড জীবগুলোর ভূতুড়ে হাসি থামতেই চায় না। অগ্নিদেবী চেঁচিয়ে ধমক দিলে তবে থামল। তখন সাহস করে বললাম, মাননীয়া অগ্নিদেবী! আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না যে আমি একজন ভারতীয়?

অগ্নিদেবী গর্জে উঠলেন,—ভারতীয় হও আর যেই হও—তোমার সভ্য দুনিয়ার লোকেরা আমার শত্রু। তোমরা বিশ্বাসঘাতক স্বার্থপর ধূর্ত। আমি তোমাদের ঘৃণা করি ... ঘৃণা করি ... ঘৃণা করি ...

বলতে বলতে আরও অস্বাভাবিক এবং হিংস্র হয়ে উঠল ওঁর চেহারা। তারপর দুলতে থাকলেন। দুলতে দুলতে চোখ বুজে ফেললেন। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

ছত্রিশ বছর ধরে আমি ওদের অপেক্ষা করছি। ওরা এসে আমাকে নিয়ে গেল না। ওরা আমাকে হায়েনার গুহায় রেখে চলে গেল। বলে গেল, ফিরে এসে আমাকে নিয়ে যাবে। ওরা বিশ্বাসঘাতক। ওরা ...

কথাগুলো শুনতে শুনতে চমকে উঠেছিলাম। তারপর হঠাৎ কোথা থেকে ভরাট গম্ভীর গলায় ইংরেজিতে কে বলে উঠল, মারিয়া! মারিয়া! তুমি কি চুপ করবে? চুপ না করলে তিন নম্বর শাস্তি তোমার পাওনা হবে। সাবধান!

'অগ্নিদেবী'র নাম তাহলে মারিয়া? নামটা কেমন যেন চেনা লাগছে। মারিয়া চুপ করেছেন। চোখ খুলে তেমনি হিংস্র চোখে তাকিয়ে বললেন,—হ্যাঁ, আমি চুপ করেছি ফাদার গ্রিনকট।

অদৃশ্য ফাদার গ্রিনকটের আওয়াজ এল,—যাও। এবার তোমার কর্তব্য পালন করো।

মারিয়া আমার দিকে হিংস্রমূর্তিতে তাকিয়ে রইলেন।

মারিয়া! ছুরি আর সাঁড়াশি কোথায় তোমার?

আমার হাতেই রয়েছে ফাদার গ্রিনকট।

আতঙ্কে কাঠ হয়ে দেখলাম, মারিয়ার একহাতে ছুরি অন্যহাতে একটা সাঁড়াশি।

ফাদার গ্রিনকটের কণ্ঠস্বর ভেসে এল আবার,—ইয়াকে বলো রেকাব নিয়ে ওই বাদামি ভূতটার কাছাকাছি দাঁড়াক। আর উয়াকে বলো ওর সঙ্গীদের নিয়ে বাদামি ভূতটাকে শক্ত করে ধরে থাক। আর মারিয়া! তুমি ওর বুকটা চিরে হৃৎপিণ্ডটা সাঁড়াশি দিয়ে উপড়ে নাও। রেকাবে রেখে আমার কাছে নিয়ে এসো। ওর ধড়টা আপাতত ওখানে পড়ে থাক পরে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এ কি দুঃস্বপ্ন—না সত্যি সত্যি ঘটছে? ওই ছুরি দিয়ে আমার বুক চিরে সাঁড়াশি দিয়ে আমার কলজে তুলে নেবে ভাবতেই মাথা ঘুরে উঠল। চিৎকার করতে চাইলাম। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। মারিয়া এবার হি হি করে হেসে উঠলেন। বেদি থেকে নেমে এলেন একহাতে চকচকে ছোরা আর অন্যহাতে কালো সাঁড়াশি নিয়ে। তারপর দেখি, একটা মিনিহুন আমাকে পেছনে ধরে ফেলে আমার বুকটা চিতিয়ে রাখল। জীবনে ভুলেও ঈশ্বরের নাম-টাম করিনি। বিশ্বাসও নেই। কিন্তু এখন যখন মরতে যাচ্ছি, বিশেষ করে ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক হবে মৃত্যুটা—তখন ঈশ্বরের নাম গলার ভেতর থেকে বেরুতে চাইল কই? বোবা হয়ে গেছি যেন।

মারিয়া ছোরাটা আমার বুকের কাছে এসে ঝুঁকে দাঁড়াতেই চোখ বুজে ফেললাম। তারপর প্রতীক্ষা করতে থাকলাম, এই এবার তীক্ষ্ণধার ছোরা বুকে ঢুকে যাবে— এক-সেকেন্ড দু-সেকেন্ড তিন সেকেন্ড ...

হঠাৎ কানে এল মারিয়া ফিসফিস করে কিছু বলছেন। ভয় পেয়ো না। আমি তোমার শত্রু নই। আমিও তোমার মতো এক বন্দী। তোমার বুকে খানিকটা লাল রঙ মাখিয়ে দিচ্ছি। আর একটুকরো স্পঞ্জ আছে আমার কাছে। সেটাতে লালরঙ ভরা রয়েছে। ওটা রেকাবে করে নিয়ে যাচ্ছি। তারপর শোনো ...

ফাদার গ্রিনকটের আওয়াজ এল,—মারিয়া! দেরি হচ্ছে কেন?

মারিয়া বললেন,—মন্ত্র পড়ছি ফাদার গ্রিনকট। বাধা দিলেন বলে আবার মন্ত্রটা গোড়া থেকে পড়তে হবে।

শয়তান ফাদার গ্রিনকট অদৃশ্য থেকে বলল,—হুঁ। ঝটপট মন্ত্রটা আওড়ে নাও। আমার মেশিন গরম হয়ে যাচ্ছে। বেশি গরম হয়ে গেলে মেয়েটার মতো বাদামি ভূতটার কলজেও পড়ে যাবে। কাজে লাগানো যাবে না।

মারিয়া ফিসফিস করে বলল,—শোনো। আমার চলে গেলে তুমি মড়ার মতো পড়ে থেকো। সাবধান, একটুও নড়ো না। তারপর এরা তোমাকে হায়েনার ঘরে ফেলে দিয়ে আসবে। ভয় নেই—হায়েনাগুলোকে আমি ঘুমের ওষুধ মেশানো মাংস খাইয়ে রেখে এসেছি। ওরা ঘুমোচ্ছে। তুমি ওঘরে চুপচাপ পড়ে থেকো। তারপর আমি সময়মতো যাব'খন।

মারিয়া ছোরা আর লালরঙ ভরা স্পঞ্জটা বুকে ঠেকিয়ে বলল,—সত্যি সত্যি বুক চিরে হৃৎপিণ্ড বের করলে মানুষ ফের যেমন আর্তনাদ করে, তেমনি আর্তনাদ করো। সাবধান, শয়তানটা যেন টের না পায় যেন তুমি অভিনয় করছ। এর ওপর তোমার বাঁচামরা নির্ভর করছে।

আমি একসময় থিয়েটার করতাম। মৃত্যু-যন্ত্রণায় আর্তনাদের অভিনয় একবারই করেছিলাম। এখন প্রাণের দায়ে সেইরকম রাম চ্যাঁচানি চেঁচিয়ে উঠলাম, ওঃ। ওঃ। ওঃ ও হো হো হো হো। তারপর গোঙাতে শুরু করলাম। হাতপা ছোঁড়াছুঁড়িও চালিয়ে গেলাম যতটা পারি।

শয়তান ফাদা গ্রিনকটের নেপথ্য অট্টহাসি শোনা গেল হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

আমার হৃৎপিণ্ড রেকাবে রাখলে আমি এলিয়ে পড়লাম। মিনিহুনরা আমাকে চিত করে শুইয়ে দিল। আমার জামা লাল হয়ে গেছে। চবচব করছে একেবারে। মুখ মড়ার মতো করে হাতপা ছড়িয়ে পড়ে রইলাম। মারিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিহুনরা আমাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে চলল সেই হায়েনার ঘরে। গুহার ভেতর যেন প্রাসাদপুরী। কারা বানিয়েছে এই সুন্দর পুরী? মিনিহুনরা তো নয়ই। হয়তো কোনো প্রাচীন যুগের আদিম রাজা এই পাতালপুরী বানিয়েছিল। যেভাবেই হোক ফাদার গ্রিনকট নামে এক শয়তান এখানে আস্তানা করেছে।

হায়েনার ঘর একটা জেলখানা যেন। মনে হল, আদিম পলিনেশীয় রাজার বন্দীশালা ছিল এটা। দুর্গন্ধে বমি আসছে। মাথার ওপর একটা আলো জ্বলছে। সেই আলোয় চোখের ফাঁক দিয়ে দেখলাম প্রায় একডজন কুৎসিত চেহারা হায়েনা দাঁত ছরকুটে ঘুমোচ্ছে। কারুর ঠ্যাং ওপরে কারুর পাশে। মিনিহুনরা একটা ফাঁকা জায়গায় আমাকে ধপাস করে ফেলে চলে গেল। গরাদের দরজা বন্ধ করতে ভুলল না।

একটু পরে সাবধানে কাত হলাম। আমার চারপাশে হায়েনার পাল মড়ার মতো পড়ে আছে। এরা যদি দৈবাৎ জেগে ওঠে, আমাকে বাঁচতে হবে না। হায়েনা মানুষকে ভয় পায়, জানি। কিন্তু এরা যেন দল বেঁধে আছে এবং নরমাংস খেতে অভ্যস্ত হয়েছে নিশ্চয়।

এদিক ওদিক তাকিয়ে উঠে বসলাম। হঠাৎ একটা হায়েনা ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতেই বুক ধড়াস করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ফের মড়ার মতো চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। তারপর মনে হল, তাহলে কি ওয়েইকাপালি গুহার ভেতর যে হোয়া হোয়া গর্জন শুনেছিলাম তা এইসব হায়েনারই?

কিন্তু হায়েনা তো মানুষের হাসির মতো শব্দ করে। হাঃ হাঃ হাঃ এইরকম শব্দ। কে জানে, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হায়েনারা হয়তো ওইরকম হোয়া হোয়া করে।

কতক্ষণ পরে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর দরজা খুলল। আড়চোখে দেখলাম, কালো কাপড়ে ঢাকা মারিয়ার মূর্তি। তখন উঠে বসলাম।

মারিয়া বললেন,—চলে এসো আমার সঙ্গে। সাবধান, কোনো শব্দ নয়। ...

মারিয়ার কাহিনি

একটা সরু করিডোর দিয়ে মারিয়া আমাকে নিয়ে চললেন। এঘর ওঘর হয়ে একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকলেন। তারপর বিস্ময় ও আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম,—জ্যোৎস্না।

মারিয়া আমার মুখ চেপে ধরেছেন সঙ্গে সঙ্গে। এ ঘরে সুন্দর একটা বিছানায় জ্যোৎস্না শুয়ে ছিল। উঠে মিষ্টি হেসে চাপাস্বরে বলল,—আসুন জয়ন্তদা। মারিয়া ঠাকমার আমরা অতিথি।

মারিয়া ঠাকমা! বলে কী জ্যোৎস্না। কিন্তু ততক্ষণে মারিয়া কালো আলখাল্লাটা খুলেছেন। এবার দেখি, এ তো এক বৃদ্ধা। তখন মনে হচ্ছিল, যুবতী না হলেও প্রৌঢ় তো ননই—বড়জোর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের বেশি বয়স হবে না। এখনই দেখছি, শরণচুলো বুড়ি। মুখের চামড়া কোঁচকানো। কিন্তু গায়ের জোরটা টিকে আছে, তা বোঝাই যাচ্ছে। মারিয়া বললেন,—বসো। তবে চেঁচামেচি করা চলবে না। এখন শয়তান গ্রিনকট ওর ল্যাবরেটরিতে আছে। মিনিহুনগুলোর ওপর পরীক্ষা চালাচ্ছে। গ্রিনকট ওদের মানুষ না বানিয়ে ছাড়বে না।

বললাম,—মানুষের কলজে ওদের বুকে ঢুকিয়ে মানুষ বানাবে বুঝি?

মারিয়া বললেন,—না, হার্টবদল করবে না। অন্যরকম পদ্ধতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

তা হলে মানুষের কলজে কী কাজে লাগে ওর?

মারিয়া বললেন,—আমি ছত্রিশ বছর ধরে ওর পাল্লায় পড়ে বন্দী হয়ে আছি বলতে পারো। কারণ এখান থেকে বেরুনোর পথ খুঁজে পাইনি। তাই বাইরের পৃথিবীতে কী ঘটছে জানি না। তবে মাঝে মাঝে টের পেয়েছি, ফাদার গ্রিনকট মিনিহুনের সাহায্যে মানুষ ধরে আনে বাইরে থেকে। কীভাবে ধরে আনে বলছি। মিনিহুনরা জলচরও বটে। খাড়ির সমুদ্রে ডুবে ওত পেতে থাকে। রাতবিরেতে কোনো দুঃসাহসী পর্যটক একলা খাড়ির নিচে চাতালে বেড়াতে এলেই মিনিহুনরা তাকে ধরে আনে। আমার ধারণা, হায়েনার লোকেরা বা সরকারিমহল ভাবেন, পর্যটক বেঘোরে ডুবে মারা পড়েছে। খাড়ির সমুদ্রে প্রচুর হাঙর আছে। কাজেই ওঁরা ধরে নেন, হাঙরে লাশটা খেয়ে ফেলেছে।

জ্যোৎস্না বলল,—আমি একবছর আছি হায়েনায়। তার মধ্যে প্রায় ছ সাতজন পর্যটকের রাতে বেড়াতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়ার কথা শুনেছি।

মারিয়া বললেন,—ফাদার গ্রিনকট তাদের হার্ট ওষুধপত্র দিয়ে জিয়েই রাখে। তারপর দেখেছি, কারা এসে সেগুলো কিনে নিয়ে যায়। ওই টাকায় গ্রিনকট তার ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি কিনে আনে।

জ্যোৎস্না বলল,—আপনি চুপিচুপি ওর পেছন ধরলে নিশ্চয় বেরুনোর পথ চিনে রাখতে পারতেন। তারপর সেই পথ দিয়ে ...

বাধা দিয়ে মারিয়া বললেন,—ও ভীষণ ধূর্ত। মিনিহুনরা আমাকে যতই খাতির করুক, ও তাদের ঈশ্বরের মতো। তক্কে তক্কে থাকে। কিন্তু এই যে আমি তোমাদের বাঁচালাম, মিনিহুনরা টের পেলেও গ্রিনকটকে জানাতে পারবে না। কেন জানো? প্রথম কথা, ওরা মানুষের ভাষা বোঝে না। দ্বিতীয় কথা, ওরা হাবেভাবে মানুষের আচরণ টের পেলেও ওদের ওপর যা হুকুম, তার বাইরে কিছু করবে না। ওদের বোঝানো হয়েছে। আমি বা কোনো বন্দী যেন এই পাতালপুরী থেকে না পালাতে পারে। কিংবা ধরো, দৈবাৎ গুহার মধ্যে মানুষ এসে পড়লে তাকে পাকড়াও করে আনতে হবে। অনেক সময় গুহায় সশস্ত্র লোক ঢুকলে গ্রিনকট টের পায়। যেমন আজ কারা ঢুকে গাঁইতি মেরে সুড়ঙ্গের দেয়াল ভাঙছিল, অমনি গ্রিনকট মিনিহুনদের হুকুম দিলে হায়েনার খাঁচা খুলে দিতে। হায়েনারা গিয়ে তাদের খেয়ে ফেলল।

টিহোর ঘটনাটা আগাগোড়া বললাম। তারপর বললাম সিগারেট কেসের কথা।

শুনে মারিয়া চোখের জল মুছে বললেন,—তা হলে এবার শোনো, কীভাবে আমি এখানে ছত্রিশবছর ধরে আটকে রয়েছি।

শুনে মারিয়ার কাহিনি সংক্ষেপে হল এই :

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা হঠাৎ মারকিন পার্লবন্দরে হামলা করে। মারিয়া তখন ওখানে ছিলেন হাসপাতালের নার্স হয়ে। বয়স তখন প্রায় তিরিশ বছর। বিয়ে করেন নি। বাবা-মা থাকেন লস এঞ্জেলসে। পার্লবন্দরে যুদ্ধ বাধলে কার্ল অসবোর্ন, পিটার ওলসন, এবং টিহো

নামে তিনজন পাইলটকে প্যাসিফিক ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ প্রচুর সোনার বাট আমেরিকার ওয়াশিংটন হেডঅফিসে পৌঁছে দিতে বলেন। ওরা ছিল বিমানবাহিনীর ভলান্টিয়ার ফোর্সে। মারিয়ার সঙ্গে ওদের চেনা ছিল। পালিয়ে তখন সবাই প্রাণ বাঁচাচ্ছে। মারিয়া ওদের সঙ্গে ছোট্ট বিমানে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেন।

কাউয়াই দ্বীপের হায়েনাতে পৌঁছে ওরা হঠাৎ প্লেন নামায় একটা পাহাড়ি উপত্যকায়। ওদের মতলব, সোনাটা হাতাবে। মারিয়া কী করবেন? ওদের পাল্লায় পড়েছেন তখন। ওদের কথা না মানলে গুলি করে মারবে। আসলে টিহো নামে পলিনেশীয় পাইলটই ওদের এই কু-মন্ত্রণা দিয়েছিল। ওরা রাত্রিবেলা সোনার বাট চারটে প্যাকেট বয়ে নিয়ে এই খাড়ির কাছে পৌঁছায়। টিহো স্থানীয় লোক বলে এই গুহাগুলোর কথা জানত। ওয়েইকাপালির ভেতর ঢুকে একজায়গায় চারটে প্যাকেট পুঁতে রাখা হয়। তার ওপর দিকে একজায়গায় একটা করচ চিহ্ন খোদাই করে রাখে ওরা।

কিন্তু তারপর সমস্যা দেখা দেয়। ওপর থেকে খাড়াই বেয়ে নামা যতটা সোজা হয়েছিল ওঠা ততটাই কঠিন। মারিয়ার পক্ষে ওঠা তো অসম্ভব। কারণ তাঁর পাহাড়ে চড়ার ট্রেনিং নেই। ওরা তিনজনে উঠে যায় একে একে। কিন্তু মারিয়া অনেক চেষ্টা করেও পারেননি। যতবার ওঠেন, গড়াতে-গড়াতে এসে নীচের চাতালে পড়েন। প্রচণ্ডভাবে আহত হন। তখন ওপর থেকে ওরা আশ্বাস দিয়ে বলে, শিগগির নৌকা নিয়ে আসবে। মারিয়াকে নিয়ে যাবে।

আর আসেনি ওরা। কী হয়েছিল, মারিয়া জানেন না। গুহার ধারে জখম অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে যান। তারপর যখন জ্ঞান হয়, দেখেন একটা পাদরীর পোশাকপরা লোক তাঁর শুশ্রূষা করছে। ফাদার গ্রিনকট তার নাম। কিন্তু তখনও টের পাননি মারিয়া, কে এই ফাদার গ্রিনকট।

ছত্রিশ বছর ফাদার গ্রিনকটের কাছে বন্দীর মতো জীবন কাটাচ্ছেন মারিয়া। এ ছত্রিশ বছরে কয়েকশ মানুষের বুক চিরে হৃৎপিণ্ড বের করার কাজ তাঁকে দিয়েই করিয়েছে শয়তান গ্রিনকট। কিন্তু সজ্ঞানে নয়—অগ্নিদেবী পিলির পোশাক পরিয়ে সেইরকম সাজিয়ে তাঁকে গ্রিনকট একটা ওষুধ খাইয়ে দেয়। তখন নেশার ঘোরে জ্যান্ত মানুষের বুক চিরে হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলেন হতভাগিনী মারিয়া। বুঝতে পারেন না কী সাংঘাতিক পাপ করছেন।

নেশা চলে গেলে যখন সব টের পান, নির্জনে হুহু করে কাঁদেন। অনুতাপ করেন।

আজ যখন জ্যোৎস্নাকে ধরে আনল মিনিহুনরা, জ্যোৎস্নার মুখের দিকে তাকিয়ে খুব মায়া হয়েছিল মারিয়ার। চালাকি করে ওষুধ মেশানো পানীয়টা নিজের হাতে খাওয়ার ভান করে জামার ভেতর ঢেলে ফেলেছিলেন।

আমাকেও যখন ধরে আনে, তখন ঠিক তাই করেছিলেন। নইলে জ্যোৎস্না ও আমি 'হৃদয়হীন' মড়া হয়ে হায়েনাদের পেটে চলে যেতাম। ...

পালানোর চেষ্টা

মারিয়ার সঙ্গে জ্যোৎস্না ঠাকমা সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে। কথায় কথায় গ্র্যান্ডমা বলে ডাকছে। ঠাকমার ঘরে আধুনিক যুগের আরামের সবরকম ব্যবস্থা আছে। জ্যোৎস্না দেখলাম ইতিমধ্যে ঘরের ভেতর কোথায় কী আছে, সব জেনে ফেলেছে। সে কফি বানাল নিজের হাতে। ঠাকমাকেও খাওয়াল। ঘড়িতে তখন বিকেল চারটে বেজেছে। জ্যোৎস্না আগেই দুপুরের খাওয়াটা খেয়ে নিয়েছে মারিয়ার সঙ্গে। খেয়ে মারিয়া ফাদার গ্রিনকটের আদেশ পালন করতে গিয়েছিলেন—অর্থাৎ কি না আমার হৃৎপিণ্ড ওপড়াতে।

দু-দুটো পলিনেশীয় কলা খেয়ে আমার তখনও পেট ফুলে রয়েছে। অমন সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল, তাতেও কলা দুটো পেটে হজম হয়নি। কী সাংঘাতিক এসব কলা।

আমরা তাড়াহুড়ো করছি না। কারণ মারিয়া ঠাকমা বলেছেন, গ্রিনকট কারুর হৃদপিণ্ড ওপড়ানোর দিন চব্বিশ ঘণ্টা তার যন্ত্র-ঘরে কাটায়। মিনিহুনের পাল তার সঙ্গে থাকে। কাজেই সামনের রাতটা পর্যন্ত আমরা নিশ্চিন্ত। কিন্তু তার মধ্যেই আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে। ঠাণ্ডা মাথায় খুঁজে বের করতে হবে বাইরে যাওয়ার পথ।

মাঝে মাঝে দমেও যাচ্ছি। ছত্রিশ বছর ধরে মারিয়া যখন বেরুনোর পথ খুঁজে পাননি, তখন মাত্র চৌদ্দ ঘণ্টা সময় হাতে নিয়ে আমরা কি পথটা খুঁজে পাব?

জ্যোৎস্না বলল,—আচ্ছা ঠাকমা। বাইরের লোকেরা হৃৎপিণ্ড কিনতে আসে বললে, তুমি কি লক্ষ করোনি, কোন পথে তারা যায়?

মারিয়া বললেন,—গ্রিনকট তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে। সঙ্গে করে নিয়ে যায়। কিন্তু তখন আমার তাদের ধারে কাছে যাবার উপায় থাকে না। একদল মিনিহুন গ্রিনকটের ঘরের দরজায় পাহারা দেয়। তবে আড়ি পেতে শুনে যা বুঝেছি, মনে হয়েছে যে পূর্বদিকের কোনো একটা হ্রদে তারা মোটরবোট রেখে অপেক্ষা করে। তারপর গ্রিনকট সেখানে হাজির হয়। তাদের চোখ বেঁধে ফেলে মিনিহুনগুলো। ওই অবস্থায় কোনো সুড়ঙ্গপথে এই পাতালপুরীতে নিয়ে আসে।

শুনে লাফিয়ে উঠলাম। ... ঠাকমা! আমি লেকটা দেখেছি। ওই সুড়ঙ্গপথেই আমি ঢুকেছিলাম পাতালপুরীতে।

মারিয়া বললেন,—কিন্তু সেটা খুঁজে বের করতে পারবে কি?

বললাম,—অগ্নিদেবী পিলির মূর্তি যেখানে আছে, সেখানে আমাকে বন্দী করেছিল মিনিহুনরা। মূর্তিটা কোথায় আছে আপনি জানেন?

মারিয়া বললেন,—জানি। কিন্তু মূর্তির ওধারে অজস্র সুড়ঙ্গপথ। আমি সব পথেই বাইরে যাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। বেশির ভাগ সুড়ঙ্গপথই হঠাৎ শেষ হয়েছে। কোনোটার শেষে গভীর গর্ত এবং গর্তে জল ফুঁসছে।

আমি স্মরণ করার চেষ্টা করছিলাম, মূর্তি পর্যন্ত আসার সময় কতবার কোনদিকে বাঁক নিয়েছি। বললাম,—আর দেরি না করে বরং মূর্তিটার কাছে চলুন। আমার মনে পড়েছে, একটা জায়গায় বাঁদিকে ঘুরেছিলাম। বাকিটা সিধে নাক বরাবর এসেছিলাম। চলুন, চেষ্টা করে দেখি।

জ্যোৎস্না বলল,—ঠাকমা। যা নেবার গুছিয়ে একটা পোঁটলা করে নিন।

মারিয়া করুণ হেসে বললেন,—নেবার কিছু নেই। আমার জিনিসপত্র এবং পরিচিতিপত্র আর যা ছিল—সবই সেই প্লেনে রেখে এসেছিলাম।

আমি বললাম,—একটা আলো-টালো থাকলে বড্ড ভালো হত।

মারিয়া বললেন,—পাতালপুরীর যেসব আলো দেখছ, তা ফাদার গ্রিনকটের পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র থেকে অদ্ভুত কৌশলে প্রতিফলিত করা হয়েছে একটুকরো সামুদ্রিক পাথরে। এ পাথর পাতালপুরীর যেখানে রাখবে অদৃশ্য আলো এসে প্রতিফলিত হবে তার ওপর।

জ্যোৎস্না বলল,—লোকটা তাহলে প্রতিভাবান বিজ্ঞানী।

বললাম,—একটুকরো সেই পাথর পেলে ভালো হত তা হলে।

মারিয়া হাসলেন। ... পাতালপুরীর বাইরে কিন্তু পাথরের ওপর প্রতিফলন ঘটবে না। কাজেই আমাদের অন্ধকারেই এগুতে হবে।

আমরা আর দেরি করলাম না। বেরিয়ে পড়লাম। মারিয়া ঠাকমা এ-ঘর ও-ঘর করে অনেক করিডোর পেরিয়ে নিয়ে চললেন। একখানে থমকে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললেন,—সাবধান। সামনে যন্ত্রঘর। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে। কারণ ওটার দেয়ালের ওপরটা কাঁচের। আমাদের দেখতে পাবে ওরা।

আগে মারিয়া, তারপর জ্যোৎস্না শেষে আমি নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিলাম। শেষ প্রান্তে গিয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড কৌতূহল হল, ভেতরে কী ঘটছে দেখে নিতে।

সাবধানে মুখটা তুললাম। ভেতরে উজ্জ্বল আলো দেখলাম। প্রকাণ্ড হলঘরের একদিকে গোল একটা মঞ্চ। মঞ্চে মিনিহুনেরা ভিড় করে বসে আছে। আর মঞ্চটা আস্তে-আস্তে ঘুরছে। ওদের ওপর একটা প্রচণ্ড লাল আলো এসে পড়ছে। ওদের লাল দেখাচ্ছে। ওরা যেন ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে।

সারা ঘরে আজব সব যন্ত্র, বড় বড় কাচের পাত্র। কোনোটাতে বাষ্প উঠছে।

তারপর দেখতে পেলাম ফাদার গ্রিনকটকে।

হলুদ রঙের অদ্ভুদ একটা পোশাক পরা লম্বা চওড়া দৈত্যের মতো এক বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে একটা যন্ত্রের সামনে। চাবি টিপছে আর কী সব বলছে। তার মাথায় হলুদ টুপিও আছে। মুখে সাদা গোঁফ দাড়ি। কিন্তু কী মিঠে অমায়িক মুখের ভাব! হাসি লেগেই আছে।

জ্যোৎস্নার টানে ঝটপট মাথা নামিয়ে সরে গেলাম। কাচের দেয়াল শেষ হলে নীল আলোয় ভরা একটা করিডোর দেখা গেল। করিডোর পেরিয়ে ডাইনে একটা ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকতেই দেখি সেই ঘর—যেখানে আমাকে মিনিহুনরা ডাব ও কলা খাইয়েছিল।

এখনও সেগুলো পড়ে আছে। বুদ্ধি করে কলার কাঁদি দুটো নিলাম। ইশারায় জ্যোৎস্নাকে ডাবের কাঁদিটা নিতে বললাম। মারিয়া ঠাকমা একটু হাসলেন শুধু।

এ ঘর থেকে বেরিয়ে আবার একটা করিডোর। তারপর দরজা খুলতেই দেখি ঘন অন্ধকার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মারিয়া ফিসফিস করে বললেন,—বাইরে থেকে এই দরজাটা খোলা যায় না। কিন্তু ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা যায়।

আমার পকেটে লাইটার আছে। কিন্তু মারিয়া ঠাকমা লাইটার জ্বালতে নিষেধ করলেন। অন্ধকারে অনেকটা পথ গিয়ে তারপর মারিয়া ফিসফিস করে বললেন,—অগ্নিদেবী পিলির মূর্তিটা এখানেই কোথাও আছে।

লাইটার জ্বালালাম। সামনে বেদীর ওপর সেই হিংস্র দেবীমূর্তি। তার চোখ থেকে হিংসা ঠিকরে বেরুচ্ছে যেন। লাইটার নিভিয়ে বললাম,—এবার আমি আগে যাব। ঠাকমা, আপনারা আমার পেছনে আসুন। ...

টিহোর চেলা তুয়া

প্রায় তিনঘণ্টা অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে ঘোরাঘুরি করছি। কিন্তু বেরুবার পথ পাচ্ছি না। ঘড়িতে সাতটা বাজে। বুঝতে পারছি, বাইরে অন্ধকার রাত। তাই কোনো ফাটলে বাইরের আকাশ দেখা গেলেও আমরা চিনতে পারব না—বিশেষ করে আকাশে যদি মেঘ থাকে। তা হলেও কি বারোঘণ্টা আমাদের এখানে কাটানো উচিত হবে? বাইরের পৃথিবীতে আলো ফুটলে কোনো ফাটলে তার আভাস নিশ্চয় পাব। কিন্তু ততক্ষণে শয়তান গ্রিনকট কি চুপ করে বসে থাকবে?

মারিয়া বললেন,—পথ খুঁজে বের না করতে পারলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত। গ্রিনকট খুব নিষ্ঠুর। সে আমাদের ক্ষমা করবে না। তিনজনের হৃৎপিণ্ড নিজেই ওপড়াবে।

জ্যোৎস্না বলল,—এবার আমি চেষ্টা করি। তোমরা আমার পেছনে এসো।

সে সামনে গেল। তারপর পেছনে মারিয়া, শেষে আমি। কয়েক পা গেছি, হঠাৎ আমার ডানহাতের কলার কাঁদিতে হ্যাঁচকা টান পড়ল। থমকে দাঁড়ালাম। কিন্তু আর কিছু ঘটল না। ভাবলাম অন্ধকারে পাথরে ধাক্কা লেগেছিল।

কিন্তু আবার একটু পরে, ফের হ্যাঁচকা টান পড়ল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আরে আরে এ কী!

মারিয়া, জ্যোৎস্না বলে উঠলেন,— কী কী?

কে কলার কাঁদি ধরে টানল যেন। পরপর দুবার।

জ্যোৎস্না বলল,—ভূতে টানছে। অত ভয় যদি, ঠাকমাকে পেছনে যেতে দাও।

রাগ করে বললাম,—ভূতটুত আমি মানিনে। চলো, এবার টান পড়লে দেখছি কী ব্যাপার।

আবার কিছুদূরে যাওয়ার পর ফের সেইরকম হ্যাঁচকা টান। সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিদুটো নামিয়ে রেখে লাইটার জ্বালালাম। জ্যোৎস্না ও মারিয়া থমকে দাঁড়িয়েছে। আলো কমে প্রায় শেষ হয়ে আসছে লাইটারের মাথায়। তবু দেখতে ভুল হল না—আমার পেছনে দাঁড়িয়ে একটা মিনিহুন গপগপ করে কলা গিলছে।

মারিয়া প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন হঠাৎ,—তুয়া! তুয়া!

জ্যোৎস্না বলল,—তুয়া কি ঠাকমা?

মারিয়া কান করলেন না জ্যোৎস্নার কথায়। লাইটারের গ্যাস আর নেই। ঘন অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতর মারিয়ার মিঠে গলা শোনা গেল,—তুয়া। এ্যাদ্দিন তুই কোথায় ছিলি?

তারপর টের পেলাম, মারিয়া মিনিহুনটার দিকে এগোচ্ছেন। বললাম,—ও ঠাকমা। ব্যাটাচ্ছেলে তুয়া তোমার ন্যাওটা নাকি?

মারিয়া বললেন,—হ্যাঁ। বছর তিনেক আগে তুয়াকে নিয়ে আমি পালানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমি ধরা পড়ে যাই। তুয়া পালিয়ে গিয়েছিল। ওর গলায় আমি আমার সরু চেনটা পরিয়ে দিয়েছিলাম। সেটা এখনও আছে দেখছি। জয়ন্ত, কলার কাঁদি দুটো আমাকে দাও। বাছার বড্ড খিদে পেয়েছে। কতদিন খায়নি মনে হচ্ছে।

কাঁদি দুটো অন্ধকারে ঠাহর করে এগিয়ে দিলাম। তারপর বললাম,—ঠাকমা। মনে পড়েছে, টিহোর কাছে যে মিনিহুনটা দেখেছিলাম, তার গলায় এই চেনটাই তাহলে চিকচিক করছিল।

টিহোর কাছে?

হ্যাঁ, ঠাকমা।

জ্যোৎস্না বলল,—তা হলে বোঝা যাচ্ছে টিহো প্রায়ই এসব গুহায় এসে সোনার প্যাকেট খুঁজে বের করার চেষ্টা করত। কোনোভাবে তুয়াকে সে দেখতে পায়। সঙ্গে নিয়ে যায়।

আমি বললাম,—বাকিটা আমিও আঁচ করতে পেরেছি। আজ সকালে ওয়েইকাপালি গুহার ভেতর গ্রিনকটের হায়েনারা যখন টিহো ও তার সঙ্গীদের খেয়ে ফেলে, তখন তুয়া পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত গুহার সুড়ঙ্গে সুড়ঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর কারণ কী ওর?

মারিয়া বললেন,—মনে হচ্ছে, দলে ফিরে যাবার জন্যে কানাচে-কানাচে ঘুরছিল। কিন্তু সাহস পায়নি। আহা, বেচারা আজ সারাদিন না খেয়ে আছে। খাও বাছা, সবগুলো খেয়ে ফেলো। তারপর ডাবের জল খাবে। জোস্না ডামগুলো দাও।

কিছুক্ষণ ধরে তুয়ার খাওয়াদাওয়া হল। তারপর মারিয়া বললেন,—আর ভাবনা নেই। তুয়া আমাদের বাইরে পৌঁছে দেবে। বাছাকে এতটুকুন থেকে আমিই লালনপালন করছি বলতে গেলে। ওর বয়স হল নবছর প্রায়। ফাদার গ্রিনকট ওর বাবা-মাকে নিয়ে উৎকট পরীক্ষা করতে গিয়ে মেরে ফেলেছিল। ওকে আমিই খাইয়ে-দাইয়ে বড় করেছিলাম।

বললাম,—তা যাই বলুন ঠাকমা। আপনার এই শ্রীমান তুয়া বড় নেমকহারাম। টিহো পোষ মেনেছিল কোন আক্কেলে?

মারিয়া বললেন,—প্রাণের দায়ে জয়ন্ত। গ্রিনকটকে মিনিহুনরা বেজায় ভয় করে।

তাই বলে ও আমার ঠ্যাং ধরে টানবে? রাগ দেখিয়ে বললাম,—জানেন? কোকো পাম হোটেলে ব্যাটাচ্ছেলে আমার টেবিলের তলায় লুকিয়ে ছিল। তারপর ঠ্যাং ধরে এমন হ্যাঁচকা টান মেরেছিল যে আমি চিৎপাত একেবারে।

মারিয়া বললেন,—চুপ। আর কথা নয়। বাছা তুয়া। এবার চলো আমরা বাইরে যাই।

খুড়ো-ভাইপোর কীর্তি

শ্রীমান তুয়ার সাহায্যে আমরা প্রাণে বেঁচে ফিরেছি। একটা গোপন পথ আছে কোকো পাম হোটেলের পেছনেই। খাড়ির ধার দিয়ে লম্বা চাতাল চলে গেছে মানিনিহোলা শুকনো গুহার দিকে। টিহো ও পথেই বরাবর গোপনে গুহাগুলোতে গিয়ে সোনা টুঁড়ত। বছর তিনেক আগে তুয়াকে সে না খেয়ে কাহিল অবস্থায় কুড়িয়ে পেয়েছিল একটা গুহার ভেতর। আমরা ফিরেছি সেই গোপনপথে।

হ্যাঁ, কথাটা টিহোর মুখেই জানতে পারলাম। সেকথা বলছি একটু পরে। ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় সে হায়েনার সেন্টপল হাসপাতালে রয়েছে এখন। বাঁচবে কি না বলা কঠিন।

সে রাতে আমরা কোকোপাম হোটেলে পৌঁছে কী তুমুল অভ্যর্থনা পেয়েছি বলার নয়। সারা হায়েনা টাউন আমার ও জ্যোৎস্নার নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়েছিল ববের দৌলতে। কতবার পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন মিলে ওয়েইকাপালির গুহার ভেতর তন্ন তন্ন খুঁজেছে। তারপর পেয়েছে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় টিহোকে। তার সঙ্গীদের তখন ক্ষুধার্ত হায়েনার পাল খেয়ে হজম করে ফেলেছে। টিহো কনটিকির মূর্তির ওপর চড়ে বসেছিল। হায়েনার কামড় খেয়ে তখন তার সারা শরীর রক্তাক্ত।

জনখুড়োর সঙ্গে জুটেছেন আরেক খুড়ো—আংকল ড্রাম ওরফে ঢাকুচাচা। দুজনে মোটরবোটে সহস্র লোকজন নিয়ে ওয়ালিপিলি লেক থেকে সমুদ্র, সমুদ্র থেকে ওয়েইকাপালির খাড়ি পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করেছেন। তারপর হতাশ হয়ে সন্ধ্যায় ফিরে কোকো পাম হোটেলের লাউজে বসে আছেন। এমন সময় আমরা এসে পৌঁছেছি। তাঁদের চেঁচামেচিতে লোক জড়ো হয়েছে। দেখতে দেখতে কোকোপাম হোটেলের সামনে সে এক জনসমুদ্র। মারকিন দেশ বড় হুজুগে। কত সাংবাদিক, টি.ভি-র ক্যামেরা কত প্রশ্ন—হুলস্থূল পড়ে গিয়েছিল। পরদিন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সব কাগজে তো বটেই, আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে সব বড় বড় কাগজে আমাদের ছবিসহ রোমহর্ষক খবর বেরুল টি.ভি-তে সবাই আমাদের দেখল।

মারিয়া ঠাকমাকে পরদিন লসএঞ্জেলস, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশকের লোকেরা টেলিফোনে সাধাসাধি শুরু করল—তাঁর ছত্রিশ বছরের গুহাজীবন আর ফাদার গ্রিনকটের কাহিনি নিয়ে তারা বই করতে চায়। লক্ষ লক্ষ ডলারের প্রস্তাব আসছিল। শেষে ঠাকমা হ্যাত্তেরি বলে সবাইকে না করে দিলেন। বই লিখতে হলে নিজেই সময়মতো লিখবেন। এখন তাঁর মাথায় ঘরে ফেরার চিন্তা।

রাতে কলকাতায় আমার গুরুদেব কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে ট্রাংকল করার চেষ্টা করেছিলাম। লাইন পাইনি। সকালে চেষ্টা করতেই লাইন পেয়ে গেলাম।

গম্ভীর গলায় সাড়া এল। জয়ন্ত নাকি? রাতদুপুরে ঘুম ভাঙালে কেন? আবার মিনিহুন নাকি?

রাতদুপুর কী বলছেন? এখন তো সকাল।

ডার্লিং! তোমার সময়জ্ঞানের গণ্ডগোল আছে বরাবর। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে যে সূর্যকে দেখতে পাচ্ছ, কলকাতায় আসতে তার এখনও প্রায় ঘণ্টা ন'য়েক দেরি আছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাও তো বটে। যাক্‌ গে, শুনুন। ভারি রোমহর্ষক ব্যাপার। আমি ... তার চেয়ে রোমহর্ষক ব্যাপার ঘটেছে আমার ঘরে। অ্যারিজোনার সেই ক্যাকটাসটার ফুলের ভেতর একটা নীল পরাগ থেকে অপূর্ব গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং ইতিমধ্যে পাড়া জুড়ে প্রশ্ন উঠেছে, এ কীসের গন্ধ?

রাগ করে বললাম,—আমি মরতে মরতে বেঁচে ফিরেছি জানেন? গুহার ভেতরে এক শয়তান—তার নাম ফাদার গ্রিনকট, আমার হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে নিয়েছিল প্রায়। তারপর ...

কী নাম বললে?

ফাদার গ্রিনকট।

তাই বলো! জীববিজ্ঞানী ফাদার গ্রিনকট!

অবাক হয়ে বললাম,—আপনি চেনেন নাকি?

নাম শুনেছিলাম একসময়। বাঁদরকে মানুষ আর মানুষকে বাঁদরে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই মার্কিন জীববিজ্ঞানীকে জার্মানরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর আর তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

তা হলে শুনুন, এখন তিন হায়েনার ভূতুড়ে গুহাগুলোর ভেতর একটা পাতালপুরীতে বহাল তবিয়তে বাস করছেন। মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে তার হৃদ্‌পিণ্ড উপড়ে চালান দিচ্ছেন প্রাইভেট ক্লিনিকে।

হুম্‌। তা হলে ওটাই আদিম পলিনেশীয় রাজা হোলাহুয়ার গোপন প্রাসাদ?

এবার তা হলে বাকিটা শুনুন।

সব শোনা যাবে না ডার্লিং! লাইন কেটে যাবে। তুমি বেঁচে-বর্তে ফিরেছ শুনে খুশি হলাম। আচ্ছা, ছাড়ছি। ঘুম পাচ্ছে।

কর্নেল ফোন রেখে দিলেন। রাগ হল। কিন্তু কী করা যাবে? হাজার হাজার মাইল দূরের লোককে রাগ দেখানোর উপায় আপাতত নেই। আসলে, গোয়েন্দাপ্রবরকে ক্যাকটাস পাঠানোই ভুল হয়েছে। ওই নিয়ে বুঁদ হয়ে আছেন আজকাল। পৃথিবীর সব মানুষ খুন হয়ে গেলেও তাকিয়ে দেখবেন না। বড় বিদঘুটে স্বভাব বুড়োর।

বব এসে বলল,—খুড়োকে নিয়ে মহা ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি।

কী ঝামেলা?

হায়েনার পুলিশকর্তা গ্যাঙ্গলারকে তাড়িয়েছেন। ফের হানা দিতে গেলেন পাতালপুরীতে। সঙ্গে রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ আর কয়েকটা ডিনামাইট। মনে হচ্ছে গোটা এলাকাটা উড়িয়ে দেবে ওরা। ফাদার গ্রিনকটকে আর বাঁচানো যাবে না।

বাঁচিয়ে লাভ কী ব্যাটাচ্ছেলেকে? আমার হৃৎপিণ্ড ওপড়ানোর হুকুম দিয়েছিল মারিয়া ঠাকমাকে।

বব ফিক করে হেসে বলল,—ভালোই তো। কোনো কোটিপতির বুকে স্থান পেত তোমার হৃৎপিণ্ড। হয়তো তার বুকটা তোমর চেয়ে অনেক চওড়া। তা ছাড়া ...

বাধা দিয়ে বললাম,—নিজের হৃৎপিণ্ডটা দান করে এসো না।

দৈবাৎ মারা পড়লে তাতে আপত্তি করব না। বব আমার হাত ধরে টেনে বলল। যাক্‌ গে, চলো—ঠাকমাকে নিয়ে টিহোর কাছে যেতে হবে। জোসনাকে ফোনে বলেছি, সেন্ট পল হাসপাতালে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।

হোটেলের ম্যানেজার খাতির করছেন খুব। নিজের গাড়ি করে হাসপাতালে পৌঁছে দিলেন আমাদের। তুয়া মারিয়া ঠাকমার কোলে চড়েছে তো আর তার নামবার নাম করে না। হাসপাতালে তাকে দেখতে ভিড় জমে গেল। কোনোরকমে ভিড় ঠেলে আমরা টিহোর কেবিনে ঢুকলাম।

সারা গায়ে ও মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে টিহো শুয়েছিল। তুয়া তার দিকে পিটিপিটি চোখে তাকিয়ে বলল,—হুঁ হুঁ হুঁ উঁয়া উঁয়া।

টিহো অতিকষ্টে একটু হাসল। তারপর মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মারিয়া বললেন,—কী টিহো! চিনতে পারছ না আমাকে? পাপের শাস্তি পেয়েছ, এতেই আমার আনন্দ হচ্ছে। ওঃ তোমরা এত বিশ্বাসঘাতক! আমাকে ছত্রিশ বছর গুহার ভেতর ফেলে রেখেছিলে! এবার মনে পড়েছে, আমি কে?

মারিয়ার চোখে জল। টিহো আস্তে বলল,—চিনেছি। তুমি মারিয়া। আমাকে ক্ষমা করো মারিয়া।

ক্ষমা? মারিয়া ক্ষুব্ধভাবে বললেন। অসবোর্ন আর ওলসন তাদের পাপের শাস্তি পেয়েছে। তুমিও পেয়েছ। তবু তোমাদের ক্ষমা করব না। আমার জীবনটা তোমরা নষ্ট করে দিয়েছ!

টিহো বলল,—কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। তবু বলছি সব। শোনো মারিয়া, আমাদের কোনো দোষ ছিল না। কী হয়েছিল, সব বলছি শোনো।

টিহো যে কাহিনি বলল,—তা এই :

মারিয়াকে উদ্ধারের ইচ্ছা তাদের ছিল। প্লেন থেকে হুক আর দড়ি আনতে গিয়েছিল তারা। কিন্তু তখন যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থা চলছে। ওখানে প্লেন দেখতে পেয়ে একদল সৈন্যের টনক নড়ে। প্লেনটা ঘিরে তারা পরীক্ষা করতে থাকে। এমন সময় এরা তিনজনে সেখানে যেতেই তাদের খপ্পরে পড়ে। কোনো কৈফিয়ত তারা বিশ্বাস করে না। টিহোদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তারপর পার্লহারবার থেকে খোঁজ নিলে তাঁদের কীর্তি ফাঁস হয়ে যায়। সোনা নিয়ে যাবার কথা কোথায়—আর কোথায় তারা প্লেন নামিয়ে বসে আছে এবং সোনার চিহ্নমাত্র নেই। কোর্ট মার্শালে তিনজনের একবছর করে জেল হয়। পাছে সোনার হদিস কর্তৃপক্ষ পেয়ে যান, তাই মারিয়ার কথা ওরা বলেনি।

এক বছর পরে টিহো জেল থেকে বেরিয়ে অসবোর্ন ও ওলসনের খোঁজ করে। টিহো ছিল এই হায়েনার জেলে। ওরা দুজন ছিল লস এঞ্জেলসের জেলে। সেখানে গিয়ে টিহো জানতে পারে, অসবোর্ন জেল থেকে পালানোর সময় রক্ষীর গুলিতে মারা পড়েছে। আর ওলসন মারা পড়েছে ক্যান্সারে। জেলকর্তৃপক্ষকে ওলসন মরার আগে বলে গেছে, তার বন্ধু কাউয়াই দ্বীপের রাজবংশধর টিহোকে যেন এই সিগারেটকেসটা পৌঁছে দেওয়া হয়। সিগারেট কেসে লুকানো সোনার সঠিক জায়গা নির্দেশ করা ছিল।

টিহো একা গুহার ভেতর ঢুকতে সাহস পায়নি। পলিনেশীয়দের কুসংস্কার তার মধ্যে ছিল। তাই সে একজন সঙ্গী খুঁজছিল। যুদ্ধের সময় আরেক পাইলটের সঙ্গে তার বন্ধুতা ছিল। তার নাম ফর্স্টার। তাকে সে বিশ্বাস করে সোনার কথা বলে। দুজনে গুহায় ঢুকে সোনার প্যাকেটগুলো আনার পরিকল্পনা করে। কিন্তু লোভী ফর্স্টার রাতারাতি সিগারেটকেসটা চুরি করে কেটে পড়ে। ওতে পলিনেশীয়ার আদিম ভাষায় সঠিক জায়গার হদিস লেখা আছে। ওই হদিস না পেলে টিহোরপক্ষেও সোনা খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। টিহোর বোকামি হয়েছিল, যদি একটা কপি রাখত লেখাগুলোর তাহলে সোনাটা খুঁজে বের করতে পারত—আরও কাউকে সঙ্গে নিত বরং। একা সে কিছুতেই তার পূর্বপুরুষের পাতালপুরীতে ঢুকে অভিশাপের পাল্লায় পড়তে রাজি নয়।

টিহো বুঝতে পারে না, ফর্স্টারের কাছে যে সিগারেটকেস ছিল—তা কেমন করে সুদূর পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের মাঠে মাটির তলায় গেল। সে আমার দিকে তাকিয়ে সেই প্রশ্নটা করল।

আমি বললাম,—আমার ধারণা—ফর্স্টার ভেবেছিল, সুযোগমতো একা গিয়ে সোনা উদ্ধার করবে। সেই সময় তাকে ভারতে পাঠানো হয়। তার প্লেন দৈবাৎ ভেঙে পড়েছিল আমাদের গ্রামের সেই সামরিক বিমান ঘাঁটিতে।

টিহো বলল,—এতকাল পরে আপনার হাতে একটা সিগারেটকেস দেখলাম —তাতে আমাদের পবিত্র রাজবংশের চিহ্ন! অমনি টের পেলাম, তা হলে এই সেই সিগারেটকেস! কিন্তু ওটা চুরি করে দেখি, ভেতরে অনেক লেখা অস্পষ্ট এবং মুছে গেছে। কাজেই ওটা পেয়েও খুব একটা সুবিধে হল না। তবু ভাবলাম, যেটুকু পড়া যাচ্ছে—তারই সূত্র ধরে খুঁজলে যদি সোনাটা পাই! কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য! কোথায় লুকিয়ে ছিল হিংস্র হায়েনার পাল। তারা আমাদের আক্রমণ করল।

অনেকক্ষণ কথা বলে টিহো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ডাক্তার এসে আমাদের বললেন,—আর নয়। আপনারা এবার আসুন। এভাবে কথা বললে ওকে বাঁচানো যাবে না।

আমরা বেরিয়ে এলাম। বব বলল,—ঠাকমাকে হোটেলে রেখে চলো আমার জনখুড়োর অবস্থা কী হল দেখি। ...

ফাদার গ্রিনকট বনাম আংকল ড্রাম

ওয়েইকাপালি গুহার সামনে গিয়ে দেখি যেন যুদ্ধের ঘাঁটি। চারদিকে খাড়ির মাথায় হাজার-হাজার লোক দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছে। পাথরে ম্যাপ বিছিয়ে জনখুড়ো, পুলিশকর্তা গ্যাঙ্গলার এবং আরও সব অফিসার তখনও জল্পনা করছেন। আমাদের সেখানে যাওয়ার বাধা ছিল না। কারণ আমরাই তো এই কাণ্ডের মূলে। উঁকি মেরে ম্যাপ দেখে জ্যোৎস্না বলল,—দেখছ জয়ন্তদা? ওয়েইকাপালি, ওয়াইকানালে আর মানিনিহোলা—এই তিনটে গুহার মধ্যে কেমন যোগাযোগ রয়েছে। এটা মিলিটারি ম্যাপ মনে হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, যাঁরা গুহার ভেতর সার্ভে করে ম্যাপ এঁকেছেন, তার রাজা হোলাহুয়ার পাতালপুরীর হদিস পাননি! অথচ দেখে, কনটিকি এবং পিলির মূর্তি কোথায়, তাও ম্যাপে চিহ্ন দিয়ে বলা হয়েছে।

বব হঠাৎ লাফিয়ে উঠল—ইউরেকা।

পুলিশকর্তা গ্যাঙ্গলার হাঁড়িপানা মুখ করে বললেন,—কী হে ছোকরা? লাফাচ্ছ কেন?

বব বলল,—তুয়া! তুয়াকে আনলেই তো সে পাতালপুরীতে নিয়ে যেতে পারে।

তুয়া! সেটা আবার কী বস্তু? গ্যাঙ্গলার ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন।

জ্যোৎস্না বলল,—মিনিহুন। মারিয়া ঠাকমার মিনিহুনটার নাম তুয়া। তুয়াই তো আমাদের গাইড।

জনখুড়ো সোজা হয়ে বললেন,—মাই গড! এটা আমরা কেউ এতক্ষণ খেয়াল করিনি বব! শিগগির! ম্যাডাম মারিয়াকে গিয়ে বলো, এক্ষুনি ওঁর পোষা প্রাণীটিকে নিয়ে যেন চলে আসেন।

বব বলল,—তা যাচ্ছি। কিন্তু খুড়ো মশাই, তুয়াকে প্রাণী বলা কি ঠিক হচ্ছে?

জন ধমক দিয়ে বললেন,—সবটাতে তর্ক করা চাই! প্রাণী না তো কী? মিনিহুন আসলে অধুনালুপ্ত পলিনেশীয় বাঁদর। তবে তারা বুদ্ধিমান বাঁদর।

জ্যোৎস্না বলল,—অধুনালুপ্ত বলছেন কেন খুড়োমশাই? ফাদার গ্রিনকটের দেখা পেলে দেখবেন অসংখ্য মিনিহুন এখনও বেঁচে আছে পাতালপুরীতে।

বব পুলিশের মোটরবোটে চলে গেল। আমরা ওর ফিরে আসার পথে তাকিয়ে রইলাম। ইতিমধ্যে এসে গেল খবর শিকারী সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার আর টি.ভি. ক্যামেরা নিয়ে একদঙ্গল লোক। মারকিন মুল্লুকে এদের প্রচুর স্বাধীনতা। পুলিশকে গ্রাহ্যও করে না। বরং পুলিশ জানে, এই সুযোগে তাদের নাম যেমন ছড়াবে, তেমনি টি.ভি-তে ঘরে ঘরে তাদের ছবিও লোকে দেখবে।

জনখুড়ো তাদের উদ্দেশে ঘোষণা করলেন,—বন্ধুগণ! আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমাদের 'পাতালপুরী অপারেশন' শুরু হয়ে যাবে। এই পাতালপুরীতে আছেন এক ধুরন্ধর

জীববিজ্ঞানী—তাঁর নাম ফাদার গ্রিনকট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইনি বানরকে মানুষ এবং মানুষকে বানর করা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান। শোনা যায়, হিটলারের হুকুমে তাঁকে জার্মান গুপ্তচরেরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল, পৃথিবীর সব মানুষকে বানর করে ছাড়বেন।

সবাই হেসে উঠল। জনখুড়োর সামনে গোটা পাঁচেক টিভি ক্যামেরার চোখ—এদিকে অনবরত ক্লিক-ক্লিক করে শাটার চলেছে কাগজের ফোটোগ্রাফারের। রিপোর্টাররা নোট করে যাচ্ছে কথাগুলো। আমিও কলকাতার প্রখ্যাত দৈনিক সত্যসেবকের রিপোর্টার। কিন্তু এদের আদিখ্যেতা দেখে হাসি পাচ্ছিল।

কতক্ষণ পরে বব ফিরে এল মারিয়া আর তুয়াকে নিয়ে তারপর 'অপারেশন' শুরু হল।

ওয়েইকাপালি গুহার ভেতর উজ্জ্বল আলো ফেলে সামনের সারিতে চলেছেন মারিয়া ও তুয়া, পেছনে সশস্ত্র পুলিশ হাতে সাবমেশিন গান, স্টেনগান, টমিমান, এমন কী কারুর হাতে গ্রেনেডও। তাদের পেছনে জনখুড়ো, আমি, বব ও জ্যোৎস্না। আমাদের পেছনে টি.ভি-র ক্যামেরা।

কনটিকির মূর্তি পেরিয়ে তুয়া বাঁয়ে ঘুরল। বাঁদিকে একটা সরু ফাটল। ফাটলে হাত ভরে সে একটা কিছু টানল। অমনি এবড়ো-খেবড়ো দেয়ালের খানিকটা অংশ ঘুরে গেল এবং ভেতরে এমনি চওড়া গুহাপথ দেখা গেল।

প্রায় আধঘণ্টা ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে একখানে তুয়া ফের তেমনি একটা সরু ফাটলে হাত ভরে কী টানল। এখানেও দরজার মতো ফাঁক হয়ে গেল দেয়াল।

ভেতরে মসৃণ বারান্দার মতো চওড়া খানিকটা জায়গা। তার সামনে কারুকার্যখচিত সুন্দর দরজা। তুয়া দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। তীব্র মিঠে গন্ধ ভেসে এল। পাতালপুরীতে ঢুকলাম আমরা।

কিন্তু এখনও কোথাও আলো জ্বলছে না।

এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে তুয়া যেখানে নিয়ে এল, দেখেই চিনতে পারলাম। সেই যন্ত্রঘর। কাচের দেয়াল। কিন্তু কোথায় ফাদার গ্রিনকট? কোথায় তার মিনিহুনের দল? কোথায় বা সেইসব হিংস্র হায়েনার পাল?

রাজা হোলাহোয়ার পাতাপৈুরী স্তব্ধ নির্জন। যন্ত্রঘরে যন্ত্রগুলো আছে। কিন্তু বড়-বড় কাঁচের পাত্র থেকে বাষ্প উঠছে না। কোনো আলোও জ্বলছে না। তারপর তুয়ার আর্তনাদ শুনতে পেলাম। তুয়া সেই গোলাকার মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে বোবা মানুষের মতো গলার ভেতর শব্দ করছে—কান্নার মতো শব্দ।

মঞ্চে একটা কালো ছাইয়ের বিরাট স্তূপ দেখা যাচ্ছে। মারিয়া চেঁচিয়ে উঠলেন, সর্বনাশ। শয়তানটা ওদের পারমাণবিক আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

জন বললেন,—কাদের? মিনিহুনদের?

মারিয়া কান্নাজড়ানো গলায় বললেন,—হ্যাঁ। শয়তান গ্রিনকট ওদের পুড়িয়ে মেরে পালিয়েছে! তুয়া! তুয়া! কোথায় গেল গ্রিনকট, খুঁজে বের করতেই হবে তোকে। প্রতিশোধ নিতে হবে বাছা!

তুয়া অমনি চলতে শুরু করল। তাকে অনুসরণ করলাম আমরা। হায়েনার খাঁচার পাশ দিয়ে যাবার সময় একই দৃশ্য দেখলাম। পলিনেশীয় এক বিচিত্র প্রজাতির হায়েনাদেরও সে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। একি জীববিজ্ঞানীর প্রতিহিংসা?

এবার অগ্নিদেবী পিলির মূর্তি সামনে পড়ল। তার ডাইনে সরু একটা গুহাপথ দিয়ে এগিয়ে বাইরের রোদ্দুর দেখা গেল।

তুয়া একটা ফাটল বেয়ে নামতে শুরু করল।

পিঁপড়ের সার যেমন করে নামে, তেমনি করে আমরা, পুলিশ-বাহিনী, সাংবাদিকরা, টিভির লোকেরা। নেমে গিয়ে মোটামুটি একটা সমতল বিশাল চাতালমতো জায়গায় পৌঁছিলাম।

হঠাৎ জ্যোৎস্না চেঁচিয়ে উঠল,—ও কী! বাবার সঙ্গে গ্রিনকট মারামারি করছে যে।

চাতালের আন্দাজ কুড়ি ফুট নীচে হ্রদের ধারে খানিকটা জায়গায় বালির বিচ। তার ওপর দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড বিক্রমে লড়ে যাচ্ছেন আংকল ড্রাম এবং ফাদার গ্রিনকট। জ্যোৎস্না লাফ দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে ধরে আটকালাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে তুয়া ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে গ্রিনকটের ওপর।

ঢাকুচাচা ওপর দিকে তাকিয়ে আমাদের দেখে বিরাট হাসি হাসলেন। ঢাকের মতো গমগম করে বললে,—হুমুন্দিরে ধরছিলাম। এ বান্দরটা না আইলে অরে ডুবাইয়া ছাড়তাম ঠাণ্ডা পানিতে। হঃ! আমার নাম ঢাকু মিয়া! আমারে চেনে নাই হুমুন্দির পোলা।

হাসবো কী, তুয়া যা করল, দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

সে সরু লিকলিকে হাতে গ্রিনকটের গলা টিপে ধরে হ্যাঁচকা টানে ছুড়ে ফেলল হ্রদের জলে। তারপর জলের ভেতর হুলস্থূল শুরু হয়ে গেল। একবারের জন্য ফাদার গ্রিনকটের পা দুটো দেখা গেল। তারপর তলিয়ে গেল চিরকালের মতো।

ঢাকুচাচা দেখতে-দেখতে বললেন,—হাঙরের পাল হুমুন্দিরে লইয়া গেল। যাউক! ...

পদ্মার ইলিশ

পলিনেশীয় রাজা হোলাহুয়ার পাতালপুরী এতদিনে আবিষ্কৃত হয়েছে। হায়েনাটাউনে এবার পর্যটকদের ভিড় বেড়ে যাবে। ওদিকে জনখুড়ো দ্বিতীয় দফা অভিযান চালিয়ে সোনাগুলো উদ্ধার করেছেন। সরকারি কোষাগারে সেটা জমা পড়েছে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের দাবি, ওই সোনার দামে দ্বীপগুলোকে স্বর্গ বানাতে হবে। মারিয়া তুয়াকে নিয়ে স্যাক্রামেন্টোতে তাঁর বাড়ি ফিরে গেছেন।

আমি ও বব চাচার রেস্তোরাঁয় ডিনার খাওয়ার নেমন্তন্ন পেয়েছিলাম। জ্যোৎস্না বলল,—বব! তোমার জন্য ঝাল কম দিয়েছি। কিন্তু আমাদের দেশের নদী পদ্মার ইলিশ। একটু ঝাল না হলে ভালো লাগে না।

বব বলল,—আই উইল ট্রাই। তারপর একটু চেখেই 'ও ফাদার গ্রিনকট' বলে আর্তনাদ করল।

চাচা এসে বলল,—কী? পোলাডা চিল্লায় ক্যান? হঃ বুঝছি, গ্রিনকট কইল না? তবে শোনেন।

চাচা তাঁর দেশোয়ালি ভাষায় এবং ববের জন্যে তাঁর নিজস্ব ইংরাজিতে অনুবাদ করে যা বললেন,—তা হল : সবাই যখন সামনের দিকে ফাদার গ্রিনকটকে ধরবে বলে তোড়জোড় করছে তখন উনি পেছনের দিকে ওত পেতে বসাই ঠিক মনে করেছিলেন। মোটর বোট থেকে মানিনিহোলা গুহার খোঁজে ওপরে উঠতে যাচ্ছেন, হঠাৎ ফাদার গ্রিনকট তাঁর সামনে এসে পড়েছেন। হাবভাব দেখে চাচা তখুনি টের পেয়েছেন, এই সেই হুমুন্দি। অমনি জাপটে ধরেছেন তাকে।

বব ঝোল মুছে ইলিশ চুষতে চুষতে বলল,—ফাইন ফিশ। বাট নট বেটার দ্যান সার্ডিন।

চাচা বললেন,—বান্দরটা গ্রিনকটেরে না ধরলে আমি ধরতাম আর করতাম কী জানেন? আষ্টমন লঙ্কা বাঁইটা হেই ঝোলে চুবাইতাম। হঃ।

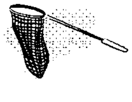

হিটাইট ফলক রহস্য

ব্রোঞ্জের ফলক চুরি

মার্চ মাসের এক ভোরবেলায় টেলিফোনের বিরক্তিকর শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। যথারীতি খাপ্পা হয়ে রিসিভার তুলে বলেছিলুম,—রং নাম্বার।

অমনই আমার কানে পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল,—রাইট নাম্বার ডার্লিং! অপ্রস্তুত হয়ে উঠে বসে বলেছিলুম,—মর্নিং ওল্ড বস! আসলে—

—জানি, জানি। তুমি আটটার আগে ওঠ না। তবে আমি জানি, নাইট ডিউটি থাকলে ভোরে ঘুমন্ত সাংবাদিকদের কানের কাছে কামান গর্জন হলেও তাদের ঘুম ভাঙে না। যাই হোক, বোঝা যাচ্ছে, তোমার নাইট ডিউটি ছিল না।

—কিন্তু ব্যাপারটা কী?

—ব্যাপার না থাকলে এই বৃদ্ধ তোমার কাঁচা ঘুম ভাঙায় না, তা তো তুমি জানো জয়ন্ত!

হাসতে-হাসতে বললুম,—অর্থাৎ আপনার বাড়িতে আমার আজ ব্রেকফাস্টের নেমন্তন্ন। তারপর!

কর্নেল কিছুটা চাপা স্বরে বললেন,—তারপর আমরা জনৈক আলুওয়ালার কাছে যাব।

—কী সর্বনাশ! এবার আলুর গুদামে রহস্যের ইঁদুর ঢুকেছে নাকি?

—জয়ন্ত! হাতে সময় কম। এখনই চলে এসো। ...

ঠিক এইভাবেই মার্চের সেই অদ্ভুত দিনটা শুরু হয়েছিল। অদ্ভুত বলছি, তার কারণ আমি কল্পনাও করিনি, জনৈক আলুওয়ালাসায়েবের পাল্লায় পড়ে একসময় আমাকে—হ্যাঁ, শুধু আমাকেই, কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে নয়, সুদূর কোনো দেশের মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে শুয়ে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে।

তবে না। সে-কথা যথাসময়ে হবে। সেদিনকার কথা দিয়েই এই রোমাঞ্চকর কাহিনি শুরু করা যাক।

কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে ব্রেকফাস্ট করে এবং কফি খেয়ে কর্নেলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলুম। তারপর পৌঁছেছিলুম সত্যি সত্যি জনৈক আলুওয়ালাসায়েবের নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে। অবশ্য তাঁকে আমি এই কাহিনিতে আলুওয়ালা বললেও তাঁর প্রকৃত পদবি আলুওয়াহ্‌লিয়া।

তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর কর্নেল এবং তাঁর মধ্যে যে-সব কথাবার্তা হয়েছিল, এবার তা বলা যাক্। ...

—মোহেনজোদাড়োতে ঘোড়া? অসম্ভব। ওখানে খোঁড়াখুঁড়ি করে এযাবৎ অনেক জন্তুর মূর্তি পাওয়া গেছে, ঘোড়ার কোনো চিহ্নই মেলেনি। এর একটাই মানে দাঁড়ায়। ওখানকার লোকেরা ঘোড়া নামে কোনো জন্তুর কথা জানত না। আর শুধু ওখানে কেন, হরাপ্পা, চানহুদড়ো, কালিবঙ্গান থেকে শুরু করে, যেখানে-যেখানে সিন্ধু সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গেছে, কোথাও ঘোড়ার মূর্তি দেখা যায়নি।

—আচ্ছা ডঃ আলুওয়ালা, মোহেনজোদাড়োর ধ্বংসাবশেষ তো বাঙালি পুরাতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আবিষ্কার করেছিলেন। তাই না?

—হ্যাঁ। ১৯২১ সালে তিনিই সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা থেকে মাইল বিশেক দূরে একটা বৌদ্ধ স্তূপ দেখতে পান। সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি করার সময় টের পান, একটা শহরের ধ্বংসাবশেষ মাটির তলায় লুকিয়ে আছে। এর প্রায় একশ বছর আগে ওখান থেকে চারশ মাইল দূরে হরাপ্পার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল। তবে যাকে বলে বিজ্ঞানসম্মত খনন, তা শুরু হয় ১৯২১ সালে। তারপর ...

—একটা কথা জিজ্ঞেস করি ডঃ আলুওয়ালা। আপনার বাবা ওই সময় লারকানায় স্টেশন মাস্টার ছিলেন। তাই না?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কীভাবে জানলেন?

—আপনার লেখা একটা প্রবন্ধ পড়ে। চমৎকার প্রবন্ধ।

—বাঃ। আপনার দেখছি পুরাতত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকা পড়ারও নেশা আছে।

—আমি সবই পড়ি, ডঃ আলুওয়ালা। সত্যি বলতে কী, আপনার ওই প্রবন্ধ পড়েই আপনার সঙ্গে যোগাযোগের লোভ সামলাতে পারিনি।

—হাঃ হাঃ হাঃ! এতক্ষণে বুঝলুম, কেন আমার কাছে এসেছেন। বাঁচালেন মশাই। এতক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা বলছি বটে, কিন্তু মনের মধ্যে অস্বস্তি হচ্ছিল প্রচণ্ড রকমের।

—সে কী! কেন, কেন?

—আপনার কার্ডটা দেখে। ওতে লেখা আছে: কর্নেল নীলাদ্রি সরকার, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার। অর্থাৎ কিনা শখের গোয়েন্দা। দেখেই আমি চমকে উঠেছিলুম। আমার কাছে এই সাতসকালে গোয়েন্দা কেন রে বাবা? আমি নেহাত অধ্যাপক মানুষ। হাঃ হাঃ হাঃ! তার ওপর আপনার সঙ্গী ভদ্রলোক আবার খবরের কাগজের লোক। বলুন, অস্বস্তি হয় কি না!

এই সময় একটা লোক চা ও স্ন্যাকস্ নিয়ে এল ট্রে বোঝাই করে। ডঃ আলুওয়ালা তার থেকে ট্রে প্রায় কেড়ে নিলেন এবং টেবিলে রেখে সযত্নে কফি তৈরি করতে ব্যস্ত হলেন। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, কর্নেল ডঃ আলুওয়ালার বইঠাসা আলমারিগুলোর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন। অপরাধতত্ত্ব থেকে প্রকৃতিতত্ত্বে এসে পৌঁছেছিলেন ইদানীং। এবার দেখছি পুরাতত্ত্বে ঝুঁকেছেন। হুঁ, এবার তত্ত্ববাগীশ না হয়ে ছাড়বেন না।

—চা নিন, কর্নেল।

কর্নেল হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিয়ে বললেন,—আপনি মোহেনজোদাড়োর একটা ফলকের হরফগুলো নাকি পড়তে পেরেছেন। দয়া করে সেটা যদি একবার দেখান, বাধিত হব।

ডঃ আলুওয়ালা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন,—আপনাকে দেখাতে আপত্তি নেই। কিন্তু জয়ন্তবাবুকে একটা বিশেষ অনুরোধ করব।

বললুম,—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

—দেখুন, জয়ন্তবাবু! সেই ১৯২২ থেকে এ পর্যন্ত দেশবিদেশের বড় বড় পণ্ডিত সিন্ধু সভ্যতার সময় নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামাচ্ছেন। সীলমোহর এবং ফলকের লেখাগুলো পড়তে পারলে হয়তো সঠিক সময় নির্ণয় করা যেত। কেউ বলছেন, এ সভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার সালের, কেউ বলছেন, আরও পরবর্তী যুগের। আজ অব্দি সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। যদিও মাঝে মাঝে কেউ কেউ দাবি করেন যে তিনি লেখাগুলো পড়তে পেরেছেন। আসলে সমস্যা কোথায় জানেন? সম্ভবত যে-ভাষার ওই লিপি, সেই ভাষাই হাজার হাজার বছর আগে লুপ্ত হয়েছে। যাই

হোক, এই সমস্যার একটা সমাধানের পথ আমি খুঁজে পেয়েছিলুম। আপনারা চিত্রলিপির কথা নিশ্চয় জানেন? অতীত যুগে সূর্য বোঝাতে সূর্য আঁকা হত। পাখি বোঝাতে পাখি। মোহেনজোদাড়োর একটা ফলক নিয়ে আমি গবেষণা শুরু করেছিলুম। সেটাতে কয়েকটা চিহ্ন দেখে আমার মনে হয়েছিল, এ নিশ্চয় চিত্রলিপি। চিহ্নগুলোতে ফসলের শীষ, লাঙল, বলদ, শস্যগোলা ইত্যাদির আভাস আছে যেন। এই সূত্র ধরেই ফলকটা আমি অনুবাদ করে ফেলেছি। কিন্তু এখনই হুট করে সেটা প্রচার করতে চাইনে। যদি ভুল প্রমাণিত হয়, উপহাস্যাস্পদ হব। তাই জয়ন্তবাবু খবরের কাগজের লোক বলেই বলছি, ফলকের অনুবাদটা যেন কাগজে ছেপে দেবেন না। আমি পত্রিকার প্রবন্ধে শুধু বলেছি, একটা ফলকের পাঠোদ্ধার করেছি বলে মনে করি। তার বেশি কিছু লিখিনি।

আমি জোরে মাথা দুলিয়ে বললুম,—কক্ষনোও ছেপে দেব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ডঃ আলুওয়ালা। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটাই আমি দৈনিক সত্যসেবকে প্রকাশ করব না। কারণ, আমার মাননীয় বন্ধু কর্নেল আমাকে আগেই সেটা নিষেধ করে দিয়েছেন।

কর্নেল দাড়ি ও টাক পর্যায়ক্রমে চুলকে বললেন,—ঠিক, ঠিক।

ডঃ আলুওয়ালা উঠে গিয়ে একটা স্টিলের আলমারি খুললেন। তারপর একটা ফাইল বের করে আনলেন।

কর্নেল ঝুঁকে পড়লেন কাগজপত্রের দিকে। আমি কিস্যু বুঝলাম না। একগাদা কাগজে নানা বিদ্‌ঘুটে আঁকজোক রয়েছে। তার পাশে নানান উদ্ভুটে শব্দ ইংরাজিতে লেখা।

ডঃ আলুওয়ালা একটা কাগজ তুলে নিয়ে বললেন,—ফলকটায় লেখা আছে কী শুনুন :

'শস্যগোলার অধিকর্তাকে একটি সেরা জাতের বলদ পাঠানো হচ্ছে।'

কর্নেল বললেন,—পাঠাচ্ছেন কে?

—সেকথা ফলকে নেই। মনে হচ্ছে, এটা একটা বাণিজ্য সংক্রান্ত সংবাদ। আজকাল যাকে বলে চালান বা ইনভয়েস।

—ফলকটা কিসের তৈরি? কোথায় আছে ওটা?

—ফলকটা ব্রোঞ্জের। মাপ হচ্ছে সাড়ে তিন ইঞ্চি চওড়া সাত ইঞ্চি লম্বা। ওটা এখন আছে লন্ডনের জাদুঘরে। মোহেনজোদাড়ো এবং হরাপ্পা পাকিস্তানে। তাই পাকিস্তান সরকার ব্রিটিশ সরকারের কাছে ওটা দাবি করছেন। শুনেছি, ফলকটা শিগগির ফেরত দেওয়া হবে।

—আপনি কোত্থেকে ফলকের নকল সংগ্রহ করেছিলেন?

ডঃ আলুওয়ালা হাসলেন। —আমার বরাত বলতে পারেন। বাবা ছিলেন লারকানার স্টেশন মাস্টার। এখন তো লারকানা বিরাট শহর। পাকিস্তানের পরলোকগত প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টোর বাড়ি ওখানে। আমার ছেলেবেলায় লারকানা ছিল অখাদ্য জায়গা। যাই হোক, বাবার একটু-আধটু পুরাতত্ত্বের বাতিক ছিল। স্যার জন মার্শাল ভারতে ব্রিটিশ সরকারের পুরাতত্ত্ব দপ্তরের কর্তা ছিলেন তখন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর অধীনে এক কর্মচারী। রাখালদাসের সঙ্গে বাবার খুব বন্ধুত্ব ছিল। সেই সূত্রে বাবা ওঁরই কাছ থেকে এই ব্রোঞ্জের ফলকের একটা অবিকল নকল জোগাড় করেছিলেন। সেটা এখনও আমার কাছে আছে। দেখাচ্ছি।

বলে ডঃ আলুওয়ালা উঠলেন। ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। এতক্ষণে আমি আবার কর্নেলকে প্রশ্ন করার সুযোগ পেলুম,—হ্যালো ওল্ড বস! ব্যাপারটা কী বলুন তো?

—চুপ, চুপ! আমাকে বস বলে ডেকো না।

—তাহলে কি টিকটিকি বলে ডাকব?

—কিচ্ছু না। স্রেফ কর্নেল বলে ডাকবে।

—বেশ। কর্নেল স্যার, এবার বলুন তো সাতসকালে আমাকে ঘুম থেকে তুলে কেন এই গোরস্থানে নিয়ে এলেন?

—গোরস্থান! ... কর্নেল চাপা হাসলেন : তুমি ঠিকই বলেছ জয়ন্ত। মোহেনজোদাড়ো কথাটার মানে মৃতদেহের স্তূপ।

—এবং এই ডঃ আলুওয়ালা দেখছি সেই গোরস্থানের এক মামদো ভূত!

—ছিঃ ছিঃ! মহাপণ্ডিত মানুষ উনি!

—যাই বলুন, হাজার হাজার বছর আগের ব্যাপার নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান, তাঁরা মামদো ভূত নয়তো কী? বর্তমানেই আমাদের কত রকম সমস্যা! তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে কাজ হত। তা নয়, মোহেনজোদাড়ো!

—উঁহু, মোহেনজোদাড়োর ঘোড়া।

—সে ঘোড়াও তো কত হাজার বছর আগে মরে ভূত হয়ে গেছে। তা ছাড়া এখন ঘোড়ার মূল্য কী? এটা যন্ত্রযুগ। বড়জোর রেস খেলায় বাজি ধরে যারা, তারা ঘোড়া নিয়ে মাথা ঘামায় দেখেছি। আপনি কি ইদানীং রেসুড়ে হয়ে উঠেছেন? ছ্যা ছ্যা!

—জয়ন্ত ডার্লিং! তোমার কথাগুলো কিন্তু ভিন্ন অর্থে সত্যি। আমি সম্প্রতি মোহেনজোদাড়োর ঘোড়া ভূতের পাল্লায় পড়েছি এবং রেসুড়েদের মতো পিছনে বাজিও ধরেছি।

এবার একটু চমকে উঠলুম। কর্নেলের কথার হেঁয়ালি আছে। কিন্তু আর প্রশ্ন করার সুযোগ পেলুম না। ডঃ আলুওয়ালা হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন। একেবারে অন্য রকম চেহারা। হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন,—তাজ্জব কাণ্ড কর্নেল! ফলকটা খুঁজে পেলুম না।

—সে কী!

—শুধু তাই নয়, শোবার ঘরের যে আলমারির লকারে ওটা রেখেছিলুম, তার তালা ভাঙা। আলমারির পাল্লার তালা কিন্তু ঠিক আছে।

—ভারি আশ্চর্য তো!

—অতি আশ্চর্য! গত রাতেও দেখেছি, লকারটা ঠিক আছে। এখন দেখি তালা ভাঙা। কে এমন সাংঘাতিক কাজ করল বুঝতে পারছি না!

—আর কোনো জিনিস চুরি গেছে কি?

—নাঃ। আমার স্ত্রীর গয়নাগাটি এবং কিছু নগদ টাকা ছিল। সব আছে।

—আপনার স্ত্রী কিছু বলতে পারছেন না?

—আমার স্ত্রী গতকাল সকালে বোম্বাই গেছেন মেয়েকে নিয়ে। বাড়িতে আমি একা।

—আপনার চাকর আছে দেখলুম!

—ও! হ্যাঁ! বৈজু আছে বটে। কিন্তু সে তো খুব বিশ্বাসী ছেলে। প্রায় মাস তিনেক হল, তাকে রেখেছি। বুঝতেই পারেন, আজকাল ভালো ঝি চাকর পাওয়া কত সমস্যা।

—বৈজুকে জিজ্ঞেস করলেন কিছু?

—নিশ্চয় করব। বোধ হয়, বাজার করতে গেছে। ফিরে আসুক।

—আপনি দয়া করে বসুন, ডঃ আলুওয়ালা!

কর্নেলের কথায় উনি ধুপ করে বসলেন। উত্তেজনায় তখনও ওঁকে অস্থির দেখাচ্ছে। আমি বললুম,—পুলিশে জানানো উচিত।

কর্নেল বললেন,—অবশ্যই। আচ্ছা ডঃ আলুওয়ালা, ফলকের নকল চুরি করে কার কী লাভ হতে পারে?

ডঃ আলুওয়ালা জবাব দিলেন,—বুঝতে পারছি না। তবে একটা কথা, ওই ফলকটার ছবি কিন্তু এ যাবৎ কোনো বইয়ে দেখিনি। কোথাও কোনো উল্লেখও পাইনি। নেহাত বাবার খেয়াল ছিল, তাই সংগ্রহ করেছিলেন, এবং আমি দেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম।

—লন্ডন মিউজিয়ামে যে আসল ফলকটা আছে, কী ভাবে জানলেন?

—খবরের কাগজে পড়ে। পাকিস্তান সরকার ব্রিটিশ সরকারের কাছে যেসব প্রত্নদ্রব্য দাবি করেছেন, তার মধ্যে ওই ফলকটার উল্লেখ ছিল।

—হুম। কষ্ট করে এবং প্রচুর অর্থ ব্যয়ে লন্ডন যাওয়ার চেয়ে আপনার আলমারি থেকে ওটার নকল বাগানো অনেক সোজা হয়েছে।

ডঃ আলুওয়ালার মনে ধরল কথাটা। সায় দিয়ে বললেন,—ঠিক, ঠিক। কিন্তু ওতে এমন কী আছে কে জানে? চোর ইচ্ছে করলে এই ফাইলটাও হাতাতে পারত। এতেও কাগজে আঁকা অবিকল স্কেচ রয়েছে।

কর্নেল হাসলেন। —কাগজের স্কেচের চেয়ে ব্রোঞ্জের নকল ফলকটাই কাজে লাগবে মনে হয়েছে কারুর। আপনার এই স্কেচ তো নকলস্য নকল। আপনার ড্রইং ক্ষমতায় সম্ভবত আস্থা নেই ভদ্রলোকের।

—ভদ্রলোক! সে ব্যাটা ভদ্রলোক। নচ্ছার চোর কাঁহেকা। এখুনি থানায় জানাচ্ছি।

ডঃ আলুওয়ালা উত্তেজিতভাবে ফোনের কাছে গেলেন। ডায়াল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিরক্ত হয়ে বললেন,—সব সময় এনগেজড্! কলকাতার টেলিফোনকে ভূতে ধরেছে। নাঃ! থানায় গিয়েই সব জানিয়ে আসি। বৈজু আসুক।

এই সময় আমি লক্ষ করলুম কর্নেল টেবিলে রাখা সেই ফাইল থেকে একটুকরো কাগজ তুলে নিয়ে কোটের পকেটে ঢোকালেন। ডঃ আলুওয়ালা টের পেলেন না। আবার ডায়াল করতে ব্যস্ত হয়েছেন। বোঝা যায় থানায় যেতে মন চাইছে না। নেহাত বেঘোরে না পড়লে আজকাল থানায় যেতে কারই বা ইচ্ছে করে!

কিন্তু কর্নেল যা করলেন, তাও যে চুরি! আমি কটমট করে তাকাতেই উনি চোখ টিপে একটু হাসলেন। আমার অস্বস্তি হল। বুড়ো বয়সে কেলেঙ্কারি করবেন যে!

ডঃ আলুওয়ালা আরও কয়েকবার চেষ্টা করার পর থানার লাইন না পেয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। তারপর আমাদের কাছে এসে বিমর্ষভাবে বললেন,—দেখুন তো, কী সর্বনাশ হল।

কর্নেল বললেন,—থানায় গিয়ে জানিয়ে দিন এক্ষুনি। আজ আমরা তাহলে উঠি। অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করলুম আপনার।

—মোটেই না। ভাগ্যিস আপনারা এসেছিলেন, তাই চুরিটা এত শিগগির ধরা পড়ল। নইলে আমি তো ওই আলমারি এখন খুলতুম না। কিছু টেরও পেতুম না।

কর্নেল ও আমি উঠে দাঁড়ালুম। ডঃ আলুওয়ালা এগিয়ে গিয়ে দরজার পর্দা তুলে ধরলেন। ভদ্রলোক অতি সজ্জন ও কেতাদুরস্ত মানুষ।

আমরা তিনতলা থেকে নেমে আসছি, দোতলার মুখে ডঃ আলুওয়ালার চাকর সেই বৈজুর সঙ্গে দেখা হল। তার হাতে বাজারের থলে। সসম্ভ্রমে একপাশে সরে সে আমাদের সেলাম দিল। কর্নেল তাকে কী যেন জিজ্ঞেস করতে ঠোঁট ফাঁক করলেন। করেই বুজিয়ে নিলেন। বৈজু জিজ্ঞাসু চোখে

তাকিয়ে রইল। কর্নেল গট গট করে নেমে গেলেন, আমি বৈজুর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে তাঁকে অনুসরণ করলুম।

রাস্তায় আমার গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। একটু পরে গাড়িতে যেতে যেতে বললুম,—আপনিও ওই চুরিতে জড়িয়ে পড়বেন নেই—তখন আপনার ওপরই সন্দেহ হবে।

কর্নেল চাপা হেসে বললেন,—চোরের ওপর বাটপাড়িতে দোষ নেই, জয়ন্ত।

—তার মানে?

—ডঃ আলুওয়ালার ব্রোঞ্জের ফলকটাও চুরি করা।

—সে কী! উনি যে বললেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ওঁর বাবাকে—

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন,—স্রেফ মিথ্যে। রাখালবাবু সত্যি এক ভদ্রলোককে আসল ফলকের একটা নকল দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ভদ্রলোকের নাম ডঃ পরমেশ্বর ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন একজন নামকরা প্রত্নবিজ্ঞানী। রাখালবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর বাড়ি বর্ধমানের এক গ্রামে। অনেক দিন আগে তিনি মারা গেছেন। তাঁর ছেলে শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। এখন রিটায়ার করেছেন। সম্প্রতি মাস দুই আগে তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে রহস্যজনক চুরি হয়েছে। চোর আর কিচ্ছু নেয়নি—নিয়ে গেছে শুধু একটা ব্রোঞ্জের ফলক।

—কী কাণ্ড! তা হলে ডঃ আলুওয়ালাই কি এই চুরির পেছনে?

—তা আর বলতে! পুরাতাত্ত্বিক পত্রিকা 'দা এনসেন্ট ওয়ার্লড'-এ একটা বিশেষ ফলক প্রসঙ্গে ওঁর লেখা প্রবন্ধ পড়েই আমার সন্দেহ জেগেছিল। তাই আজ ওঁর বাড়ি এসেছিলুম। ইচ্ছে করেই নিজের পরিচয় দিয়েছিলুম। ভদ্রলোক অসম্ভব ধূর্ত।

—কিন্তু ওঁর আলমারি ভেঙে ফলকটা চুরি গেছে! নিশ্চয় ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো।

কর্নেল হো হো করে হাসলেন। —চুরি যায়নি। এক মিথ্যে ঢাকতে আরেক মিথ্যে।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম। সত্যি, এতক্ষণে একটা জটপাকানো রহস্য সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাজা হেহয়ের গুপ্তধন

ইলিয়ট রোডে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে সেদিন দুপুর অব্দি কাটাতে হল আমাকে। কাপের পর কাপ কফি খেলুম এবং অসংখ্য প্রশ্ন করলুম। জবাবে যেটুকু জানলুম, তা আগেই যা জেনেছি তার একচুল বেশি নয়। অর্থাৎ বর্ধমানের এক গ্রামের জনৈক স্কুল শিক্ষক শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ি থেকে ব্রোঞ্জের ফলক চুরি গেছে। শচীনবাবু কবে এসে কর্নেলকে ধরে ছিলেন। কর্নেল কথা দিয়েছিলেন, চেষ্টা করবেন ফলকের হদিস পেতে। মনে হচ্ছে, পেয়েও গেছেন। ব্যস, এটুকুই।

কর্নেল ডঃ আলুওয়ালার আঁকা সেই স্কেচটার দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন। কয়েকবার প্রশ্ন করে যখন জবাব আর পেলুম না, তখন বললুম,—বেলা হয়ে গেছে। আমি উঠি তাহলে।

কর্নেলের ধ্যান ভাঙল একথায়। বললেন,—আচ্ছা, জয়ন্ত! ফলকের স্কেচে এই চিহ্নটা দেখে কী মনে হচ্ছে তোমার? বাঁদিক থেকে পঞ্চম চিহ্নটা।

তারপর স্কেচটা আমার সামনে এগিয়ে ধরলেন।

দেখে নিয়েই বললুম,—হনুমান ওটা। অবশ্য অনুমানের হনুমানও বলতে পারেন।

কর্নেল হেসে উঠলেন। বললেন,—তা হলে ডঃ আলুওয়ালার পাঠোদ্ধারটা দাঁড়াচ্ছে : **শস্য অধিকর্তাকে একটি সেরা জাতের হনুমান পাঠানো হল**। এই তো? বৎস, হনুমান শস্যের যম। অতএব শস্য অধিকর্তার কাছে হনুমান পাঠিয়ে রসিকতা করেছিল কেউ!

—তা ছাড়া আর কী হতে পারে? ডঃ আলুওয়ালা ওটাকে কীভাবে বলদ ভাবলেন কে জানে!

—আচ্ছা জয়ন্ত, ওটাকে ঘোড়া ভাবতে দোষ কী?

—কিন্তু ডঃ আলুওয়ালা তো বললেন, মোহেনজোদাড়োতে ঘোড়ার কোনো মূর্তি পাওয়া যায়নি। বুনো জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি আছে। ঘোড়ার মতো উপকারি গৃহপালিত প্রাণীর মূর্তি কেন থাকবে না? তার মানে ঘোড়ার কথা কেউ জানত না। তাই ঘোড়ার চিহ্নই নেই।

—তা বটে। হরাপ্পাতে কুকুর আর মুরগির মূর্তি পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

—তা হলে বুঝতেই পারছেন, ওটা ঘোড়া নয়, হনুমান!

—হুম! জয়ন্ত তুমি শুনলে খুশি হবে যে ওখানে হনুমানের ছবিও পাওয়া গেছে।

লাফিয়ে উঠে বললুম,—তবে তো আর কথাই নেই। ওটা হনুমান। বাঁদিক থেকে চতুর্থ চিহ্নটা লক্ষ করুন না! হনুমানটার তাড়া খেয়ে একটা লোক পালাচ্ছে। এই লোকটাই শস্যঅধিকর্তা।

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—শাবাশ জয়ন্ত, শাবাশ! প্রত্নতত্ত্ব দফতর তোমাকে যাতে পুরস্কৃত করেন, তার ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু মুশকিল কী হয়েছে জানো? ডঃ পরমেশ্বর ভট্টাচার্যও এই ফলকটার পাঠোদ্ধার করেছেন বলে দাবি করেছিলেন। তাঁর অনুবাদ একেবারে আলাদা। তোমাকে দেখাচ্ছি।

বলে কর্নেল উঠে টেবিলের দেরাজ থেকে একটা কালো জীর্ণ নোট বই বের করে আনলেন। নোট বই খুলে বললেন,—ডঃ ভট্টাচার্যের মতে প্রাচীন যুগের ভারতে প্রচলিত খরোষ্ঠী লিপির মতো সিন্ধুলিপি ডানদিক থেকে পড়তে হবে। সেইভাবে পড়ে উনি কী অনুবাদ করেছেন শোনো :

'... প্রথম চিহ্নের অর্থ : সৌর বৎসরের ষষ্ঠ মাস। সূর্যের চাকার মধ্যে ছটা রেখা থাকায় ওটা হবে ষষ্ঠ মাস। দ্বিতীয় চিহ্নের অর্থ : চন্দ্রের প্রতিপদ। চন্দ্রকলার মধ্যে একটা দাঁড়ি রয়েছে। তৃতীয় চিহ্নের অর্থ : সিন্ধুনদের বাঁকের মধ্যবর্তী ত্রিকোণ ভূমি। চতুর্থ চিহ্নের অর্থ : ঘোড়া। পঞ্চম চিহ্নের অর্থ : মানুষ। ষষ্ঠ চিহ্নের অর্থ : খণ্ডিকৃত কৃষিজমি। সপ্তম চিহ্নের অর্থ : শস্য। অষ্টম চিহ্নের অর্থ : বৃক্ষমূলে প্রোথিত সম্পদ।

কথাগুলি বাক্যের আকারে সাজালে দাঁড়ায় : **বৎসরের ষষ্ঠ মাসে চাঁদের প্রথম তিথিতে এক ব্যক্তি ঘোড়া নিয়ে সিন্ধুনদের বাঁকে ত্রিকোণ শস্যক্ষেত্রের সীমানায় এক বিশাল গাছের তলায় ধনসম্পদ পুঁতে রেখেছিল**। ....

আমি চমকে উঠে বললুম,—গুপ্তধন! গুপ্তধন!

কর্নেল হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—ডঃ ভট্টাচার্যের ডাইরি থেকে পড়ে শোনাচ্ছি। শুনে যাও।

'... রাখালদাসবাবুর সঙ্গে আমার এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। উনি আমার অনুবাদ যথার্থ বলে স্বীকার করেছেন। সিন্ধুনদ এখন মোহেনজোদাড়ো থেকে সামান্য দূরে সরে গেলেও ধ্বংসাবশেষের দু'মাইল দূরে প্রাচীন খাতের চিহ্ন আমরা দুজনেই দেখে এসেছি। অবিকল ওই তৃতীয় চিহ্নের মতো বাঁক দেখেছি। তিনকোণা জমিটার আয়তন আন্দাজ বারো একর। পোড়ো রুক্ষ জমি। ক্ষয়াখর্বুটে গুল্মে ঢাকা। রাখালদাস বলেছেন, প্রত্নদফতরের কর্তা জন মার্শালকে কথাটা বলবেন এবং ওই জায়গায় মাটি খোঁড়ার কাজ শুরু করা হবে।' ...

কর্নেল আবার কয়েকটা পাতা উল্টে গিয়ে পড়তে শুরু করলেন :

'... আমাদের দুর্ভাগ্য। প্রবল বর্ষার জন্য খোঁড়ার কাজ একবছর পিছিয়ে গেল। তা ছাড়া জন মার্শালও বিশেষ উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। রাখালদাস বলেছিলেন তাঁর শরীর ইদানীং ভালো যাচ্ছে না। শীঘ্র কলকাতায় ফিরতে চান। ...

'... রাখালদাস কাল চলে গেলেন দেশে। আমি স্টেশনে তাঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছি। স্টেশন মাস্টার রামচন্দ্র আলুওয়ালার সঙ্গে অনেকক্ষণ আড্ডা দিলাম। কথায় কথায় ঝোঁকের মুখে ওঁকে ব্রোঞ্জের ফলকটার কথা বলে ফেললাম। কাজটা ঠিক হল কিনা কে জানে! ভদ্রলোক কিন্তু পুরাতত্ত্বের ব্যাপারে খুব উৎসাহী। অনেক খোঁজখবর রাখেন। বললেন, সরকারি দফতরের ব্যাপার স্যাপারই এরকম। ওদের বিশ মাসে বছর। বরং আপনি যদি আমার সাহায্য চান, বলুন। মাটি কাটার লোক জোগাড় করে দেব। আমি বললুম ওখানে বেসরকারি লোককে মাটি কাটতে দেওয়া হবে না। আইনে বাধা আছে। তাই শুনে স্টেশনমাস্টার বললেন, তা হলে রাতে লুকিয়ে মাটি খোঁড়ার ব্যবস্থা করা যায়। আমার হাসি পেল। গুপ্তধনের কথা শুনেই ভদ্রলোক লোভে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। বললুম, তা কি সম্ভব? এক রাতের কাজ নয়। কাজেই ধরা পড়ে যাবার চান্স আছে। আমারও চাকরি যাবে মশাই? এতে মিঃ আলুওয়ালা খুব নিরাশ হলেন। ...

'... স্যার জন মার্শালকে কলকাতার অফিসে সব জানিয়ে আবার চিঠি লিখেছিলাম। আজ জবাব এসেছে। উনি এবার স্পষ্ট করে বলেছেন যে আমার পাঠোদ্ধার ভুল। তা ছাড়া ওই বিশেষ চিহ্নটা ঘোড়া নয়। সিন্ধুসভ্যতায় ঘোড়ার কথা অবান্তর। তখন প্রাক-আর্য যুগে ওখানে ঘোড়ার কথা কেউই জানত না। ঘোড়াকে বশ মানানো হয়েছিল মধ্য এশিয়ায়। সে সিন্ধুসভ্যতার যুগের অন্তত দেড় দুই হাজার বছর পরের কথা।

'... হায়! কীভাবে বোঝাব, আমার অনুবাদ যথার্থ। মার্শাল কেন বুঝতে পারছেন না, এমনও তো হতে পারে, তারও আগে তিব্বত বা চীনে ঘোড়াকে বশ মানানো হয়ে থাকবে এবং কোনো দেশত্যাগী অথবা পলাতক রাজপুরুষ ঘোড়ার পিঠে ধনরত্ন নিয়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মোহেনজোদাড়ো শহরে! তিনিই ধনরত্ন ওইভাবে গুপ্তস্থানে পুঁতে রেখেছিলেন এবং সেই সংবাদ প্রাচীন প্রথামতো একটা ব্রোঞ্জের ফলকে খোদাই করেছিলেন—যাতে তাঁর অবর্তমানে কেউ না কেউ ধনরত্নের সদ্‌গতি করতে পারে।

'... এই অনুমানের কারণ আছে। তিব্বতের মঠে এক পুরোনো পুঁথিতে লেখা আছে : মর্ম অর্থাৎ ব্রহ্মবংশোদ্ভূত রাজা হেহয় এক দুর্যোগের রাতে অশ্বসহ এই মঠে আশ্রয় নেন। তাঁর সঙ্গে প্রচুর ধনরত্ন ছিল। বিবেকবান বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা ধনরত্ন ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে চলেন। তাই রাজা হেহয়কে পরামর্শ দেন, স্বরাজ্য ব্রহ্মাবর্তে ফিরে গিয়ে আপসে মিটমাট করুন। তা শুনে রাজা হেহয় ক্রুদ্ধ হয়ে মঠ ত্যাগ করেন।

'... কোথায় গিয়েছিলেন হেহয়? নিশ্চয় মোহেনজোদাড়ো নামে দ্রাবিড় রাজ্যে। আমার ধারণা হেহয় থেকেই হয় কথাটির উদ্ভব। হয় মানে ঘোড়া। পুরাণে হয়গ্রীব অবতারের কথা আছে। সে কি ব্রহ্মাবর্তরাজ হেহয়েরই উপাখ্যান? সম্ভবত রাজ্যে বিদ্রোহের ফলে হেহয়কে উত্তরে পালাতে হয়েছিল। আশ্রয় না পেয়ে সেখান থেকে তিনি কাশ্মীর ঘুরে দক্ষিণ-পশ্চিমে দ্রাবিড় রাজ্যের রাজধানীতে চলে আসেন। কাশ্মীরে একটি গিরিপথের নাম হোহো। ...'

কর্নেল ডাইরিটি বন্ধ করে বললেন,—তাহলে দেখা যাচ্ছে ডঃ আলুওয়ালার ফলকচুরির উদ্দেশ্য সম্ভবত নিছক পুরাতত্ত্ব নয়, গুপ্তধন। পৈতৃক নেশার ব্যাপার।

বললুম,—কিন্তু মোহেনজোদাড়ো তো এখন পাকিস্তানে। আর কি সুবিধে করতে পারবেন ডঃ আলুওয়ালা?

কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেন,—জানি না। তবে সম্প্রতি একটা সুযোগ ওঁর সামনে এসেছে। সিমলাচুক্তি অনুসারে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদের জ্ঞান আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারই ভিত্তিতে খুব শিগগিরি ভারত থেকে একদল পুরাতাত্ত্বিক পাকিস্তানে মোহেনজোদাড়ো এবং হরাপ্পা দেখতে যাচ্ছেন। খবরের কাগজের লোক হয়েও এ খবর রাখ না দেখে অবাক লাগছে বৎস!

বললুম,—রোজ হাজার হাজার খবর বেরোয়। অত মনে থাকে না।

—তা স্বীকার করছি। ... বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। একটু পায়চারি করলেন। তারপর বললেন,—পুরাতাত্ত্বিকদের সঙ্গে একদল সাংবাদিকও যাচ্ছেন শুনেছি। জয়ন্ত, তোমাকে একটা দায়িত্ব দিচ্ছি। তুমি যেভাবে হোক, কর্তৃপক্ষকে রাজি করিয়ে দৈনিক সত্যসেবকের পক্ষ থেকে তোমার নামটা সেই দলে ঢোকাবার ব্যবস্থা করো। আর আমিও চেষ্টা করে দেখি, কোনো ফিকিরে নিজেকে ঢোকাতে পারি।

হাসতে-হাসতে বললুম—খুব সোজা রাস্তা আছে। আপনি তো ইদানীং ন্যাচারালিস্ট বা প্রকৃতিবিজ্ঞানী হয়ে উঠেছেন। দুর্লভ ও বিরলজাতের পাখি প্রজাপতি পোকামাকড় নিয়ে ধানাইপানাই করছেন বিস্তর। বিদেশি কাগজে অনেক প্রবন্ধও লিখে ফেলেছেন। মাকড়সা আর প্রজাপতি সম্পর্কে তো আপনার খুব মাথাব্যথা। কারণ নাকি, দুইয়ের মধ্যে খুনী ও জোচ্চোরদের প্রবৃত্তি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। অতএব হে প্রাজ্ঞ ঘুঘু! আপনার অসুবিধেটা কোথায়? বিশেষ করে কেন্দ্রীয় দফতরে দিল্লিওয়ালারা অনেকেই তো আপনার বন্ধু। আপনি ...

কর্নেল হাত তুলে থামিয়ে হাসতে বললেন,—যথেষ্ট, যথেষ্ট ডার্লিং। তোমার প্রদর্শিত পথেই আমি এগবো। ...

ডঃ আলুওয়ালার অন্তর্ধান

অনেক চেষ্টাচরিত্র করে পাকিস্তানগামী সাংবাদিকদের দলে ঠাঁই পেলুম। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে যখন পৌঁছেছি, তখনও কিন্তু কর্নেলের পাত্তা নেই। বিমান ছাড়তে আর পনেরো মিনিট দেরি। উদ্বিগ্ন হয়ে ঘোরাঘুরি করছি, সেই সময় পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের দলটি এসে পৌঁছলেন। পনেরো জন পণ্ডিত এক জায়গায় জুটলে যা হয়। প্রত্যেকের মুখ গম্ভীর—হাবভাব দেখে ভয় করে আমার। দু-তিনজন বাদে সবার চুল পাকা। জ্ঞানের তাপেই হয়তো টাক পড়েছে অনেকের মাথায়। কিন্তু কোথায় আমার সেই সুপরিচিত টাক? শুধু টাক থাকলেই চলবে না, দাড়িও চাই।

রাশভারি দলটির মধ্যে দাড়িওয়ালা আছেন, টাকওলাও আছেন। কিন্তু একসঙ্গে দাড়ি ও টাক আছে, এমন কাকেও দেখতে পাচ্ছি না।

তা হলে কর্নেল কি দলে ভিড়তে পারেন নি? ভাবনায় পড়ে গেলুম। আমি খামোকা একা গিয়ে করবোটা কী? তা ছাড়া ওইসব গোরস্থান বা ভূতপেরেতের জায়গায় যাওয়া আমার একেবারে পছন্দসই নয়। নেহাত বুড়ো ঘুঘুমশায়ের টানে এত কাণ্ড করে এখানে হাজির হয়েছি।

মাইকে বিমানযাত্রীদের ডাকাডাকি শুরু হল। সেই সময় ঠাহর করে দেখি, ডঃ আলুওয়ালা ভিড় ঠেলে বেরিয়ে কাকে যেন খুঁজছেন। আমার চোখে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়ালেন। তারপর

এগিয়ে এলেন হাসিমুখে,—আরে! জয়ন্তবাবু না? আপনিও কি যাচ্ছেন নাকি ডেলিগেশনের সঙ্গে?

—যাচ্ছি। আপনিও আছেন, তা লিস্টে দেখলুম। ... বলে আমি খুব অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করলুম।

ডঃ আলুওয়ালা মুখে খুশির ভাব ফুটিয়ে বললেন,—যাকগে মশাই। বাঁচা গেল। আমি গোলমাল ভিড় একদম পছন্দ করি নে। তাতে বুঝতেই পারছেন, আজকাল আমি অনেক জ্ঞানীগুণী লোকেরই ঈর্ষার কারণ হয়েছি। তাই একদম ইচ্ছে করছিল না যেতে। সরকারও ছাড়লেন না, আর শেষ অব্দি দেখলুম, যে বিষয়ে সারাজীবন গবেষণা করছি—সেই বিষয়েই তো এই ডেলিগেশন। তবে তার চাইতে বড় কথা বাল্যস্মৃতি। লারকানা এলাকায় আমার ছেলেবেলা কেটেছে। কাজেই মনের টানও বাজল।

আমি মন দিয়ে ওঁর কথা শুনছিলাম না। কারণ কর্নেল বুড়ো এখনও এসে পৌঁছলেন না। বিমানযাত্রীদের আবার ডাকা হচ্ছিল। ডঃ আলুওয়ালা আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন। সিকিউরিটি পুলিশ ও শুল্ক দপ্তরের লোকেরা পরীক্ষা করছেন। প্রত্যেক যাত্রীকে লাইনে দাঁড়াতে হবে।

পাসপোর্ট ভিসা এবং অন্যান্য আইন কানুনের ব্যাপার সামলে যখন পাকিস্তান এয়ারলাইনসের বিশাল বোয়িং বিমানের সিঁড়ির কাছে পৌঁছলুম, তখনও কর্নেলের পাত্তা নেই।

কোনো গণ্ডগোলে পড়েননি তো? ডেলিগেশনের লিস্টে নাম আছে দেখেছি। অথচ এখনও আসছেন না কেন?

দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সুযোগ নেই। ডঃ আলুওয়ালা ঠেলতে ঠেলতে বিমানে চড়িয়ে ছাড়লেন। সিট নম্বর মেলাতে গিয়ে দেখি আমার পাশে ডঃ অনিরুদ্ধ যোশী বলে এক পণ্ডিতের সিট পড়েছে। দুচ্ছাই! বরং কোনো সাংবাদিক পাশে থাকলে জমতো ভালো। মিঃ যোশী গাব্দাগোব্দা প্রকাণ্ড মানুষ। বেঁটে। দাড়িগোঁফ আছে মুখে। অবশ্য টাক নেই। কাঁচাপাকা কোঁচকানো একরাশ চুলে মাথাটা ভর্তি। আমার সঙ্গে তখুনি আলাপ করে নিলেন। ভারি অমায়িক লোক মনে হল। একটু পরেই বিমান ছাড়ার সময় হয়ে গেল। আমি তখন কর্নেলের আশা ছেড়ে দিয়ে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছি।

বিমান ফ্লাই অন রানওয়ে দিয়ে চলতে চলতে ক্রমশ গতি বাড়াল। তারপর মাটি-ছাড়া হল। আজ আবহাওয়া ভারি চমৎকার। সকালের রোদ ঝলমল করছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখি আকাশের এতদূরে পৌঁছেছি যে নীচে সব সমতল দেখাচ্ছে—যেন একখানা চমৎকার কার্পেট পাতা রয়েছে। যাক্ গে! কর্নেল যখন এলেন না, তখন ফলকরহস্য তোলা রইল। অন্য সাংবাদিকরা যে উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন, আমিও যখন সাংবাদিক তখন সেই উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সফর করে আসি। উপায় কী আর?

লারকানা বিমানবন্দর তিন ঘণ্টার যাত্রা। একটু পরে বিমানে পরিচারিকা স্ন্যাকস্ ও কফি দিতে এলেন। স্ন্যাকসের প্যাকেটের সঙ্গে দেখি একটা চিরকুট। তাতে লেখা আছে : ডার্লিং! ইওর ওল্ড ডাভ ইজ হিয়ার।

ওল্ড ডাভ! বুড়ো ঘুঘু। আমি চঞ্চল চোখে তাকাতেই পরিচারিকা একটু হেসে পিছনে ইশারা করলেন। ঘুরেই ইচ্ছে হল চেঁচিয়ে উঠি—হ্যালো ওল্ড ডাভ।

কিন্তু চেঁচামেচি করা গেল না। দুজনে পরস্পরের দিকে হাসলুম শুধু। ধড়ে প্রাণ এল আমার।

ডঃ যোশী আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। কথায় কথায় জানলুম, ইনি পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। ছাত্রজীবনে কলকাতায় ছিলেন। বাঙালিদের প্রতি প্রচুর শ্রদ্ধা

পোষণ করেন। এক ফাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলুম,— আচ্ছা, স্যার, সিন্ধুসভ্যতার যুগে কি ঘোড়া ছিল না?

ডঃ যোশী যেন চমকে উঠলেন। বললেন,—ঘোড়া? হঠাৎ ঘোড়ার কথা কেন? তারপর হাসতে থাকলেন। সাংবাদিকের পক্ষে ঘোড়া রোগ খুব সুবিধের নয়।

মনে মনে একটু রাগ হল। কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে ফুটিয়ে বললুম,—প্রশ্নটা কি অন্যায়, স্যার?

ডঃ যোশী আমার কাঁধে হাত রেখে সকৌতুক বললেন,—মোটেই না। তবে ইদানীং দেখছি কারুর-কারুর মাথায় সিন্ধুসভ্যতার কাল্পনিক ঘোড়া দৌড়াদৌড়ি করছে।

—তা হলে সিন্ধুঘোটক বলুন!

ডঃ যোশী আরও জোরে হেসে উঠলেন।—যা বলেছেন! অবশ্য সিন্ধুঘোটক থাকে অন্য সিন্ধুতে। অর্থাৎ সমুদ্রে। এ সিন্ধু প্রদেশটা নেহাত মাটি দিয়ে তৈরি। তাই মাটির ঘোড়া দু-একটা থাকলেও থাকতে পারত সিন্ধুসভ্যতার যুগে।

—যেমন আমাদের বাঁকুড়ার ঘোড়া। কুটিরশিল্পের খাসা দৃষ্টান্ত।

ডঃ যোশী আমার পাল্টা রসিকতায় খুশি হলেন। বললেন,—রসকষ আছে বলেই আমি সাংবাদিকদের পছন্দ করি।

—স্যার, একটু আগে বললেন, ইদানীং নাকি কারুর কারুর মাথায় ...

বাধা দিয়ে ডঃ যোশী বললেন,—হ্যাঁ জয়ন্তবাবু। যেমন ধরুন আপনাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্বের অধ্যাপক ডঃ আলুওয়ালার মাথায় ঘোড়া ঢুকেছে। এর আগে উনি মাথায় বলদ ঢুকিয়েছিলেন। এখন বলছেন, বলদটা আসলে ঘোড়াই হবে। বিশুদ্ধ সংস্কৃতে যাকে বলে কিনা 'হয়'।

—শুনেছি হেহয় থেকে নাকি 'হয়'।

—অ্যাঁ বলে ডঃ যোশী আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন,—কোথায় শুনলেন একথা?

বললুম,—এক ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতের কাছে।

—কে তিনি? নাম কী? থাকেন কোথায়?

এতক্ষণে মনে হল, ভুল করেছি। মুখ ফসকে গোপন একটা তথ্য বের করে দিয়েছি। অথচ কর্নেল পই পই করে বারণ করেছিলেন। অগত্যা বানিয়ে বললুম,—কলকাতায় ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ডঃ ভবার্ণব ভট্টাচার্যর কাছে।

—ডঃ ভবার্ণব ভট্টাচার্যর নাম তো শুনিনি!

আমার ভাগ্য ভালো এইসময় পরিচারিকা দ্বিতীয় দফা খাদ্য পরিবেশন করতে এলেন। এটা ব্রেকফাস্ট। ডঃ যোশীকে পেটুক মনে হল। তখুনি স্যান্ডউইচের প্যাকেট খুলে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু আড়চোখে লক্ষ করলুম, উনি খেতে খেতে মাঝে মাঝে সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে আমাকে দেখে নিচ্ছেন। ব্যাপারটা কেমন যেন লাগল ...

কিন্তু আমার পক্ষে স্বস্তির কথা, ডঃ যোশী আর এ প্রসঙ্গে গেলেন না। দেশের রাজনীতি নিয়ে পড়লেন। দেখতে-দেখতে কখন সময় কেটে গেল। আমাদের বিমান লারকানা বিমান, বন্দরের ওপর চক্কর দিতে শুরু করল। নীচে সিন্ধুনদ দেখা যাচ্ছিল। লারকানার পূর্বে সামান্য দূরে সিন্ধুনদ বয়ে চলেছে।

বিমান যখন মাটিতে নামল, তখন সকাল সাড়ে দশটা। পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি এবং সেখানকার পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিত ভারতীয় প্রতিনিধিদের স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছিলেন। পরিচয়

ও কোলাকুলি পর্ব সেরে গাড়ি করে শহরের দক্ষিণপ্রান্তে নিরিবিলি এলাকায় একটা স্টার হোটেলে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। দশতলা এই রাজকীয় হোটেলে বিদেশি পর্যটকদের বেশ ভিড় দেখলুম। শীতের শেষ বলে নাকি এখন ভিড়টা কমেছে। মোহেনজোদাড়ো এখান থেকে কিছু দূরে দক্ষিণে সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে রয়েছে। তাই এত পর্যটকদের ভিড়।

এলাকার ভূপ্রকৃতি কেমন যেন রুক্ষ। অবশ্য গাছপালা রয়েছে প্রচুর। তাদের রং কেমন ধূসর। ছোট ছোট পাহাড় আছে অসংখ্য। পাকিস্তান সরকার সিন্ধুনদের জল সেচের কাজে লাগিয়েছেন। ফলে ফসলের ক্ষেত ও গাছপালা অনেকটা শ্রী ফুটিয়ে তুলেছে।

কর্নেলের মুখোমুখি হয়েছিলুম হোটেলের লাউঞ্জে। তারপর আশ্বস্ত হয়ে দেখলুম, তাঁর ঘরেই আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। অর্থাৎ উনিই তদ্বির করে এ ব্যবস্থাটা করে ফেলেছেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

ঘরটা দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, সাততলায়। কর্নেল দক্ষিণের জানালায় দাঁড়িয়ে ওঁর প্রখ্যাত বাইনোকুলারটি—যা বিরল জাতের পাখির খোঁজে ব্যবহার করেন, চোখে চোখ রেখে বললেন, —হুম! মোহেনজোদাড়ো অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

বললুম,—আপনার মাথা খারাপ! এখান থেকে অনেক মাইল দূরে!

—ঠিকই! তবে আমরা একটা টিলার মাথায় দশতলা হোটেলের সাততলায় দাঁড়িয়ে আছি। সামনে বরাবর ফাঁকা। তুমিও দেখতে পার। তা ছাড়া এই দূরবিনটা খুব শক্তিশালী।

—কাছে গিয়েই দেখব'খন। বিকেল তিনটেয় যাওয়ার প্রোগ্রাম না?

—হুঁ। ... বলে কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে আবার যেন মোহেনজোদাড়ো দেখতে থাকলেন। কী বিদঘুটে স্বভাব!

বললুম,—এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

—বলো ডার্লিং!

—এয়ারপোর্ট পৌঁছতে আপনার দেরি হল কেন?

—পাকিস্তানের দূতাবাসে গিয়েছিলুম এক বন্ধুকে নিয়ে।

—কেন?

—মোহেনজোদাড়োর সরকারি অতিথিশালায় একটা ডাবল বেড ঘর জোগাড় করতে।

—সে কী! ডেলিগেশনের ব্যাপার। এঁদের সঙ্গেই তো থাকা উচিত।

—থাকব না। আমি আগাম ব্যবস্থা সেরে এসেছি।

—আমাদের প্রতিনিধিদের নেতা আপত্তি করবেন না তো?

—ডঃ তিড়কে? মোটেই না। কথা বলে নিয়েছি ওঁর সঙ্গে।

—ডঃ আলুওয়ালার সঙ্গে নিশ্চয় চোখাচোখি হয়েছে আপনার?

—হয়েছে। ভদ্রলোক খাপ্পা হয়ে গেছেন। বিশেষ কথাবার্তাই বললেন না।

—স্কেচ চুরির অভিযোগ করলেন না?

—নাঃ। তো জয়ন্ত, তোমার সঙ্গে ডঃ যোশীর খুব ভাব দেখলুম।

—ভাব জমাতে আমি ওস্তাদ।

—তোমাকে একটা ব্যাপারে সতর্ক করে দিই। ডঃ যোশীর সঙ্গে আর ভাব জমাতে যেও না। বিপদে পড়বে। আমাকেও বিপদে ফেলবে।

—কেন? কেন?

—আপাতত আর কিছু বলব না, ডার্লিং!

জানি, আর হাজার প্রশ্ন করলেও জবাব পাব না, তাই চুপ করে গেলুম। যতক্ষণ কথা বললেন, কর্নেলের চোখে বাইনোকুল্যার রয়ে গেল। কী দেখছেন অমন করে? আমার অস্বস্তি জাগল। তাই না বলে পারলুম না—এত কী দেখছেন বলুন তো?

কর্নেল বাইনোকুলার আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন,—এবার তুমি দেখ। আমার দেখা শেষ হয়েছে আপাতত।

—দেখবটা কী? মোহেনজোদাড়ো তো?

—না। এই হোটেলের নীচের রাস্তার যে টিলাটা আছে, সেখানে দেখবে একটা পার্ক। পার্কে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছেন দুই ভদ্রলোক।

তখনি বাইনোকুলারে চোখ রাখলুম। তারপর চমকে উঠলুম। দুই ভদ্রলোকের একজন হচ্ছেন ডঃ আলুওয়ালা। অন্যজনের গাঁট্টা-গোঁট্টা চেহারা। পেল্লায় গোঁফ আছে মুখে। এই গুঁফো লোকটিকে আমাদের দলে দেখেছি, এতে কোনো ভুল নেই।

কিন্তু ডঃ আলুওয়ালা হোটেলে পৌঁছেই বেরিয়ে গেছেন এবং ওই লোকটির সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কী কথা বলছেন? ভারি সন্দেহজনক ব্যাপার।

একটু দেখেই আমার ক্লান্তি লাগল। সরে এলুম। কর্নেল পোশাক বদলাতে ব্যস্ত হয়েছেন। আমি পোশাক বদলে নিলুম। দিল্লিতে ভোরবেলা স্নান করে নিয়েছি। এখানে দেখছি মার্চ মাসেও শীতটা কড়া। বাথরুম থেকে এসে দেখি, চা এসে গেছে। তার সঙ্গে প্রচুর ফল এবং মিষ্টান্নও। আমরা সরকারি অতিথি বলেই এত আদর নিশ্চয়।

কিন্তু কর্নেলের মুখটা গম্ভীর কেন? কাছে যেতেই একটা খাম এগিয়ে দিয়ে বললেন,—ওদের টনক নড়েছে। এই দেখো।

—কাদের?

—খুলে চিঠিটা পড়ে নাও আগে।

খামের মধ্যে ভাঁজ করা একটা চিঠি আছে। খামের ওপরে ইংরেজিতে লেখা : ৬৩২ নম্বর স্যুটের অধিবাসীদ্বয়কে।

চিঠি নয়—চিরকুট বলাই উচিত। তাতে ডটপেনে লেখা আছে : '**ঘোড়াটা রোগা। ওই নিয়ে রেস লড়তে যেও না। সর্বস্বান্ত হবে।**

ইতি—রেসুড়েদের রাজা।'

আমার হাত কাঁপছিল। কর্নেল চাপা হেসে বললেন,—জয়ন্ত কি এতেই ভয় পেয়ে গেলে?

শুকনো হেসে বললুম,—মোটেও না। আপনার কথা মতো আমি সঙ্গে আমার রিভলভারটা এনেছি। গুলিও এনেছি প্রচুর। না না—আইন ভেঙে আনিনি। সিকিউরিটির হাতে ধরা পড়তুম। ওদের মেটাল ডিটেক্টর যন্ত্রে ঠিক টের পেয়ে যেত। দিল্লির পাকিস্তানি দূতাবাসে আপনার যেমন বন্ধু আছেন, আমারও কি থাকতে নেই? তবে আমার প্রত্যক্ষ বন্ধু নয়। বন্ধুর বন্ধু আর কী! আর আপনি তো জানেন, সাংবাদিকরা কিছু বিশেষ সুবিধা সব দেশের সরকারের কাছেই পেয়ে থাকেন। অতএব কোনো ঝামেলা হয়নি অনুমতি পেতে।

কর্নেল বললেন,—আমিও সশস্ত্র, জয়ন্ত। আমারও অনুমতি পেতে ঝামেলা হয়নি। বরং আরও অস্ত্র সাহায্য চাইলে পেয়ে যাব।

—বলেন কী!

—এখনই সব বুঝতে পারবে। করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের সিন্ধুসভ্যতা সংক্রান্ত শাখার প্রধান অধ্যাপক ডঃ আবদুল করিমের আসবার সময় হল। তাঁর সঙ্গে আসছেন

সরকারি গোয়েন্দা দফতরের স্থানীয় অধিকর্তা কর্নেল কামাল খাঁ। আমি সব আয়োজন করেই এসেছি।

সব দুর্ভাবনা মুহূর্তে চলে গেল। চা খেতে-খেতে এবার ডঃ যোশীর সঙ্গে আমার বাক্যালাপ প্রসঙ্গটি তুললুম। কর্নেল বিরক্ত হয়ে বললেন,—তুমি এখনও বড্ড ছেলেমানুষ জয়ন্ত! কোন আক্কেলে 'হেহয়' কথাটা বললে ওঁকে?

—মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু ডঃ যোশী আসলে কে?

—এই প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারছি, তোমার বুদ্ধি খুলেছে। জয়ন্ত, ওই একই প্রশ্ন আমার মাথাতেও ঘুরছে। কারণ পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পত্রিকায় ডঃ যোশীর যে ছবি দেখেছিলুম, তাতে মুখে দাড়ি নেই।

—কী মুশকিল। এখন দাড়ি রেখেছেন উনি?

—সেই ছবির মুখে দাড়ি কল্পনা করেছি, কিন্তু মিলছে না।

—তা হলে কি ইনি জাল ডঃ যোশী?

এই সময় ফোন বাজল। কর্নেল ফোন তুলে সাড়া দিলেন এবং চাপা গলায় কী বললেন। তারপর ফোন রেখে হাসিমুখে ঘুরলেন,—জয়ন্ত, ডঃ করিম এবং কামাল খাঁ এসে গেছেন।

তিন মিনিট অপেক্ষার পর ঘণ্টা বাজল। দরজা খুলে দেখি একজন বেঁটে, অন্যজন দৈত্যের মতো বিশাল লোক ঘরে ঢুকে সম্ভাষণ জানালেন। কর্নেলের সঙ্গে কোলাকুলি শেষ হতেই চায় না। তারপর আমার দিকে দুজনে এগোতেই ভয় পেয়ে গেলুম। এই বেঁটে ও লম্বা পর্বতের সামনে আমি একেবারে নেংটি ইঁদুর যে!

কর্নেল বেঁটে ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন,—আমার একসময়কার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কর্নেল কামাল খাঁ মিলিটারি জীবনে দুজনেই আফ্রিকা রণাঙ্গনে ছিলুম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়।

মনে হল ওঁরা ব্যস্ত। ঝটপট কাজের কথা শুরু করলেন। কর্নেল কামাল খাঁ ব্রিফকেস থেকে একটা ভাঁজ করা ম্যাপ বের করে বিছানায় খুলে ধরলেন। তিনজনে ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। তারপর যা সব কথাবার্তা হল, আমি স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারলুম না। শুধু টের পেলুম, এতদিনে মোহেনজোদাড়োর ঘোড়া রহস্যের একটা কিনারা হতে চলেছে।

ওঁরা বিদায় নিয়ে যাওয়ার পর আমরা লাঞ্চ খেতে গেলুম। এই ফ্লোরেও ডাইনিং হল আছে। সেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ভোজ দিচ্ছেন। বক্তৃতাও হল। তারপর অতিথিদের খানাপিনা শেষ হতে পাক্কা একঘণ্টা লেগে গেল।

ঘরে ফিরে কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত, ভোজসভায় একটা বিশেষ ব্যাপার কি তোমার চোখে পড়ছে?

—বিশেষ ব্যাপার? না তো।

—ডঃ আলুওয়ালা কিন্তু ভোজসভায় অনুপস্থিত!

—তাই নাকি? লক্ষ করিনি।

—তুমি না সাংবাদিক! সব কিছুতে লক্ষ রাখা তোমার উচিত ডার্লিং!

—তাই বলে আলুওয়ালা পটলওয়ালাদের নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—কিন্তু প্রতিনিধিদলের নেতা ডঃ তিড়কের মাথাব্যথা শুরু হয়েছে। ডঃ আলুওয়ালা ছিলেন ডঃ যোশীর ঘরে। ডঃ যোশী বলেছেন, তাঁর সঙ্গে নাকি কী একটা ব্যাপারে তর্কাতর্কি হয়েছিল। ডঃ আলুওয়ালা রেগেমেগে দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। ডঃ তিড়কে এতে যেমন উদ্বিগ্ন, তেমনি খাপ্পা। ভারতীয় পণ্ডিতের এহেন

আচরণ বিদেশে বাঞ্ছনীয় নয়। যাই হোক, নীচে রিসেপশনের কেউ লক্ষ করেনি কখন উনি বেরিয়ে গেছেন। শুধু লিফটম্যান বলেছে, এক বেঁটে মোটা ভদ্রলোক ব্যাগেজ নিয়ে নেমেছেন। যাক গে, এবার নাটক জমে উঠল মনে হচ্ছে।

ক্লান্তি তো বটেই, বাদশাহী ধরনের একটা অসাধারণ খাওয়ার পর আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছিল। শুয়ে পড়লুম। সেই সময় লক্ষ করলুম, কর্নেল একটা ম্যাপ খুলে বসেছেন এবং কী সব চিহ্ন দিচ্ছেন ম্যাপে।

ঘুম ভাঙল কর্নেলেরই ডাকে। —ওঠ জয়ন্ত! তিনটে বেজে গেল। আমরা এবার রওনা দেব। ডঃ তিড়কের কাছে বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে। আর দেরি করা ঠিক নয়। এখনই কামাল সায়েবের জিপ এসে পড়বে।

দ্রুত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলুম। কিছুক্ষণ পরে ফোনে রিসেপশান থেকে জানাল—জিপ এসে গেছে। আমরা বেরিয়ে পড়লুম। ব্যাগেজ হোটেলের লোকেরা এসে নিয়ে গেল। করিডোরে লিফটের দিকে এগোচ্ছি, টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সাংবাদিক মিঃ রঘুনন্দনের সঙ্গে দেখা। বললেন, —এ কী চৌধুরী! কোথায় যাচ্ছ তুমি?

—এত বাদশাহী আরামে থাকা পোষাবে না ভাই! এক চেনা ভদ্রলোকের ওখানে উঠব।

—সে কী!

মিঃ রঘুনন্দন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি দৌড়ে গিয়ে লিফটে ঢুকলুম। কর্নেল বললেন,—কী বললে ওঁকে?

বললুম,—এক চেনা ভদ্রলোকের বাসায় যাচ্ছি ...

নীচে নেমে গিয়ে জিপে উঠলুম। পাঠান ড্রাইভার জিপে স্টার্ট দিল। রাস্তায় যেতে-যেতে একটা অদ্ভুত বৈষম্য চোখে পড়ছিল। বিশাল চওড়া হাইওয়েতে অজস্র বিলিতি গাড়ি যাতায়াত করছে বটে, উট আর ঘোড়াগাড়ির সংখ্যাও কম নয়। মাথায় পাগড়ি ও পা অব্দি রঙবেরঙের আলখাল্লা পরা মানুষের ভিড়ে বিলিতি পোশাকের মানুষও রয়েছে। সেইসঙ্গে ভেড়ার পাল নিয়েও যাচ্ছে যারা—তারা কসাই না রাখাল বুঝতে পারলুম না।

অদ্ভুত এখানকার ভূপ্রকৃতিও। কখনও চড়াই, কখনও উৎরাই। এই রাস্তার দুধারে মাঝে-মাঝে টানা সবুজ শস্যের মাঠ, কখনও ধু ধু বালিয়াড়ি আদিগন্ত। ন্যাড়া টিলা, আবার কখনও রুক্ষ বাঁজা জমির ওপর বড় বড় পাথর পড়ে রয়েছে। তারপর রাস্তা ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেছে। গাছপালা খুবই কম। তারপর একটানা বাজার। বাজার পেরিয়ে গিয়ে একটা টিলার গায়ে সরকারি গেস্ট হাউস।

গেস্ট হাউসের পুবের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কর্নেল বললেন,—ওই হের বৎস! সিন্ধুনদ ও তার তীরবর্তী হাজার-হাজার বছরের পুরোনো ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন সেই মোহেনজোদাড়ো।

কে জানে কেন, অস্বস্তিতে আমার বুক কেঁপে উঠল এতক্ষণে। ...

মামদো ভূতের কবলে

গেস্ট হাউসটার পরিবেশ এই রুক্ষ মরুসদৃশ জায়গায় একেবারে বিপরীত। সবুজ গাছ ও ফুলে সাজানো। মোহেনজোদাড়ো রয়েছে পূর্বে অনেক নীচে। তার ওধারে সিন্ধুনদের চরগুলো দেখা যাচ্ছে। বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে চা খেতে খেতে কর্নেল হঠাৎ বললেন,—ওই দেখো জয়ন্ত, ভারতীয় পণ্ডিত এবং সাংবাদিকদের বাস দুটো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওঁরা মোহেনজোদাড়ো শহরের রাজপথে হেঁটে যাচ্ছেন।

দেখে নিয়ে বললুম,—আমরা কখন বেরুব?

—সন্ধ্যার একটু আগে। ওঁরা বিদায় নিক, তারপর।

—ওরে বাবা! শুনেছি ভূতের ভয়ে নাকি সন্ধ্যার দিকে ওখানে কেউ ঘেঁষে না।

—তা সত্যি। তবে সরকারি লোকেরাও পাঁচটার পর ওখানে কাউকে যেতে দেয় না।

—আমরা কীভাবে যাব তা হলে?

—আমরা আপাতত অন্য এলাকায় যাব।

এরপর কর্নেল মোহেনজোদাড়োর কথা শুরু করলেন। বুঝলুম, বুড়ো ইতিমধ্যে প্রচুর কেতাব পড়ে ফেলেছেন। সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, ইরাকের ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরে সুমেরু সভ্যতার সঙ্গে তার সম্পর্ক থেকে শুরু করে আর্যদের ভারতে আগমন এবং দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে সংঘর্ষ—সে এক পেল্লায় ইতিহাস শুনিয়ে ছাড়লেন। আমার কান ও মাথা ভোঁ ভোঁ করছিল। সেই সময় ডঃ করিম এবং কর্নেল কামাল খাঁ এসে গেলেন। বাঁচা গেল এবার।

আরেকবার চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে। কিন্তু যথেষ্ট রোদ আছে। কারণ এটা পশ্চিম ভারতের—থুড়ি, পশ্চিম পাকিস্তানের একটি অঞ্চল। কলকাতার সঙ্গে সময়ের তফাত আছে। কলকাতার সূর্যাস্ত যখন, তখনও এখানে সূর্য দিগন্তের অনেকটা উঁচুতে।

আমরা জিপে চেপে চলেছি। বুঝলুম, গন্তব্যস্থান আপাতত ওই ভূতের শহর নয়, সিন্ধুনদের সেই মজে-যাওয়া ত্রিকোণ জায়গা। বুকের মধ্যে কাঁপন শুরু হয়ে গেল।

দক্ষিণে মাইল দুই এগিয়ে ন্যাড়া এবং পাথরভর্তি জমি এবং টিলাগুলোর মধ্যে একস্থানে জিপ দাঁড়াল। সবাই নামলুম। আগে আগে চললেন ডঃ করিম। উনি পথপ্রদর্শক।

এবার আমরা পুবের দিকে চলেছি। রাস্তাঘাট নেই কোথাও। কাঁটাঝোপ আর পাথুরে জমি। কিছুটা এগিয়ে দূরে আবার সিন্ধুনদ চোখে পড়ল। আমরা যেখানে দাঁড়ালুম, তার নীচে গভীর এবং চওড়া খাদ উত্তর থেকে এসে বাঁক নিয়ে পুবে এগিয়ে গেছে। কর্নেল বলে উঠলেন,—এটাই কি সেই প্রাচীন সিন্ধুনদের গতিপথ?

ডঃ করিম বললেন,—হ্যাঁ। আমাদের এই খাদ পেরিয়ে ওপারে উঠতে হবে।

পাথরে পা রেখে সাবধানে চারজনে নামতে শুরু করলুম। তিনশ ফুট নীচে খাদে অন্ধকার জমে গেছে ইতিমধ্যে।

খাদ থেকে ওপারে ওঠাটা ভারি কষ্টকর। কিন্তু তিনজন বয়স্ক মানুষ—বিশেষ করে একজন তো পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো, অর্থাৎ কর্নেল নীলাদ্রি সরকার—ওঁরা যখন পারছেন, জোয়ান হয়ে আমার না পারার কারণ নেই।

ওপরে উঠে ঢালু সমতল ত্রিকোণ জমিটায় যখন পৌঁছলুম, তখন প্রচণ্ড হাঁফাচ্ছি।

ডঃ করিম বললেন,—আসুন, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক। এখনও কিছুটা দেরি আছে।

সবাই শুকনো ঘাসে বসে পড়লুম। জানতে চাইলুম কীসের দেরি।

—চাঁদ ওঠার। জবাবটা কর্নেল দিলেন। জয়ন্ত, প্রথম চাঁদ কিন্তু! প্রতিপদে চাঁদ দেখা যায় না। আজ দ্বিতীয়া।

—তা চাঁদের সঙ্গে কী সম্পর্ক?

—ফলকের সংকেতের কথা কি ভুলে গেছ জয়ন্ত?

—তাই বলুন। কিন্তু চাঁদ উঠলে হবেটা কী শুনি?

ডঃ করিম হাসতে হাসতে বললেন,—জয়ন্তবাবু সাংবাদিক মানুষ। কাজেই এত কৌতূহলী। তবে অপেক্ষা করুন। কিছুক্ষণ পরেই সব বুঝতে পারবেন।

দিনের আলো ক্রমশ কমে আসছিল। ওঁরা চাপা গলায় কীসব আলোচনা করছিলেন! কান দিলুম না। আমি একটু কল্পনাপ্রবণ হয়ে পড়েছিলুম। আজ থেকে অন্তত পাঁচ হাজার বছর আগে এখানে শস্যক্ষেত্র ছিল। ব্রহ্মাবর্তরাজ হেহয় রাজ্যচ্যুত হয়ে এদেশে সেদেশে ঘুরতে ঘুরতে ঘোড়ার পিঠে চেপে যখন এখানে পৌছলেন, তখন সবে চাঁদ উঠেছে। একফালি ক্ষীণ চাঁদ। ধনরত্ন লুকিয়ে রাখতে এসেছেন এই নির্জন শস্যক্ষেত্রে। কারণ কখন ওই ধনের লোভে তাঁকে দস্যুরা মেরে ফেলবে বলা যায় না।

কল্পনার চোখে দেখতে থাকলুম দৃশ্যটা। নির্জন নিঝুম, অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠা এই মাঠে ওই যেন একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে এগিয়ে আসছে একটা মানুষ! তারপর ...

আচমকা আমার কল্পনা ছত্রখান হয়ে গেল। কোত্থেকে কে বা কারা গুলিবৃষ্টি শুরু করল মুহুর্মুহু। সঙ্গে-সঙ্গে আমরা উবুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম। কর্নেল কামাল খাঁর চিৎকার শুনলুম।—লুকিয়ে পড়ুন, লুকিয়ে পড়ুন! পাথরের আড়ালে চলে যান সবাই!

এখানে ওখানে পাথরের মস্ত চাঁই রয়েছে। তখন অন্ধকার কিছুটা ঘন হয়েছে। ঝোপঝাড় ও শুকনো ঘাসে প্রায় সাপের মতো বুকে হেঁটে যে-যেখানে পারলুম। আত্মরক্ষা করতে ব্যস্ত হলুম। একটা উঁচু পাথরের আড়ালে পৌঁছে মাথা তুললুম। আবার এক ঝাঁক গুলি এসে পড়ল। মুখ গুঁজে মড়ার মতো পড়ে রইলুম।

তারপর সব চুপচাপ।

তারপর জোরালো টর্চের আলো ছড়িয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আমাদের দলের কেউ আলো লক্ষ করে গুলি ছুঁড়লেন। আলো নিভে গেল।

এতক্ষণে আমার মনে পড়ল, আসার সময় রিভলভারটা নিতে ভুলে গেছি! নিজেকে অসহায় মনে হল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমাদের দলটা ছত্রভঙ্গ হয়ে কে কোথায় ছিটকে পড়েছি বোঝা যাচ্ছে না। পাথরটা উঁচু এবং প্রকাণ্ড। এপাশ-ওপাশ সাবধানে ঘুরে আবছা অন্ধকারে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছি।

একটু পরে সম্ভবত পিছনে খাদের দিক থেকে কর্নেল কামাল খাঁর ডাক শোনা গেল—জয়ন্তবাবু! জয়ন্তবাবু!

সাড়া দিয়ে বললুম,—আমি এখানে!

সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনের পাথরে এক ঝাঁক গুলি এসে পড়ল। স্পিল্‌নটারের ফুলকি আর পাথরের টুকরো ছিটকে পড়তে থাকল। আবার ঘাড় গুঁজে মড়ার মতো পড়ে রইলুম।

গুলি ছোঁড়া বন্ধ করল ওরা। কতক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মুখ তুলে দেখি, অন্ধকার ঘন হয়েছে। কারুর কোনো সাড়া নেই। চেঁচিয়ে কর্নেলকে ডাকব ভাবলুম। কিন্তু আবার যদি ওরা গুলি ছোঁড়ে, সেই ভয়ে চুপ করে গেলুম।

কিন্তু ওরা কারা? যারাই হোক, অন্তত এটুকু বুঝতে পারছি এখানে আমাদের এসে পড়াটা ওদের পছন্দ হয়নি।

ঘাড় ঘুরিয়ে এ সময় চোখে পড়ল, পিছনে দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশের দিগন্তে একফালি ক্ষীণ চাঁদ জেগে আছে। এখনই ওই চাঁদ অস্ত যাবে। পাঁচ হাজার বছর আগে এখানে ঠিক এই সময়ে যে নাটক শুরু হয়েছিল, আজ এতকাল পরে কি তারই শেষ দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে?

কিন্তু আর এভাবে থাকা যায় না। আস্তে আস্তে গিরগিটির মতো লম্বা হয়ে পিছিয়ে গেলুম। যে ভাবেই হোক, খাদে গিয়ে নামতে হবে। সম্ভবত দুই কর্নেল এবং ডঃ করিম খাদেই নেমে গেছেন এবং আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। একবার নীচে থেকে আবছা ডাকও যেন শুনলুম।

কতক্ষণ ওইভাবে পিছু হটে এগিয়েছি হিসাব নেই। এক সময় দেখি, উঁচু উঁচু পাথরের মধ্যে এসে পৌঁছেছি। মনে পড়ল, খাদের কিনারায় এমনি উঁচু পাথরের সারি ছিল বটে। এবার হামাগুড়ি দিয়ে সোজা এগোলুম। কিন্তু হঠাৎ পা পিছলে গেল এবং গড়াতে গড়াতে নীচের দিকে পড়তে থাকলুম।

ক্রমাগত পাথরে ধাক্কা খেতে-খেতে হাড়গোড় ভেঙে যাবার দাখিল। আঁকড়ে ধরার মতো কিছু পাচ্ছি না। শুধু মসৃণ পাথর। তারপর গিয়ে পড়লুম বালির গাদায়। আঘাতটা জোর হল না। বুঝলুম, খাদের তলায় বালির চড়ায় এসে পড়েছি।

চিত হয়ে কতক্ষণ আচ্ছন্নভাবে পড়ে থাকলুম।

হঠাৎ কী একটা খসখস শব্দ হল। তারপর বিশ্রী দুর্গন্ধ টের পেলুম। নিশ্চয় কোনো হিংস্র জন্তু—বাঘ কিংবা নেকড়ে। শুনেছি এদেশের পাহাড়ি এলাকায় নেকড়েরা দলে-দলে ঘুরে বেড়ায়। আতঙ্কে আবার কাঁপুনি শুরু হল।

একটু পরে মনে হল যে খসখস শব্দটা শুনেছিলুম, সেটা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। দুর্গন্ধে বমি এসে যাচ্ছে। নাকে রুমাল চাপা দেব ভেবে যেই প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাতে গেছি, অমনি কী একটা প্রাণী আমার হাত ধরে ফেলল।

হাত ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে বুঝলুম, প্রাণীটার গায়ে অসম্ভব শক্তি। সে এক হ্যাঁচকা টানে আমাকে বালির ওপর টানতে শুরু করল।

এবার টের পেলুম, প্রাণীটার মানুষের মতো হাত আছে। সেই হাত আমার কব্জি সাঁড়াশির মতো ধরেছে। পরক্ষণে সে আচমকা পিলে চমকানো হাসি হেসে উঠল—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ!

ওরে বাবা! এ যে ভুতুড়ে হাসি! তা হলে এ কার পাল্লায় আমি পড়েছি? চেঁচিয়ে ওঁদের ডাকব ভাবলুম, কিন্তু গলা দিয়ে শুধু গোঁ গোঁ আওয়াজ হল। তারপর দেখি, সেই ভুতুড়ে প্রাণীটা দুহাতে আমাকে শূন্যে তুলে নিয়েছে এবং দৌড়তে শুরু করেছে। বিকট গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উগরে আসছে।

তারপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললুম। ...

রাজা হেহয়ের শিলালিপি

যখন জ্ঞান হল, কয়েক মুহূর্ত কিছু বুঝতে পারলুম না কোথায় আছি এবং কী ঘটেছে। তারপর সব মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলুম। সর্বাঙ্গে ব্যথা করছে।

সামনে একটা পিদিম জ্বলছে। সেই আলোয় যা দেখা গেল, বুঝলুম আমি একটা গুহার মধ্যে আছি। পিদিম জ্বলছে একটা পাথরের বেদির ওপর। মাটির পিদিম আর বেদির পাশে এক বুড়ো জটা-জুটধারী লম্বাচওড়া দাড়িওয়ালা ফকির চোখ বুজে সম্ভবত ধ্যান করছেন। তাঁর গলায় কয়েকটা রঙিন পাথরের মালা।

তখন মুহূর্তেই আতঙ্ক ঘুচে গেল। ডাকলুম,—ফকিরসায়েব! ফকিরসায়েব!

ফকির চোখ খুললেন এবং ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। বললুম,—আমাকে এখানে কে আনল ফকিরসায়েব?

ফকির ইশারায় কাছে ডাকলেন। গুহার ছাদটা নিচু। দাঁড়ালে মাথা ঠেকে যাবে। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে কাছে গেলুম। তখন ফকির আমাকে অবাক করে পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলেন,—তুমি কে বাবা?

—এ কী! আপনি বাঙালি?

—হ্যাঁ বাবা, আমি বাঙালি। কিন্তু তুমি কি কোনো পর্যটক? মোহেনজোদাড়ো দেখতে এসেছিলে?

—হ্যাঁ ফকিরসায়েব। কিন্তু আপনি ...

ফকির একটু হেসে বললেন,—দেখতেই তো পাচ্ছ আমি সংসারত্যাগী ফকির। এই গুহায় সাধনভজন করি। এটাই আমার আস্তানা। কিন্তু তুমি কেমন করে ওই নচ্ছারটার পাল্লায় পড়লে? ভাগ্যিস, ওই সময় একবার বেরিয়েছিলুম। আমার সামনে পড়তেই ব্যাটা তোমাকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। আমি তখন নিয়ে এলুম তোমাকে।

—কে ও? ভূত, না মানুষ?

ফকির আবার হেসে ফেললেন। —ও ব্যাটাকে ভূতও বলতে পার মানুষও বলতে পার। ও একটা ভূত-মানুষ।

—তার মানে কী ফকিরসায়েব?

—মানে? মানে কী আমিও জানি ছাই? এই গুহায় জুটেছি আজ প্রায় দুবছর। প্রথম প্রথম অমাকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। তারপর আমিই ওকে ভয় পাইয়ে দিলুম। আমার এই ফকিরি চিমটে ঝনঝন করে বাজালেই ব্যাটা পড়ি-কী-মরি করে পালিয়ে যায়। তবে একথা ঠিক, ওকে দিনে একবারও দেখিনি! তা হলে ও আসলে কে, ঠিকই বুঝতে পারতুম। ব্যাটা সন্ধ্যার পর বেরিয়ে পড়ে। এই খাদেই ওর গতিবিধি। তবে একবার ফুটফুটে চাঁদের আলোয় সামনা-সামনি দেখেছিলুম। ও মানুষের মতো দু-পায়েও হাঁটে। অসম্ভব জোরে দৌড়াতে পারে। আর ওর একটা বিদঘুটে অভ্যাস। মাঝে মাঝে ঘোড়ার মতো চিঁহি করে ওঠে। মনে হবে, ওটা ওর হাসি। কিন্তু মোটেও তা নয়। ব্যাটা নিজেকে হয়তো ঘোড়া ভাবে।

ফকিরের এসব কথা শুনে আমি তো হতভম্ব। বললুম,—এবার আপনার কথা বলুন।

—আমার কথা কী বলব বাবা? বললুমই তো, আমি সংসারত্যাগী মানুষ।

—কিন্তু আপনি বাঙালি বলেই আমার সব কিছু জানতে ইচ্ছে করছে।

—জেনে কী হবে? তার চেয়ে এখন তোমার বিশ্রাম জরুরি। এ গরিবের আখড়ায় তোমার খুব কষ্ট হবে, জানি। কিন্তু উপায় কী? অল্প কিছু ফল আছে। খেয়ে নাও। কুঁজোয় জল আছে। খেয়েদের শুয়ে পড়ো। কম্বলও পাবে।

—জায়গাটা কোথায় বলুন! আমি বরং ট্যুরিস্ট লজে ফিরে যাব তা হলে।

—সর্বনাশ! সর্বনাশ! খবর্দার বাবা, এখন গুহা থেকে বেরুলেই বিপদে পড়বে।

—কেন বলুন তো?

ফকির গম্ভীর হয়ে বললেন,—সম্প্রতি কিছুকাল থেকে গুণ্ডাপ্রকৃতির কিছু লোক ওপরের দিকে একটা গুহায় আস্তানা গেড়েছে। তাদের কাছে প্রচুর গুলিবারুদ অস্ত্রশস্ত্রও আছে। মাঝে-মাঝে দেখি, তারা এখানে-ওখানে মাটি খোঁড়াখুড়ি করছে। পাথরের আড়াল থেকে ওদের গতিবিধি লক্ষ করেছি। আমার ধারণা, ওরা গুপ্তধন খুঁজছে। যদি বৈদাৎ ওদের পাল্লায় পড়ে যাও, খুন হয়ে যাবে। কারণ ওদের খরব কেউ জানুক, এটা ওরা চায় না। একদিন আমি তো গুলিতে মরতে-মরতে বেঁচে গেছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার এই আস্তানার খবর ওরা জানে না।

আজ সন্ধ্যায় যা ঘটেছে, ফকিরকে বলব ভাবলুম। পরে মনে হল, কী দরকার? ফকির হয়তো আরও ভয় পেয়ে যাবেন এবং আমাকে পাল্টা আরেকটা গুপ্তধন সন্ধানী দলের লোক ভেবে বসবেন।

বললুম,—অন্তত একটা কথার জবাব দিন। এই গুহাটা ট্যুরিস্ট লজ থেকে কত দূরে?

—তা মাইল পাঁচেকের বেশি তো হবেই। তবে গুহাটা খাদের ধারেই। একবার বেরিয়ে গেলে কিন্তু আর খুঁজে এখানে ঢোকা মুশকিল। এটাই এ গুহার মজা!

—কেন?

—সে স্বচক্ষে সকালে দেখবে'খন। এটা একটা গোলকধাঁধার মতো। খাদের পাশে দেওয়ালের মতো এবড়োখেবড়ো পাথরে অজস্র ফাটল আছে। কোন ফাটল দিয়ে ঢুকলে এ গুহায় পৌঁছানো যাবে, বোঝা মুশকিল। আমারও মাঝে-মাঝে গণ্ডগোল হয়ে যায়। বিশেষ করে রাতের বেলা। ভুল ফাটলের মধ্যে ঢুকে হয়রান হই। প্রত্যেকটা ফাটলই তলায়-তলায় সুড়ঙ্গের মতো গলিঘুঁজি ঘুরে গিয়ে শেষ হয়েছে। শুধু একটা ফাটলের পথ এ গুহায় পৌঁছেছে। সেই ফাটলে অবশ্য একটা চিহ্ন দিয়ে রেখেছি। অন্যের চোখে পড়া মুশকিল। ওটা শুধু আমিই চিনতে পারি। ... বলে ফকির বেদির ওপর রাখা একটা ঝোলা থেকে দুটো আপেল বের করলেন। তারপর বললেন,—নাও। খেয়ে ফেলো। অনেক রাত হয়েছে। আমার এখন ধ্যানে বসার সময়। দয়া করে আর আমাকে ডাকাডাকি কোরো না। আর এই কম্বলটা রইল। গুহার মধ্যে শীত তত টের পাবে না। শুয়ে পড়বে চুপচাপ।

কী আর করি, একটা আপেলে কামড় বসালুম। খিদেয় পেট চোঁচোঁ করছে। মাটির কুঁজো থেকে জলও খেলুম। তারপর নগ্ন পাথরের মেঝেয় শুয়ে পড়লুম। কম্বলটা দরকার হল না। ওই একটা মোটা কম্বল। ফকিরের কম্বলে আর ভাগ বসাই কেন? ফকির আবার চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়েছেন ততক্ষণে।

যাক গে, রাতের আশ্রয় পেয়েছি এবং মামদো ভূতের—উঁহু, ঘোড়াভূতের হাত থেকে বেঁচে গেছি, এই পরম সৌভাগ্য।

হঠাৎ মনে পড়ল, কর্নেল বলেছিলেন মোহেনজোদাড়োর ঘোড়াভূতের কথা। তা হলে তো এই সেই ঘোড়াভূত! ওর বিকট হাসির মতো হিঁ হিঁ করে ওঠাটা এখনও কানে ভাসছে।

কিন্তু কে ও? বেঁচেবর্তে ট্যুরিস্ট লজে ফিরতে পারলে কর্নেলকে সব জানাতে হবে। তারপর এই রহস্যের কিনারা করতেই হবে।

এইসব ভাবতে-ভাবতে আর ঘুমই এল না। তার ওপর সারা শরীরে ব্যথা। কেটে ছড়ে গেছে অনেক জায়গায়। জ্বরজ্বালা না এলে বাঁচি। একটু পরে পাশ ফিরে দেখলুম ফকির একইভাবে ধ্যানস্থ। পাশ দিয়ে বেদিটা দেখা যাচ্ছে।

বেদিটার কিছু অংশে আলো পড়েছে। হঠাৎ চমকে উঠে দেখলুম বেদির গায়ে অজস্র খোদাই করা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। অবিকল সিন্ধুলিপির মতো।

মতোই বা বলছি কেন? এখানে সিন্ধুলিপিই তো স্বাভাবিক। তা হলে এই বেদিটা নিশ্চয় সিন্ধুসভ্যতার সমকালীন।

চঞ্চল হয়ে উঠলুম। তা হলে তো আমি এযাবৎ অনাবিষ্কৃত একটা প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কার করে ফেলেছি?

কিন্তু ওই বেদিটা কীসের? নিছক পুজো-আচ্চার বেদি—নাকি ওটা একটা কবর? সিন্ধুসভ্যতার কবরও পাওয়া গেছে অনেকগুলো। তখন যেমন মড়া পোড়ানো হত, তেমনি কবরও দেওয়া হত।

হরাপ্পাতে কয়েকটা কঙ্কালও পাওয়া গেছে। মাটির জালায় সেগুলো ঠেসে ভরা ছিল। কর্নেলের কাছেই তো শুনেছি এসব কথা।

সাবধানে মুখটা একটু বাড়িয়ে লিপিগুলো ভালো করে দেখার চেষ্টা করলুম। তারপর আবার চমকে উঠলুম।

এ কী দেখছি? ডঃ আলুওয়ালার যে ফলকের স্কেচ কর্নেল হাতিয়ে ছিলেন এবং ডঃ ভট্টাচার্য যে ফলকের পাঠোদ্ধার করেছিলেন,—তার সঙ্গে বেদির গায়ের খোদাই করা লিপিগুলোর হুবহু মিল রয়েছে।

সেই ফলকের চিত্রলিপিগুলো আমার স্পষ্ট মনে আছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম। না। অবিকল সেই বলদ অথবা হনুমান অথবা ঘোড়া এবং মানুষটাও রয়েছে যে!

তা হলে কি এই বেদির তলায় ...

আর ভাবতে পারলুম না। আনন্দে উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠলুম। যেভাবেই হোক, এই গুহায় ঢোকার পথটা সকালে যাবার সময় ফকিরের অজান্তে চিহ্নিত করে রাখব।

তারপর আর সময় কাটতেই চায় না। ফকির ধ্যানমগ্ন। নিস্তব্ধ গুহা ছমছম করছে।

তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি।

ফকিরের ডাকে ঘুম ভাঙলে তাকিয়ে দেখি মাথার ওপর একটা ফাটল দিয়ে সূর্যরশ্মি এসে গুহায় ঢুকেছে। গুহার ভেতর অন্ধকার নেই।

উঠতে গিয়ে টের পেলুম, এবার হেঁটে অতখানি পথ যাওয়া ভারি কষ্টকর হবে। কিন্তু উপায় নেই।

ফকির সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন,—শরীর কেমন বাবা? হেঁটে যেতে পারবে তো?

একটু হেসে বললুম,—দেখা যাক।

—যদি না পার, থেকে যাও। তোমার সেবাযত্নের ত্রুটি হবে না!

—না ফকিরসায়েব, আমাকে যেতেই হবে।

—তা হলে এসো।

ফকিরের সাহায্যে আস্তে-আস্তে উঠে বসলুম। নিচু খাদ। ফকির আগে, আমি পেছনে-সাবধানে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকলুম।

সত্যি এ একটা গোলকধাঁধা। ঘুরে-ঘুরে পথটা অন্ধকারে এগিয়েছে। আমি বাঁকগুলো গুনতে থাকলুম। নটা বাঁকের পর অন্ধকার ঘুচল। কিন্তু টের পেয়ে গেছি, এই সুড়ঙ্গ পথের আরও অনেক শাখাপথ আছে। তবে সেই পথগুলো আরও ঘুপটি। কাজেই ভুল হবার চান্স নেই।

আবছা আলোর মধ্যে চলার সময় হাত বাড়িয়ে ফকিরের অজান্তে একটুকরো পাথর কুড়িয়ে নিলুম। কিছুক্ষণ পরে ফাটলের মুখে পৌঁছনো গেল। ফকির বেরিয়ে গিয়ে ডাকলেন—এসো বাবা!

সেই সময় দ্রুত পাথরের টুকরোটা দিয়ে ফাটলের নীচে একটা বর্গমূল নির্ণয়ের চিহ্নের মতো চিহ্ন দিলুম।

ফাটলটা মোটে ফুট দেড়েক চওড়া, কিন্তু অনেকখানি লম্বা। অতিকষ্টে বেরিয়ে গিয়ে দেখি, সেই খাদে পৌঁছেছি। খাদটা বালি আর পাথরে ভর্তি। দুধারে খাড়া পাথরের দেওয়াল। ফকির ফের জিজ্ঞেস করলেন,—কষ্ট হচ্ছে কি হাঁটতে?

বললুম,—না।

—আমি কিন্তু বেশি দূর যেতে পারব না। তোমাকে মোহেনজোদাড়ের প্রটেক্টেড এরিয়ার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসব।

ফকিরের মুখে ইংরেজি শব্দটা শুনে চমকে উঠলুম। উচ্চারণও নিখুঁত। তা হলে কে এই ফকির? বললুম,—আপনি নিজের কোনো পরিচয়ই দিলেন না ফকিরসায়েব।

ফকির একটু হেসে বললেন,—কী হবে পরিচয় জেনে? পরিচয় বলতে আজ আর কি আছে আমার? ঈশ্বরের ধ্যানে কাটাচ্ছি। যেকটা দিন বাঁচব ঈশ্বরের ধ্যানেই কাটাব। বাবা, আমার মতো পাপী আর কে আছে? এ সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত!

—পাপী কেন বলছেন আপনি?

—হ্যাঁ বাবা, আমি মহাপাপী। একদিন আমিও মোহেনজোদাড়োর গুপ্তধনের লোভে পাগল হয়ে উঠেছিলুম। গুপ্তধনের লোভ বড় সাংঘাতিক বাবা! এই লোভেই আমার এক প্রাণের বন্ধুকে খুন করেছিলুম!

বলে ফকির দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। আমি হতবাক।

পরক্ষণেই উনি সংযত হয়ে চোখ মুছলেন জোব্বায়। তারপর বললেন,—চলো বাবা! এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে।

বাকি পথ আমরা দুজনেই চুপচাপ এলুম। মাইলখানেক চলার পর দেখা গেল, একখানে খাদের দুধারেই ঝোপঝাপ গাছপালা দেখা যাচ্ছে। পাথরও বিশেষ নেই। দুধারে পাড় অনেক ঢালু। ফকির বললেন,—বাঁ পাড়ে উঠে গেলেই আশা করি চিনতে পারবে।

আমি কৃতজ্ঞতায় ওঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে এগিয়ে গেলুম। এক সময় পাড়ে উঠে পিছু ফিরে দেখি ফকির দ্রুত চলেছেন খাদের পথে। একবারও ওঁকে পিছু ফিরতে দেখলুম। না। কিন্তু কে এই ফকির? ...

ঘোড়াভূত ও ডঃ আলুওয়ালা

ট্যুরিস্ট ম্যানেজার ইকবাল খাঁ আমাকে দেখেই দৌড়ে এলেন। বললেন,—কী ব্যাপার মিঃ চৌধুরী? আপনার এ দশা কেন? কোথায় ছিলেন সারারাত? আমরা তো ভেবেই অস্থির। আপনার কর্নেল সাহেব আবার সকালে আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন। ডঃ করিম আর কর্নেল কামালও গেছেন একদল মিলিটারি নিয়ে।

—মিলিটারি নিয়ে? সে কী?

ইকবাল খাঁ হাসলেন। —এ দেশে মিলিটারি ছাড়া দুশমনদের জব্দ করা যায় না মিঃ চৌধুরী। আমরা কথায় কথায় মিলিটারির সাহায্য নিই। যাকগে, ঝটপট পোশাক বদলান। আমি খবর পাঠাই ওঁদের।

আমাদের ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি ওঁর কাছে রয়েছে। দরজা খুলে দিলেন। বেয়ারা হুকুমের অপেক্ষায় সেলাম দিয়ে দাঁড়ালে বললুম,—আপাতত এককাপ কড়া কফি ছাড়া আর কিছু দরকার হবে না।

—ব্রেকফাস্ট খাবেন না স্যার?

—ওঁরা ফিরে আসুন, তারপর।

বেয়ারা চলে গেল। একটা এনার্জি ট্যাবলেট বের করে খেয়ে ফেললুম। তারপর বাথরুমে পোশাক ছাড়লুম। স্নান করে এসে দেখি, কফি রেডি।

জানালার কাছে বসে কফি খেতে খেতে মোহেনজোদাড়ো শহরের দিকে তাকিয়ে রইলুম। কী বিচিত্র মানুষের অতীত ইতিহাস!

অনেকক্ষণ পরে বাইরে জিপের শব্দ হল। তারপর দুমদাম জুতোর শব্দ শোনা গেল বারান্দায়। প্রথমে ঢুকলেন কর্নেল কামাল খাঁ। দৈত্যাকৃতি পাঠান ভদ্রলোক এক লাফে এগিয়ে আমাকে প্রায় শূন্যে তুলে ফেললেন। মুখে শুধু—হ্যাল্লো, হ্যাল্লো!

ডঃ করিম বললেন,—তবিয়ত ঠিক আছে তো জয়ন্তবাবু?

বললুম,—হাঁ, ঠিক আছে।

আমার বৃদ্ধ বন্ধু টাকে হাত বুলোচ্ছেন এবং মিটমিট হাসছেন। টুপিটা বগলদাবা। গলায় বাইনোকুলার ও ক্যামেরা যথারীতি ঝুলছে। বললেন,—আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে ডার্লিং! হবারই কথা। ফকিরসাহেব অতি দয়ালু এবং স্নেহপ্রবণ মানুষ।

চমকে উঠে বললুম,—ফকিরসাহেবের কথা আপনি কীভাবে জানলেন?

তিনজনেই অট্টহাস্য করে উঠলেন। তারপর কর্নেল বললেন,—এটা কোনো অলৌকিক উপায়ে অবগত হইনি আমরা। কারণ আমরা ফকির নই। সাধারণ মানুষ মাত্র।

বিরক্ত হয়ে বললুম,— হেঁয়ালি করার দরকার কী?

ডঃ করিম বললেন,—একটা হেঁয়ালি বোধহয় আছে জয়ন্তবাবু। আপনাকে রাতে বিশেষ খোঁজাখুঁজি করতে পারিনি, সেজন্য ক্ষমা করবেন। অন্ধকার ওই এলাকায় গেলে আবার দুশমনগুলোর সঙ্গে অকারণ গুলি ছোড়াছুড়ি করতে হত। তাই সকালে বেরিয়ে পড়েছিলুম। খাদ বরাবর সিন্ধুনদ পর্যন্ত এগিয়ে ব্যর্থ হয়ে যখন ফিরে আসছি, একস্থানে আপনার বন্ধু বালিতে আপনার জুতোর ছাপ আবিষ্কার করলেন। ছাপ ক্রমশ উত্তর-পশ্চিমে এগিয়েছে। তার মানে, বোঝা গেল আপনি ফিরে চলেছেন। একটা বাঁক পেরিয়ে দেখি একজন ফকির হন্তদন্ত হয়ে আসছেন। আমাদের তিনি দেখেই পাড়ের দেওয়ালের খাঁজে লুকিয়ে পড়লেন। কর্নেল কামাল খাঁ তাঁর বাহিনী নিয়ে দৌড়ে গিয়ে জায়গাটা ঘিরে ফেললেন। গুলি ছোড়ার ভয় দেখালে ফকিরসাহেব বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখেই আপনার খবর পাওয়া গেল।

কর্নেলের দিকে ঘুরে বললুম,—ওই ফকির কিন্তু বাঙালি এবং রীতিমতো শিক্ষিত লোক।

কর্নেল বললেন,—জানি বৎস! তবে তুমি কি ওঁর আসল পরিচয় টের পেয়েছ?

—না তো। কে উনি?

—উনি এক প্রখ্যাত বাঙালি পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ডঃ ফরিদ আমেদ। একসময় কলকাতার পুরাতত্ত্ব দফতরের অধিকর্তা ছিলেন। অজন্তা, ইলোরা এবং সিন্ধুসভ্যতার ওপর ওঁর মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থগুলো দেশ-বিদেশে এখনও সমাদৃত হয়। দেশভাগের পর উনি চলে যান প্রাক্তন পূর্বপাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশে। সেখানে রিটায়ার করার পর দিব্যি ছিলেন। হঠাৎ লন্ডনে একটা সেমিনারে আমন্ত্রিত হন এবং সেখানে গিয়ে জাদুঘরে একটা ব্রোঞ্জের ফলক দেখতে পান।

—রাজা হেহয়ের আসল ফলকটা তো?

—ঠিক বলেছ। ওই হল ওঁর কাল। অভিশপ্ত ফলক বলতে পার। ফিরে এসে ফলকের পাঠোদ্ধারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সে এক দীর্ঘ কাহিনি। সংক্ষেপেই বলছি। বর্ধমানের গ্রামে ডঃ ভট্টাচার্যের ছেলে সেই শিক্ষক ভদ্রলোকের কাছেও উনি অনেকবার যাতায়াত করেছিলেন। কারণ ডঃ ভট্টাচার্যের বইয়ে ফলকটার উল্লেখ ছিল। শেষপর্যন্ত ওঁর ডায়েরিটা দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন ডঃ আমেদ। নিজের অনুবাদের সঙ্গে ডঃ ভট্টাচার্যের অনুবাদের মিল দেখে আর ধৈর্য ধরতে পারেন নি। নাম ভাঁড়িয়ে ভারতের নাগরিক সেজেই উনি পাসপোর্ট-ভিসা জোগাড় করেন।

আবার একপ্রস্থ কফি এল। আমার ব্রেকফাস্টও এসে গেল। খেতে-খেতে বললুম,—তারপর কী হল বলুন?

কর্নেল বললেন,—ডঃ আমেদ একটা ভুল করলেন। ডঃ ভট্টাচার্যের ডায়েরিতে লারকানার স্টেশন মাস্টার মিঃ আলুওয়ালার উল্লেখ ছিল। তাঁর ছেলে ডঃ আলুওয়ালার সঙ্গে ডঃ আমেদের অল্প চেনাজানা ছিল। একা মোহেনজোদাড়ো অভিযানে যেতে সাহস করেন নি। ডঃ আলুওয়ালাকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ডাঃ আলুওয়ালা পণ্ডিত মানুষ হলে কী হবে? ভীষণ পাজি লোক। যাবার আগে ষড়যন্ত্র করেন যে গুপ্তধন পেলে ডঃ আমেদকে মেরে ফেলা হবে। তাই এক আন্তর্জাতিক ডাকতদলের সর্দার কিষাণচাঁদের সাহায্য নিলেন। কিষাণচাঁদ পণ্ডিত সাজলো। নাম নিল ডঃ ব্রীজেশ সিং। ডঃ আমেদ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হলেন। যাইহোক, ডঃ আমেদ একটা কাজ কিন্তু করেছিলেন, ফলকের প্রকৃত অনুবাদের কথা সঙ্গীদের জানান নি। এখানে এসে বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেন তিনজনে। তারপর একরাতে তিনজনে কী একটা কথায় নাকি তুমুল ঝগড়া বেধে যায়। রাগের চোটে ডঃ আমেদ খাদের ওপর থেকে ধাক্কা মেরে ডঃ আলুওয়ালাকে ফেলে দেন। কিষাণচাঁদ তাঁকে আক্রমণ করে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ওই সময় একদল মিলিটারি টহলদার দূর থেকে সার্চলাইট ফেলেছিল। নেহাত রুটিন মাফিক ঘোরাঘুরি করছিল ওরা। এর ফলে কিষাণচাঁদ পালিয়ে যায়। ডঃ আমেদ লুকিয়ে পড়েন। সকালে খাদে নেমে একজায়গায় রক্ত দেখে ওঁর অনুতাপ জাগে। ভাবেন, নির্ঘাত ডঃ আলুওয়ালা এখানে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন এবং নেকড়েরা তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলেছে। ধর্মভীরু ডঃ আমেদের অনুশোচনা তীব্র হয়ে ওঠে ক্রমশ। দিনের পর দিন পাপবোধে অস্থির হয়ে ওঠেন। তারপর ফকিরী অবলম্বন করেন। তারপর থেকে ওইভাবে থেকে গেছেন।

—এসব কথা কি উনিই বলেছেন আপনাকে?

আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন কর্নেল কামাল খাঁ। —মিঃ চৌধুরী, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ফকিরসাহেব ওরফে ডঃ আমেদকে আমি গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছি। জেরার চোটে উনি সব কবুল করেছেন।

চমকে উঠলুম। —গ্রেফতার করেছেন? কেন?

—প্রথম কথা উনি নাম ভাঁড়িয়ে ভিসা জোগাড় করেছিলেন। পরে আমার গোয়েন্দা দফতর সেটা টের পেয়ে ওঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল এটা দুবছর আগের ঘটনা। দ্বিতীয় কথা, উনি বে-আইনিভাবে গুপ্তধন খোঁজাখুঁজি করছেন। আমরা কিষাণ সিং এবং ডঃ আলুওয়ালাকেও গ্রেফতার করার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম। কিন্তু ব্যাপারটা টের পেয়েই দুজনে গা ঢাকা দিয়েছে।

কর্নেল সরকার বললেন,—কিষাণ সিং কে জানো? তুমি প্লেনে যে ভদ্রলোকের পাশে বসে এসেছ—সেই জাল ডঃ অনিরুদ্ধ যোশী!

কর্নেল কামাল খাঁ বললেন,—গা ঢাকা দিয়ে দুজনে দলবল নিয়ে ওই এলাকায় লুকিয়ে আছে। ওদের অস্ত্রশস্ত্র আছে প্রচুর। কিষাণ সিং-এর লোকেরা তো ওখানে বরাবর রয়ে গেছে। কোনো গুহায় আস্তানা গেড়েছে। খুঁজে বের করতেই হবে।

বললুম,—ফকিরসাহেব কোথায় এখন?

—আপাতত লারকানায় হাজতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

শুনে খুব দুঃখ হল। কিন্তু এদেশে মিলিটারি আইন। কিছু করার নেই।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে কর্নেল কামাল খাঁ এবং ডঃ করিম চলে গেলেন। কর্নেলকে বললুম,—হ্যালো ওল্ড ম্যান। ফকিরসাহেবের কাছে কী শুনেছেন জানি না। আমার ব্যাপারটা এবার আপনার শোনা দরকার। আমি গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছি।

কর্নেল চমকে উঠলেন—সে কী? কোথায়? কীভাবে পেলে?

—বলব। একটা শর্ত।

—কী শর্ত?

—কথা দিন, পাকিস্তানি গোয়েন্দা দফতরের অধিকর্তা এবং আপনার বন্ধু ওই কর্নেল কামাল খাঁকে বলে ফরিকসাহেবের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—চেষ্টা করতে পারি।

—চেষ্টা নয়, করতেই হবে। কামাল খাঁর হাতে প্রচুর ক্ষমতা!

—ঠিক আছে। এবার বলো?

—ফকিরসাহেব যে গুহায় থাকেন এবং আমি যেখানে আশ্রয় পেয়েছিলুম, সেখানে একটা বেদি আছে। তার গায়ে অবিকল সেই ফলকের চিত্রলিপি খোদাই করা আছে।

কর্নেল অবাক হয়ে বললেন,—বলো কী জয়ন্ত!

—হ্যাঁ। গুহার পথ খুঁজে বের করা কঠিন। তাই গোপনে একটা চিহ্ন দিয়ে এসেছি।

কর্নেল গম্ভীর মুখে কিছু ভাবলেন তারপর বললেন,—তা হলে তো ফকিরসাহেব অর্থাৎ ডঃ আমেদ গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েই গিয়েছিলেন! অথচ ... আশ্চর্য তো!

—কী আশ্চর্য!

—তবু উনি গুপ্তধন উদ্ধার করেননি কেন?

—হয়তো সংসারত্যাগী ফকির হয়েছেন এবং ডঃ আলুওয়ালাকে মেরে ফেলায় পাপ হয়েছে ভেবেই নির্লোভ থাকার সাধনা করেছেন। বলেছিলেন, প্রায়শ্চিত্ত করছি।

—হুম! তোমার এ কথায় যুক্তি আছে।

—সেই স্বাভাবিক। তাই বেদির সামনে ওঁকে ধ্যানমগ্ন দেখেছি।

—ঠিক, ঠিক ... বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর একটু পায়চারি করে বললেন,—জয়ন্ত, আমি আসছি।

বেরিয়ে গেলেন কর্নেল। আমার শরীরের ব্যথাটা যায়নি। একটা পেনকিলার ট্যাবলেট খেয়ে নিলুম এবং শুয়ে পড়লুম। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। ...

দুপুরে লাঞ্চের সময় কর্নেল এসে আমাকে জাগালেন। তখন শরীর অনেকটা হাল্কা হয়েছে আমার।

খাওয়া-দাওয়া সেরে কর্নেল বললেন,—এখনই ডঃ করিম এবং কর্নেল কামাল খাঁ এসে পড়বেন। ফোনে যোগাযোগ করতে না পেরে সেই লারকানা যেতে হয়েছিল। তোমার কথামতো কর্নেল কামালকে অনুরোধ করেছি। সম্ভবত ফকিরসাহেব মুক্তি পাবেন। তুমি চিন্তা করো না। তৈরি হয়ে নাও।

পোশাক পরে ফেললুম ঝটপট। এবার গুলিভরা রিভলভারটা নিতে ভুল করলুম না। বললুম।—দিনের আলো থাকতে-থাকতে পৌঁছানো দরকার। নইলে ফাটলের চিহ্নটা খুঁজেই পাব না।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—বোধ করি, তোমার চিহ্নের আর দরকার হবে না। কারণ ফকিরসাহেবকে কর্নেল কামাল সঙ্গে আনার চেষ্টা করবেন। নিজের গোপন আস্তানা চিনতে ওঁর ভুল হবে না আশা করি।

আমার মনে যেটুকু গর্ব ছিল, মিইয়ে গেল। মনে মনে কামনা করলুম, ফকিরসাহেব যেন কিছুতেই না আসেন। তা হলে আমাকেই সাধাসাধি করিয়ে ছাড়বে। এতকাল কর্নেল সব রহস্যে

চাবিকাঠিটি নিজের হাতে রেখেছেন। এবার চাবিকাঠি আমি ভাগক্রমে হাতিয়েছি। এমন মওকা ছাড়ব কেন?

কিছুক্ষণ পরে জিপের শব্দ হল বাইরে। আমরা বেরিয়ে গেলুম। ...

জিপে যেতে-যেতে ওঁদের যে আলোচনা হল, তাতে বুঝলুম কর্নেল কামাল খাঁয়ের বাহিনীটি বেশ বড়। একদল দুপুরে গিয়েই সেই শুকনো খাদের মাথায় ত্রিকোণ মাঠটা ঘিরে রেখেছে। পাথরের আড়ালে ওৎ পেতে সৈনিকেরা লক্ষও রেখেছে। সৈনিকগুলো নাকি একেবারে কসাই। কিষাণচাঁদের দলের লোকেদের পেলেই গলায় ছুরি চালিয়ে কোতল করবে। বেছে-বেছে কাঠখোট্টা ধরনের হিংস্র পাঠানদেরই মোতায়েন করা হয়েছে। কাজেই কিষাণচাঁদ আর সুবিধে করতে পারবে না আজ। একেই বলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। আগের দিন যেখানে জিপ রেখে আমরা খাদে নেমেছিলুম, সেইখানেই নামলুম। যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল, খাদের ওপরে উঁচুতে পাথরের আড়ালে মিলিটারি পাঠান সাবমেশিনগান বাগিয়ে বসে আছে। এ যে প্রায় যুদ্ধের আয়োজন।

বুঝলুম, কর্নেল কামাল খাঁ কাল সন্ধ্যায় কিষাণচাঁদের দলের হাতে ইটটি খেয়ে ভারি রেগে গেছেন এবং তার শোধটা ভালোমতো তুলবেন।

বেচারি মিঃ আলুওয়ালার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছিল। অধ্যাপক এবং পণ্ডিত মানুষ। অথচ গুপ্তধনের নেশায় পড়ে এমন সর্বনাশের পথে ছুটে বেড়াচ্ছেন কতদিন থেকে!

ব্রহ্মাবর্তরাজ হেহয়ের গুপ্তধন যে অভিশপ্ত তাতে কোনো ভুল নেই। সেই অভিশাপের জন্যেই মানুষ হয়ে পড়েছে ষড়যন্ত্রী শয়তান।

যাচ্ছি তো যাচ্ছি, খাদের যেন শেষ নেই। বাঁক ঘুরে পুবে এগিয়ে সেই গুহা। কিন্তু অবাক কাণ্ড, ঠিক সেই জায়গাটা আমি চিনতে পারছিনে কেন? কর্নেল বারবার জিজ্ঞেস করছেন। আমি বাঁদিকে খাড়া দেওয়ালের মতো পাড়ে ফাটল খুঁজছি। এখানে কোথাও ফাটল নেই। তা হলে কি বেশি এগিয়ে এসেছি?

মনে পড়ছে, বাঁকের পরই বাঁদিকে ফাটল শুরু হবার কথা। অজস্র ফাটল পাথুরে পাড়ে তখন লক্ষ করেছিলুম। কিন্তু কই সেগুলো?

এবার কর্নেল মুচকি হেসে বললেন,—জয়ন্ত সব গুলিয়ে ফেলেছে। তা হলে এবার আমরা নিজেদের বুদ্ধির ওপর ভরসা করে খুঁজি। কী বলেন ডঃ করিম?

ডঃ করিম বললেন,—অগত্যা তাই।

কর্নেল কামাল খাঁ আমাদের দেহরক্ষীর মতো দুহাতে দুটো রিভলভার বাড়িয়ে সাবধানে চারিদিকে দেখতে দেখতে পিছনে আসছিলেন। বললেন,—কী হল?

কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত পথ হারিয়েছে।

একেই বলে পিলে চমকানো হাসি। এক কর্নেলের কথা শুনে আরেক কর্নেল যা একখানা হাসলেন, এই খাদের মধ্যে যেন মেঘ ডাকল।

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ও ডঃ করিম বালির দিকে ঝুঁকে বোধকরি আমারই সকালবেলার জুতোর ছাপগুলো খুঁজছেন। কিন্তু খাদের মধ্যে প্রবলবেগে বাতাস বইছে। শুকনো বালি উড়ছে। ছাপ ঢেকে গেছে সম্ভবত।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, গুহার ফাটল দিয়ে বেরিয়ে খাদের ওপারে প্রথমেই চোখে পড়েছিল একটা বিরাট লাল পাথর। এখানে কোথাও অমন লাল পাথর না থাকায় ওটা চোখে না পড়ে পারে না। কথাটা বললুম ওঁদের। ওঁরা খুঁজতে ব্যস্ত হলেন।

আমি ডানদিকের পাড়ে পাথরগুলো ভালো করে দেখার জন্যে কর্নেলের কাছে বাইনোকুলার নিলুম। প্রথমে পিছনের দিকে অর্থাৎ যেদিক থেকে এসেছি,সেদিকে ডান পাড়টা খুঁটিয়ে দেখলুম। কোনো লাল পাথর নেই কোথাও। অন্তত মাইলখানেক দূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

তারপর সামনের দিকে ডান পাড় বরাবর লক্ষ করলুম। কিন্তু কোথায় গেল লাল পাথরটা? এ যে রীতিমতো রহস্যময় ব্যাপার! সামনে খাদ সোজা পুবে গিয়ে সিন্ধুনদে মিশেছে। পাথরের একটা প্রাকৃতিক বাঁধ দেখা যাচ্ছে শেষ সীমায়। তাই বর্ষায় এই নদের জল ঢোকার সুযোগ পায় না। তবে বৃষ্টির জল জমতে পারে। কিন্তু এই এলাকায় বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। তাই জল জমলেও তার পরিমাণ সামান্য হওয়াই সম্ভব। বুঝতে পারলুম, এজন্যেই গুহাটা নিরাপদ রয়েছে। নইলে বর্ষায় জল ঢুকে যেত। ফকির সাহেবের পক্ষে ওখানে বাস করা সম্ভবই হত না।

বাইনোকুলারে চোখ রেখেই একথা ভাবছিলুম, আমাদের কাছেই ডান পাড়ে একটা পাথরের আড়ালে কালো রঙের কী একটা বসেছিল, সরে গেল। বললুম,—কর্নেল! নেকড়ে বাঘ নিশ্চয় কালো হয় না। অথচ একটা কালো জন্তু দেখলুম যেন। এখানে কি ভাল্লুক আছে?

কর্নেল কামাল খাঁ বললেন,—কোথায়, কোথায়?

—ওই যে ওখানে।

সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে উনি ওপর দিকটা তাক করে দুহাতের রিভলভার থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুড়ে বসলেন। প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল। তারপর তুলকালাম ঘটে গেল।

আমাদের বাঁদিকের পাড়ে সেই ত্রিকোণ মাঠ অন্তত একশ ফুট উঁচুতে রয়েছে। সেখানে থেকে পাঠান মিলিটারিরা গুলিবর্ষণ শুরু করে দিল। আমরা উপুড় হয়ে শুয়ে প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হলুম। কর্নেল কামাল খাঁ রেগে আগুন হয়ে গেলেন। দুর্বোধ্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে যখন উঠলেন, তখন সাদা বালিতে মিলিটারি পোশাক ভূতের পোশাক হয়ে উঠেছে। তারপর বিকট চিৎকার করে মাতৃভাষায় কী বললেন।

মুখ তুলে দেখি, পাড়ের উঁচুতে এক মিলিটারি পোশাক পরা মূর্তি দাঁত বের করে স্যালুট দিচ্ছে। পশ্চিম থেকে রোদ্দুর সোজা তার দাঁতে গিয়ে পড়েছে। সে এক দেখার জিনিস বটে!

বাকি তিনজন বালি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠলুম। হঠাৎ কর্নেল বলে উঠলেন, —জয়ন্ত জয়ন্ত! ওই তোমার লাল পাথর।

ঘুরে দেখে আমি হতবাক। আশ্চর্য কাণ্ড, এতক্ষণ ধরে খুঁজছি—কোথাও ছিল না। হঠাৎ যেন আলাদিনের-পিদিমের দৈত্যের মতো ওটা আমাদের নাকের ডগায় এসে ঠিক জায়গায় বসেছে। এই রহস্যের অর্থ কী?

কর্নেল গুম হয়ে যেন একথাই ভাবছিলেন। তারপর ইউরেকা বলে চেঁচিয়ে ওঠার মতো বললেন,—বুঝেছি! বুঝেছি! ব্যাপারটা আর কিছু নয়—মোহেনজোদাড়োর কাক।

—কাক! তার মানে?

—ওই দেখ, কাকগুলো এখন তুমুল চ্যাচাতে চ্যাচাতে পালিয়ে যাচ্ছে। আসলে ওই কাকগুলো লাল পাথরটা জুড়ে বসেছিল। তাই এতক্ষণ লাল রং ঢেকে গিয়েছিল। গুলির শব্দে ভয় পেয়ে পালাতেই লাল পাথরটা বেরিয়ে পড়েছে। শুনেছিলুম বটে কাকের কথা। সিন্ধুপ্রদেশে নাকি অসংখ্য কাকের উপদ্রব আছে। বিশেষ করে নাকি মোহেজোদাড়োতে কাকের উপদ্রবটা বেশি। এবার স্বচক্ষে দেখলুম।

বললুম,—কিন্তু লাল পাথরের বিপরীত দিকের পাড়ে ফাটল থাকার কথা। কিন্তু ফাটল নেই যে!

কর্নেল বললেন,—হুম! ওই তো ফাটল। একটা কেন? সারি সারি কয়েক গজ অন্তর অজস্র ফাটল দেখতে পাচ্ছি।

এতক্ষণে গোলমালটা টের পেলুম। সকালে সূর্যের আলো পড়েছিল। পশ্চিমের পাড়ে। এই পুব পাড়টা ছিল ছায়ায় ঢাকা। তাকালে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল ফাটলগুলো। কিন্তু সূর্য এখন পশ্চিমে রয়েছে। তার উজ্জ্বল কিরণ এসে পড়েছে পুব পাড়ের দেওয়ালে। সোনালি রঙের পাথরে সেই আলো ঠিকরে গিয়ে বিভ্রম সৃষ্টি করেছে। দেওয়ালটা মসৃণ বলেই রোদের প্রতিফলন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে।

এবার খুঁটিয়ে প্রতিটি ফাটলের তলার দিকে আমার এঁকে রাখা সেই বর্গমূল চিহ্ন খুঁজতে শুরু করলুম। সাতটা ফাটলের পর যে ফাটলটা দেখলুম, তার তলায় চিহ্নটা দেখা গেল এবং আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলুম,—পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে!

প্রথমে ঢুকলুম আমি। তার পিছনে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। তার পিছনে ডঃ করিম। শেষে কর্নেল কামাল খাঁ।

কর্নেল টর্চ জ্বেলে আমার কাঁধের ওপর ধরে রেখেছেন। গোলকধাঁধার পথ এটা। বাঁকে বাঁকে নটা সরু ফাটল দেখে গেছি। সেগুলো এড়িয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে গুহার মুখে পৌঁছনো গেল।

ভেতরে সকালের মতো আলো নেই। যদিও ফাটল দিয়ে ওপরের আলো টের পাওয়া যাচ্ছে। কারণ সকালে সূর্য ছিল ওদিকেই। সোজা আলো এসে ঢুকছিল। এখন সূর্য পশ্চিমে চলে গেছে।

বেদিতে পিদিম জ্বলছে না। দেখে কেমন খারাপ লাগল। ফকির সাহেবের কম্বলটা ভাঁজ করে রাখা আছে। ওঁর ঝোলাটাও আছে। কর্নেল কামাল খাঁও দুটো নিলেন। ডঃ করিম টর্চের আলোয় লিপিগুলো পরীক্ষা করে বললেন,—এই তা হলে সেই গুপ্তধন!

কর্নেল সরকার বললেন,—বেদিটা ভাঙা উচিত নয়। সেটা একটা জঘন্য অপরাধই হবে। বরং পরীক্ষা করে দেখা যাক আগে।

কর্নেল কামাল খাঁ বললেন,—আমার কাছে ট্রেঞ্চ খোঁড়ার ছোট্ট গাঁইতি আছে। দরকার হবে বলে এনেছি।

—দেখছি। বলে কর্নেল সরকার বেদির চারদিক খুঁচিয়ে দেখতে থাকলেন। তারপর ওপাশে গিয়ে দুহাতে সিন্দুকের ডালা খোলার মতো হ্যাঁচকা টান দিলেন। বেদির ওপরটা নড়ে উঠল।

ডঃ করিম বললেন,—এ কী! এ যে দেখছি একটা পাথরের সিন্দুক!

সবাই মিলে হাত লাগিয়ে পাথরের ডালাটা সরানো হল। ভেতরে আলো ফেলতে দেখা গেল, কোণার দিকে দুটো বাঁকা ধূসর রঙের আট-ন-ইঞ্চি মাপের চ্যাপ্টা কী জিনিস ছাড়া আর কিছু নেই।

কর্নেল হাত বাড়িয়ে তুলতে গিয়ে বললেন,—গুঁড়ো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। ওঠানো যাবে না!

বললুম,—কী ও দুটো?

—সম্ভবত ঘোড়ার চোয়াল। প্রিয় ঘোড়ার মৃত্যু হলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে তার দুটো চোয়াল যত্ন করে রাখা হত।

ডঃ করিম বললেন,—তা হলে রাজা হেহয়ের ঘোড়ার চোয়াল!

—তা ছাড়া আর কী। ... বলে কর্নেল হাত বাড়িয়ে কী একটা তুলে নিলেন। চোখের সামনে নাড়াচাড়া করে দেখে বললেন,—একটা ব্রোঞ্জের চাকতি। পরিষ্কার করে দেখতে হবে এই সীলমোহরটা কার।

কর্নেল কামাল খাঁ বললেন,—তা হলে গুপ্তধন নেই?

—সেই তো দেখছি। মনে হচ্ছে, কে কবে হাতিয়ে নিয়ে গেছে। কর্নেল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন। কতকাল আগে নিয়ে গেছে, কে বলতে পারে! হয়তো দুহাজার বছর আগে—কিংবা তারও আগে! ভাই কামাল সায়েব! সব গুপ্তধনই এখন তাই নিছক কিংবদন্তিতে পরিণত।

আমরা গুহার মধ্যে হতবাক হয়ে বসে রইলুম। একটু পরে স্তব্ধতা ভেঙে ডঃ করিম বললেন, —গুপ্তধন কী ছিল, জানি না। কিন্তু এ একটা বড় আবিষ্কার নয় কি কর্নেল সরকার? ব্রহ্মাবর্তরাজ হেহয়ের বাকি ইতিহাসটুকু পেয়ে গেলুম। এই পাথরের সিন্দুকই বিশ্বের পুরাতত্ত্বের ইতিহাসে সেরা একটি সম্পদ। আসলে এটাই একটা গুপ্তধন। দেশবিদেশে হিড়িক পড়ে যাবে। বিশেষ করে আপনাদের ভারতীয় পণ্ডিতরা এসেছেন। এই বিস্ময়কর আবিষ্কার দেখতে তাঁদের আমন্ত্রণ জানাব। ইতিহাসের এক রহস্যময় অধ্যায় এবার আলোকিত হয়ে উঠবে। ...

হঠাৎ আমাদের পিছনে থেকে কে জোরালো টর্চের আলো ফেলল। চোখ ধাঁধিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সে চিৎকার করে বলল,—একটু নড়লেই গুলি করব। যে যেভাবে আছ চুপ করে বসে থাকো। আর টর্চ নেভাও।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা হতচকিত। আমাদের টর্চগুলো নিভে গেল।

তারপর কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ডঃ আলুওয়ালা! শুনে দুঃখিত হবেন যে গুপ্তধনের সিন্দুকটা একেবারে খালি। স্বচক্ষেই দেখুন। রাজা হেহয়ের ঘোড়ার চোয়াল দুটো ছাড়া আর কিছু নেই।

মিথ্যা কথা! তোমরা গুপ্তধন বাগিয়ে লুকিয়ে ফেলেছ!

—না ডঃ আলুওয়ালা! আমরা ...

—চুপ! এখনও বলছি, গুপ্তধন বের করো। নয়তো গুলি করে মারব।

—গুপ্তধন যদি সত্যি আমরা বাগিয়ে থাকি এবং আপনাকে তা দিই, তাহলেও তো আপনি আমাদের খুন করবেন ডঃ আলুওয়ালা! কারণ, আমাদের বাঁচিয়ে রাখলে আপনিই বিপদে পড়বেন।

শুনে আমার আত্মা খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম। অথচ কর্নেল কী ঠাণ্ডা গলায় নির্বিকার মুখে কথা বললেন।

ডঃ আলুওয়ালা জোরালো আলোর পিছনে রয়েছেন বলে ওঁকে দেখতে পাচ্ছি না। এবার হা হা করে হেসে বললেন,—ঠিকই বুঝেছ! তা হলে রেডি। ...

হঠাৎ ওঁর পিছনে কাল রাতে শোনা সেই বিদঘুটে হাসি অথবা ঘোড়ার ডাক শোনা গেল—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ!

তারপর কী একটা ঘটল। ডঃ আলুওয়ালার টর্চ ছিটকে পড়ল। হাতের রিভলভার থেকে গুহার মধ্যে কান ফাটানো আওয়াজে গুলি বেরুল। কয়েক মুহূর্ত অন্ধকারে ধস্তাধস্তির শব্দ শোনা গেল। গুহার ভেতর ততক্ষণ উগ্র দুর্গন্ধে ভরে গেছে।

তারপর আমাদের টর্চগুলো জ্বলে উঠল। সেই আলোয় যা দেখলুম, গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একটা কালো চামচিকের মতো মানুষ জাতীয় প্রাণী ডঃ আলুওয়ালার বুকের ওপর বসে দুহাতে গলা টিপে ধরেছে। ডঃ আলুওয়ালার জিভ বেরিয়ে গেছে।

কর্নেল কামাল খাঁ দুহাতের দুটো রিভলভারেরই ঘোড়া টিপে দিলেন। প্রাণীটা একটা বিদঘুটে আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ল। তারপর কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে গেল।

আমরা হামাগুড়ি দিয়ে গেলুম। ডঃ আলুওয়ালাকে পরীক্ষা করে কর্নেল হতাশভাবে বললেন, —বেচারি মারা পড়েছেন। অতি লোভের পরিণাম!

প্রাণীটাকে কর্নেল কামাল খাঁ ও ডঃ করিম পরীক্ষা করেছিলেন। কর্নেল সরকার একটু ঝুঁকে দেখে নিয়ে বললেন,—এ কী! এ যে মানুষ! ...

বিদায় সম্বর্ধনায় তুলকালাম

লারকানা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের একটি বিশাল সভাকক্ষে ভারতীয় পণ্ডিতদের সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছিল পরদিন সকাল দশটায়। একের পর এক দু-দেশের পণ্ডিতরা বক্তৃতা দিয়ে উঠে মোহেনজোদাড়োতে নতুন এবং বিস্ময়কর প্রত্ন-আবিষ্কারের কথা বলছেন। প্রত্যেকেই কর্নেল বুড়ো এবং এই অধম সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরীর প্রশংসা করছেন। ডঃ আলুওয়ালার জন্য দুঃখ প্রকাশও করছেন।

শুনে-শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। উসখুস করছি দেখে কর্নেল বললেন,—তোমাকেও বক্তৃতা দিতে হবে ডার্লিং। তৈরি হয়ে নাও।

—পাগল, না মাথাখারাপ! আমি ওতে নেই। এক্ষুনি কেটে পড়ছি!

উঠতে যাচ্ছি, ডঃ করিম ঘোষণা করলেন,—এবার ভারতীয় সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরীর মুখে এই রোমহর্ষক আবিষ্কারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শুনবেন আপনারা। মিঃ চৌধুরী কলকাতার প্রখ্যাত পত্রিকা দৈনিক সত্যসেবকের স্পেশাল রিপোর্টার।

কী আর করি, অগত্যা মঞ্চে দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে দায়সারা কাহিনি শোনালুম। তারপর আসনের উদ্দেশে এগোলুম। মুহুর্মুহু করতালি চারদিকে। আমি তো একেবারে ঘাবড়ে গেছি।

গিয়ে দেখি, কর্নেলের আসন শূন্য। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ওঁকে খুঁজলুম। তারপর দেখি, দরজার পাশে উঁকি মেরে চোখের ইশারায় আমাকে ডাকছেন।

কাছে যেতে-যেতে শুনি, সভাপতি ডঃ করিম ঘোষণা করছেন—এবার আমি প্রখ্যাত প্রকৃতিবিদ কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে অনুরোধ করছি ...

বাইরে গিয়ে কর্নেল বললেন,—এসো, কেটে পড়া যাক।

বললুম,—আপনি অদ্ভুত মানুষ তো! এটা অভদ্রতা হচ্ছে না? আপনাকে তাঁরা বক্তৃতা দিতে ডাকছেন আর আপনি কেটে পড়ছেন?

কর্নেল জবাব না দিয়ে হনহন করে লন পেরিয়ে চললেন। আমার খুব রাগ হল। মাঝে-মাঝে বুড়োর মাথায় যেন ভূত চাপে। এমন একটা জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ ছেড়ে এবং রীতিমতো অভদ্রতা দেখিয়ে চলে গেলেন! এতে ভারতেরই মাথা কি হেঁট হচ্ছে না? কারণ উনি একজন ভারতীয় প্রতিনিধি!

দেশের সম্মান বাঁচাতে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। এখনই সভামঞ্চে গিয়ে জানিয়ে দেব, কর্নেল সরকার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি ভাষণ দিতে পারছেন না।

কিন্তু হলে ঢুকেই আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

মঞ্চে অবিকল কর্নেল মতোই দাড়ি ও টাকওয়ালা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক সবে মাইকের সামনে দাঁড়িয়েছেন এবং সবিনয়ে ঘোষণা করছেন,—অধমের নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ...

আমি কি স্বপ্ন দেখছি? আসল কর্নেল থাকতে নকল কর্নেল কেন রে বাবা?

ডঃ করিম এবং আরও অনেকে তো আসল কর্নেলকে চেনেন। এমনকি এই দু-তিনদিন ধরে ওঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়ালেন। অথচ একজন উটকো লোক উঠে গিয়ে কর্নেল সেজে মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছে।

আমি হতভম্ব হয়ে সামনের দিকে সাংবাদিকদের জায়গায় আমার নির্দিষ্ট আসনে বসতে গেছি, সেই সময় আচম্বিতে একটা তুলকালাম শুরু হয়ে গেল।

প্রথমে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হল। তারপর দেখলুম নকল কর্নেল মাইকের সামনে উঁচু ডেস্কটার তলায় ঢুকে পড়লেন।

তারপর চেঁচামেচি, হুড়োহুড়ি তাণ্ডব চলতে থাকল। মিলিটারি সেপাইদের মঞ্চ ঘিরে ফেলতে দেখলুম। ওরে বাবা! পাকিস্তানে কি আবার মিলিটারি বিপ্লব হচ্ছে তাহলে?

মঞ্চে কর্নেল কামাল খাঁকে দেখলুম। দুহাতে দুটো রিভলভার নিয়ে হেঁড়ে গলায় গর্জন করলেন,—যে-যেখানে আছেন, চুপচাপ বসে পড়ুন! আমরা আততায়ীকে পাকড়াও করেছি।

এই সময় আমার বাঁদিকের দরজার কাছে দেখতে পেলুম, সেপাইরা একটা লোককে টানতে-টানতে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটাকে আমার চেনা মনে হল। ওঃ হো! একেই তো সেদিন পার্কে ডঃ আলুওয়ালার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলুম। সভা এবার অনেকটা শান্ত হয়েছে। যারা হুড়মুড় করে বেরিয়ে গিয়েছিল, তারা অনেকে ফিরে এসে আসনে বসছে। বুঝলুম, এ দেশে এমন কাণ্ড যেন লোকের গা সওয়া।

কিন্তু ততক্ষণে আমি ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি।

গোয়েন্দা দফতর আগেভাগে টের পেয়েছিল, কর্নেল মঞ্চে উঠলেই গুপ্তঘাতকের পাল্লায় পড়বেন। তাই নকল কর্নেল সাজিয়ে গোপনসূত্রে পাওয়া খবরের সত্যতা যাচাই করতে চেয়েছিল। বলাই বাহুল্য, সত্যিকার কর্নেলকে মঞ্চে হাজির করে ঝুঁকি নিতে চায়নি। কিন্তু বলিহারি সাহস ওই নকল কর্নেল ভদ্রলোকের! যদি গুলিটা লাগত!

আমি আর বসে থাকতে পারলুম না। তখুনি ভিড়ের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। বাইরে কোথাও কর্নেলকে দেখতে পেলুম না।

তখন একটা ট্যাক্সি ডেকে সটান হোটেলে চলে গেলুম। ইন্টারলকিং সিস্টেমের দরজা লক করা আছে। চাবি দিয়ে খুললুম। হ্যাঁ, বুড়ো ঘরেই আছেন। তবে চুপচাপ বসে নেই। টেবিলে সেই গুহার সিন্দুকে পাওয়া চাকতিটা ঘষামাজা করছেন। দুটো ছোট শিশিতে সাদা ও রঙিন তরল পদার্থ রয়েছে। একটা ছোট্ট ব্রাশ দিয়ে ব্রোঞ্জের চাকতিটা পরিষ্কার করছেন কর্নেল।

হিটাইট সীলমোহর

ঘরে ঢুকেই রুদ্ধশ্বাসে যা ঘটেছে বললুম। শুনে কর্নেল একটু হাসলেন। বললেন,—কিষাণচাঁদ ওরফে ডঃ অনিরুদ্ধ যোশী সহজে ছাড়বে না। এবার মরিয়া হয়ে উঠেছে।

অবাক হয়ে বললুম,—কেন? গুপ্তধনের সিন্দুক তো খালি! মিছিমিছি আর কেন সে ঝামেলা করতে চাইছে?

কর্নেল চাকতিটা দেখিয়ে বললেন,—জয়ন্ত, ভেবেছিলুম রাজা হেহয়ের গুপ্তধন রহস্যের পর্দা এতদিন খুলতে পেরেছি। কিন্তু তার বদলে দেখছি, রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে উঠল।

—বলেন কী!

—এই চাকতিটা লক্ষ করো। একটা ফুটো দেখতে পাচ্ছ। তাই না? আমার ধারণা, ব্রোঞ্জের এই চাকতি বা সীলমোহরটা রাজা হেহয়ের ঘোড়ার কপালে ঝোলানো ছিল। চাকতির হরফগুলোর পাঠোদ্ধার করা পণ্ডিতদের কাজ। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, ব্রোঞ্জের ফলকটা বা পাথরের সিন্দুকের গায়ে যে-চিত্রলিপি আমরা দেখেছি, এগুলো সেই ঢঙের চিত্রলিপি নয়। তুমি এই আতস কাচের মধ্যে দিয়ে দেখতে পার এ কিছুতেই সিন্ধুসভ্যতার চিত্রলিপি নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের।

আতস কাচের সাহায্যে ব্রোঞ্জের চাকতিটা দেখতে থাকলুম। হ্যাঁ, কর্নেল যা বলছেন তাই বটে।

—এই চাকতির মধ্যে দণ্ডধারী পুরুষটি নিশ্চয় রাজা। ব্রহ্মাবর্তের রাজা হেহয়। কী বলেন কর্নেল?

কর্নেল হেসে বললেন,—ব্যস! তা হলে তুমি তো পাঠোদ্ধার করেই ফেলেছ দেখছি। তোমাকে পণ্ডিতরা এবার বিদ্যাদিগ্‌গজ বাচস্পতি উপাধি দেবেন, জয়ন্ত! নাকি বিদ্যার্ণব—বিদ্যাবাগীশ গোছের কিছু চাই তোমার?

ক্ষুব্ধ হয়ে বললুম,—এটা একটা রামছাগলকে দেখান। বলবে, এই মূর্তিটা একজন রাজার। রাজার হাতে রাজদণ্ড থাকে না?

কে জানে। —বলে কর্নেল অন্যমনস্কভাবে ঘড়ি দেখলেন। তারপর হাই তুলে বললেন,— ডঃ করিম আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা। তারপর বেরুব।

—কোথায় বেরুবেন? আবার ওই ঘোড়াভূতের আড্ডায় নাকি?

—হুম। কিন্তু তুমি ওকে এখনও ঘোড়াভূত বলছ কেন জয়ন্ত? বেচারী আসলে তো একজন মানুষ। রাজা হেহয়ের গুপ্তধনের লোভে এ পর্যন্ত কত মানুষ যে অমনি পাগল হয়ে গেছে, তার সংখ্যা নেই। এই হতভাগ্যের পরিচয় আর জানা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকুই বলতে পারি, সে পাগল হয়ে যাবার পর ওই এলাকার কোনো একটা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে জীবনধারণ করছিল। আর শেষ পর্যন্ত নিজেকেই ভেবেছিল, রাজা হেহয়ের সেই ঘোড়া!

—কিন্তু ওর গায়ের রঙ এত কালো হল কীভাবে?

—যে গুহায় ও ছিল, সম্ভবত সেই গুহায় কালো ছাই ভর্তি রয়েছে। কীসের ছাই, তাও এখানে ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়েছে। শুনলে অবাক হবে, কারবন-১৪ নামে একরকম আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতি আছে। তাতে প্রায় নিখুঁত হিসেব করে বলা যায়, জিনিসটি কত বছরের পুরনো। জানা গেছে, লোকটার গায়ে যে ছাই লেগে আছে, তা আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের কাঠ পোড়ানো ছাই।

—বলেন কী! তাহলে মোহেনজোদাড়োতে যখন মানুষ বাস করত, তখনকার ছাই!

—হ্যাঁ জয়ন্ত। তখনকারই।

—কিন্তু গুহার মধ্যে কাঠ পুড়িয়েছিল কেন?

—সম্ভবত ওটা ছিল মোহেনজোদাড়োবাসীদের শ্মশান।

—গুহার মধ্যে শ্মশান! কেন?

—জয়ন্ত, সব দেশেই প্রাগৈতিহাসিক কালে গোপনে মৃতদেহের সৎকার করার প্রথা ছিল। সর্বত্র এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। লোকে বিশ্বাস করত, মৃতদের আত্মা শান্তিতে থাকতে চায়। তাই এমন নির্জন জায়গায় তাদের শেষকৃত্য করা হত—যাতে কোনো ক্রমেই জীবিত মানুষদের জীবনযাত্রার কোনো আওয়াজ তাদের কানে না পৌঁছয়। নইলে তাদের শান্তির ঘুম ভেঙে যাবে এবং বিরক্ত হয়ে জীবিতদের ক্ষতি করতে থাকবে। বুঝলে তো?

—বুঝলুম। কিন্তু এও বুঝলুম, আপনি সেই শ্মশান গুহা আবিষ্কার না করে ছাড়বেন না। কিন্তু একটু আগে সম্বর্ধনা সভায় যা ঘটল, তাতে কি আপনার একটুও ভয় হচ্ছে না?

কর্নেল মিটিমিটি হেসে শুধু মাথা দোলালেন।

—কিষাণচাঁদ ডাকুর হাতে নির্ঘাত এবার প্রাণটি খোয়াবেন দেখছি।

—তুমি কি খুব ভয় পেয়েছ, ডার্লিং?

—আলবাৎ পেয়েছি। সবসময় আমার বুকে ভূমিকম্প হচ্ছে!

কর্নেল হো হো করে হেসে উঠলেন। —তত ভয়ের কারণ নেই জয়ন্ত! আমার বন্ধু কর্নেল কামাল খাঁ অতি ধুরন্ধর গোয়েন্দাসর্দার। কিষাণচাঁদের দলেও ওঁর এজেন্ট রয়েছে। কাজেই নিশ্চিন্তে গোঁফে তা দাও।

আমার গোঁফই নেই।

—গোঁফ রাখতে শুরু করো। ... বলে কর্নেল ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। ফোন বাজছিল। কাকে কী জবাব দিয়ে বললেন,—ডঃ করিম এবং আমাদের প্রতিনিধিদলের নেতা ডঃ তিড়কে এসে গেছেন।

একটু পরেই ওঁরা দুজনে ঘরে ঢুকলেন। ডঃ তিড়কে কর্নেলের বয়সি। মস্ত গোঁফ আছে। লম্বা ঢ্যাঙা রোগাটে গড়নের মানুষ। একটু কুঁজোও। তিনজনে টেবিলে ঘিরে বসে চাকতিটা দেখতে ব্যস্ত হলেন। আমি কর্নেলের নির্দেশমতো কফির অর্ডার দিলুম ফোনে। ঘড়িতে এখন বাজছে দুপুর বারোটা। লাঞ্চ সেই একটায়।

একটু পরে প্রথমে মুখ খুললেন ডঃ তিড়কে। —এটা হিটাইট চিত্রলিপি মনে হচ্ছে।

ডঃ করিম বললেন,—হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা।

কর্নেল বললেন,—হিটাইট? পশ্চিম এশিয়াবাসি আর্যদের একটা শাখা ছিল ওরা তাই না?

ডঃ তিড়কে বললেন,—হ্যাঁ, কর্নেল সরকার। হিটাইটরাও আর্য জনগোষ্ঠীভুক্ত ছিল। প্রথমে ওরাও বর্বর পশুপালক ছিল। অনেক প্রাচীন কৃষিকেন্দ্রিক নগরসভ্যতা ওরা ধ্বংস করেছিল। পরে ওরা ক্রমশ সভ্য হয়ে ওঠে। বাইবেলেও ওদের কথা আছে। সিরিয়ায় ওদের অনেক ফলক ও সীলমোহর পাওয়া গেছে।

ডঃ করিম বললেন,—হিটাইটরা নিজেদের দেশকে বলত হাট্টি বা হত্তি।

কর্নেল বললেন,—কিন্তু হিটাইট ভাষায় লেখা এই চাকতি রাজা হেহয়ের ঘোড়ার মাথায় ঝোলানো ছিল কেন? হেহয়কে তো উত্তর ভারতের ব্রহ্মাবর্ত রাজ্যের লোক বলা হয়। কোথায় সিরিয়া, কোথায় উত্তর ভারত!

ডঃ তিড়কে একটু ভেবে নিয়ে বললেন,—বড্ড গোলমেলে ব্যাপার, তা সত্যি। এই চাকতিতে কী লেখা আছে না জানা পর্যন্ত রহস্যভেদ করা যাচ্ছে না। ডঃ করিম, চলুন বরং আপনার স্টাডিতে

গিয়ে দুজনে কিছুক্ষণ মাথা ঘামানো যাক্। হিটাইট লিপির পাঠোদ্ধার তো জার্মান পণ্ডিত হেলমুথ থিওডোর বোসার্ট ১৯৪৬ সালে করে ফেলেছেন। কাজেই সেই সূত্র ধরে এগোলে আমরাও নিশ্চয় চাকতির লেখাগুলো পড়ে ফেলতে পারব।

ডঃ করিম বললেন,—কর্নেল সরকারকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কর্নেল সবিনয়ে হাসতে হাসতে বললেন,—ক্ষমা করবেন ডঃ করিম। আপনাদের কাজের সময় এই অপণ্ডিত মহামূর্খের উপস্থিতি অনেক বিঘ্ন ঘটাবে। আপনারা অনুগ্রহ করে সময়মতো জানাবেন, চাকতিতে কী লেখা আছে। ব্যস, তাহলেই যথেষ্ট।

চাকতি নিয়ে ওঁরা চলে গেলেন। দরজা লক করে এসে কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত আশা করি, বুঝতে পেরেছ যে রাজা হেহয়ের গুপ্তধনরহস্য কেন ঘনীভূত হয়েছে?

মাথা দুলিয়ে বললুম,—কিচ্ছু বুঝিনি।

—যে সিন্দুকটা আমরা গুপ্তধনের আধার বলে ভেবেছি, ওটা আসলে মৃত ঘোড়ার চোয়াল সংরক্ষণের জন্য প্রাচীন প্রথা অনুসারে তৈরি একটা পাথরের সিন্দুক। ... কর্নেল ছাত্রকে বোঝানোর ভঙ্গিতে বলতে থাকলেন। ... একটা ব্যাপার গোড়াতেই আমাদের বুঝতে ভুল হয়েছিল। ব্রহ্মাবর্তরাজ হেহয়ের মাতৃভাষা কিছুতেই সিন্ধুভাষা ছিল না—হতেই পারে না। তিনি এখানে বিদেশি মাত্র। যদি গুপ্তধনের সঙ্কেত তিনি ফলকে লিপিবদ্ধ করেন, তাহলে মাতৃভাষাতেই করা স্বাভাবিক ছিল। কাজেই এটা মোটেই রাজা হেহয়ের লিপি নয়। নিশ্চয় অন্য কারুর। তিনি স্থানীয় লিপিকারকে দিয়ে মোহেনজোদাড়োর ভাষায় লিখিয়ে নিয়েছিলেন, তাও বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। কারণ তাতে দ্বিতীয় একজন গুপ্তধনের হদিস পেয়ে যাবে। কোন বুদ্ধিমান মানুষ এটা করবেন না।

—তা হলে?

—এর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে। কোনো মোহেনজোদাড়োবাসী সন্দেহবশে রাজা হেহয়ের পিছু নিয়েছিল এবং সে যা দেখেছিল, তা একটা ব্রোঞ্জের ফলকে লিপিবদ্ধ করেছিল। এবার এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ডঃ ভট্টাচার্যের অনুবাদটা পড়া যাক। কী দাঁড়াচ্ছে শোনো :

'আমি দেখেছি : সৌরবর্ষের ষষ্ঠ মাসে চাঁদের প্রথম তিথিতে একজন লোক একটা ঘোড়া নিয়ে সিন্ধুনদের তীরে ত্রিকোণ ভূমিতে উপস্থিত হল। ঘোড়ার পিঠে একটা বাক্স ছিল। সে বাক্সটা শস্যক্ষেত্রের সীমানায় একটি বৃক্ষের নীচে পুঁতে রাখল।'

বললুম,—'আমি দেখেছি'-টা কোথায় পাচ্ছেন?

কর্নেল হতাশভঙ্গিতে বললেন,—তা হলে সব প্রাচীন লিপির ইতিহাস তোমাকে শোনাতে হয়। আপাতত সে-সময় হাতে নেই। শুধু জেনে রাখ, সব প্রাগৈতিহাসিক ফলক বা শিলালিপি বা সীলমোহর যা কিছু লেখা আছে, সবের গোড়ার ধরে নিতে হবে, কেউ কিছু বলছেন কিংবা ঘোষণা করছেন। অর্থাৎ প্রত্যেকটি লেখা ব্যক্তিগত উক্তি। আজকালকার মতো নৈর্ব্যক্তিক নয়। কোনো পুরোহিত বা কোনো রাজা বা কেউ না কেউ কিছু স্থায়ীভাবে অন্যান্য মানুষকে জানাতেই ওগুলো লিখেছেন। নিজে না লিখুন, লিপিকারকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন। কাজেই সব লেখার গোড়ায় 'আমি দেখেছি' বা 'আমি বলছি' এই কথাটা ধরে নিতেই হবে। এই ফলকে একটা ঘটনার কথা লেখা রয়েছে। কাজেই ...

বাধা দিয়ে বললুম,—বেশ, তাই। তা হলে পাথরের বাক্সেও অবিকল একই লেখা এল কী ভাবে?

—এর একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। সে লোভ সামলাতে না পেরে রাজা হেহয় এবং তার ঘোড়াটিকেও হত্যা করেছিল। তারপর তখনকার প্রথা অনুসারে পালিত পশু হিসাবে ঘোড়ার চোয়াল একটা পাথরের সিন্দুকে ভরে ওই গুহায় সমাধিস্থ করেছিল। ঘোড়ার মাথায় ঝোলানো সীলমোহর বা চাকতিটাও সিন্দুকে রেখে দিয়েছিল। কারণ ওটা ঘোড়াটারই একটা সাজ।

—কিন্তু গুপ্তধন?

—বলছি। পাথরের সিন্দুকের গায়েও একই কথা লিখে রাখার কারণ : নিজের জীবনে যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটল, তার একটা বিবরণ আরও স্থায়ীভাবে রেখে যেতে চেয়েছিল সে। এবার গুপ্তধনের প্রসঙ্গে আসি। আমরা দুটো লেখাতেই কিন্তু এমন কোনো আভাস পাচ্ছি না, যাতে নিশ্চয় করে বলা যায় ঘোড়ার পিঠে সোনাদানা হীরা-জহরত ছিল। একটা বাক্স-জাতীয় জিনিস চিত্রলিপির ঘোড়ার পিঠে দেখছি এবং তিনটে ডালওয়ালা গাছের তলাতেও শুধু সেই বাক্সই দেখছি। একই চৌকোণা জিনিস এবং মধ্যিখানে একটা বিন্দুচিহ্ন।

—তা হলে কী এমন অমূল্য জিনিস ছিল বাক্সে, যা রাজা হেহয় কাকেও জানতে দিতে চাননি?

—বোঝা যাচ্ছে না। শুধু এটুকু বুঝতে পারছি মোহেনজোদাড়োবাসী লোভী ও খুনে লোকটি বাক্সর মধ্যে হিরে-জহরত সোনাদানা না পেয়ে নিরাশ হয়ে কিংবা পাপবোধে অনুতপ্ত হয়েই ঘটনাটা লিখে রেখেছিল।

—ভ্যাট্! আরও গোলমাল হয়ে গেল সব। তিব্বতি মঠের পুঁথিতে বলা হয়েছে নাকি, রাজা হেহয় ধনরত্ন নিয়েই আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানে।

—তিব্বতি মঠের সাধুরাও কি ওই লোকটির মতো ভুল করতে পারে না?

—হ্যাঁ! তা অবশ্য ঠিকই।

এই সময় ফের ফোন বাজল। কর্নেল ফোন তুলে কী শুনে নিয়ে বললেন,—অলরাইট। উই আর রেডি। তারপর ফোন রেখে বললেন,—জয়ন্ত, লাঞ্চের আয়োজন করা হয়েছে। তৈরি হয়ে নাও। ...

ফকিরসাহেবের কেরামতি

বিকেলে আমরা আবার চলেছি মোহেনজোদাড়োর দিকে। এবার সঙ্গে রীতিমতো মিলিটারি কনভয়। চারটে ট্রাকভর্তি মিলিটারি সামনে ও পিছনে যেন আমাদের জিপটাকে গার্ড দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ তো দেখছি ফ্রন্টে যুদ্ধ করতে যাওয়ার মতো। আমার অস্বস্তি বেড়ে যাচ্ছিল।

আমাদের জিপে আছেন আর পাঁচজন। কর্নেল, আমি এবং ডঃ তিড়কে বসেছি পেছনে। কর্নেল কামাল খাঁ জিপ চালাচ্ছেন। তাঁর পাশে বসেছেন ডঃ করিম। বুঝতে পারছি, ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিরাপত্তার কড়া আয়োজন করা হয়েছে।

ভারতের অন্যান্য প্রতিনিধি ও সাংবাদিকরা আজ মোহেনজোদাড়োর সাত মাইল দূরে একটা বৌদ্ধস্তূপ দেখতে গেছেন। সহকারী নেতা ডঃ দীনবন্ধু আচার্য তাঁদের নেতা হয়েছে। কারণ মূল নেতা ডঃ তিড়কে আমাদের সঙ্গে এসেছেন।

মোহেনজোদাড়োর কাছাকাছি এসে আমাদের জিপ একটা এবড়োখেবড়ো বাজে রাস্তার দক্ষিণে এগোল। বাঁদিকে অজস্র ন্যাড়া টিলার আড়ালে সিন্ধু নদ দেখা যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। ডানদিকে রুক্ষ ধু-ধু মরুভুমি বলাই চলে—বালি, পাথর আর কঠিন মাটির দেশ। ছোট-ছোট কাঁটাগাছ আর ক্বচিৎ ঝোপঝাড় আছে। সেইসব ক্ষয়াখর্বুটে ঝোপের পাতা মুড়িয়ে খাচ্ছে মস্ত-মস্ত ছাগল আর তাগড়াই

গড়নের দুম্বা নামে এক জাতের ভেড়া। কোথাও উটের পিঠে জিনিসপত্র চাপিয়ে দড়ি ধরে ধীরে-সুস্থে চলেছে কোনো মানুষ। মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, হাতে একটা লম্বা বর্শা। একখানে জিপসিদের ছোটখাটো একটা দলকে দেখলুম তাঁবু পেতে রান্নাবান্না করছে। ওখানে একটা কুয়ো আছে। একদল ছাগল ভেড়াকে লাইন দিয়ে চৌবাচ্চা থেকে জল খাওয়াচ্ছে রাখালরা। জিপসি মেয়েরা চাকা ঘুরিয়ে জল তুলছে আর অকারণে হাসাহাসি করছে। আমাদের মিলিটারি গাড়িগুলো দেখে কিছুক্ষণ যেন ওরা সবাই ভয় পেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

এবার সত্যি বলতে কী কোনো পথই নেই। অসমতল প্রান্তর ও বালিয়াড়ি পেরিয়ে কনভয় চলেছে। ধুলোর মেঘ চলেছে আমাদের সঙ্গে। দম আটকানো অবস্থা।

কর্নেল ও ডঃ তিড়কে চাপাগলায় কী সব আলোচনা করছেন। মাঝে মাঝে পিছু ফিরে সামনের সিট থেকে ডঃ করিমও তাতে যোগ দিচ্ছেন। কিছু বুঝতে পারছি না—শুধু 'হিটাইট' শব্দটা বাদে।

এদিকে ধুলোর ধূসর হয়ে গেছি সবাই। বড্ড বিরক্তিকর লাগছিল যাত্রাটা। একসময় কর্নেলের উদ্দেশে না বলে পারলুম না, —আর কতদূর?

সামনে থেকে ডঃ করিম জবাব দিলেন,—এসে পড়েছি।

সামনে বাঁদিকে সিন্ধুনদ দেখা যাচ্ছিল। ঘড়িতে তখন ছটা বাজে। সূর্য অস্ত যেতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি আছে। কিন্তু এবার আর ধুলো নেই। মাটি শক্ত। হলদে ঘাসের চাবড়া গজিয়েছে। তারপর একটা দুটো করে গাছও নজরে পড়তে থাকল। আমরা সিন্ধুনদের প্রায় কিনারা ধরে চলেছি এখন।

কোথাও কোনো বসতি দেখতে পেলুম না। তবে আরও দূরে দক্ষিণে দিগন্তের কাছে সবুজ রং দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলুম,—ওটা কী?

ডঃ করিম বললেন,—ওটা সেচ এলাকা। ওখানে সরকারি কৃষিক্ষেত্র আছে।

বাঁয়ে অনেকগুলো টিলা সিন্ধুনদের ধারে সার বেঁধে চলে গেছে সবুজ কৃষিক্ষেত্রের দিকে। ডাইনেও তেমনি টিলার সারি আছে। এখানে অজস্র কাঁটাগুল্মের জঙ্গল গজিয়ে রয়েছে। আর তার-মধ্যে একটা করে চ্যাপ্টা পাথর পোঁতা আছে দেখলুম। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, ওগুলো কোন্ যুগের গোরস্থান। প্রাগৈতিহাসিক যুগের তো বটেই। ওই পাথরগুলো নাকি এই এলাকার এক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছে খুব পবিত্র। তারা প্রতি বছর শীতের শুরুতে এসে ওখানে পুজো আচ্চা করে। ভেড়া বলি দেয়। মেলা বসে তখন। অনেক পর্যটক দেখতে আসে। শুনলুম, জায়গাটার নাম দুহালা। নামটা অদ্ভুত লাগল। কতকটা বাংলা-বাংলা নাম যেন!

এখানেই আমাদের কনভয় থামল। আমরা জিপ থেকে নামলুম। কর্নেল কামাল খাঁ মিলিটারি সেপাইদের দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব আদেশ দিলেন। তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সিন্ধুনদের ধারে টিলাগুলোর দিকে চলে গেল। কয়েকজন সেপাই সাবমেসিনগান নিয়ে পাহারায় রইল গাড়িগুলোর কাছে।

ফ্লাস্কে আনা চা খাওয়া হল ঘাসে বসে। আলোচনা শুরু হল তার ফাঁকে-ফাঁকে। সামনে একটা ম্যাপও রাখা হল। ওঁরা ঝুঁকে পড়লেন ম্যাপটার দিকে। আমি মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

একসময় অধৈর্য হয়ে উঠে দাঁড়ালুম। সেই প্রাগৈতিহাসিক গোরস্থানে গিয়ে চ্যাপ্টা পাথরগুলো দেখতে লাগলুম। প্রতিটি পাথর মাটির ওপর অন্তত ছ'সাতফুট লম্বা। তার গায়ে দুর্বোধ্য কী যেন লেখা আছে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, পূর্বভারতে মেঘালয় এলাকায় এমন অনেক গোরস্থান দেখেছিলুম বটে। শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি যাবার পথে একটা দেখেছি। আরও নানা জায়গায়। ওগুলো খাসি জাতির লোকদের কাছে খুব পবিত্র। ওরাও পুজো-আচ্চা করে সেখানে গিয়ে।

আমার পিছনে জুতোর শব্দ হচ্ছিল। ঘুরে দেখি, আমার বৃদ্ধ বন্ধুটি আসছেন। মুখে মিটিমিটি হাসি। —হ্যাল্লো খুদে পণ্ডিত! নতুন কিছু আবিষ্কার করলে নাকি?

— চেষ্টা করছি।

—কিন্তু সাবধান, এখানে বিস্তর ভূত আছে। ঘাড় মটকে দেবে।

বুড়োর কথায় না হেসে পারা যায় না। হাসতে-হাসতে বললুম,—আপনারা কি সেইসব ভূতের সঙ্গে লড়াই করতে সেপাইসান্ত্রি গোলাগুলি নিয়ে এসেছেন?

—তুমি ঠিকই ধরেছ, জয়ন্ত।

—আর কিষাণচাঁদ ডাকু বুঝি ওদেরই সর্দার।

—বাঃ! তা হলে তোমার বুদ্ধি খুলে গেছে!

—কিন্তু কর্নেল, আগেভাগে বলে দিচ্ছি, ওসব গোলাগুলির মধ্যে আমি নেই।

আমার মুখের কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে সিন্ধুনদের ধারে টিলাগুলোর দিকে পৃথিবী কাঁপানো একটা আওয়াজ হল। তারপর দেখলুম, কিছুটা দূরে প্রচণ্ড ধোঁয়া এবং তার সঙ্গে বড় বড় পাথরের টুকরো আকাশে ছড়িয়ে গেল। পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠেছিল। কী সাংঘাতিক ওই বিস্ফোরণ!

কর্নেল চাপা গলায় বললেন,—ডিনামাইট দিয়ে টিলাটা উড়িয়ে দিল বুঝি!

উত্তেজিতভাবে বললুম,—কারা ডিনামাইট চার্জ করল কর্নেল?

—আবার কারা? কিষাণচাঁদরা।

—কেন বলুন তো?

—একটা গুহায় ঢোকার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না, তাই পাহাড় উড়িয়ে দিয়ে সে গুহার পথ আবিষ্কার করতে চায়।

—কী আছে সে গুহায়?

—জানি না। শুধু এইটুকুই জানি, কিষাণচাঁদ মশাই ধুরন্ধর লোক এবং সে আমাদের টেক্কা দিতে পেরেছে। সম্ভবত সে অসাধারণ পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিতের সাহায্য নিয়েছে।

—ডাকুকে কোন পণ্ডিত সাহায্য করতে যাবেন?

কর্নেল জবাব না দিয়ে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। —চলে এসো জয়ন্ত। আমরা এবার রওনা দেব।

ওঁর সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে দেখলুম, ডঃ তিড়কে এবং কর্নেল কামাল খাঁ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। এবার দলবেঁধে সবাই দ্রুত টিলাগুলোর উপর দিয়ে এগিয়ে চললুম।

একটা টিলার উপর পৌঁছে বড় পাথরের আড়ালে সব বসে পড়লুম। উঁকি মেরে দেখে অবাক হয়ে গেলুম। নীচে সিন্ধুনদ দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হবে সমুদ্র যেন। কূল-কিনারাহীন। তবে জায়গায় জায়গায় অনেক বালিয়াড়ি দ্বীপের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। সেই চাতালে জনাপাঁচেক সশস্ত্র লোক একজন আলখাল্লাধারী ফকিরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

ফকির আর কেউ নন, আমার প্রাণদাতা সেই সাধকপুরুষ এবং বাঙালি পণ্ডিত ডঃ আমেদ!

কর্নেলের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। ফিসফিস করে বললেন,—যা আশঙ্কা করেছিলুম, তাই ঘটেছে। ফরিকসাহেব কিষাণচাঁদের পাল্লায় পড়েছেন।

ডঃ করিম বললেন,—মুক্তি পেয়েই উনি গা ঢাকা দিয়েছিলেন। অনেক খুঁজে আর পাত্তা পেলুম না। কিন্তু ভাবিনি যে উনি বোকার মতো আবার এখানে এসে পড়বেন।

ওঁকে থামিয়ে দিলেন কর্নেল কামাল খাঁ। ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে ইশারা করলেন। সেই সময় দেখলুম, মিলিটারি সেপাইরা বুকে হেঁটে চাতালটার দুদিক থেকে পাথরের আড়ালে এগুচ্ছে। আমার বুক টিপটিপ করতে লাগল। নির্ঘাত প্রচণ্ড লড়াই বেধে যাবে। তার মধ্যে ফকিরসাহেব বিপন্ন হয়ে পড়বেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই কর্নেল কামাল খাঁ পাঠান বলেই বুঝি এত গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষ।

কিন্তু তারপরই আশ্বস্ত হয়ে দেখলুম, সেপাইরা চাতালের তলায় গিয়ে ঢুকল। এবং ফকিরসাহেব দুহাতে বার কতক তালি বাজালেন। আকাশের দিকে মুখ।

তারপর সিন্ধুনদের দিকে ইশারা করে কিছু বললেন। সশস্ত্র লোকগুলো সেদিকে তাকিয়ে কী দেখতে থাকল। তখন সদ্য সূর্যাস্ত হয়েছে। সিন্ধুর জলে রক্তিম ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দেখতে-দেখতে সেই সিঁদুর গোলা জলের রঙ বদলাতে থাকল। এমন বিচিত্র দৃশ্য আমি দেখিনি। সোনালি-রূপালী পাখনা মেলে যেন অসংখ্য পরী স্নান করতে নেমেছে।

ব্যাপারটা বিস্ময়কর এজন্যে যে শুধু একটা জায়গায় ওই রঙের খেলা দেখা যাচ্ছে। লোকগুলো নিশ্চয় তাজ্জব হয়ে দেখছে। ফকিরসাহেব এবার সোজা দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে প্রার্থনা করছেন।

তারপর দেখলুম, ফকিরসাহেব প্রার্থনা শেষ করে কয়েকবার তালি দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাথরের চাতালটার কিনারা থেকে মিলিটারি সেপাইরা আচমকা লাফিয়ে উঠল এবং লোকগুলোকে ঘিরে ফেলল।

লোকগুলো চমকে উঠেছিল। ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থায় প্রত্যেকে বন্দুক ফেলে দিয়ে দুহাত তুলে দাঁড়াল।

কর্নেল কামাল খাঁ দৌড়ে নেমে গেলেন। দুহাতে দুটো রিভলভার থেকে দুবার গুলি ছুড়তে ভুললেন না।

আমারও নীচে গিয়ে ব্যাপারটা মুখোমুখি দেখার ইচ্ছে করছিল। কিন্তু একটু নড়তেই কর্নেল চিমটি কেটে বসে থাকতে ইশারা করলেন।

কর্নেল কামাল খাঁ এবং তাঁর বাহিনী ডাকাতগুলোকে আগ্নেয়াস্ত্রের ডগায় রেখে চাতাল থেকে নামালেন। অপেক্ষাকৃত ঢালু পথটা দিয়ে ভেড়ার পালের মতো তাড়িয়ে নিয়ে চললেন। ফকিরসাহেব এবার আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন।

কর্নেল বললেন,—চলুন, এবার যাওয়া যেতে পারে।

আমরা চারজনে নীচে নেমে গেলুম। নামাটা সহজ হল না অবশ্য। পাথরে সাবধানে পা রেখে নামতে হল।

কাছে গিয়েই ডঃ করিম বুকে জড়িয়ে ধরেছেন ফকিরসাহেবকে। কর্নেল এবং ডঃ তিড়কে করমর্দন করলেন ওর সঙ্গে। আর আমি ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালুম। এই মানুষটি আমার প্রাণদাতা!

ফকিরসাহেব হাসতে হাসতে বললেন,—কেরামতিটা কেমন দেখালুম বলুন? সিন্ধুনদের ওই জায়গাটায় অদ্ভুত আলোর খেলা দেখা যায় সন্ধ্যার আগে। ন্যাচারাল ফেনোমেনা। ব্যাটাদের বললুম, ওই দ্যাখ—ওখানেই রাজা হেহয়ের গুপ্তধন পোঁতা আছে। ওরা বিশ্বাস করল। ...

শ্মশানগুহার বিভীষিকা

ফকিরসাহেব ওরফে ডঃ আমেদের কাছে জানা গেল : কাল বিকেলে কর্নেল খাঁ ওঁকে মুক্তি দিয়েছিলেন। উনি তাঁর গুহার আড্ডায় ফেরার পথে কিষাণচাঁদের হাতে বন্দি হন। বুদ্ধিমানের মতো তিনি ওদের সাহায্য করতে রাজি হয়েছিলেন। নইলে প্রচণ্ড নির্যাতন করে ওরা তাঁকে মেরে ফেলত। এখানে ওই খাড়িমতো জায়গায় উঁচু তিনশো ফুট যে পাথরের দেওয়াল দেখা যাচ্ছে, তার গায়ে দুশো ফুট উঁচুতে একটা গর্ত আছে। এই গর্তটা একটা গুহার পথ। কিন্তু নীচে সিন্ধুনদের জল ওখানে সমুদরের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়েছে। তাই ওখানে কোনো নৌকা নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। গেলেও খাড়া পাথরের দেওয়াল বেয়ে উঠে গর্তে পৌঁছানো দুঃসাধ্য। তাই কিষাণচাঁদকে উনি পরামর্শ দিলেন, যদি দেওয়ালটার ওপর থেকে দড়ি ঝুলিয়ে সেই দড়ি বেয়ে কেউ নামতে পারে তাহলে একশো ফুট নীচে গর্তটায় পৌঁছতে পারবে। এ কাজ দক্ষ পর্বতারোহীর। ওদের দলে তেমন কেউ নেই। তাই সেই দুপুর থেকে গর্ত খুঁড়ে ডিনামাইট ভরে দিয়েছিল কিষাণচাঁদ। কিছুক্ষণ আগে আমরা সেই ডিনামাইটের বিস্ফোরণ টের পেয়েছি। দেওয়ালটা উড়ে গেছে। গুহার ছাদে ফাটল ধরেছে। সেই ফাটল দিয়ে কিষাণচাঁদ নেমে গেছে একা। সঙ্গীদের বলে গেছে, এক ঘণ্টার মধ্যে আমি না ফিরলে এই ফকিরকে জবাই করবে।

এখনও কিষাণচাঁদ ফেরেনি। এদিকে চাতালে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ ফকিরসাহেবের চোখে পড়েছিল, একদল মিলিটারি সেপাই পাথরের আড়ালে বসে আছে। তখন তিনি শয়তানগুলোকে কথায় কথায় ভুলিয়ে রাখেন এবং ওই কেরামতি দেখান। সেই সঙ্গে সেপাইদের এগিয়ে আসতেও ইশারা করেন।

কর্নেল কামাল খাঁ বন্দিদের ট্রাকে তুলে চালান করে ফিরে এলেন। এখন আলো আর নেই। ধূসরতা ঘনিয়ে উঠেছে। উনি এসেই বললেন,—কিষাণচাঁদ তো নেই ওদের দলে!

ফকিরসাহেব বললেন,—চলুন, আপনাদের কিষাণচাঁদের কাছে নিয়ে যাই। কিন্তু তার আগে বলুন, আপনারা এভাবে এখানে হঠাৎ এসে পড়লেন কোন্ সূত্রে?

জবাব দিলেন ডঃ তিড়কে। —সে ভারি অদ্ভুত যোগাযোগ বলতে পারেন। রাজা হেহয়ের ঘোড়ার কপালে যে ব্রোঞ্জের চাকতি ছিল, সেটা নিশ্চয় আপনি পাথরের সিন্দুকে দেখেছিলেন?

—হুঁ, দেখেছিলুম। কিন্তু আমি ও-নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাইনি। ঈশ্বরের দিকে যে মন ফিরিয়েছে, তার কাছে আর ওসব জিনিসের কতটুকু মূল্য ডঃ তিড়কে?

—তা ঠিক। এবার ব্যাপারটা শুনুন তা হলে। ওই চাকতিটা একটা হিটাইট সীলমোহর। হিটাইট লিপি আছে ওতে।

—বলেন কী! ব্রহ্মাবর্তরাজের ঘোড়ার সাজে হিটাইট লিপি!

—হ্যাঁ। যাই হোক, হঠাৎ আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, একটা হিটাইট ফলকে সিন্ধুনদ অঞ্চলের সূর্যপূজারী সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। তারা মৃতদেহের কবর দেয় এবং প্রতিটি কবরে পাথর পুঁতে খাড়া করে রাখে। তারা ঘোড়া আমদানি করে হিটাইট দেশ হাট্টি (বর্তমান সিরিয়া) থেকে। মোহেনজোদাড়োবাসীরা অবশ্য ঘোড়া তাদের কাছে দেখে থাকবে। কিন্তু ঘোড়া তারা যে কারণেই হোক, পছন্দ করেনি। হয়তো ঘোড়ার পিঠে চাপা পাপ ভাবত। লাঙল বা গাড়ি টানতে তো বলদই যথেষ্ট। আমি তাই ডঃ করিমকে জিজ্ঞেস করলুম সিন্ধুনদের তীরে তেমন কোনো গোরস্থান আছে নাকি। উনি বললেন,—হ্যাঁ, আছে। তখন ঠিক হল, আমরা সেখানে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করব। সেই সময় কর্নেল কামাল খাঁ জানালেন, কিষাণচাঁদের দল দুহালায় রওনা হয়ে গেছে। ওর দলে সরকারি

গোয়েন্দা আছে। সেই খবর দিয়েছে। তখন আমরা বুঝলুম, আমাদের অনুমান সঠিক। কিষাণচাঁদ কীভাবে এসব জানতে পেরেছিল, কে জানে।

কর্নেল কামাল খাঁ বললেন,—লারকানা জাদুঘরের সহকারি ডিরেক্টর আরশাদ হুসেন কিষাণচাঁদের পরামর্শদাতা। ফিরে গিয়েই ওকে আমি গ্রেফতার করব। এবার চলুন ফকিরসাহেব। অন্ধকার হয়ে এল যে!

ফকিরসাহেব পা বাড়িয়ে বললেন,—চলুন। কিন্তু সাবধান। আলো জ্বালাবেন না। আমি গোপনে একটা পথে আপনাদের ওই গুহায় নিয়ে যাব। শুধু মনে রাখবেন কিষাণচাঁদ খুব ধূর্ত এবং ভীষণ হিংস্র।

ফকিরসাহেব আগে, তাঁর পিছনে কর্নেল কামাল খাঁ, তাঁর পিছনে ডঃ করিম, তারপর একে-একে ডঃ তিড়কে, কর্নেল সরকার এবং আমি। আমি সবার পিছনে। অন্ধকার খুব একটা ঘন হয়নি। তাছাড়া আজ চতুর্থী, চাঁদের জ্যোৎস্না ফুটেছে। অসুবিধে হচ্ছিল না।

ওপরে উঠে সমতল একটা জায়গা পাওয়া গেল। ততক্ষণে চাঁদের আলো বেশ পরিষ্কার হয়েছে। এক ফাঁকে ফিসফিস করে কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলুম,—ব্রোঞ্জের চাকতিতে কি সত্যি গুপ্তধনের খোঁজ আছে?

কর্নেল ফিসফিস করে বললেন,—ভাগ চাই নাকি তোমার? পাবে, কথা দিচ্ছি।

রাগে মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। আমি কি গুপ্তধনের লোভে ঘুরে বেড়াচ্ছি এঁদের সঙ্গে? অদ্ভুত বললেন তো!

কাঁটাঝোপগুলো এড়িয়ে সাবধানে অনেকখানি যাওয়ার পর ফকিরসাহেব দাঁড়ালেন। সামনে আবার একটা প্রাগৈতিহাসিক কবরখানা মনে হল। সার সার চ্যাপ্টা উঁচু পাথরের চাঁই পোঁতা আছে। ফিকে জ্যোৎস্নায় ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো। আগে না দেখা থাকলে ভয়ে ভিরমি খেতুম।

ফকিরসাহেব ইশারায় সেই কবরখানায় ঢুকতে বলে এগিয়ে গেলেন। মাঝামাঝি গিয়ে একখানে একটা পাথরের সামনে দাঁড়ালেন। ফিসফিস করে বললেন,—এখানেই। তারপর পাথরের চাঁইটা অক্লেশে দুহাতে উপড়ে ফেললেন। এ যে দৈত্যদানবের কীর্তি! আমরা সবাই হতভম্ব হয়ে গেছি। কেউ কেউ অস্ফুটস্বরে বিস্ময়সূচক শব্দও করেছেন। তাই ফকিরসাহেব বললেন,—এই পাথরগুলো কাঠের তক্তার মতো হাল্কা। এক বিশেষ ধরনের পাথর। অথচ ভারি মজবুত। দুহালা এলাকার লোকেরা বলে চাঁদের পাথর। সূর্যদের পুজোয় খুশি হয়ে নাকি ওদের পূর্বপুরুষদের এইসব পাথর চাঁদ থেকে পাঠিয়ে দিতেন। পরীরা বয়ে আনত। অবশ্য কেউ মারা গেলে, তবেই। যাকগে, নীচের এই বেদিটার তলায় সুড়ঙ্গপথ আছে।

বলে উনি বেদির মতো চারকোণা একটা হাল্কাপাথর একইভাবে তুলে পাশে রাখলেন। বেদির মধ্যে পাথরের চাঁই বসানোর গর্ত রয়েছে।

ফকিরসাহেব বললেন,—সাবধান, আলো জ্বালবেন না কেউ। ভেতরে কিষাণচাঁদ কোথায় আছে আমরা জানি না। সিঁড়ি বেয়ে নামবেন একে-একে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের পিঠে হাত রাখবেন।

গর্তটা কোনোমতে একজন ঢোকার মতো। কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, —জয়ন্ত, ইচ্ছে না করলে তুমি অপেক্ষা করতে পার এখানে।

বললুম,—পাগল! একা এই ভূতের রাজ্যে বসে থাকার চেয়ে পাতালে আপনাদের সঙ্গে গিয়ে মরা ঢের ভালো।

একে-একে সবাই অদৃশ্য হলেন। তারপর কর্নেলের পিছনে আমিও নেমে গেলুম। কেমন একটা বাসি ধূপ-ধুনোর গন্ধ যেন। কুয়োর মতো সুড়ঙ্গের সিঁড়ি বেয়ে নামছি তো নামছি। ঠাসা অন্ধকার। সংকীর্ণ জায়গা। দম আটকে যাচ্ছিল।

কতক্ষণ পরে টের পেলুম, মেঝের মতো মসৃণ চওড়া একটা জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

হঠাৎ সামনে দূরে কোথাও একঝলক আলো জ্বলেই নিভে গেল। ফকিরসাহেব ফিসফিস করে বললেন,—আবার সবাই সবাইকে ছুঁয়ে পা বাড়ান। আমি আগে থাকছি।

এবার মেঝের মতো সমতল জায়গায় হেঁটে চলেছি পরস্পরকে ছুঁয়ে। কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে ঘুরে-ঘুরে অনেকখানি যাওয়ার পর সবাই দাঁড়ালাম। কোথায় খসখস শব্দ হচ্ছে। শব্দটা বাড়তে থাকল। তারপর উপর্যুপরি বন্দুকের আওয়াজে গুহার স্তব্ধতা চুরমার হয়ে গেল।

তারপর একটা অমানুষিক আর্তনাদ অথবা গর্জন শোনা গেল। আঁ—আঁ—আঁ—আঁ! ওটা যে মানুষের গলার নয়, তা ঠিকই। কিন্তু অমন কানে তালাধরানো ভয়ঙ্কর চিৎকার কোন প্রাণীর?

অমনি ফকিরসাহেব চাপা গলায় বলে উঠলেন—সর্বনাশ! শ্মশান-গুহার দানবটা জেগে গেছে। পালিয়ে আসুন পালিয়ে আসুন। যেপথে এসেছি, সেই পথে।

একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। ঝোঁকের মাথায় কর্নেল কামাল খাঁ টর্চ জ্বাললেন। ফকিরসাহেব বললেন,—আলো নয়। আলো নয়! আমার পিছু পিছু সেইভাবে চলে আসুন সবাই।

আমি সবার পিছনে। হুড়োহুড়ি করে উঠতে গিয়ে পড়ে গেলুম। তারপর গড়াতে গড়াতে আবার মেঝেয়। কর্নেল কি টের পেলেন না? পায়ের শব্দ ওপরের দিকে মিলিয়ে গেল দ্রুত। সেদিনকার চোটখাওয়া জায়গাতেই আবার চোট পেয়েছি। গোড়ালি দুমড়ে গেছে। উঠতে দেরি হল।

তারপর আর কিছুতেই সিঁড়িটা খুঁজে পেলুম না। যেদিকে যাই দেয়ালে বাধা পাই। শেষে একজায়গায় ফাঁক পেয়ে পা বাড়ালুম, কিন্তু সেখানে সিঁড়ি নেই। এদিকে পিছনে আবার বন্দুকের প্রচণ্ড আওয়াজ আর সেই অমানুষিক গর্জন বা আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে—আঁ—আঁ—আঁ—আঁ।

পাগলের মতো খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চললুম। কিছুটা যাওয়ার পর মনে হল ধুলোবালির মধ্যে হাঁটছি। গলা শুকিয়ে গেছে। আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছি। শেষপর্যন্ত মরিয়া হয়ে রিভলভার বের করলুম। এবং দেশলাই বের করে জ্বালাতেই দেখি, আমি কালো ছাই গাদায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছি!

তা হলে এই সেই মামদো-ভূতের আড্ডা শ্মশানগুহা! এখান থেকে বেরুতে পারলে আমাকেও সবাই মামদোভূত ভেবে বসবে, তাতে কোনো ভুল নেই।

অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি তো আছি। এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আবার কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়ব ভেবে পা বাড়াতে সাহস হচ্ছে না।

ওদিকে গুলির শব্দ ও গর্জন বা আর্তনাদটা আবার থেমেছে। মনে হচ্ছে, কিষাণচাঁদ কিংবা সেই অজ্ঞাত দানবের লড়াই শেষ হয়েছে এতক্ষণে। কে জিতেছে কে জানে! আমি মনে জোর আনার চেষ্টা করতে থাকলুম।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম জানি না, হঠাৎ পিছন থেকে আমার গায়ে টর্চের আলো পড়ল। ঘুরেই রিভলভার বাগিয়ে গর্জে বললুম,—কে তুমি?

আলোর পিছন থেকে চাপা অট্টহাসি হাসল কেউ। —কী? বুড়ো ঘুঘুর বাচ্চা! তুমি কেমন করে শ্মশান-গুহার ছাইগাদায় এসে জুটলে হে? তোমার বুড়ো ঘুঘুটি কোথায়? তার সাঙ্গপাঙ্গ টিয়া-বুলবুলি আর সেই হুতুম প্যাঁচাটাই কোথায়?

—আর একটা কথা বললে গুলি ছুঁড়ব।

—তার আগে তোমার মুণ্ডু উড়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছ না, এটা একটা স্টেনগান?

এবার লক্ষ করলুম, আলোর সামনে কালো একটা নল আমার দিকে তাক করে আছে। বললুম, —তুমি কি কিষাণচাঁদ?

—রিভলভার ফেলে দাও আগে। তারপর কথাবার্তা হবে।

—যদি না ফেলি।

—মুণ্ডুটি হারাবে। রেডি—ওয়ান ... টু ... থ্রি ...

রিভলভার ফেলে দিলুম। ছাইগাদায় ডুবে গেল। কিষাণচাঁদ এসে পায়ে ছাই সরিয়ে সেটা তুলে নিল। দেখলুম, ওর জামাপ্যান্টে রক্ত লেগে আছে। রক্তগুলো ওর নিশ্চয় নয়। কারণ ওকে আহত বলে মনে হচ্ছে না।

সে আমার জামার কলার খামচে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। পায়ের ব্যথার কথা ভুলে গেলুম। নির্ঘাত শয়তানটা আমাকে জবাই করতে নিয়ে যাচ্ছে।

নিচু ছাদওয়ালা একটা করিডোরের মতো জায়গা পেরিয়ে একটা প্রশস্ত ঘরে পৌঁছলুম। সেখানে দেখি, অনেক মাটির জালা রয়েছে। গুপ্তধন নাকি?

পরক্ষণে বুঝলুম, সব ছাইভর্তি অস্থিভস্ম। কত হাজার-হাজার লোকের অস্থিভস্ম কে জানে! মনে হল, একটু আগে যে ঘরে ঢুকে পড়েছিলুম—সে ঘরের জালাগুলো কেউ ভেঙে ফেলেছে বলে ছাই ঘরময় ছড়িয়ে রয়েছে।

কিষাণচাঁদ এবার পকেট থেকে একটা মোম জ্বালল। একটা জালার মুখে রেখে টর্চ নেভাল। তারপর বাঁকা হেসে বলল,—এবার খবর বলো হে ক্ষুদে ঘুঘু!

বললুম,—খবর সাংঘাতিক। তোমার দলবলকে মিলিটারিরা গ্রেফতার করে চালান দিয়েছে। এবার তোমার সেই দশা হবে। চারদিক মিলিটারিরা ঘিরে রেখেছে

কিষাণচাঁদ একটু ভড়কে গেল যেন। ভুরু কুঁচকে বলল,—তাই নাকি?

—হ্যাঁ! আর তোমার পরামর্শদাতা মুরুব্বি লারকানা জাদুঘরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকেও এতক্ষণ গ্রেফতার করা হয়েছে।

কিষাণচাঁদ কী যেন ভাবল! তারপর বলল,—সেদিন প্লেনে আসতে-আসতে তোমার প্রতি আমার স্নেহ জন্মে গিয়েছিল। নয়তো এতক্ষণ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতুম না। তা ছাড়া তুমি সাংবাদিক। সাংবাদিক মারা আর ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা একই কথা। যাকগে, আমার এই ব্যবহারের বিনিময়ে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

—আলবাত করছি। আমি কৃতজ্ঞ ডঃ অনিরুদ্ধ যোশী! কিষাণচাঁদ বাঁকা হেসে বলল,—ডঃ অনিরুদ্ধ যোশীকে তোমার মনে ধরেছিল দেখছি। হুঁ, আমাকে কিন্তু অদ্ভুত মানিয়েছিল।

—দারুণ! আমি তো একটুও ধরতে পারিনি।

—কিষাণচাঁদ লাখে একটাই জন্মায় হে ছোকরা! যাকগে, এবার তোমাকে নিয়ে কী করব একটু ভাবা যাক। ... বলে সে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। ভাবতে থাকল।

বললুম,—আমি আপনাকে ডঃ যোশী বললে কি রাগ হবে কিষাণভাই?

—তুমি আমাকে ভাই বলছ?

—কেন বলব না? আমাকে এতক্ষণ বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমি কি অকৃতজ্ঞ?

—হুঁ, তুমি এবার পথে এসেছ দেখছি। তা আমাকে ডঃ যোশী বললে আপত্তি করব না। পুনার ডঃ যোশীর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক জানো? আমরা দুজনে স্কুল-কলেজে সহপাঠী ছিলুম। সে

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাদের দুজনের চেহারাতেও দারুণ মিল! যাকগে সেকথা। শোনো, তোমাকে আমি ... হ্যাঁ মুক্তিই দেব। একটা শর্তে।

—বেশ, বলুন।

—হেহয়রাজার ঘোড়ার সেই ব্রোঞ্জের চাকতিটা আমার চাই।

—কিন্তু আমি কোথায় পাব? আমার কাছে তো ওটা নেই।

—তুমি এই কাগজে নিজের হাতে লেখ : 'আমি বন্দি আছি। আমার মুক্তিপণ হিটাইট ব্রোঞ্জচাকতি। পত্রবাহকের হাতে না দিলে আগামীকাল ভোর ছটায় এরা আমাকে মেরে ফেলবে।' নীচে নাম সই করে তারিখ দাও। আমার লোক এটা আজ রাতে তোমার কর্নেল সাহেবের কাছে পৌঁছে দেবে। চাকতি কোথায় কীভাবে পৌঁছে দিতে হবে সেসব আলাদা চিরকুটে লিখে দেব। বাকি যা করার, আমি করব। নাও, লেখ।

সে পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে কাগজ ছিঁড়ল এবং একটা ডটপেন দিল। আমি কথাগুলো লিখে সই করে দিলুম, তারিখও দিলুম।

এবার কিষাণচাঁদ জালার ওপর রাখা একটা হ্যাভারস্যাক থেকে মোটা নাইলনের রশারশি বের করল। বুঝলুম, দেওয়াল বেয়ে এই গুহায় ঢোকার জন্য দরকার হবে বলে দড়ি এনেছিল সে।

দড়িতে আমার হাতদুটোকে পিঠমোড়া করে বাঁধল। তারপর বলল,—চলো, তোমাকে ভালো জায়গায় রেখে আসি। এখানে থাকলে তো তোমার স্যাঙাতরা এসে তোমাকে উদ্ধার করে ফেলবে।

একহাতে টর্চ আর আমার রিভলভার অন্য হাতে স্টেনগানের নল আমার পিঠে ঠেকিয়ে সে আমাকে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে চলল। আবার একটা নিচু ছাদওয়ালা সংকীর্ণ করিডোরের মতো জায়গা পেরিয়ে গেলুম। এতক্ষণে মনে হল অজস্র ঘর ও করিডোরওয়ালা গুহাটা প্রাকৃতিক গুহা নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষরা বানিয়েছিল। এখানেই তারা সম্মানিত লোকেদের অস্থিভস্ম এনে জালায় রেখে দিত।

এবার যে চওড়া ঘরে ঢুকলুম, সেই ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠতে হল। একটা অক্টোপাসের গড়নের মতো জানোয়ার রক্তাক্ত শরীরে পড়ে আছে। বললুম,—ওটা কী প্রাণী? ওটার সঙ্গেই কি আপনি লড়াই করছিলেন তখন?

কিষাণচাঁদ খুশি হয়ে বলল,—হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছ, ওটার কী দশা হয়েছে।

—প্রাণীটার নাম কী ডঃ যোশী।

কিষাণচাঁদ আরও খুশি হয়ে বলল,—ওটা অধুনালুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক জীব হেক্টোপাস। ...

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে

হেক্টোপাস নামে এই প্রাগৈতিহাসিক জন্তুটির'রক্তাক্ত শরীর থেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল। এই ঘরেই যদি আমাকে বন্দি করে রাখে, তা হলে বমি করতে করতে নির্ঘাত মারা পড়ব। কিন্তু কিষাণচাঁদ আমাকে সেই ঘর থেকে আরেকটা ঘরে নিয়ে গেল।

এ ঘরের ছাদের ফাটল দিয়ে আকাশ দেখা গেল। তখন বুঝলুম, এই ঘরেরই ওপরটা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে ফেলেছে কিষাণচাঁদ। ফাটলটা অনেকটা চওড়া। মেঝেভর্তি পাথরের চাঁই পড়ে আছে। ভয় হল, এখনই ফাটলধরা ছাদটা ধসে পড়বে না তো?

কিষাণচাঁদ বলল,—এবার আমার কিছু হুকুম তামিল করো লক্ষ্মী ছেলের মতো।

—বলুন কী করতে হবে?

—এই টর্চটা ধরে থেকে আমাকে আলো দেখাবে।

—আমার হাত যে বাঁধা।

তাতে কোনো অসুবিধা হবে না সোনা! তোমার কব্জি দুটো পিছন থেকে বাঁধা আছে এই তো? আমি তোমার হাতে জ্বলন্ত টর্চ ধরিয়ে দিচ্ছি। তুমি এদিকে পিঠ রেখে দাঁড়াও। ব্যস! কিন্তু খুব সাবধান। আলো ওপরে ফেলার চেষ্টা করবে না। তা করলেই দেখতে পাচ্ছ, স্টেনগান রেডি আছে।

—কী করতে চান ডঃ যোশী?

কিষাণচাঁদ চোখ নাচিয়ে বলল,—বাহাদুর ছোকরা দেখছি হে! অ্যাঁ? ডঃ যোশী বলে আমাকে গলাবার চেষ্টা করছ যে! উঁহু, ও চালাকি বারবার খাটবে না। নাও, টর্চ ধরে থাক। সাবধান।

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। সে আমার হাতে জ্বলন্ত টর্চ ধরিয়ে দিল। টর্চের মুখ দেওয়ালের দিকে। তারপর চোখের কোণা দিয়ে দেখলুম, সে একটা বড় পাথর ঠেলে এনে এক জায়গায় রাখল। সেই পাথরে তাকে উঠতে দেখে টের পেলুম সে কী করতে চায়।

আমাকে বেঁধে রাখা দড়ির ডগা সে নিজের কোমড়ে জড়িয়ে ভালোভাবে বাঁধল। তারপর ছাদের ফাটল আঁকড়ে ওপরে উঠে গেল। দড়িটা বেশি বড় নয়। টানটান হয়ে রইল। ওপর থেকে সে স্টেনগানের নল বের করে রাখতে ভুলল না। তারপর হুকুম দিল চাপা গলায়,—আঙুল বাঁকা করে টর্চের স্যুইচ অফ করে দাও।

চেষ্টা করে বললুম,—পারছি না যে!

—পারতেই হবে। স্যুইচ তোমার তর্জনীর কাছেই রেখেছি টিপে নীচের দিকে ঠেলে দাও।

অনেক কষ্টে টর্চ নেভাতে পারলুম। তখন সে বলল,—সাবধান! তোমার সঙ্গে আমিও বাঁধা আছি। কাজেই অন্ধকারে পালাবার চেষ্টা কোরো না। এবার যা বলছি, করো। ওই পাথরে উঠে দাঁড়াও।

দু-হাত পেছনে বাঁধা আছে। কিছুতেই উঠতে পারছি না। কোনোভাবেই ওঠা সম্ভব নয়। অথচ সে বারবার ফিসফিস করে বলছে,—কী হল? দেরি হচ্ছে কেন?

বললুম,—অসম্ভব। হাত বাঁধা মানুষ পাথরে চাপবে কী ভাবে?

—লাফ দাও না।

—অন্ধকারে লাভ দিয়ে হাড়গোড় ভাঙবে না? তা ছাড়া পাথরটা যে আড়াই ফুটের বেশি উঁচু মনে হচ্ছে।

—অপদার্থ! মুরগির যেটুকু জোর আছে তোমার নেই। আবার ঘুঘুগিরি করতে এসেছ! ঠিক আছে, তোমাকে ওঠাচ্ছি। কিন্তু ব্যাপারটা ভারি কষ্টদায়ক হবে তোমার কাছে।

অসহ্য লাগছিল। পা-মচকানো ব্যথা, তার ওপর বেঁধে রাখার ফলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে কব্জির ওখানটা ফুলে ঢোল হচ্ছে বুঝতে পারছি। খুব যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। তার ওপরে সেই অবস্থায় টর্চ ধরে আছি। দাঁতে দাঁত চেপে বললুম,—যা হয়, করুন। আর পারছি না।

আমাকে ওপর থেকে হ্যাঁচকা টানে শূন্যে ঝোলাল। আর্তনাদ করে উঠলুম। দুই বাহু ভেঙে গেল মনে হল। কিন্তু সে চাপা গর্জে বলল,—চুপ!

দ্বিতীয়বার হ্যাঁচকা টানে আমাকে শয়তানটা ফাটলের কাছে তুলে ফেলল। ওর গায়ে দানবের শক্তি যেন।

কিন্তু আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারলুম না। অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলুম জানি না, যখন জ্ঞান হল দেখি মুখের ওপর বিশাল নক্ষত্রভরা আকাশ ঝলমল করছে। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। তারপর টের পেলুম, আমি বালির ওপর শুয়ে

আছি। আমার বাঁধনটা আর নেই। কিন্তু উঠে বসার ক্ষমতাও নেই। এদিকে প্রচণ্ড কনকনে ঠাণ্ডা। যন্ত্রণা ও ঠাণ্ডার চোটে কাতর হয়ে রইলুম।

আমার মাথা, কাঁধ, মুখ ও জামার ওপরটা ভিজে মনে হচ্ছিল। আমি অতিকষ্টে বললুম—কে আছ এখানে?

সঙ্গে সঙ্গে মাথার কাছ থেকে কিষাণচাঁদের সাড়া এল—এই যে সোনা! ঘুম ভেঙেছে দেখছি। অনেক কষ্ট দিলে হে। কিষাণচাঁদ জীবনে যা করেনি, তাকে দিয়ে তাই করালে। তোমার মতো একটা ক্ষুদে বিচ্ছুর সেবাও করতে হল।

—আমি কৃতজ্ঞ ডঃ যোশী।

—চুপ। বাঁদরামি করলে মুখ ভেঙে দেব।

বুঝলুম, কিষাণচাঁদ খামখেয়ালি প্রকৃতির লোক। এখন একরকম, তখন একরকম হয়ে ওঠে। ওর রাগ হয়, এমন কিছু করা উচিত হবে না। বললুম,—দাদা বললে কি আপত্তি করবেন কিষাণচাঁদজি?

—আমি কারুর দাদা নই।

—আমার সেবা করেছেন যে! দাদা ছাড়া ছোটভায়ের সেবা কেউ করে?

—করেছি নিজের স্বার্থে। চাকতিটা না পাওয়া পর্যন্ত যেভাবেই হোক তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

—তারপর বুঝি মেরে ফেলবেন?

—চাকতি পেলে দেখা যাবে।

—আপনি কিন্তু কথা দিয়েছেন, চাকতি পেলে আমাকে ছেড়ে দেবেন।

কিষাণচাঁদ কোনো কথা বলল না। মনে মনে শিউরে উঠলুম। তা হলে কি সে আমাকে মেরে ফেলবে চাকতি পেলেও?

জানি না, আমার চিঠি পেয়ে কর্নেল কী করবেন। আমাকে তিনি কত স্নেহ করেন, তা জানি। কিন্তু ওই চাকতিটা তো তাঁর ব্যক্তিগত জিনিস নয়। যখনই পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি ডঃ করিম এবং কর্নেল কামাল খাঁকে ওটা দেখিয়েছেন তখনই ওটা সরকারি সম্পত্তি হয়ে গেছে।

এই সময় কেউ এসে দাঁড়াল। কিষাণচাঁদ তাকে বলল,—দেখা হয়েছে?

—হ্যাঁ, স্যার। এই নিন, উনি চিঠিও দিয়েছেন।

ডাকাত সর্দারকে স্যার বলা শুনে এখন হাসার অবস্থা নয়। নয়তো হো হো করে হেসে ফেলতুম। কিষাণচাঁদ মন দিয়ে চিঠি পড়ছে এখন। পড়া শেষ হলে সে টর্চ নিভিয়ে জিজ্ঞেস করল—আর কী বললেন?

—বললেন, খাঁটি জিনিসই বটে।

—কখন দেখা হবে ওঁর সঙ্গে?

—চিঠিতে তো সব লিখে দিয়েছেন?

—তোমার মুখেই শুনি।

—কাল দশটায় তিন নম্বর গেটে থাকবেন।

—ঠিক আছে। চলো, রওনা হওয়া যাক।

—আপনার উট কী হল?

—পাঠিয়ে দিয়েছি। হারুনকে বলেছি, উট বেঁধে রেখে তাবারুর জিপ নিয়ে রুণ্ডিতে অপেক্ষা করবে আমার জন্যে। তুমি কোন পথে এলে?

—জুলং বাজার হয়ে।

—মিলিটারি আছে ওখানে?

—নাঃ। তবে শুনলুম, দুহালার দিকে একটা বড় কনভয় রাত বারোটায় রওনা দিয়েছে।

—ঠিক আছে। চলো রওনা হই।

—আসামির অবস্থা কী? কবর দিয়ে যেতে হবে নাকি?

কিষাণচাঁদ টর্চের আলো আমার মুখে ফেলল। ওর স্যাঙাত বলল,—তাজ্জব। এখনও তাজা হয়ে আছে যে স্যার!

কিষাণচাঁদ চাপা হেসে আমার উদ্দেশে বলল,—তা হলে ছোটঘুঘু! আসি আমরা। তুমি আরামে ঘুমোও। তোমাকে মুক্তি দেব বলেছিলুম, দিলুম। আমরা আসি।

ওঠার চেষ্টা করে বললুম,—আমি এখানে পড়ে থাকব? এ তো মরুভূমি!

—বাঙালি হয়ে জন্মেছ। মরুভূমি একবার দেখবে না কেমন বস্তু?

রাগে দুঃখে বলে উঠলুম,—আপনি এত নিষ্ঠুর কিষাণচাঁদজি! আপনি জবাব দিয়েছিলেন, চাকতির বদলে কর্নেলের কাছে আমাকে পৌঁছে দেবেন।

—মোটেও না। তেমন কিছু বলি নি। যা বলেছি, তা করেছি। তোমার ঠিকানা আমার লোক তোমার বুড়ো ঘুঘুকে দিয়ে এসেছে। অতএব ভাবার কিছু নেই। ওরা এসে তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে!

বলে কিষাণচাঁদ উটের পিঠে বসল। ওর স্যাঙাত উটের দড়ি ধরে নিয়ে চলল। আস্তে আস্তে দূরে উটের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। অন্ধকার রাতের মরুভূমিতে হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডায় আহত শরীরে পড়ে রইলুম। চোখ ফেটে জল এল এতক্ষণে।

একটু পরে হঠাৎ মাথায় এল, এই মরুভূমিতে কর্নেলরা আমাকে খুঁজে পাবেন কীভাবে? ওঁরা খুঁজতে-খুঁজতে যদি বেলা হয়ে যায়, রোদ তীব্র হতে থাকে, তা হলে তো আমি তেষ্টাতেই মারা পড়ব। তারপর প্রচণ্ড উত্তাপ তো আছেই।

অতএব প্রাণপণ চেষ্টায় কোনোরকমে যদি রাত থাকতে এগোবার চেষ্টা করি, তা হলে বাঁচার সুযোগ পেতেও পারি।

কিষাণচাঁদ যে দিকে গেল, সেই দিকে তাকিয়ে আবছা দূরে যেন সিগারেটের আগুন দেখলুম। মরিয়া হয়ে ওঠার চেষ্টা করলুম।

হামাগুড়ি দিয়ে কিছুটা চলার পর উঠে দাঁড়ালুম অতিকষ্টে। দুই কাঁধে ভীষণ যন্ত্রণা। আস্তে-আস্তে টলতে-টলতে পা বাড়ালুম। কখনও আছাড় খাচ্ছি, কখনও উঠে হামাগুড়ি দিচ্ছি। আবার কখনও কয়েক পা কুঁজো হয়ে হাঁটছি। এভাবে কিছুটা চলার পর মনে জোর এল।

যখনই দম আটকানোর মতো অবস্থা হল, তখনই থেমে চিত হয়ে শুয়ে পড়লুম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলুম। তারপর হাঁফাতে-হাঁফাতে এইভাবে এগিয়ে গেলুম।

একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র লক্ষ করে চলার ফলে কিষাণচাঁদরা পেথে গেছে, সেই পথেই যাচ্ছি মনে হল। সাদা বালির ওপর নক্ষত্রের আলো পড়ায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল উটের ও মানুষের পায়ের গভীর ছাপ।

একবার মনে হল কিষাণচাঁদের নাগাল পেয়ে গেছি। পরে দেখলুম, ভুল। বাতাসের শব্দ।

এইভাবে চলেছি তো চলেছি। কখনও হাঁটু ভর করে, কখনও বুকে হেঁটে। আবার কখনও উঠে দাঁড়িয়ে পা ফেলার চেষ্টা করছি। মাঝে মাঝে বিশ্রামও নিচ্ছি।

কিছুক্ষণ পরে উটের পায়ের দাগ হারিয়ে ফেললুম। সামনে উঁচু বালির পাহাড় আছে মনে হল। সেখানে গিয়ে অনেক চেষ্টা করেও ওটাতে উঠতে পারলুম না। প্রতিবার কিছুটা উঠে গড়িয়ে নীচে এসে পড়লুম।

বারবার চেষ্টার পর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লুম। শেষবার গড়াতে গড়াতে এত জোরে নীচে পড়লুম যে ঝাঁকুনির চোটে আবার অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

যখন জ্ঞান হল, তখন দিনের আলো ফুটছে।

অনেক কষ্টে মুখ তুলে চারপাশটা দেখলুম। তারপর আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। যতদূর চোখ যায়, শুধু বালি আর বালি। দিগন্তে আকাশ নিচু হয়ে এসে মিলেছে। মরুভূমি কাকে বলে, এতক্ষণে টের পেলুম।

একটু পরে সূর্য উঠবে। তারপর কী ঘটবে, স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

তবু মানুষের মনে কী যেন একটা শক্তি আছে। বেঁচে থাকার একটা সুতীব্র ইচ্ছা আছে। সেই শক্তি আর ইচ্ছা আমাকে সাহস জোগাল।

আবার ক্ষীণ একটা আশা জেগে উঠল, কর্নেলরা আমাকে খুঁজে বের করবেনই। বিশেষ করে কর্নেল কামাল খাঁ মিলিটারি কনভয় নিয়ে নিশ্চয় বেরিয়ে পড়েছেন ওর সঙ্গে। আমি চারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে বসে রইলুম। এ আমার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ। ...

জিপসি মেয়ে রমিতা

কিছুক্ষণ পরে দিগন্তের আকাশ লালচে হয়ে উঠছে, দেখে জানলুম ওটাই তাহলে পূর্বদিক। আমি উত্তর দিকেই এগিয়েছি। আমার পায়ের ছাপ দেখে সেটা বোঝা গেল। কিন্তু এবার সূর্য ওঠার সময় হয়েছে। দেখতে-দেখতে মরুভূমির সূর্য উঁকি দিল। লাল প্রকাণ্ড একটা চাকার মতো সূর্য। বুক শুকিয়ে গেল আতঙ্কে।

চাকাটা ক্রমশ বড় হতে-হতে এক লাফে মাটি ছাড়া হল। এক ভয়ংকর একচক্ষু দানব যেন আমাকে দেখতে পেয়েই লাল জিভ বের করে ঠোঁট চাটছে।

ওদিকে তাকাতে ভয় করছিল। তাই ঘুরে দক্ষিণে দৃষ্টি রাখলুম। তারপর এক আজব দৃশ্য দেখলুম। শূন্যে কী একটা কালো জিনিস ভাসছে।

জিনিসটা কাঁপতে কাঁপতে রঙ বদলাল ক্রমশ। মনে হল কী একটা প্রকাণ্ড চারঠেঙে প্রাণী দিগন্তের আকাশে নড়বড় করে পাখির মতো সাঁতার কাটছে।

একটু পরে দেখি, প্রাণীটা যেন একটা উট।

তা হলে কি মরুভূমিতে দিনের প্রথম মরীচিকা দেখতে পাচ্ছি আমি? মনে-মনে ঠিক করলুম, মরীচিকার দিকে তাকাবো না। মরীচিকার নাকি মায়া আছে। মানুষ বা প্রাণীকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায় এবং পরিণামে ওই মিথ্যার পিছনে ছোটাছুটি করে মারা পড়তে হয়।

কিন্তু আবার দেখবার ইচ্ছে হল ব্যাপারটা। তখন ঘুরে, স্পষ্ট দেখলুম সত্যি সত্যি একটি উট দৌড়ে আসছে। উটের পিঠে একটা ছাতার মতো কিংবা নৌকার ছইয়ের মতো জিনিস চাপানো রয়েছে এবং তাতে দু-জন মানুষ বসে আছে।

মরীচিকার পিছনে মানুষ ছোটে। কিন্তু এ যে দেখছি মরীচিকাই আমার দিকে ছুটে আসছে। হতবাক এবং অসহায় হয়ে তাকিয়ে রইলুম।

ততক্ষণে সূর্যের রঙ সোনালি হয়ে উঠছে। দিগন্ত বিস্তৃত ধু ধু বালির সমুদ্রে তরল সোনার

স্রোত বয়ে যাচ্ছে যেন। ক্রমশ উত্তাপ জেগে উঠছে শীতল বালিতে।

উটটা দেখতে দেখতে এসে পড়ল কাছাকাছি। তখন দেখলুম সামনের দিকে বসে আছে একটি কিশোরী মেয়ে। তার হাতে উটের দড়ি। পিছনে বসে আছে এক বৃদ্ধ। ওরা আমাকে দেখতে পেয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছিল না।

তাই অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলুম,—বাঁচাও! বাঁচাও!

সঙ্গে সঙ্গে কিশোরীটি উটের দড়ি টেনে ধরল এবং উটটা মুখ উঁচুতে তুলে দাঁড়িয়ে গেল।

আবার চিৎকার করে বললুম,—বাঁচাও! বাঁচাও!

উট দৌড়তে শুরু করছে আমার দিকে। এ কখনও মরীচিকা হতে পারে না। মরীচিকার কোনো ছায়া পড়ে না। কিন্তু এই উট এবং তার আরোহীদের লম্বাটে ছায়া পড়েছে।

উটটা এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। কিশোরীটি ড্যাবডেবে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বৃদ্ধ দুর্বোধ্য ভাষায় আমাকে কী বলল, বুঝতে পারলুম না। ইশারায় বোঝাবার চেষ্টা করলুম, পথ হারিয়ে বিপদে পড়েছি। আমাকে উদ্ধার করো।

উটকে ইশারা করতেই হাঁটু ভাঁজ করল। তখন বৃদ্ধ এবং কিশোরী নেমে দাঁড়াল। আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টে দেখে নিয়ে বৃদ্ধ এবার উর্দু ভাষায় বলল,—তুমি কে? এখান কেমন করে এলে?

উর্দু আর হিন্দিতে তফাত খুব কম। আমি হিন্দিতেই জবাব দিলুম,—আমি হিন্দুস্থানী। খবরের কাগজের লোক। দোশান মরুভূমি দেখতে এসে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। সারারাত ঘুরে মরছি।

বৃদ্ধ হাসল।—তাজ্জব কথা বটে। মরুভূমি দেখার শখ এত বেশি তোমার? ঠিক আছে। এসো আমাদের সঙ্গে। তবে আমার উটটা খুব ক্লান্ত। আগের রাতে আমরা গিয়েছিলুম এই মরুভূমির একটা তীর্থে। সেখানে এক পীরের দরগা আছে। সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় রওনা দিয়েছিলুম। কিন্তু উটটা পাজি। পথ ভুল করে উল্টোদিকে চলে গিয়েছিল। তাই সকাল হয়ে গেল। আমরা ফিরে যাচ্ছি রুণ্ডির বাজারে।

বৃদ্ধের গায়ে একটা হাতকাটা ফতুয়া, পরনে ঢিলেঢোলা পাতলুন, কোমরে একপ্রস্থ কাপড় জড়ানো। মাথায় পাগড়ি আছে। তার কাছে একটা বল্লম আর সেকেলে গাদা বন্দুকও দেখতে পাচ্ছিলুম।

মেয়েটির পরনে একটা ঘাগরা। কোমরবন্ধ আছে। ফুলহাতা জামার ওপর একটা হাতকাটা ক্ষুদের জহরকোটের মতো সবুজ ও নকশাদার আঙরাখা চাপানো। পরনে সালোয়ার ও পায়ে নাগরা জুতো। তার চুল বেণীবাঁধা। মাথায় একটা রুমালও সুন্দরভাবে জড়ানো আছে। সে ফ্যালফ্যাল করে আমাকে দেখছে আর দেখছে।

সাজ-পোশাক দেখে মনে হল এরা কি জিপসিদলের লোক? তাই জিজ্ঞেস করলুম,—আপনারা কি রোমানি?

জিপসিরা নিজেদের রোমানি বলে। বৃদ্ধ জবাব দিল,—হ্যাঁ, আমরা রোমানি। আমাদের লোকেরা রুণ্ডি বাজারের ওখানে একটা মাঠে তাঁবু পেতেছে। আমি ওদের সর্দার। দলের জন্যে মানত দিতে গিয়েছিলুম। তা, তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি, খাওয়া জোটেনি। ঠিক আছে। রোদ বেড়ে যাচ্ছে। উটের পিঠে যেতে-যেতে খেয়ে নেবে।

উটের পিঠে সুন্দর গদির আসন। ছইয়ের মতো একটা কাঠামো চাপানো। তিন দিক তেরপলের মতো শক্ত কাপড়ে ঘেরা। ছাদও রয়েছে। আরামে বসব ভাবলুম। কিন্তু উট চলতে শুরু করলে বেজায় ঝাঁকুনি টের পেলাম। শরীরের ব্যথা বেড়ে গেল।

বৃদ্ধ খুব দয়ালু। সে একটা টিফিন কেরিয়ার বের করে একটুকরো মোটা রুটি, খানিকটা জেলির মতো জিনিস আর একমুঠো কিসমিস দিল। বলল,—খেয়ে নাও। আর এই রইল জল। সবটাই খেয়ে নিতে পার। আর আমাদের জলের দরকার হবে না। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পৌঁছে যাব।

ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটিয়ে নিয়ে ওদের সঙ্গে গল্প শুরু করলুম। কথায় কথায় জানা গেল, বৃদ্ধ সর্দারের নাম মেহেরু। ওর মেয়ের নাম রমিতা। ওরা রুণ্ডিবাজারে এসেছে দিন সাতেক আগে। তার আগে ওরা ছিল কাফরিস্তানে। সেটা বালুচিস্তান ও ইরানের মধ্যে একটা পাহাড়ি এলাকা। কাফরিস্তানে থাকার সময় ওদের তিনটে ভেড়া মারা পড়েছে অসুখে। রুণ্ডিতে এসে কয়েকটা মুরগি মারা পড়েছে। ওদের ধারণা, শয়তানের নজর পড়েছে ওদের দলের ওপর। তাই তিখারি মরূদ্যানের তীর্থে পুজো দিয়ে এল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রমিতার সঙ্গেও আমার খুব ভাব হয়ে গেল। আমি কোন দেশের লোক সে-দেশটা কেমন—সব খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করল। তারপর অবাক হয়ে গেল যেন। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সবুজ বাংলার ছবি ওর কল্পনায় আসছিল না। তারপর কলকাতার কথা উঠল। কলকাতার কথা ওরা শুনেছে। বড় আজব শহর পুবের দেশে নাকি। বাবা ও মেয়ে অজস্র প্রশ্ন করে কলকাতা শহরের কথা জেনে নিল। তারপর বুড়ো বলল,—কলকাতা না দেখে ওর মৃত্যু হবে না। দেখা চাই। তবে সে তো বহুদিনের রাস্তা। সেই যা সমস্যা। ...

ঘণ্টা দেড়েক চলার পর দিগন্তে রুণ্ডি বাজারের বাড়িগুলো ভেসে থাকতে দেখা গেল। একটু ভয় হল এবার। কিষাণচাঁদ রুণ্ডির কথা বলছিল। ওখানে নিশ্চয় ওর লোকজন আছে। আমাকে কি তারা চিনতে পারবে?

আরও আধঘণ্টা চলার পর আমরা রুণ্ডি পৌঁছে গেলুম। রুক্ষ অনুর্বর পাহাড়ি এলাকা। কিছু কল-কারখানা আছে দেখলুম। শহরের বাইরে একটা উপত্যকায় জিপসিদের গোটা পাঁচেক তাঁবু রয়েছে। ছাগল-ভেড়া-দুম্বা আর মুরগির পাল আছে। বেঁটে কয়েকটা ঘোড়া আর উটও আছে। কুকুর আছে একডজন। আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করছিল কুকুরগুলো। দু-জন জোয়ান জিপসি তাদের তাড়া করে ভাগিয়ে দিল। তারপর তিরিশ-বত্রিশ জন ক্ষুদে ও বড় নানা বয়সের জিপসি নারী পুরুষ আমাকে ঘিরে ধরল। সর্দার মেহেরু তাদের অল্প কথায় ব্যাপারটা শুনিয়ে আমাকে তার তাঁবুতে নিয়ে গেল।

তাঁবুর মধ্যে একটা খাটিয়ায় সুন্দর বিছানা পাতা রয়েছে। আমাকে শুয়ে পড়তে বলল। একটু পরে রমিতা এল হাসতে-হাসতে। ভাঙা উর্দুতে বলল,—ভাইজি। আপনার স্নান করা দরকার। আমি জল এনেছি কুয়ো থেকে। স্নান করে নিন।

বেরিয়ে দেখি, তাঁবুর সামনে একটা টুল পেতে রেখেছে। দুটো প্লাস্টিক বালতিতে জল রয়েছে। রমিতার হাতে সাবানের কৌটো আর তোয়ালে। শুধু তাই নয়, একপ্রস্থ পোশাকও এনেছে।

টের পাচ্ছিলুম, জিপসিরা একালের শহরে মানুষের ব্যবহৃত সব জিনিসই ব্যবহার করে। স্নান করার পর শরীরের ব্যথা অনেকটা কমে গেল। রমিতা ছাগলের টাটকা দুধ এনে দিল এক গ্লাস। বলল,—ভাইজি, খেয়েদেয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও। খাবার সময় হলে ডাকব।

চোখের পাতা জড়িয়ে আসছিল। আমার পরনে এখন জিপসি পোশাক। ঘুমিয়ে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলুম। মরুভূমির মধ্যে দুলতে দুলতে উটের পিঠে চলেছি তো চলেছি। রমিতা বলছে—ভাইজি! বাংলা মুল্লুক আর কতদূর। ...

ঘুম ভেঙে দিল কার ভারী গলার ডাকাডাকিতে। তারপর চোখ খুলে কয়েক মুহূর্ত বুঝতে পারলুম না—কোথায় আছি।

—ডার্লিং! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে।

সঙ্গে-সঙ্গে হুড়মুড় করে উঠে বসলুম। এই কণ্ঠস্বর এবং এই বাক্যটি বহুকালের পরিচিত।

দেখি, আমার খাটিয়ার পাশে একটা টুলে বসে আছে আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

নিশ্চয় আবার বিদঘুটে একটা স্বপ্ন দেখছি। চোখ কচলে বললুম,—আপনি কি সত্যিই কলকাতার ইলিয়ট রোডবাসী সেই বৃদ্ধ ঘুঘু?

—অবশ্যই সত্য, ডার্লিং!

—কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? জয়ন্ত তো কিষাণচাঁদের হাতে মারা পড়েছে। আমি জয়ন্ত নই! দেখছেন না আমি একজন জিপসি।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

—লজ্জা করেনি আপনার আমার কাছে আসতে? কাল সারারাত আমি মরুভূমিতে কী ভোগান না ভুগেছি নেহাত বাবা-মা'র পুণ্যে কোনোমতে বেঁচে গেছি।

কর্নেল হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—সব শুনেছি। জয়ন্ত, আমাদের ক্ষমা করো। তোমাকে উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। সারাটা রাত পুরো একটা মিলিটারি কনভয় নিয়ে কর্নেল কামাল খাঁ আর আমি দোশান মরুভূমি তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছি। কিষাণচাঁদ যে পথনির্দেশ দিয়েছিল, তা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যে। ওর নিষ্ঠুরতার তুলনা নেই।

—আমি জিপসি তাঁবুতে আছি, কে বলল?

—তোমাকে সারারাত খোঁজাখুঁজি করে আমরা রুণ্ডির দিকে আসছিলুম। একস্থানে উটের পায়ের ছাপ দেখে সন্দেহ হল। পরীক্ষা করে দেখলুম, বালিতে কেউ শুয়েছিল। আশেপাশে কয়েকটা জুতোর ছাপও রয়েছে। তারপর উটের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে আমাদের গাড়ি এগোল। ছাপ গেছে সোজা উত্তরে। তখন ভাবলুম, হয়তো কিষাণচাঁদ তোমাকে এখনও ছেড়ে দেয়নি। কোনো কারণে আরও কোনও তথ্য আদায় করতে চায়। যাই হোক, এইমাত্র রুণ্ডি পৌঁছে খবর নিতে শুরু করলুম।—দোশান থেকে কোনো উটওয়ালা এদিকে এসেছে নাকি। তারপর সেইসূত্রে এদের তাঁবুতে এসে দৈবাৎ তোমাকে পেয়ে গেলুম।

তাঁবুর সামনে ভিড় জমেছিল। দুজনে বেরিয়ে গিয়ে দেখি, কর্নেল কামাল খাঁ একদল সেপাই নিয়ে আসছেন। জিপসিদের মুখে আতঙ্কের ছাপ পড়েছে। ব্যাপারটা কর্নেলকে বললুম। তখন তিনি ওদের উদ্দেশে ছোটখাটো একটা ভাষণ শুরু করলেন। কর্নেল যে এত চমৎকার উর্দু জানেন, কে জানত।

কর্নেলের বক্তৃতা শুনে ওরা খুশি হল। জিপসিরা খুব আমুদে। কেউ কেউ অতি উৎসাহে নাচগান জুড়ে দিল আমাদের ঘিরে।

ভিড় ঠেলে রমিতা এতক্ষণে এসে আমার হাত ধরল।—ভাইজি, তুমি নাকি চলে যাচ্ছ?

—যাচ্ছি বোন!

—বা রে! তোমার জন্যে খানার জোগাড় হয়েছে না? তুম আমাদের মেহমান (অতিথি)।

কর্নেল ওর চিবুক সস্নেহে নাড়া দিয়ে বললেন,—বেটি! এ বুড়ো বুঝি মেহমান নয়?

রমিতা সলজ্জ হেসে মাথা দুলিয়ে বলল,—হ্যাঁ, তুমিও মেহমান।

কর্নেল কামাল খাঁ ভিড়ে উঁকি মেরে বললেন,—আর আমি?

রমিতা ভেংচি কেটে বলল,—তুমি তো মিলিটারি আদমি। মানুষ মারো। তুমি দূর হও এখুনি।

সর্দার মেহেরু বলল,—ছি, ছি বেটি! সবাই মেহমান। আজ সবাই খাবে। আজ আমাদের জীবনে একটা খুশির দিন। তিখারির পীরবাবা আমাদের দয়া করেছেন। তাই এত সব বড়া আদমি আমাদের তাঁবুতে এসেছেন।

বলে সে জিপসি ভাষায় ভিড়ের উদ্দেশে কিছু বলল। অমনি ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। কাঠের খুঁটি পুঁততে শুরু করল জোয়ানরা। তার ওপর রঙিন নকশাকাটা শামিয়ানা চড়াল। বুঝলুম, রীতিমতো একটা পার্টির আয়োজন হচ্ছে। কী সুন্দর ঝালরওয়ালা শামিয়ানা!

একটু তফাতে তেরপলের ছাউনির তলায় উনুনে বড়-বড় পাত্রে রান্না চাপল। যাকে বলে কমিউনিটি ভোজ। একসঙ্গে ওরা খায়। এখন হঠাৎ মেহমান এসে পড়ায় বাড়তি খাদ্যের ব্যবস্থা হচ্ছে। দুজন জোয়ান একটা মস্ত দুম্বা নিয়ে গেল টানতে টানতে। নিশ্চয় ওই দুম্বার মাংসে অতিথিদের সেবা হবে।

গতিক দেখে কর্নেল কামাল খাঁ ওঁর দলবলকে ধমক-ধামক দিয়ে কোথায় যেন পাঠিয়ে দিলেন। পঞ্চাশজন সেপাইয়ের খাবার জোগানো এদের ওপর অত্যাচারের শামিল হত। জনা দুই মিলিটারি অফিসার এবং স্বয়ং কামাল খাঁ রয়ে গেলেন। একটা জিপ থাকল। জিপ ঘিরে জিপসি ছেলেমেয়েরা খেলা জুড়ে দিল। উজ্জ্বল রৌদ্রে বিশাল নীল আকাশের তলায় রঙিন পোশাকপরা ছেলেমেয়েদের মনে হচ্ছিল প্রজাপতির ঝাঁক।

এদিকে তাঁবুর সামনে একদল যুবক-যুবতী। গিটারের বাজনার সঙ্গে নাচগান শুরু করেছে। দেখলুম, বিশালদেহী কর্নেল কামাল খাঁকে ওরা টানতে টানতে ভেতরে ঢোকাল। তারপর তাজ্জব হয়ে গেলুম। মাথার ওপরে একটা হাত ঘুরিয়ে এবং মাঝে মাঝে গোঁফে তা দিয়ে ভুঁড়ি দুলিয়ে ও কোমর ঘুরিয়ে গোয়েন্দা দফতরের মিলিটারি অধিকর্তা সে কী নাচ নাচছেন!

হঠাৎ রমিতা দৌড়ে এসে কর্নেল বুড়োকে হ্যাঁচকা টান দিল।

তারপর দেখলুম, বুড়ো আসরে ঢুকে গেছেন। এবং দিব্যি নাচ শুরু করেছেন। কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের নাচ দেখব, সে কি স্বপ্নেও ভেবেছিলুম?

ওদের নাচগান চলতে থাকল। সর্দার মেহেরু আমাকে নিয়ে গেল ওর সেই তাঁবুতে। তারপর বলল,—তুমি কমজোর হয়ে গেছ, বেটা। তুমি রোদে ঘুরো না। চুপচাপ শুয়ে থাকো। খেতে একটু দেরিই হবে। ততক্ষণ তুমি আংরেজি কেতাবটা পড়তে পার।

বইটা দেখে অবাক হলুম। জাঁ পল সার্ত্রের লেখা ফরাসি বইয়ের ইংরাজি অনুবাদ : দা জিপসিজ। বললুম, এই বই কোথায় পেলেন সর্দারজি?

মেহেরু বলল,—এক সাহেব দিয়েছিল। আমাদের খবরা-খবর জানতে এসেছিল। তখন আমরা কাফ্রিস্তানে ছিলুম। ওটা তুমি ইচ্ছে করলে নিতে পার। আমরা কী করব ও নিয়ে?

বইটা পড়তে শুরু করলুম। অনেক খবর জানা গেল। এরা আসলে ভারতেরই বাসিন্দা ছিল কোনো যুগে। এদের ভাষায় হিন্দুস্থানী শব্দ প্রচুর। রোমানি কথাটা এসেছে সংস্কৃত 'রম্যানি' থেকে। তার মানে ভ্রমণকারী। ফার্সিতে রম্ মানেও ভ্রমণ। 'রম্‌তা' মানে বেড়াচ্ছে।

তাহলে রমিতার মানে দাঁড়ায়—যে মেয়ে সারাজীবন বিশ্বজুড়ে ঘুরে বেড়াবে বলে জন্মেছে। হায়, আমি যদি একজন জিপসি হতুম, রমিতা হত আমার ছোটবোন!

আবার মোহেনজোদাড়ো

রওনা হতে পাঁচটা বেজে গেল। রমিতার জন্য রুণ্ডি বাজার থেকে কয়েকটা সুন্দর পাথরের মালা আর একজোড়া সোনার দুল কিনে এনেছিলুম। সেগুলো পেয়ে রমিতা কি খুশি!

কিন্তু যাবার সময় সে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল,—ভাইজি এমন করে চলে যাবে জানলে ওই মরুভূমিতেই ফেলে রেখে আসতুম।

ওকে আদর করে বললুম,—বোনটি আমার! রাগ করো না। আবার দেখা হবে।

সে বেণী দুলিয়ে জোরে মাথা নেড়ে বলল,—হবে না। বাইরের লোকের সঙ্গে আমাদের দুবার দেখা হয় না।

—বেশ। তা হলে মরে গিয়ে আমি তোমাদের দলে জন্মাব।

রমিতা কী বুঝল কে জানে, হঠাৎ, ভেংচি কেটে দৌড়ে চলে গেল তাঁবুর দিকে। কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ের চড়াইয়ে ওঠার সময় ঘুরে নীচের উপত্যকার জিপসি তাঁবুগুলোর দিকে তাকালুম। হঠাৎ দেখতে পেলুম, উপত্যকার পুবদিকের টিলার চূড়ার একটা পাথরের ওপর রমিতা দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে রুমাল নাড়ছে।

আমি হাত নেড়ে মনে মনে বললুম—বিদায় রমিতা! বিদায়! মন খারাপ হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। এই যাযাবর মানুষগুলোর সম্পর্কে কত ভুল ধারণা ছড়িয়ে আছে। ওরা নাকি চোর-ডাকাত, খুনে এবং জাদুকর।

মনে হল, সব মিথ্যা। ওদের চির-যাযাবর জীবনের আনন্দ, ওদের স্বাধীনতা আর বাধাবন্ধনহীন উদ্দাম জীবন দেখে ঈর্ষাবশত আমরা ওদের নামে বদনাম রটাই।

কিছুক্ষণ পরে আমাদের জিপ পৌঁছল একটা প্রশস্ত হাইওয়েতে। অজস্র যানবাহন যাতায়াত করছে। কর্নেল কামাল খাঁ জানালেন—এই হাইওয়ে লারকানায় পৌঁছেছে। উনি জিপ চালাচ্ছেন। কর্নেল ও আমি ওর ডানপাশে বসেছি। এতক্ষণে কর্নেলকে জিজ্ঞেস করার সময় পেলাম। —শেষ পর্যন্ত কী হল গুপ্তধনের?

কর্নেল বললেন,—হিটাইট সীলমোহরের অবিকল একটা নকল ভাগ্যিস আগেভাগেই তৈরি করিয়ে রেখেছিলুম। সেটা দেওয়া হয়েছে কিষাণচাঁদকে। চিত্রলিপি অদলবদল করা হয়েছে ডঃ তিড়কের সাহায্যে। ওই সূত্র ধরে কিষাণচাঁদ ফাঁদে পড়বে। কামালসাহেব ফাঁদ পেতে রেখেছেন। মোহেনজোদাড়োর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে লুকিয়ে আছে ওঁর বাহিনী।

—গতরাতে দুহালার সেই গুহায় কি আমার খোঁজ করেননি আপনারা?

—করেছিলাম। তোমাকে পাইনি। তারপর ...

—থাক ও কথা। এবার হিটাইট সীলমোহরটার কথা বলুন।

—ওটা হিটাইটরাজ তাবার্নার সীলমোহর। ওটা একটা আদেশপত্র! তাতে লেখা আছে :

'এতদ্বারা হিটাইটারাজ তাবার্না তার পুত্র হেহয়কে আদেশ দিচ্ছেন, প্রিয় সখা ইন্দিলম্মার অস্থিভস্ম সিন্ধুতীরবর্তী সূর্য-উপাসক সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।'

বললুম,—কিন্তু হেহয় তো উত্তর ভারতের রাজা ছিলেন!

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ, ও ঘটনা আর্যদের আগমনের প্রথম যুগের। হিটাইটরাও আর্য। আর্যদের যে-গোষ্ঠীকে বলা হয় ইন্দো-ইরানীয়, তাদের উপাস্য দুই দেবতা অসুর ও দেবকে কেন্দ্র করে পরস্পর সংঘর্ষ বেধেছিল। দেব-ভক্ত আর্যগোষ্ঠী পালিয়ে এসে পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করে। অসুর-ভক্তরা ইরানে থেকে যায়। ওদিকে একদল হিটাইটও কাশ্মীর হয়ে ভারতে এসে বসতি করে। তাবার্নার পুত্র হেহয় ছিল এই গোষ্ঠীর নেতা। এ পর্যন্ত আমরা প্রমাণসিদ্ধ ইতিহাস পাচ্ছি। পরেরটুকু এই চাকতি থেকে অনুমান করে নিতে হয়েছে।

—বলুন, শুনি।

—সম্ভবত দেবভক্ত আর্যদের আর একটা দল সূর্য-উপাসক হয়ে ওঠে এবং দুহালায় গিয়ে বাস করতে থাকে। তাদেরই নেতার নাম ইন্দিলাম্মা। ইন্দি শব্দটাতে সিন্ধুর আভাস আছে। যাই হোক, ইন্দিলাম্মা হিটাইটরাজ তাবার্নার প্রিয় বন্ধু ছিলেন। হাত্তিদেশে বেড়াতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে মারা যান। তাই তাবার্না তার অস্থিভস্ম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পুত্র হেহয়ের কাছে উত্তর ভারতে। এর পর কী

ঘটেছিল, তিব্বতি মঠের পুঁথিতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে একটা কথা বলা দরকার। গৌতম বুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের। আর এ ঘটনা তার আড়াই হাজার বছর আগের। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, বৌদ্ধধর্ম আরও প্রাচীন। গৌতম বুদ্ধ ১৯তম বুদ্ধ ছিলেন। কাজেই আর্যযুগেও বৌদ্ধ ছিল। তিব্বত অঞ্চলে। হেহয় এই সময় রাজ্যচ্যুতি হন এবং পিতৃ আদেশ পালন করতে ঘোড়ার পিঠে একটা বাক্সে ইন্দিলাম্মার চিতাভস্ম নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। পশ্চিম-তিব্বত ঘুরে তিনি কাশ্মীর হয়ে পাঞ্জাব পেরিয়ে দুহালা পৌঁছানো নিরাপদ মনে করেছিলেন। তারপর যথাসময়ে তিনি পৌঁছান মোহেনজোদাড়ো শহরে। বাক্সে বিন্দুচিহ্ন মৃতের প্রতীক। শ্মশানগুহার জালার গায়ে এই চিহ্ন আমরা দেখেছি।

—কিন্তু তিনি অস্থিভস্মের বাক্স পুঁততে গেলেন কেন?

—ডঃ তিড়কে ব্রোঞ্জের সেই ফলকটা পরীক্ষা করে একটা কারণ খুঁজে পেয়েছেন। ঘোড়াটার যে চিত্রকল্প আঁকা হয়েছে, তা একটা রুগ্ণ ঘোড়ারই। কারণ ঘোড়ার পেটের দিকটায় টানা কয়েকটা রেখা আছে। ওগুলো পাঁজরের হাড় বেরিয়ে পড়া ঘোড়া। তা না হলে স্বাভাবিক নীতিতে অন্যান্য জীবজন্তুর ছবির মতোই পেটটা চৌকো করে আঁকা হত। কোন রেখার আঁকিবুকি থাকত না?

—খুব যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। তারপর?

—ঘোড়াটা বাক্স বইতে পারছিল না। ওদিকে সম্ভবত দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত হেহয় দুহালা পৌঁছতে পারেননি। বিশ্রাম করতে চেয়েছিলেন মোহেনজোদাড়োতে। কিন্তু পবিত্র অস্থিভস্মের বাক্স দেখে লোকেরা কানাকানি শুরু করেছিল। পাছে বাক্সটা কেউ কেড়ে নিয়ে ধনরত্নের বদলে ছাই দেখে তা নষ্ট করে ফেলে, তাই হেহয় ওটা সেবারের মতো নির্জন কোনো গুপ্তস্থানে পুঁতে রাখতে গিয়েছিলেন। ঘোড়াটাও আর ভার বইতে পারছিল না। তাঁর পক্ষে বাক্স বয়ে নিয়ে সৌর উপাসক সম্প্রদায়ের জনপদ খুঁজে বের করা কঠিন কাজ। ফলে যা স্বাভাবিক, তাই করতে গেলেন এবং এক গুপ্ত অনুসরণকারীর পাল্লায় পড়লেন। আশা করি, আবার সব স্পষ্ট হয়েছে তোমার কাছে।

—হয়েছে। তা হলে অস্থিভস্মের জন্যেই এতকাল ধরে এত হাঙ্গামা আর খুনোখুনি? ভ্যাট! কোনো মানে হয়?

হ্যাঁ, জয়ন্ত। অলীক গুপ্তধনের নেশা। এ নেশা চিরকালের।

একটু পরে জিজ্ঞেস করলুম,—ফকিরসাহেব কোথায় আছেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—করাচি রওনা হয়ে গেছেন। সেখান থেকে মক্কাতীর্থে যাবেন। সেখানেই বাকি জীবন সন্ন্যাসব্রতে কাটাবেন।

—একটা প্রশ্নের জবাব বাকি আছে।

—কী?

—কাল সন্ধ্যায় সব জেনেও কেন দুহালা অভিযানে গিয়েছিলেন? খামোকা যত রাজ্যের বিপদ আমাকেই ভুগিয়ে ছাড়লেন।

কর্নেল জোরে হাসলেন,—গিয়েছিলুম, শ্মশানগুহায় হেহয়ের বাক্সটারই সন্ধানে। সেই সঙ্গে বন্ধুবর কামাল খাঁয়ের প্ল্যান ছিল দুর্ধর্ষ ডাকু কিষাণচাঁদকে বন্দি করা।

কর্নেল কামাল খাঁ বললেন,—কাল হাত ফসকে পালিয়েছিল। উটের পিঠে যে জয়ন্তবাবুকে নিয়ে যাচ্ছে ব্যাটা, কীভাবে বুঝব? ব্যাটা ছদ্মবেশ ধরতে ওস্তাদ। দিব্যি উটওয়ালা সেজে নাকের ডগা দিয়ে চলে গেল। তখন রাত প্রায় সাড়ে নটা। তবে আজ আর নিস্তার নেই। ফাঁদে পড়বেই।

বললুম,—আচ্ছা কর্নেল, অস্থিভস্মের বাক্সটা কি পেয়েছেন?

কর্নেল বললেন,—পেয়েছি। শ্মশানগুহায় একটা জালার মধ্যে ছিল। পাথরের বাক্স। দু ফুট

চওড়া আড়াই ফুট লম্বা। মজার ব্যাপার, হেহয়ের হত্যাকারী এটা পৌঁছে দিয়ে থাকবে। সেই বাক্সের গায়েও অবিকল একই কথা লিখে রেখেছে সে। ব্রোঞ্জের ফলকে এবং ঘোড়ার চোয়াল রাখা সিন্দুকের গায়ে লেখা ছিল, হুবহু তাই। বোঝা যায়, খুব অনুতপ্ত হয়েছিল লোকটা। ...

বাকি পথ আমরা চুপচাপ ছিলুম। জিপের গতি ক্রমশ বাড়ছিল। সাতটার মধ্যে পৌঁছে গেলুম লারকানায়। সেই হোটেলের পরিচিত ঘরে আমাদের পোঁছে দিয়ে কর্নেল কামাল খাঁ চলে গেলেন।

অনেক রাতে কর্নেলের ডাকে ঘুম ভাঙল। কর্নেল বললেন,—সুসংবাদ ডার্লিং! এইমাত্র বন্ধুবর কামালের ফোন পেলুম। মোহেনজোদাড়োর শস্যগোলার ওখানে কিষাণচাঁদ এবং তার সঙ্গীরা ধরা পড়েছে। এবার নিশ্চিন্তে ঘুমোও। অনেক ভোগান্তি গেছে তোমার ওপর। তবু তোমার বাকি রাতের সুনিদ্রার কথা ভেবে তোমাকে এই খবর দেওয়া জরুরি ভেবেছিলুম। আর ডার্লিং জয়ন্ত, আগামীকাল সকালে আমরা সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাব। শুভরাত্রি। সুনিদ্রা সুখের হোক! ....

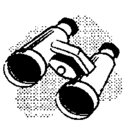

ঠাকুরদার সিন্দুক রহস্য

সময়টা ছিল নভেম্বরের গোড়ার দিকে এক রবিবারের সকালবেলা। ইলিয়ট রোড এলাকায় কর্নেলের তিনতলার অ্যাপার্টমেন্টে তাঁর জাদুঘরসদৃশ ড্রয়িংরুমে আড্ডা দিচ্ছিলুম। কর্নেল গভীর মনোযোগে টাইপরাইটারে কীসব টাইপ করছিলেন। মাঝে-মাঝে তিনি পোস্টকার্ড সাইজ কীসের রঙিন ছবি তুলে দেখছিলেন এবং আবার টাইপে মন দিচ্ছিলেন। অবশেষে বুঝতে পেরেছিলুম, তিনি বিরল প্রজাতির পাখি-প্রজাপতি-অর্কিড কিংবা ক্যাকটাস সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখছেন। দেশে ও বিদেশে প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাতি তাঁর কম নয়। এই বৃদ্ধ বয়সেও যে-কোনো শক্তিমান যুবকের মতো তিনি দুর্গম পাহাড়-জঙ্গল-মরুভূমি চষে বেড়াতে পারেন। লক্ষ করছিলুম, দাঁতে-কামড়ানো চুরুটের নীল একফালি ধোঁয়া উঠে তাঁর প্রশস্ত টাকের ওপর ঘুরপাক খেতে-খেতে মিলিয়ে যাচ্ছিল। ঝকঝকে সাদা দাড়িতে চুরুটের একটুকরো ছাই আটকে ছিল। জানতুম টাইপ করা শেষ না হলে ছাইটুকু খসে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

সোফার এককোণে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ কৃতান্তকুমার হালদার—আমাদের প্রিয় 'হালদারমশাই'। তাঁর ডানহাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর চিমটিতে একটুখানি নস্যি। কখন সেটা নাকে গুঁজবেন বোঝা যাচ্ছিল না।

হালদারমশাই একজন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার। রিটায়ার করার পর একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন। মাঝে-মাঝে তাঁর এই এজেন্সির বিজ্ঞাপন দেন। কখনও-সখনও দু-একটা কেসও পান। কেস জটিল হলে তিনি 'কর্নেলস্যারের লগে কনসাল্ট' করতে আসেন। তবে আজ তাঁর হাবভাব দেখে বুঝতে পেরেছিলুম, কোনো কেসের ব্যাপারে কর্নেলের কাছে আসেননি।

নভেম্বর মাস শুরু হয়ে গেলেও এখনও কলকাতায় শীতের কোনো সাড়া নেই। প্রশস্ত ড্রয়িংরুমে দুটো সিলিংফ্যান পূর্ণ বেগে ঘুরছিল। একসময় নস্যি নাকে গুঁজে প্যান্টের পকেট থেকে নোংরা রুমাল বের করে নাক মুছলেন গোয়েন্দাপ্রবর কে. কে. হালদার। তারপর আপনমনে বললেন,—পড়বার মতন খবর নাই। জয়ন্তবাবু! আপনাগো দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা কী যেসব ল্যাখে, বুঝি না। খালি ন্যাতাগো বক্তৃতা। বক্তৃতা কি খবর? খবর কই গেল?

খবর আছে হালদারমশাই!—কর্নেল বলে উঠলেন। দেখলুম, এতক্ষণে তাঁর টাইপ করা শেষ হয়েছে। কাগজগুলো গুছিয়ে ছবিগুলো তার সঙ্গে ক্লিপে এঁটে তিনি একটা প্রকাণ্ড খামে ঢোকাচ্ছিলেন। তাঁর দাড়ি থেকে চুরুটের ছাইটা এবার খসে পড়ে গেছে। হালদারমশাইয়ের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন,—আপনার পড়ার মতো খবর জয়ন্তদের কাগজেই আছে।

হালদারমশাই কর্নেলের দিকে গুলিচোখে তাকিয়ে বললেন,—কী খবর আছে কর্নেলস্যার?

—ছয়ের পাতায় মফস্বলের খবর দেখুন! তিন নম্বর কলামে বোল্ড টাইপে ছাপা!

গোয়েন্দাপ্রবর দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার পাতা উল্টে একটু ঝুঁকে বসে বিড়বিড় করে কী একটা খবর পড়তে শুরু করলেন।

একটু পরে তিনি খিখি করে হেসে উঠলেন,—অ্যাঁ? মৎস্যজীবীদের জালে মুণ্ডুকাটা কালো কুকুর! এটা কী হইল? মুণ্ডুকাটা মাইনষের বডি হইলে কথা ছিল। মুণ্ডুকাটা কুত্তার লাশ!

কর্নেল খামটা ড্রয়ারে ভরে সোফার কাছে তাঁর ইজিচেয়ারে এসে বসলেন। মিটিমিটি হেসে বললেন,—মুণ্ডুকাটা কালো কুকুরের লাশ আপনার খবর বলে মনে হচ্ছে না হালদারমশাই?

হালদারমশাই বললেন,—বুঝলাম না কর্নেলস্যার। জয়ন্তবাবু কই, মশায়! আপনাগো সাংবাদিকগো হাতে যখন ল্যাখনের মতো খবর থাকে না, তখন মুণ্ডুকাটা কালো কুত্তারে খবর কইরা ফ্যালেন!

বললুম,—কর্নেল ঠিক ধরেছেন। আপনি ধরতে পারেননি।

—ক্যান?

—চিন্তা করে দেখুন! দেবতার সামনে মুণ্ডু কেটে বলিদান করা হয় পাঁঠা। কোথাও-কোথাও মোষের মুণ্ডু কেটেও বলিদানের প্রথা আছে। প্রাচীন যুগে নাকি এইভাবে নরবলির প্রথাও ছিল। কিন্তু কুকুর বলিদান! কোন দেবতা কুকুর-বলি পেলে খুশি হন? এটা একটা রহস্য না?

প্রাইভেট ডিটেকটিভ হাসলেন,—নাঃ। পোলাপানগো কাম। মশায়! চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি! পাড়াগাঁয়ে দেখছি, পোলাপানরা শেয়ালের ছানার মুণ্ডু কাটত। বড়রা বাধা দিত না। ক্যান কী, শেয়াল অগো ছাগল, হাঁস-মুরগি খাইয়া ফ্যালে! কিন্তু কুত্তা হইল গিয়া উপকারী প্রাণী। রাত্রে পাড়ায় চোর ঢুকলে কুত্তা চ্যাচাইয়া মাইনষেরে সাবধান করে।

কর্নেল বললেনে,—হালদারমশাই! আপনি নিজেই কুকুর-বলির রহস্য ফাঁস করে দিলেন কিন্তু!

—ফাঁস করলাম! কন কী কর্নেলস্যার?

—হ্যাঁ। পাড়ায় রাতবিরেতে চোর ঢুকলে কুকুর চ্যাঁচামেচি করে মানুষকে সাবধান করে। এটা আপনারই কথা। কাজেই চোরেরা সেই কুকুরকে রাগের বশে বলি দিতেই পারে। আর একটা কথা। খবরের শেষ লাইনটা আপনি পড়েননি।

হালদারমশাইয়ের গোঁফের দুই ডগা উত্তেজনায় তিরতির করে কাঁপছিল। তিনি খবরের কাগজ তুলে আবার বিড়বিড় করে পড়তে থাকলেন। তারপর শেষ লাইনটা আওড়ালেন : খবর পেয়ে দোমোহানির থানার পুলিশ মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে মুণ্ডুকাটা কালো কুকুরের লাশ উদ্ধার করেছে।

কর্নেল বললেন,—কী বুঝলেন এবার?

হালদারমশাই চাপাগলায় বললেন,—পুলিশ! তা হইলে খবরের একখান ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। কিন্তু দোমোহানির নিজস্ব সংবাদদাতা তা ল্যাখে নাই ক্যান, বুঝি না।

আমি বললুম,—নিজস্ব সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর জায়গার অভাবে কেটেছেঁটে ছাপানো হয়।

ঠিক এই সময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল যথারীতি হাঁক দিলেন,—ষষ্ঠী!

কর্নেলের এই ড্রয়িংরুমে ঢুকতে হলে ডাক্তারবাবুদের জন্য অপেক্ষারত রোগীদের ঘরের মতো একটা ঘর পেরিয়ে আসতে হয়। কর্নেলের ওই ঘরটা অবশ্য ছোট। ষষ্ঠী আগন্তুককে ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে ওদিকের করিডোর হয়ে নিজের ঘর বা কিচেনে চলে যায়। কর্নেলের কাছে সকলের জন্য দরজা খোলা, তা ষষ্ঠী জানে।

যাই হোক, একটু পরে ড্রয়িংরুমের পর্দার ফাঁকে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখা গেল। তিনি পা থেকে জুতো খোলার পর জুতো দুটো হাতে নিয়ে ঢুকছিলেন। কর্নেল বললেন,—আপনি ইচ্ছে করলে জুতো পরেই ঢুকতে পারেন। আর যদি জুতো ওঘরে খুলে রেখেই ঘরে ঢোকেন, আপনার জুতো চুরি যাবে না।

ভদ্রলোক কাঁচুমাচু মুখে হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—আজ্ঞে অভ্যেস!

—তার মানে বাইরে জুতো খুলে কোথাও ঢুকলে আপনার জুতো চুরি হয়!

—আজ্ঞে স্যার! ঠিক ধরেছেন।

—এ পর্যন্ত কতজোড়া জুতোচুরি গেছে?

—পাঁচজোড়া স্যার! আমার দুঃখের কথা আর কাকে বলব? অবশেষে আমার মাসতুতো ভাই পরেশ—পুলিশে চাকরি করে স্যার, সে-ই আপনার নাম-ঠিকানা দিল। আপনার চেহারার বর্ণনাও দিল। পরেশ বলল, এর বিহিত পুলিশ করতে পারবে না। তুমি কর্নেলস্যারের কাছে যাও। তাই এলুম! তা-তাহলে জুতো পরেই ঢুকি?

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—হ্যাঁ। দেখছেন না, আমরা জুতো পরেই আছি!

যে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন, তাঁর পরনে সাদাসিধে প্যান্ট-শার্ট, কাঁধ থেকে একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে এবং ব্যাগের ভিতর থেকে একটা সোয়েটার উঁকি দিচ্ছে। খাড়া নাকের নীচের প্রজাপতি-ছাঁট গোঁফ আর সিঁথে করা কাঁচাপাকা চুলে ঈষৎ শৌখিনতার ছাপ। পায়ের পামশুজোড়া নতুন তা বোঝা যাচ্ছিল। এ-ও বোঝা যাচ্ছিল, ইনি যেখান থেকে আসছেন, সেখানে শীত এসে গেছে। কারণ তিনি কলকাতায় এসেই গায়ের সোয়েটার খুলে ব্যাগে ঠেসে ঢুকিয়ে রেখেছেন।

ভদ্রলোক সোফায় বিনীতভাবে বসে প্রথমে কর্নেলকে, পরে হালদারমশাই ও আমাকে করজোড়ে নমস্কার করলেন। তারপর বললেন,—আমার নাম জয়গোপাল রায়। রেলে চাকরি করতুম। আজ এখানে, কাল সেখানে বদলির চাকরি। থিতু হয়ে কোথাও বসতে পারিনি যে বাড়ি-ঘর করব। আর করেই বা কী হবে? বাবুগঞ্জে পৈতৃক একতলা একখানা বাড়ি আছে। সেখানে আমার বিধবা বোনকে থাকতে দিয়েছিলুম। চাকরি থেকে গত মাসে রিটায়ার করার পর সেই বাড়িতেই চলে এসেছি, তারপর থেকেই এক উটকো বিপদ!

কর্নেল বললে,—জুতোচুরি?

—আজ্ঞে কর্নেলসায়েব! প্রথমে চুরি গেল পুরোনো পামশুজোড়া। সন্ধ্যাবেলা ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। গোবিন্দ-কোবরেজের ঘরে আড্ডা দিচ্ছিলুম। বাড়ি ফেরার সময় দেখি, সকলের জুতো আছে। আমার জোড়া নেই। সেই শুরু। কিন্তু তখন তলিয়ে কিছু ভাবিনি। আবার বাজার থেকে নতুন একজোড়া জুতো কিনলুম। দিন-তিনেক পরে মুখুজ্যেমশাইয়ের ঠাকুরবাড়িতে কথকতা শুনতে ঢুকেছিলুম। দরজার বাইরে জুতো খুলে রেখেছিলুম। কথকতা শেষ হল রাত দুটোয়। বেরিয়ে এসে আমার জুতোজোড়া আর খুঁজেই পেলুম না।

—তা হলে এইভাবে আপনার মোট পাঁচজোড়া জুতো চুরি হয়েছে?

—হ্যাঁ কর্নেলসায়েব। তারপর থেকে সতর্ক হয়েছিলুম। যেখানে ঢুকি, জুতোজোড়া হাতে নিয়েই ঢুকি কিন্তু এবার শুরু হল আরেক বিপদ! রাতবিরেতে বাড়ির আনাচে-কানাচে কারা ঘুরঘুর করতে আসে।

—সেটা টের পান কী করে?

—আজ্ঞে কালু! আমার বোনের পুষ্যি একটা কালো তাগড়াই কুকুর ছিল। তার নাম কালু। সে চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিত। তখন আমি আর আমার বোন হৈমন্তী ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁকডাক করে পড়শিদের জাগাই। তারা লাঠিসোটা, টর্চ নিয়ে বাড়ির চারদিকে খোঁজাখুঁজি করে। তবে দেখুন স্যার, দু-একদিন অন্তর এরকম হলে পড়শিরা বিরক্ত হয় না? দোষটা গিয়ে পড়ত কালুর ঘাড়ে।

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে শুনছিলেন। বললেন,—হুঁ। তারপর?

জয়গোপালবাবু জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন,—বাবুগঞ্জে বিদ্যুৎ আছে। কিন্তু চোর আসে রাতবিরেতে, হঠাৎ যদি লোডশেডিং হয়, তখন। তো গত মঙ্গলবার ভোরবেলা উঠে দেখি

সাংঘাতিক কাণ্ড। কাড়ির দরজার সামনে রক্তের ছড়াছড়ি। চাপ-চাপ রক্ত। চমকে উঠেছিলুম। কে কাকে আমার বাড়ির দরজার সামনে খুন করেছে ভেবে। তারপর চোখে পড়ল দরজার পাশে দেওয়াল থেকে—

—কালুর মুণ্ডু ঝুলছে?

জয়গোপালবাবু নড়ে বসলেন,—আপনি খবর পেয়েছেন স্যার? তক্ষুনি থানায় গিয়েছিলুম। পুলিশ এসেছিল। সে এক হইচই ব্যাপার! হৈমন্তী কালুর শোকে কেঁদেকেটে অস্থির। কর্নেলসায়েব! পরেশ বলছিল, আপনার নাকি পিছনেও একটা চোখ আছে। ওরে বাবা! সে এক বীভৎস দৃশ্য! আপনি নিশ্চয়—

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—আপনি খবরের কাগজ পড়েন?

জয়গোপালবাবু কিছু বলার আগেই গোয়েন্দাপ্রবর হালদারমশাই বলে উঠলেন,—সেই কুত্তার বডি উঠছে মৎস্যজীবীগো জালে! কর্নেলস্যার ঠিকই কইছিলেন। কুকুর-বলির রহস্য ঠিকই ফাঁস করছিলাম।

জয়গোপালবাবু অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন,—খবরের কাগজ নিয়মিত পড়ি না। কিন্তু উনি বলছেন মৎস্যজীবী—মানে জেলেদের জালে কুকুরের বডি উঠেছে। কিছু বুঝতে পারছি না!

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—পুলিশ আপনাকে খবর দেয়নি?

—আজ্ঞে না তো!

—বাড়ি ফিরে হয়তো আপনার বোনের কাছে জানতে পারবেন, পুলিশ আপনাদের হতভাগ্য কালুর লাশ উদ্ধার করেছে। আপনার বাড়ি বাবুগঞ্জে। নদীর ধারেই গঞ্জ গড়ে ওঠে। আপনাদের বাবুগঞ্জের নদীটার নাম কী?

—বেহুলা। একসময় নাকি বড় নদী ছিল। এখন প্রায় মজে এসেছে।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ বললেন,—আপনাগো কুত্তাটার মাথা চোরেরা কাটল ক্যান তা কি বুঝছেন?

জয়গোপালবাবু বিব্রতভাবে বললেন,—চ্যাঁচামেচি করত বলে।

রাত্রে জুতোচোরেরা আপনার জুতো চুরি করতে আইলে কুত্তাটা চ্যাঁচামেচি করত—বলে হালদারমশাই কর্নেলের দিকে ঘুরলেন,—কর্নেলস্যার! একটা কথা বুঝি না। চোরেরা ভদ্রলোকের জুতো চুরি করে ক্যান? হেভি মিস্ট্রি।

কর্নেল হাসলেন, —ঠিক বলেছেন হালদারমশাই! হেভি মিস্ট্রি। আচ্ছা জয়গোপালবাবু, কেউ বা কারা আপনার জুতো চুরি করে কেন, একথা কি ভেবে দেখেছেন?

জয়গোপালবাবু করুণমুখে বললেন, —অনেক ভেবেছি কর্নেলসায়েব। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি!

—আপনার বোন হৈমন্তীদেবীর কী ধারণা?

—সে-ও কিছু বুঝতে পারছে না। হৈমন্তী কান্নাকাটি করে চুপিচুপি বলছিল, কালুকে চিরকালের জন্য চুপ করাতে চেয়েছে কেউ বা কারা, তা ঠিক। কিন্তু তার মনে একটা আতঙ্ক ঢুকেছে। কালুকে মারল, মারল, কিন্তু তার মাথা কেটে দোরগোড়ায় ঝোলালো কেন? তার আতঙ্কের কারণ, হয়তো এরপর আমার মাথা কেটে ফেলবে, ওটা তারই নোটিস! হৈমন্তীর ধারণা, রেলে চাকরি করার সময় আমি কারওর কোনো ক্ষতি করেছিলুম। আমি ওকে বলেছি, আমি ছিলুম রেলের সামান্য কেরানি। জ্ঞানত কারও কোনো ক্ষতি করিনি।

কর্নেল ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললেন,—আপনার বাবা কী করতেন?

—বাবাও রেলে চাকরি করতেন। বাবা অবশ্য রেলে গার্ড ছিলেন। কাটিহারে মারা যান।

—আপনাদের বাড়িটা কে তৈরি করেছিলেন?

—আমার ঠাকুরদা বিনয়গোপাল রায়।

—তিনি কী করতেন?

—ঠাকুরদা বাবুগঞ্জে মুখুজ্যেমশাইয়ের জমিদারির সেরেস্তায় খাজাঞ্চি ছিলেন!

হালদারমশাই জিজ্ঞেস করলেন,—খাজাঞ্চি? সেটা কী পোস্ট?

কর্নেল বললেন,—ট্রেজারার বলতে পারেন। পুরোনো আমলে জমিদারদের খাজাঞ্চিখানা থাকত। অর্থাৎ ট্রেজারি। প্রজাদের খাজনা আদায় করে সেখানে রাখা হত। তাছাড়া জমিদারবাড়ির পারিবারিক সম্পদ, ধনরত্ন এসব কিছুই খাজাঞ্চিখানায় জমা থাকত। খাজাঞ্চি ছিলেন একাধার তদারককারী, আর ক্যাশিয়ার। কোষাধ্যক্ষ বলতে পারেন।

গোয়েন্দাপ্রবর গম্ভীরমুখে বললেন,—হঃ! বুঝছি।

কর্নেল বললেন,—জয়গোপালবাবু! আপনার ঠাকুরদাকে আপনি দেখেছেন?

—আজ্ঞে না। আমার জন্মের আগে তিনি মারা যান। ওদিকে জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদের পর মুখুজ্যেপরিবারের লোকেরা কে কোথায় চলে যায়।

—এখন বাবুগঞ্জে কোন মুখুজ্যে আছেন?

—আজ্ঞে স্যার, প্রমথ মুখুজ্যেমশাই। সেই সাতমহলা বাড়ি এখন ধ্বংসস্তূপ। প্রমথবাবুর হাতে কিছু জমিজিরেত আছে। নিজেই দেখাশোনা করেন। মেকানাইজড্ এগ্রিকালচার। বুঝলেন তো?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—বুদ্ধিমান লোক।

জয়গোপালবাবু আড়ষ্টভাবে হাসলেন,—তা আর বলতে? ভাগচাষিদের ভাগিয়ে দিয়ে পাওয়ারটিলার আর সেচের জন্য পাম্পিং মেশিন কিনে রীতিমতো ফার্মহাউস করে ফেলেছেন। দোতলা নতুন বাড়ি করেছেন। তবে ঠাকুরবাড়িটা পুরোনো আমলের।

—আপনার জুতোচুরির কথা তাঁকে কি আপনি বলেছেন?

—বলিনি। বলে কী হবে? আমার বোন হৈমন্তী ছাড়া আর কেউ জানে না।

—পুলিশকে জানাননি?

জয়গোপালবাবু চাপাস্বরে বললেন,—হৈমন্তী নিষেধ করেছিল। পুলিশ জুতোচুরির কথা শুনলে হাসবে। বরং রাতবিরেতে বাড়িতে চোরের উৎপাতের কথা বলাই ঠিক হবে। তাই আমি পুলিশকে শুধু চোরের কথাই বলেছিলুম। তবে দেখুন কর্নেলসায়েব, দু-একটা মিথ্যা নালিশ না করলে কেস শক্ত হবে না। তাই পুলিশকে বলেছিলেন, চোর রান্নাঘর থেকে থালা-ঘটি-বাটি চুরি করেছে। আরও চুরি করার জন্য প্রায়ই রাতবিরেতে হানা দিচ্ছে।

—কুকুরটার কথা কি বলেছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। পুলিশ ডায়েরি লিখে নিয়ে বলেছিল, কাকে সন্দেহ হয় বলুন। কাকেই বা সন্দেহ করব বলুন? বাবুগঞ্জে চোর নিশ্চয় আছে। তাদের কারও নাম করলে আমাদের ক্ষতি করতে পারে। তাই কারও নাম বলিনি।

—পুলিশকে আপনাদের কুকুরটার মুণ্ডুকাটার খবর নিশ্চয় দিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। পুলিশ এসে মুণ্ডুটা নিয়ে গিয়েছিল। সে-ও স্যার, আমার মাসতুতো ভাই পরেশের অনুরোধে। পরেশ কলকাতার বেনেপুকুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর। সে-ই তো আমাকে আপনার কথা বলেছে।

ষষ্ঠীচরণ এতক্ষণে আমাদের জন্য দ্বিতীয় দফা কফি আনল। কর্নেল বললেন,—কফি খান জয়গোপালবাবু। কফি নার্ভ চাঙ্গা করে।

জয়গোপালবাবু কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—বাবুগঞ্জে স্যার জাঁকিয়ে শীত নেমেছে। শেয়ালদা স্টেশনে নেমে গরমের চোটে সোয়েটার খুলতে হল। তবে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কফি খেয়ে সত্যিই চাঙ্গা হচ্ছি!

প্রাইভেট ডিটেকটিভ গুলি-গুলি চোখে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ বললেন,—জয়গোপালবাবুরে একটা কথা জিগাই।

জয়গোপালবাবু বললেন,—আপনি কি স্যার ওপার বাংলার লোক?

—জন্ম হইছিল ওপারে। ছোটবেলায় এপারে আইছিলাম। তো কথাটা হইল, আপনার ঠাকুরদা জমিদারবাড়ির খাজাঞ্চি ছিলেন। ওনার একখান বাড়ি ছাড়া আর কোনো প্রপার্টি ছিল না?

জয়গোপালবাবু যেন চমকে উঠে বললেন,—প্রপার্টি?

তারপর ভদ্রলোক কফির কাপ-প্লেট রেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে কী সর্বনাশ! —বলে আমাদের হতবাক করে বেরিয়ে গেলেন।

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন,—এটা কী হইল? অরে আমি ফলো করুম...!

কর্নেল হালদারমশাইকে বাধা না দিলে উনি সত্যিই জয়গোপালবাবুকে অনুসরণ করে হয়তো বাবুগঞ্জে গিয়ে হাজির হতেন। কর্নেল বললেন,—হালদারমশাই! শুনলেন তো! বাবুগঞ্জে এখন জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। শীতের পোশাক ছাড়া সেখানে গিয়ে শীতে কাঁপতেন, না গোয়েন্দাগিরি করতেন? কাজেই তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই।

হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে বললেন,—হেভি মিস্ট্রি আরও হেভি হইয়া গেল! 'প্রপার্টি' কথাটা যেই কইলাম, অমনই উনি কফি খাওয়া ছাড়ান দিয়া ঘোড়ার মতন ছুট দিলেন।

ঠিক বলেছেন। ঘোড়ার মতোই ব্যাপারটা অদ্ভুতই বটে।—বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন। চোখ বুজে তিনি আবার ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন।

আমি বললুম,—ভদ্রলোকের মাথায় ছিট আছে মনে হচ্ছে। ওঁর কথা বলার ভঙ্গিও কেমন এলোমেলো। গুছিয়ে সব কথা বলতে পারছিলেন না। পুলিশ কুকুরের কাটামুণ্ডু নিয়ে গেল কেন, তাও বুঝিয়ে বললেন না।

হালদারমশাই বললেন,—জয়ন্তবাবু! আপনি সাংবাদিক। পুলিশের কামের মেথড বুঝবেন না।

হাসতে-হাসতে বললুম,—মেথডটা কী?

—মশায়! চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি। মেথডটা আমি জানি। ভদ্রলোক রাত্রিকালে চোরের উৎপাতের কথা কইছিলেন। তারপর ওনার কুত্তাটার মাথা কাইটা ঝুলাইয়া দিছিল অরা। এখন পুলিশের কাম হইল গিয়া কুত্তার মুণ্ডু ডাক্তাররেরে দেখাইয়া সার্টিফিকেট লওয়া। পুলিশ যখন ডায়েরি লিখছে, তখন ওই কুত্তার মুণ্ডুকাটার ঘটনাও পুলিশের ডিউটির মধ্যে পড়ে। আপনাগো দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় লিখছে, মৎস্যজীবীগো জালে পাওয়া মুণ্ডুকাটা বডিটার খোঁজ লইতে গেছে পুলিশ! তা হইলেই বুঝুন!

হালদারমশাই ঢ্যাঙা বলিষ্ঠ গড়নের মানুষ। মাথার চুল খুঁটিয়ে ছাঁটা। তিনি ছদ্মবেশ ধরতে পটু। তবে তিনি বড্ড হঠকারী স্বভাবের মানুষ। পুলিশ ইন্সপেক্টরের পদ থেকে রিটায়ার করলেও মাঝে-মাঝে সেই কথাটা ভুলে গিয়ে বিভ্রাট বাধান। আজ সকালে বুঝতে পারছিলুম, তাঁর নাকের ডগায় একখানা অদ্ভুত কেস এসে ঝুলছিল। কেসটা কর্নেলের হলেও তিনি এতে নাক গলাতে উদগ্রীব। অবশ্য এ-ও সত্যি, অসংখ্য জটিল রহস্যজনক কেসে কর্নেল তাঁর সাহায্য নেন। তাই লক্ষ

করছিলুম, পুলিশের কাজের 'মেথড' নিয়ে কথা বলার পর তিনি কর্নেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। উত্তেজনায় চোয়ালে-চোয়ালে ঘর্ষণের জন্যই তাঁর গোঁফের দুই সূক্ষ্ম ডগা যথারীতি তিরতির করে কাঁপছিল।

একটু পরে কর্নেল চোখ খুলে বললেন,—হালদারমশাই। আমার মনে হচ্ছে জয়গোপালবাবুর বোনের আশঙ্কার কারণ আছে। একটা কুকুরকে চিরকালের জন্য চুপ করানোর অনেক উপায় আছে। অথচ কেউ বা কারা কুকুরটার মাথা কেটে দরজার পাশে ঝুলিয়ে রেখছিল কেন? জয়গোপালবাবুকে নিশ্চয় তারা বোঝাতে চেয়েছিল, তোমার মুণ্ডুও এমনি করে কাটা হবে।

—ঠিক কইছেন কর্নেলস্যার! এবার আমার ধারণাটা কইয়া ফেলি?

—হ্যাঁ বলুন!

—কে বা কারা ওনার ঠাকুরদার কোনো প্রপার্টি ফেরত চায়।

আমি অবাক হয়ে বললুম,—ফেরত চায় মানে?

জবাবটা কর্নেল দিলেন,—জয়ন্ত! হালদারমশাই সম্ভবত ঠিক বুঝেছেন! জমিদারের খাজাঞ্চি ছিলেন জয়গোপালবাবুর ঠাকুরদা। এমন হতেই পারে, তিনি কারও কোনো প্রপার্টি—তার মানে কোনো দামি জিনিস হাতিয়ে নিয়েছিলেন। এখন তার বংশধর সেটা ফেরত চাইছে। এছাড়া রাতবিরেতে চোরের উপদ্রবের কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। জিনিসটা খাজাঞ্চি ভদ্রলোকের নিজের হলে চোরেরা এত সব কাণ্ড করতে যাবে কেন? জুতোচুরি, রাতবিরেতে হানা দেওয়া, কুকুরের মুণ্ডুকাটা!

বললুম,—আমার ধারণা, জুতোচুরি মানে জয়গোপালবাবুকে উত্যক্ত করা।

হালদারমশাই বললেন,—হঃ! ঠিক কইছেন জয়ন্তবাবু! বারবার জুতোচুরি করলে মাইনষের মাথা ব্যাবাক খারাপ হওনের কথা! তারপর কুত্তার মুণ্ডুকাটা! জয়গোপালবাবুকে উত্যক্ত কইর‍্যা মারছে অরা। কর্নেলস্যার! আপনি আমারে পারমিশন দ্যান! বাবুগঞ্জে গিয়া খোঁজখবর লই।

কর্নেল বললেন,—আমার মতো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবেন?

—আপনিও লগে-লগে থাকবেন!

আমি বললুম,—বাবুগঞ্জ কোথায়?

কর্নেল মিটি-মিটি হেসে বললেন,—বেহুলা নদীর ধারে!

বিরক্ত হয়ে বললুম,—ওঃ কর্নেল! এমন একটা সিরিয়াস ব্যাপারকে আপনি হাল্কাভাবে নিচ্ছেন। ধরুন, যদি সত্যি জয়গোপালবাবুর কোনো বিপদ হয়?

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন,...হ্যাঁ। বলছি।...আরে কী কাণ্ড ! পরেশ। তুমি বেনেপুকুরে কবে এলে?...কী আশ্চর্য! আমার নাকের ডগায় আছো! তোমার মাসতুতো দাদাকে সঙ্গে নিয়ে তুমিই আসতে পারতে!...হ্যাঁ। জয়গোপালবাবু এসেছিলেন। তোমার কথাও বলছিলেন।...হ্যাঁ তুমি যখন বলছ, আমার পক্ষে যতটা সম্ভব সাহায্য নিশ্চয় করব।...আমারও তাই মনে হল। একটু ছিটগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। সেটা এ অবস্থায় স্বাভাবিক। তো শোনো! উনি হঠাৎ উঠে চলে গেলেন।...বুঝতে পেরেছি। তো বাবুগঞ্জ জায়গাটা ঠিক কোথায়?...না। ওই যে বললুম, হঠাৎ চলে গেলেন।...তার মানে শান্তিপুরের আগে!... কাছারিবাড়ির মোড়? তারপর?...নাঃ! বাসে নয়। গাড়িতেই যাব, তত কিছু দূরে নয়।...দোমোহানি ওয়াটারড্যাম?...বাঃ! এখন তাহলে তো সাইবেরিয়ান হাঁসের মেলা বসে গেছে।...বলো কী! গড়ের জঙ্গলেও...ওয়ান্ডারফুল! বুঝলে পরেশ? কদিন থেকে ভাবছিলুম মফস্বলে শীত এসে গেছে। জলাভূমিতে দেশ-বিদেশের পাখি এসে জুটবে। এবার কোথায় যাব, তা ঠিক করতে পারছিলুম

না।...ধন্যবাদ পরেশ! এই খবরটার জন্য ধন্যবাদ।...না, না। ওঁর কেসটা আমি নিয়েছি।...আচ্ছা রাখছি।

রিসিভার রেখে কর্নেল একটু হেসে বললেন,—জয়ন্ত, তিতলিপুরের গড়ের জঙ্গলের কথা ভুলে গেছ?

হালদারমশাই নড়ে বসলেন।—হঃ! সেই তিতলিপুর! গড়ের জঙ্গল!

বললুম,—বাজে জায়গা। তিতলিপুরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। বিশেষ করে নভেম্বর মাসে।

কর্নেল বললেন,—বাবুগঞ্জ তিতলিপুর থেকে সামান্য দূরে। আমরা দোমোহানির যে সেচ-বাংলোতে ছিলুম, সেখানে নয়। আমরা এবার থাকব বাবুগঞ্জের কাছাকাছি অন্য একটা বাংলোতে।

একটু অবাক হয়ে বললুম,—একজন ছিটগ্রস্ত মানুষের আবোল-তাবোল কথা শুনে আপনিও দেখছি হালদারমশাইয়ের মতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন! হালদারমশাই একজন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার এবং বর্তমানে গোয়েন্দাগিরি ওঁর নেশা ও পেশা। বরং হালদারমশাই আগে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝে আসুন।

হালদারমশাই সহাস্যে বললেন,—আমি তো যামুই। হেভি একখান মিস্ট্রির লেজটুকু দেখছি। কিন্তু কর্নেলস্যারের লগে-লগে একদিন ঘুইর‍্যাও আসল কথাটা আপনি বুঝলেন না জয়ন্তবাবু?

—আসল কথাটা কী?

গোয়েন্দাপ্রবর চোখ নামিয়ে বললেন,—পক্ষী! উনি চোখে বাইনোকুলার দিয়া ওয়াটারড্যামে পক্ষী দেখবেন! বেনেপুকুরের এস. আই. ভদ্রলোক কর্নেলস্যারকে হেভি পক্ষীর খবর দিছেন!

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে বললেন,—ঠিক বলেছেন হালদারমশাই! সাইবেরিয়ান হাঁস হেভি পক্ষীই বটে। একেকটার ওজন আট-দশ কিলোগ্রামেরও বেশি। সুদূর উত্তরের সাইবেরিয়া থেকে প্রতি শীতে চীন পেরিয়ে হিমালয় ডিঙিয়ে ওরা বাংলার মিঠে জলে সাঁতার কাটতে আসে। আবার শীতের শেষে দেশে ফিরে যায়। প্রকৃতির এ এক বিচিত্র রহস্য! পরিযায়ী পাখিদের রহস্য!

হাসি চেপে বললুম, —হ্যাঁ। এ-ও হেভি রহস্য।

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—তুমি সাংবাদিক। একালের সাংবাদিকরা সর্ববিদ্যাবিশারদ। জয়ন্ত! তোমার জানা উচিত ছিল, পাখিদের হাজার-হাজার মাইল উড়ে আসা এবং ঠিক পথ চিনে ঘরে ফেরা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কত গবেষণা চলেছে। পাখিদের এই পরিযানের রহস্য আজও সঠিকভাবে সমাধান করা যায়নি। শুনলে অবাক হবে, জিনোমবিজ্ঞানীরাও পরিযায়ী পাখিদের ডি. এন. এ.-র মধ্যে...

আবার ডোরবেল বাজল। তাই কর্নেলের বক্তৃতা শোনা থেকে রেহাই পেলুম। কর্নেল যথারীতি হাঁকলেন,—ষষ্ঠী!

একটু পরে আমাদের আবার হতবাক করে বাবুগঞ্জের জয়গোপাল রায় এক হাতে জুতোজোড়া নিয়ে ঘরে ঢুকলেন এবং পরক্ষণে জিভ কেটে জুতোদুটো পায়ে পরে সোফায় বসলেন।

কর্নেল বললেন,—আপনার ঠাকুরদার প্রপার্টি পেলেন?

জয়গোপালবাবু কাঁচুমাচু মুখে হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—হ্যাঁ স্যার! ভাগ্যিস ওই ভদ্রলোক মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। উনি মনে করিয়ে না দিলে আবার পরের রোববার আসতে হত।

বলে তিনি হালদারমশাইয়ের দিকে তাকালেন। হালদারমশাই বললেন,—কী কন বুঝি না!

জয়গোপালবাবু বললেন,—আজ্ঞে স্যার, এন্টালি মার্কেটের উল্টোদিকে ডাক্তার লেনে আমাদের বাবুগঞ্জের এক ল-ইয়ার পাঁচুবাবু থাকেন। পঞ্চানন বারিক। আমার ঠাকুরদার প্রপার্টির

উইল ওঁর সাহায্যেই আমার বাবা কোর্টে প্রবেট করিয়েছিলেন। ঠাকুরদার উইলে বসতবাড়ির লাগোয়া কাঠাদশেক জমির কথা ছিল। জমিদারবংশের প্রমথ মুখুজ্যেমশাইয়ের খুড়তুতো ভাই অবনী জমিটা দখলে রেখেছিল। বাবা মামলা-মোকদ্দমা করবেন, না রেলের গার্ড হয়ে কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক ঘুরে বেড়াবেন। তখন বলেছিলুম, বাবা কাটিহারে মারা যান। তো আমি রেলের চাকরি থেকে রিটায়ার করে বাড়ি ফিরলুম। তখন আমার বোন হৈমন্তী আমাকে ওই জমিটার কথা বলল। হৈমন্তীর আগেই পাঁচুবাবু ল-ইয়ারের সঙ্গে বাবুগঞ্জে ওঁর দেশের বাড়িতে কথা বলেছিল। তারপর সেই উইল পাঁচুবাবু দেখতে চেয়েছিলেন।

কর্নেল বললেন,—বুঝেছি। আপনার ঠাকুরদার উইল পাঁচুবাবুর কাছেই থেকে গিয়েছিল!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, গত রোববার পাঁচুবাবু দেশের বাড়িতে গিয়েছিলেন। হৈমন্তী তাঁর কাছে উইল চাইতে গিয়েছিল। উনি বলেছিলেন, পরের রোববার আমি যেন কলকাতা গিয়ে উইলখানা ওঁর কাছে ফেরত নিই। কারণ এদিন উনি বাবুগঞ্জে যাবেন না। ফ্যামিলি নিয়ে সাড়ে দশটার বাসে চেপে তারাপীঠে তীর্থ করতে যাবেন।

—পেলেন উইল?

জয়গোপালবাবু একটু হেসে বললেন,—আর একটু দেরি করলেই ওঁকে পেতুম না। তীর্থ করতে বেরুনোর মুখে বাগড়া দিলুম। একটু বিরক্ত হয়েই বাড়ি ঢুকে প্যাকেটটা এনে দিলেন। বললেন, দশকাঠা দখলি জমি এতদিন পরে ফেরত পাওয়ার হ্যাপা অনেক। ফিরে এসে বলবেন।

—আপনার ঠাকুরদা সম্পত্তির উইল করেছিলেন কেন? আপনার বাবা ছাড়া কি আর কোনো ছেলে-মেয়ে ছিল তাঁর?

জয়গোপালবাবু কী বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিলেন। বললেন না।

কর্নেল বললেন,—সম্পত্তির আইনত কোনো নির্দিষ্ট প্রাপক না থাকলে এবং সম্পত্তির পরিমাণ বেশি হলে তবেই লোক উইল করে। তাই জিজ্ঞেস করছি আপনার ঠাকুরদা উইল করেছিলেন কেন?

জয়গোপালবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন,—ঠাকুরদার শেষ বয়সে দেখাশোনা করতেন আমার পিসিমা। বাবা তো রেলের গার্ড।

—তার মানে, আপনার ঠাকুরদার একটি মেয়ে ছিল?

—ঠিক ধরেছেন স্যার। তো তাঁরও দুর্ভাগ্য আমার বোনের মতো। পিসিমাও বিধবা ছিলেন। তাঁর একটি মাত্র ছেলে। তার নাম প্রবোধ। সে এখন বাবুগঞ্জে আছে। ঠাকুরদার শুধু বসতবাটি আর তার লাগোয়া দশকাঠা পোড়ো জমি বাবাকে দিয়ে গেছেন। উইলে সম্পত্তির বেশি অংশই ছিল পিসিমা কুমুদিনীর নামে। পিসিমা মারা গেলে সেই সম্পত্তি প্রবোধ পেয়েছিল। ধানি জমি, পুকুর, একটা আমবাগান। উড়নচণ্ডী প্রবোধ সব বেচে খেয়ে এখন অবনী মুখুজ্যের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। নির্লজ্জ বজ্জাত! হৈমন্তীর কাছে কম টাকা ধার করেছে! আমাকে দেখলে এখন ছায়া মাড়ায় না!

—আপনার বোন হৈমন্তী টাকা পান কোথায়?

জয়গোপালবাবু চাপাস্বরে বললেন,—প্রাইমারি স্কুলের টিচার যে! অনেক টাকা মাইনে পায়। আপনার দিব্যি স্যার! রেলে আমি হৈমন্তীর মাইনের আদ্ধেক টাকা মাইনে পেতুম। অবশ্য পেনশন পাচ্ছি! হৈমন্তীও পাবে! বদমাশ প্রবোধের মুখ থেকে লালা ঝরবে না? বলুন! অবনী মুখুজ্যে ওকে আশ্রয় দিয়ে দু-দশটাকায় সব সম্পত্তি গ্রাস করেছে। প্রবোধের সায় না থাকলে অবনী আমার বাবার ন্যায্য দশকাঠা জমি দখল করতে পারত? হৈমন্তী তো মেয়ে। সে একা কী করতে পারত?

হালদারমশাই কথা বলার জন্য উসখুস করছিলেন। এবার বলে উঠলেন,—তাহলে জুতোচুরি, রাত্রে আপনারে জ্বালাতন, তারপর কুত্তার মাথা কাইট্যা ঝোলানো সেই প্রবোধেরই কাম!

জয়গোপালবাবু হাত নেড়ে বললেন,—না। না। প্রবোধের সে সাহসও নেই। আর ক্ষমতাও নেই। নেশাভাঙ করে বুড়ো বয়সে তার শোচনীয় অবস্থা। লাঠিতে ভর করে লেংচে হাঁটে। একটু হেঁটেই হাঁপায়। একদিন সে—

জয়গোপালবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। কর্নেল বললেন,—বলুন জয়গোপালবাবু।

—কালীপুজোর কদিন আগের কথা। বাজারে গেছি। হঠাৎ দেখি প্রবোধ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু চমকে উঠেছিলুম বইকী! কিন্তু সে হাঁউমাউ করে কেঁদে বলল, ও ভাই গোপাল! আমাকে গোটাদশেক টাকা দে, তোর পায়ে পড়ি! আমার বড্ড কষ্ট রে! অবনী আমাকে এখন তাড়িয়ে দেওয়ার ছল খুঁজছে! কান্নার চোটে ভিড় জমে গেল।

—আপনি টাকা দিলেন?

—দিলুম স্যার! মনটা ভিজে গেল। পিসতুতো দাদা! বুদ্ধির দোষে এই অবস্থায় পড়েছে।

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন,—তা হইলে সে আপনারে উত্যক্ত করতাছে না?

—আজ্ঞে না। কেউ বললেও ও কথা বিশ্বাস করব না।

—তা হইলে সেই অবনীবাবু করতাছে।

জয়গোপালবাবু বললেন,—অবনী মুখুজ্যে জমিটা দখল করেছে, তা ঠিক। তবে ওই জমিতে সে গার্লস হাইস্কুল করবে শুনেছি। হৈমন্তীর মতে, ওটা নাকি ওর চালাকি। আর আমাদের ন্যায্য জমি ফিরে পাওয়ার চান্স থাকবে না। তাই গার্লস স্কুল করে নাম কিনতে চাইছে। কিন্তু আমার জুতো চুরি করবে কেন সে?

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন,—আপনার ঠাকুরদার উইলটা একটু দেখতে পারি?

জয়গোপালবাবু বললেন,—নিশ্চয়ই দেখতে পারেন। হৈমন্তী মাঝে-মাঝে আমাকে বলে, ঠাকুরদার উইলেই এমন কিছু গণ্ডগোল আছে, যা কোনো ল-ইয়ারও বুঝতে পারছে না। দলিল-দস্তাবেজের ভাষা স্যার, বোঝা বড়ই কঠিন।

বলে তিনি ব্যাগের ভিতর থেকে বড় আকারের একটা খাম কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল খাম থেকে আরেকটা জীর্ণ নোংরা খাম বের করলেন। তারপর দু-পাতার একটা কাগজ বের করে চোখ বুলিয়ে বললেন,—যদি আমার প্রতি আপনার বিশ্বাস থাকে, আমি এটা দু-একটা দিনের জন্য রাখতে চাই।

জয়গোপালবাবু করজোড়ে বললেন,—কর্নেলসায়েব, বিপদে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি, আপনাকে অবিশ্বাস করতে পারি?

—ঠিক আছে। আপনাকে আসতে হবে না। আপনি বাবুগঞ্জে বসেই শিগগির এটা ফেরত পাবেন। আর একটা কথা। আপনি যে আমার কাছে এসেছিলেন, তা আপনার বোন ছাড়া আর কাকেও ঘুণাক্ষরে যেন জানাবেন না। তবে আপনার মাসতুতো ভাই পরেশ চৌধুরী পুলিশের লোক। পরেশ আমার বিশেষ স্নেহভাজন। সে আমাকে কিছুক্ষণ আগে টেলিফোন করেছিল। সে আমাকে আপনার কথা বলেছে। কাজেই বাইরের লোক বলতে শুধু পরেশই জানল।

জয়গোপালবাবু খুশি হয়ে বললেন,—পরেশ টেলিফোন করেছিল আপনাকে? তাহলে আর আমি ওর কাছে যাচ্ছিনে। বারোটা পাঁচের লালগোলা প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরব। রানাঘাট জংশনে নেমেই বাস পাব।

বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর কর্নেলকে নমস্কার করে পা বাড়িয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন, —ওঁদের সঙ্গে তো আলাপ হল না! দেখছ কাণ্ড? ছ্যা-ছ্যা! আমার ভদ্রতাবোধটুকুও হারিয়ে ফেলেছি!

কর্নেল আগে হালদারমশাইয়ের পরিচয় দিতেই জয়গোপালবাবু বিস্ফারিত চোখে নমস্কার করে বললেন,—ওরে বাবা! প্রাইভেট ডিটেকটিভ? জানেন স্যার, হৈমন্তী আমাকে একবার বলেছিল—

তাঁর কথা থামিয়ে কর্নেল আমার পরিচয় দিলেন। জয়গোপালবাবু আমাকে নমস্কার করে বললেন,—আমার কী সৌভাগ্য! ওরে বাবা! আপনারা সব কত নামজাদা মানুষ। আমি সামান্য এক চুনোপুঁটি!...

জয়গোপালবাবু বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি একটু হেসে বললুম,—হালদারমশাই কি এখন ওঁকে ফলো করতে চান?

গোয়েন্দাপ্রবর একটিপ নস্যি নিচ্ছিলেন। রুমালে নাক মুছে বললেন,—কর্নেলস্যার যা করতে বলেন, তা করব।

কর্নেল হাস্‌লেন না। নিভে যাওয়া চুরুটটা জ্বেলে বললেন,—বাবুগঞ্জে হালদারমশাই যদি যেতে চান, আপত্তি করব না। বরং খুশি হব। তবে ছদ্মবেশে গেলেই ভালো হয়।

হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে বললেন,—যামু!

—আপনি তো সবচেয়ে ভালো পারেন সাধু-সন্ন্যাসী সাজতে।

—সাধুর বেশেই যামু!

—কিন্তু ঝুলির ভিতরে আপনার লাইসেন্সড রিভলভার থাকবে। আপনার সরকারি আইডেন্টিটি কার্ডও সঙ্গে থাকা দরকার।

আমি বললুম,—কিন্তু সেখানে প্রচণ্ড শীত!

প্রাইভেট ডিটেকটিভ হাসলেন,—সাধুরা কম্বল গায়ে জড়ায় না? ধুনি জ্বালে না?

—আপনার সেই সিন্থেটিক কাপড়ে তৈরি বাঘছাল, ত্রিশূল আর প্লাস্টিকে তৈরি মড়ার খুলি নিতে ভুলবেন না যেন!

হালদারমশাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—বাড়ি গিয়া খাওয়াদাওয়া কইর‍্যাই বারাইয়া পড়ুম। বাবুগঞ্জে গিয়া সন্ধ্যার পর সাধুর ছদ্মবেশ ধরুম। জয়গোপালবাবুর বাড়ির কাছাকাছি জায়গা হইলে ভালো হয়। চলি কর্নেলস্যার। চলি জয়ন্তবাবু!

কর্নেল বললেন,—যথাসময়ে আমাদের দেখা পাবেন। কিন্তু সাবধান হালদারমশাই! কুকুরের মুণ্ডু যে বা যারা কেটেছে, সে বা তারা শুধু ধূর্ত নয়, নৃশংসও বটে।

কর্নেলস্যার! পঁয়তিরিশ বৎসর পুলিশ ছিলাম। ভাববেন না।—বলে গোয়েন্দাপ্রবর সবেগে বেরিয়ে গেলেন।...

আমার ফিয়াট গাড়িটা কিছুদিন থেকে বেগড়বাঁই করছিল। গত সপ্তাহে মেকানিকের পাল্লায় পড়ে জব্দ হয়েছে। পরদিন সোমবার সকাল আটটায় বেরিয়ে চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়িটা যেন পক্ষীরাজের মতো উড়ে যাচ্ছিল। কর্নেল আমার বাঁদিকে বসেছিলেন। তাঁর গলা থেকে ঝোলানো ক্যামেরা আর বাইনোকুলার। পিঠে যথারীতি আঁটা তাঁর প্রসিদ্ধ কিটব্যাগ, যার ভিতর একজন মানুষের জন্য দরকারি অসংখ্য জিনিস ঠাসা। কোণা দিয়ে উঁকি মারছিল প্রজাপতি ধরার জন্য অদ্ভুত একরকম জালের লম্বা হাতল। মাঝে-মাঝে তিনি বাইনোকুলারে পাখি দেখছিলেন,

নাকি অন্য কিছু তা বলা কঠিন। এটা ওঁর এক বাতিক। মাঝে-মাঝে তিনি আমাকে সাবধান করে দিচ্ছিলেন, যেন গতি কমাই।

এই রাস্তায় কর্নেলের সঙ্গে কতবার কত জায়গায় গেছি। কিন্তু আমার কিছু মনে থাকে না। ঘণ্টা আড়াই চলার পর তিনি বললেন,—সামনে ডাইনে একটা পিচরাস্তায় ঘুরতে হবে জয়ন্ত।

রাস্তাটা সঙ্কীর্ণ। কখনও যাত্রী-বোঝাই বাস, কখনও ট্রাক-লরি-টেম্পো, কখনও বা সাইকেলভ্যানের আনাগোনা। তাই এবার সাবধানে যেতে হচ্ছিল। রাস্তাটা বাঁক নিতে-নিতে চলেছে। দুধারে কখনও গ্রাম, কখনও পাকাধানে ভরা আদিগন্ত মাঠ, দূরে নীলাভ কুয়াশা আর মাঝে-মাঝে জলাভূমি, জঙ্গল, তারপর হঠাৎ ছোট্ট বাজার, বাসস্ট্যান্ড। আধঘণ্টা পরে বাঁ-দিক থেকে আরেকটা পিচরাস্তা এসে এই রাস্তার সঙ্গে মিশে একটু চওড়া হল। কর্নেল বাইনোকুলারে সামনেটা দেখে নিয়ে বললেন,—বাবুগঞ্জ এসে গেছি বলতে পারো। ওই দেখো, বাঁদিকে একটা ছোট্ট নদী। বেহুলা নদীই হবে।

বলে তিনি মাথার টুপি খুলে টাকে হাত বুলিয়ে নিলেন। বললুম,—সামনে যা ভিড়ভাট্টা দেখছি, ওর ভিতরে ঢুকলে কি সহজে বেরুতে পারব?

কর্নেল বললেন,—আমরা বাবুগঞ্জের ভিতরে ঢুকব না।

—তাহলে আমরা যাচ্ছি কোথায়?

—বাবুগঞ্জের পূর্বপ্রান্তে একটুখানি এগোলেই নদীর ধারে সেচদফতরের বাংলো।

একটু অবাক হয়ে বললুম,—আপনি কি আগে কখনও এসেছেন?

—নাঃ!

—তাহলে কেমন করে জানলেন...

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—জানা খুবই সোজা। কলকাতার সেচদফতরের এক বড়কর্তাকে ফোন করে রাস্তার হালহদিশ সব জেনে নিয়েছি। তুমি যখন কাল দুপুরে খাওয়ার পর ডিভানে চিত হয়ে ভাতঘুমে ডুব দিয়েছিলে, তখন এইসব জরুরি কাজ সেরে নিয়েছিলুম। হ্যাঁ-এবার বাঁ-দিকে মোরামবিছানো পথে চলো।

বাঁদিকে গাছপালার ভিতরে একতলা-দোতলা বাড়ি আর ডানদিকে শাল-সেগুনের জঙ্গল। জিজ্ঞেস করলুম,—এই জঙ্গলটা কি সরকারি বনসৃজন প্রকল্পের রূপায়ণ?

কর্নেল হাসলেন,—বাঃ! বেশ বলেছ। এটা তা-ই। শাল-সেগুন এই মাটির স্বাভাবিক উদ্ভিদ নয়।

—তাহলে এ জঙ্গলে বাঘ-ভালুক নেই।

—নাঃ! নিরামিষ জঙ্গল বলতে পারো। তবে শীতের প্রকোপে জঙ্গলের তাজা ভাবটা নেই। শরৎকালে এলে ভালো লাগত।

কিছুক্ষণ পরে সামনে উত্তরে একটা উঁচু জমির ওপর মনোরম বাংলোটা দেখা গেল। নিচু পাঁচিলের ওপর কাঁটাতারের বেড়া। ভিতরে রঙবেরঙের ফুলের উজ্জ্বলতা। আমাদের গাড়ি দেখতে পেয়েই উর্দিপরা একটা লোক গেট খুলে দিল। নুড়িবিছানো লন পেরিয়ে ডাইনের চত্বরে গাড়ি দাঁড় করালুম। একজন প্যান্ট-শার্ট পরা লোক নমস্কার করে বলল,—কর্নেলসায়েব কি আমাকে চিনতে পারছেন?

কর্নেল গাড়ি থেকে নেমে বললেন,—কী আশ্চর্য! সুবিমল, তুমি এখানে এসে জুটলে কবে?

—আজ্ঞে গত মার্চ মাসে। মালঞ্চতলার ক্লাইমেট সহ্য হচ্ছিল না। তাই বড়সায়েবকে ধরাধরি করে বাড়ির কাছে বদলি হয়ে এসেছি।

—তোমার বাড়ি কি বাবুগঞ্জে?

—না স্যার! নদীর ওপারে ওই যে দেখছেন, ঝাঁপুইহাটিতে। তো গত রাত্তিরে ইঞ্জিনিয়ারসায়েব ফোন করে জানালেন, আপনি আসছেন। শুনেই মনটা নেচে উঠল। চলুন স্যার! এদিকটা বেজায় ঠান্ডা!

কর্নেল বললেন,—আলাপ করিয়ে দিই! জয়ন্ত! সুবিমল হাজরা এই বাংলোর কেয়ারটেকার। জলচর। জলচর পাখির খবর ওর নখদর্পণে। সুবিমল! জয়ন্ত চৌধুরীর নাম তুমি শুনে থাকবে। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার বিখ্যাত সাংবাদিক।

সুবিমল হাজরা আমাকে নমস্কার করে বলল,—কী সৌভাগ্য! আপনার ক্রাইমস্টোরির আমি ফ্যান!

একটু অবাক হয়ে বললুম,—এখানে দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা আসে?

—কোন পত্রিকা আসে না তাই বলুন স্যার! কর্নেলসায়েব আমাকে আপনার কথা বলেছিলেন যেন! অনুগ্রহ করে এদিকে আসুন আপনারা। গাড়ির চাবি নিশ্চিন্তে চণ্ডীকে দিন। চণ্ডী! সায়েবদের গাড়ি গ্যারেজে ঢুকিয়ে জিনিসপত্র পৌঁছে দাও।

একজন গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার লোক কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল লক্ষ করিনি। সে আমাদের সেলাম দিয়ে গাড়ির ডিকি খুলতে যাচ্ছিল। বললুম,—ডিকিতে কিছু নেই। আমাদের ব্যাগেজ ব্যাকসিটে আছে।

বাংলোর দক্ষিণের বারান্দায় রোদ পড়েছে। বেতের কয়েকটা চেয়ার আর টেবিল আছে। কর্নেল সেখানে বসে বললেন,—আচ্ছা সুবিমল! কাগজে পড়েছি, বাবুগঞ্জে কারা নাকি কুকুর-বলি দিয়েছে?

সুবিমল হাসতে-হাসতে বলল,—এক ভদ্রলোক রেলে চাকরি করতেন। রিটায়ার করে বাড়ি ফিরে কীসব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন। খামোকা যাকে-তাকে ধরে তম্বি করেন, তুমি আমার জুতো চুরি করেছ! পাগল স্যার! পাগল আর কাকে বলে? তাঁর বোন প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করেন। একটা পেল্লায় গড়নের কুকুর পুষেছিলেন। গোপালবাবু—মানে সেই টিচারের দাদা, যিনি রেলে চাকরি করতেন, এসে অবধি যার-তার দিকে কুকুর লেলিয়ে দিতেন। আর কুকুরটাও ছিল বজ্জাত। বাড়ির সামনে দিয়ে কেউ গেলেই তাকে কামড়াতে আসত।

—কাউকে কি কামড়েছিল?

—কামড়ায়নি। তবে চ্যাঁচামেচি করত। দাঁত বের করে তেড়ে আসত। তাই হয়তো দুষ্টু ছেলেরা রাত্তিরে কুকুরকে কোনো কৌশলে বেঁধে বলি দিয়েছিল। আর তাই নিয়ে গোপালবাবু থানাপুলিশ করে হইচই বাধিয়ে ছাড়লেন। মাথায় ছিট আছে স্যার!

এই সময়ে একটা রোগা চেহারার লোক ট্রেতে কফি আর পটাটোচিপস এনে টেবিলে রাখল। সুবিমল বলল,—ঠাক্‌মশাই!

ঠাক্‌মশাই নমস্কার করে বললেন,—সুবিমল! আমি তো ইংরিজি জানি না। তুমি সায়েবকে জিজ্ঞেস করো উনি কী খাবেন।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন,—আমি ঠাক্‌মশাইয়ের মুণ্ডু খাব!

ঠাক্‌মশাই সবিনয়ে বললেন,—সায়েব তো ভালো বাংলা জানেন। আর সুবিমল, তুমি গত রাত্তির থেকে আমাকে ভয় দেখাচ্ছ, এক সায়েব আসবেন। তাঁর সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলতে হবে। তা স্যার! আমার মুন্ডু খেতে তেতো লাগবে। তেতো বোঝেন তো স্যার?

কর্নেল তাঁর বিখ্যাত অট্টহাসি হেসে বললেন,—ঠাক্‌মশাই! আমি কলকাতার এক ভেতো-বাঙালি। আমার চেহারা পোশাক-আশাক দেখে লোকে সায়েব বলে ভুল করে।

ঠাক্‌মশাই ভাঙা দাঁত বের করে হাসলেন,—কী কাণ্ড! এখন চেহারা দেখে বুঝতে পারছি। তবে হঠাৎ করে দেখলে বোঝবার উপায় নেই কিছু! বাঁচা গেল। সুবিমল! আজ তোমার পাতে কী পড়বে বুঝলে? কচু।

বলে বুড়োআঙুল দেখিয়ে তিনি চলে গেলেন। সুবিমল বলল,—ঠাক্‌মশাইয়ের নাম নরহরি মুখুজ্যে। বাড়ি বাবুগঞ্জে। মানুষটি বড় সরল স্যার!

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—শুনেছি বাবুগঞ্জের জমিদার ছিলেন মুখুজ্যেরা। ঠাক্‌মশাই তাঁদের বংশের কেউ নাকি?

—সঠিক জানি না স্যার! তবে মুখে তো বড়াই করে বলেন! সম্পর্ক থাকতেও পারে, না-ও পারে। বাবুগঞ্জে অনেক মুখুজ্যে-চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে আছেন। কফি ঠিক হয়েছে তো স্যার?

—হ্যাঁ। শীতের সময় গরম কিছু দিয়ে গলা ভেজানোই যথেষ্ট। তো তুমি কি বাংলোয় সারাক্ষণ থাকো, নাকি বাড়ি-টাড়ি যাও?

সুবিমল একটু হেসে বলল,—বাংলোয় কেউ এলে বাড়ি যাওয়া হয় না। অন্যদিন সন্ধ্যার সময় কেটে পড়ি। সকালে আসি। সাইকেল আছে।

—কিন্তু নদী পার হও কী করে? নৌকায়?

—না স্যার! আর সে-বাবুগঞ্জ নেই। নদীতে ব্রিজ হয়েছে। বাবুগঞ্জ এখনও ছোটবাবু, মেজবাবু বড়বাবুদের টাউন। এই বাংলোয় বিদ্যুৎ এসে গেছে। টেলিফোনও।

—বাঃ! আচ্ছা সুবিমল, মুখুজ্যেবংশের জমিদারদের কে নাকি কৃষিফার্ম করেছে এখানে? তোমাদের কলকাতার বড়সাহেব বলছিলেন।

—প্রমথ মুখুজ্যে স্যার! ওঁর ফার্মহাউস ওই জঙ্গলের ওধারে। ওখানে নদী বাঁক নিয়ে দক্ষিণে গেছে। সেই বাঁকের ওপরদিকে প্রমথবাবুর ফার্ম। দোমোহানির ওয়াটারড্যাম ওখান থেকে প্রায় পাঁচ কি.মি. পূর্বে।

কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরিয়ে বললেন,—তুমি দোমোহানির ড্যামের পাখির খবর বলো সুবিমল। আর জয়ন্ত! ততক্ষণ তুমি ঘরে গিয়ে পোশাক বদলে জিরিয়ে নিতে পারো! তিনঘণ্টা টানা ড্রাইভ করেছ।

সত্যিই আমি ক্লান্ত। ঘরে ঢুকে দেখলুম মেঝেয় কার্পেট। দুধারে দুটো নিচু খাট। একটা সোফাসেট। সেন্টার টেবিলে ফুলদানিতে তাজা ফুল, একদিকে ওয়ার্ড্রোব। ঘরটা প্রশস্ত। লাগোয়া বাথরুম উঁকি মেরে দেখে নিলুম গিজার আছে। গরম জলে স্নান করা যাবে।

পোশাক বদলে বিছানায় লম্বা হলুম। টের পাচ্ছিলুম, রোদ কমে এলে শীত কী সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠবে। আর শীতের কথা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাইয়ের কথা। ভদ্রলোক গতকাল এখানে এসেছেন। সাধু-সন্ন্যাসীর বেশে কোথায় ধুনি জ্বেলে রাত কাটিয়েছেন কে জানে! তবে ওঁর পক্ষে অসাধ্য কিছু নেই। পুলিশজীবনের কত রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি তিনি শুনিয়েছেন। অবশ্য কর্নেলের সঙ্গে তাঁকে এযাবৎ অনেক অ্যাডভেঞ্চারে বেপরোয়া পা বাড়াতে দেখেছি।

এবারকারটা কেমন হবে, এখনও বুঝতে পারছি না। জয়গোপালবাবু যে ছিটগ্রস্ত লোক, তা ঠিক। সুবিমলবাবুর কথায় মনে হল, জুতোচুরি নিয়ে ওঁর একটা পাগলামি আছে। অথচ কর্নেল এত গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটা ভেবেছেন কেন কে জানে! কী আছে জয়গোপালবাবুর ঠাকুরদার দলিলে?

দেড়টার মধ্যে স্নানাহার সেরে নিয়ে কর্নেল বলেছিলেন,—আজ দোমোহানি জলাধারে পাখি দেখার মতো সময় পাব না। বরং বাবুগঞ্জের ভিতরটা দেখে নেওয়া যাক! সুবিমলকে সঙ্গে নিয়ে বেরুব।

আমি বলেছিলুম,—মফস্বলের শহরের যা অবস্থা! ওর ভিতরে আপনার দর্শনযোগ্য কিছু আছে বলে মনে হয় না। তার চেয়ে গোয়েন্দামশাই কী অবস্থায় কোথায় আছেন, দেখা উচিত।

কর্নেল একটু হেসে বলেছিলেন,—পাশে একটা নদী, তখন শ্মশানঘাট সেই নদীর ধারে কোথাও নিশ্চয়ই আছে। সাধুবাবার বেশে হালদারমশাই শ্মশানঘাট বেছে নিতেও পারেন!

সেই সময় সুবিমল এসে গেল,—এবেলা কী প্রোগ্রাম করেছেন স্যার?

—জয়ন্ত এখানকার শ্মশানঘাট দেখতে চাইছে!

সুবিমল গম্ভীর হয়ে বলল,—বাবুগঞ্জের শ্মশানঘাট খুব প্রাচীন। জমিদারবাবুদের পূর্বপুরুষরা জায়গাটা নদীর তলা থেকে পাথরে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে নদীর স্রোতে ধসে না যায়। বুঝুন স্যার! মালগাড়িতে চাপিয়ে বিহার থেকে সেই পাথর আনা হয়েছিল। তারপর গরু-মোষের গাড়িতে চাপিয়ে বাবুগঞ্জ। বুঝুন কী এলাহি কাণ্ড! তারপর ওই শ্মশানকালীর মন্দির! জয়ন্তবাবু দেখার মতো জায়গাই দেখতে চেয়েছেন। স্যার!

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে বললেন,—দেখার মতো জায়গা মানে?

সুবিমল চাপা গলায় বলল,—শ্মশানকালীর মন্দিরে নরবলি দিত জমিদারের পূর্বপুরুষেরা। শুনেছি, কাকে বলি দেওয়া হবে, তার খোঁজ দিত জমিদারের নায়েব। যে প্রজার খাজনা সবচেয়ে বেশি বাকি পড়েছে, সেই হতভাগাকে রাত্তিরে পাইকরা বেঁধে আনত, স্যার! সে মন্দির ভেঙে গেছে। বটগাছটা গিলে খেয়েছে মন্দির। প্রতিমা তুলে নিয়ে বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেছে ওরা। আর বটগাছের গোড়ায় মন্দিরের ধ্বংসস্তূপে কত যে মড়ার খুলি আছে—না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। কখনও-সখনও কোনো সাধুবাবা এসে খুলিগুলি জড়ো করে বসে থাকে। ধুনি জ্বেলে চোখ বুজে মন্ত্র পড়ে।

কথাটা শুনতে পেয়ে চণ্ডী বলল,—কাল সন্ধ্যাবেলায় দেখেছিলুম এক সাধুবাবা এসে জুটেছেন।

কর্নেল আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন,—তাহলে জয়ন্তের ইচ্ছে পূর্ণ হোক। সুবিমল! কোথায় সেই শ্মশানঘাট? শর্টকাটে যেতে চাই কিন্তু!

সুবিমল বলল,—তাহলে নদীর ধারে বাঁধের পথে চলুন। ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে একটুখানি এগোতে হবে।

পূর্ববাহিনী বেহুলার দক্ষিণ তীরে বাঁধের দুধারে ঘন গাছপালা আর ঝোপঝাড়, একটা জেলেবসতি বাঁদিকে চোখে পড়ল। একটা একতলা ঘরের মাথায় টাঙানো আছে 'বাবুগঞ্জ-ঝাঁপুইহাটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি,' লেখা সাইনবোর্ড। কিছুদূর হেঁটে যাওয়ার পর নদীর ব্রিজের এদিকটায় দুধারে দোকানপাট আর ভিড়। ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে আবার বাঁধ এবং গাছের সারি। তারপর নদী যেখানে উত্তরে বাঁক নিয়েছে, সেখানে উঁচু জমির ওপর একটা বিশাল বটগাছ। কর্নেল মাঝে-মাঝে বাইনোকুলারে হয়তো পাখি দেখছিলেন। সুবিমল বলল,—এসে গেছি স্যার!

চওড়া উঁচু জায়গাটা ছাইভর্তি। ঘাসে ঢাকা বটতলার ওদিকটায় ইতস্তত চিতার ছাই। সেই ছাই উত্তরের বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। বাঁধ থেকে সেখানে কয়েক পা এগিয়ে তারপর 'সাধুবাবা' কে চোখে পড়ল। সামনে ধুনি জ্বেলে গায়ে কম্বল জড়িয়ে তিনি বসে আছেন। হ্যাঁ—গোয়েন্দাপ্রবরই বটে! আমাদের দেখামাত্র তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

সুবিমল একটু দূরে হাঁটু মুড়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে দেখে হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু কর্নেল চোখের ইঙ্গিতে আমাকে দূরে থাকতে বললেন। আমি আস্তে বললুম,—সুবিমলবাবু! সাধুবাবা খুব রাগী মানুষ মনে হচ্ছে। পাশেই ত্রিশূল পোঁতা। কিছু বলা যায় না, হঠাৎ ত্রিশূল ছুড়ে মারতে পারেন। চলুন, ওপাশে ওই নিমগাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। কর্নেলের ব্যাপার তো জানেন! উনি সাধুদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তুলতে পারেন।

নিমতলায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করলুম। কর্নেল অবিকল সুবিমলের মতো হাঁটু মুড়ে নমো করলেন। তবে টুপিপরা মাথা মাটিতে ঠেকানোর অসুবিধে আছে। তারপর দেখলুম, দুজনে কী সব কথা হচ্ছে।

সুবিমল সতর্কভাবে একটু হেসে ফিসফিস করে বলল,—বুঝলেন জয়ন্তবাবু! সাধুবাবা কর্নেলসায়েবকে বিদেশি সায়েব ভেবেছেন। আমি সাধুবাবাদের এই ব্যাপারটা দেখেছি। সায়েব-মেমদের খাতির করে।

একটু পরে কর্নেল এসে বললেন,—সাধুবাবার আশীর্বাদ নিয়ে এলুম।

আমি বললুম,—তাহলে আমিও আশীর্বাদ নিয়ে আসি?

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—সাধুবাবা প্রতিদিন মাত্র একজনকে আশীর্বাদ করেন। তারপর যারা যায়, তাদের অভিশাপ দেন। ভাগ্যিস আজ সারাদিন ওঁর কাছে কেউ যায়নি। নইলে আমাকে অভিশাপ দিতেন। এ এক সাঙ্ঘাতিক সাধু। চলো সুবিমল। এখান থেকে কেটে পড়ি।

সুবিমল বাঁধে উঠে বলল,—জয়ন্তবাবু নিশ্চয় মড়ার খুলিগুলো দেখতে পেয়েছেন?

বললুম,—হ্যাঁ! দেখলুম, কত খুলি গাছের শেকড়ে আটকে আছে।

সুবিমল হঠাৎ ফুঁসে উঠল। —ওই হতভাগা প্রজাদের অভিশাপেই তো মুখুজ্যেদের জমিদারি ধ্বংস হয়ে গেছে।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদ করা হয়েছিল স্বাধীনতার পরে, হতভাগ্যদের অভিশাপ দেরি করে লেগেছিল।

—দেরি কী বলছেন স্যার! প্রথম মুখুজ্যের ঠাকুরদার আমলেই নাকি সাংঘাতিক কাণ্ড হয়েছিল। তখন আমার জন্মই হয়নি। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের কথা বইয়ে পড়েছি। আপনারা তো আমার চেয়ে বেশি জানেন। বাবার মুখে শুনেছিলুম, আগস্ট মাসে তখন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল ক'দিন ধরে। একরাত্রে স্বদেশিবাবুরা জমিদারের খাজাঞ্চিখানা লুঠ করেছিলেন। অনেক ধনরত্নও নাকি লুঠ হয়েছিল। শোনা কথা, জয়গোপালবাবুর ঠাকুরদা ছিলেন খাজাঞ্চিবাবু। ঝড়জলের জন্য তিনি বাড়ি যেতে পারেননি। তাঁকে বেঁধে রেখে লুঠ চলেছিল। শেষরাত্তিরে বিনয়বাবু—খাজাঞ্চি, কোনোভাবে বাঁধন খুলে পালিয়ে আসেন। তবে শোনা কথা স্যার। খাজাঞ্চিবাবু নাকি বিপ্লবীবাবুদের লুঠ-করা জুয়েলসের কিছুটা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তাই নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধেছিল। পুলিশ বিনয়বাবুকে জেল খাটাতে চেয়েছিল। প্রমাণের অভাবে তিনি খালাস পান। তবে জমিদারবাবুদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন।

কর্নেল বললেন,—তারপর?

—বছর আট-দশ পরে বিনয়বাবু বাবুগঞ্জে ফিরে আসেন। জমিদারবাবুদের অবস্থা ততদিনে পড়ে গেছে। দালানকোঠা মেরামতের অভাবে ধ্বসে পড়েছে। ওই যে বলছিলুম, অভিশাপ!

—তাহলে জয়গোপালবাবুর ঠাকুরদা নিরাপদে বাড়ি-ঘর তৈরি করে বসবাস করতে পেরেছিলেন?

—হ্যাঁ স্যার। এখনও সেই তিনকামরা একতলা বাড়ি আছে।

—চলো সুবিমল! সেই বাড়িটা বাইরে থেকে দেখে বাবুগঞ্জের ভিতর দিয়ে বাংলোয় ফিরব।

ব্রিজের কাছে আসতেই দেখলুম, একটা লোক লাঠি হাতে ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে এদিকে আসছে। গায়ে সোয়েটার। মাথায় মাফলার জড়ানো। আর পরনে যেমন-তেমন প্যান্ট, পায়ে চপ্পল, লোকটা যে নেশা করেছে, তা বোঝা যাচ্ছিল। সুবিমলকে দেখেই সে বলে উঠল,—এই যে বাবা হারাধন।

সুবিমল ধমকের সুরে বলল,—মাতলামি করবে না প্রবোধদা! দেখছ না আমার সঙ্গে কারা আছেন?

জয়গোপালবাবুর মুখে তাঁর পিসতুতো ভাই প্রবোধের কথা শুনেছিলুম। এই সেই প্রবোধ। সে জড়ানো গলায় হেসে বলল,—মাইরি সুবিমল! আমার খালি ভুল হয়! ছেলেকে দেখলেই বাপের নাম বলে ফেলি। হ্যাঁ! তুমি ঝাঁপুইহাটির হারাধনের ছেলে সুবিমল। বাবা সুবিমল! সাবধান! জুতো হারিয়ো না যেন! জুতো হারাতে-হারাতে শেষে নিজেই হারিয়ে যাবে! মাইরি বলছি! আমাদের গোপাল! জয়গোপালের জুতো হারাত না? শেষে আজ শুনি সে নিজেই হারিয়ে গেছে। হিমি কেঁদেকেটে থানাপুলিশ করে বেড়াচ্ছে। এই বাবা সায়েব! গিভ মি টেন রুপি! ওনলি টেন।

কর্নেল বললেন,—জয়গোপালবাবু হারিয়ে গেছেন। আপনি তাঁকে খুঁজে বের করুন।

মাতাল প্রবোধ হিহি করে হেসে উঠল।—ওরে বাবা! এ তো দিশি সায়েব দেখছি! ধুস!

কর্নেল আমাকে অবাক করে তাকে একটা দশটাকার নোট দিয়ে বললেন,—জয়গোপালবাবু আপনার মামার ছেলে। তাঁকে খুঁজে বের করে সুবিমলকে গোপনে জানালে একশো টাকা বকশিশ পাবেন। কেউ যেন জানতে না পারে।

টাকা পেয়ে প্রবোধ যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর সে সেলাম ঠুকে চাপাস্বরে বলল,—মাইরি, একশো টাকা দেবেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—দেব।

—মা কালীর দিব্যি?

—মা কালীর দিব্যি।

মাতাল প্রবোধ ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে মিশল। শেষ-বিকেলে তখন ব্রিজের মুখে যানবাহন আর তুমুল ভিড়। কারণ বাবুগঞ্জের উত্তরপ্রান্তে ব্রিজের কাছাকাছি দুধারে দোকানপাট। নদীর ওপারের গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে লোকেরা এসে শেষবেলায় কেনাকাটা করে বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত। গরু-মোষের গাড়ি, সাইকেলভ্যান, টেম্পো, লরি-বাস ব্রিজের মুখে এসে জট পাকিয়েছে।

ভিড় পেরিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর সুবিমল কর্নেলকে বলল,—ওই মাতালটাকে টাকা দিলেন স্যার! ও আবার মদের দোকানে গিয়ে মদ গিলবে।

কর্নেল বললেন,—সুবিমল! এবার জয়গোপালবাবুর বাড়ি চলো!

—সামনে ডানদিকের গলিরাস্তায় ঢুকতে হবে। কিন্তু আপনি কি প্রবোধদার কথা বিশ্বাস করেছেন?

—কিছু বলা যায় না। প্রবোধের কথা সত্য হতেও পারে।

বিকেলের আলো দ্রুত কমে আসছিল। গলির দুপাশে মাটি বা ইটের একতলা বাড়ি। কিন্তু গলিপথটা নির্জন। একটু পরে দুধারে পোড়ো জমি চোখে পড়ল। ঝোপ-জঙ্গল গজিয়ে আছে। তারপর একটা পুরোনো একতলা ইটের বাড়ি দেখতে পেলুম। সামনে খানিকটা জায়গায় মাটি নগ্ন।

সেখানে দাঁড়িয়ে সুবিমল বাঁদিকে নিচু পাঁচিলে ঘেরা জমিটা দেখিয়ে বলল,—ওখানে স্যার মুখুজ্যেমশাইয়ের এক শরিক অবনীবাবু গার্লস স্কুল তৈরি করবেন। কিন্তু জমিটা জবরদখল।

জয়গোপালবাবু যখন রেলে চাকরি করতেন, তখন হিমিদি—মানে হৈমন্তীদি, উনি স্যার প্রাইমারি স্কুলের টিচার—তো উনি অবনীবাবুর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেননি। মামলা করার সাহস হয়নি। পঞ্চায়েতে নালিশ করেছিলেন। শেষে পঞ্চায়েত বলেছিল, জমিটা খালি পড়ে আছে। ওটা গার্লস স্কুলের জন্য দান করে দাও।

এই সময় বাড়ির দরজা খুলে একজন প্রৌঢ়া বেরিয়ে বলল,—ওখানে কারা গো?

সুবিমল এগিয়ে গিয়ে বলল,—সরলামাসি! আমি সুবিমল! হিমিদি বাড়ি নেই বুঝি?

—অ! সুবিমল? এই দ্যাখো না বাবা কী বিপদ! আমাকে পাহারায় রেখে বাবুদিদি গেছেন থানায়। সেই দুপুরে গেছেন। এখনও ফিরছেন না। আমি শুধু ঘর-বার করছি।

—কী বিপদ সরলামাসি?

—তুমি শোনোনি? সারা বাবুগঞ্জ শুনেছে। বিপদ বলে বিপদ! অমন এক জলজ্যান্ত লোক গোপালবাবু কলকাতা গেলেন। গিয়ে ফেরার পথে হারিয়ে গেলেন!

—হারিয়ে গেলেন মানে?

—হারিয়ে গেলেন বইকী। রানাঘাট ইস্টিশনে বাবুদাদাকে ট্রেন থেকে কাল বিকেলে নামতে দেখেছিল হরেন-গয়লা। শুধু সে একা দেখেনি। আরও দেখেছিল মুসলমান পাড়ার মকবুল। বাবুদিদির কান্নাকাটি আর থানা-পুলিশ করার খবর পেয়ে তারা এসে বলে গিয়েছে। পুলিশকেও বলেছে। এদিকে সারাটা রাত্তির গেল। সকাল গেল। বাবুদাদার খবর নেই। বাবুদিদির মাসতুতো দাদা কলকাতার পুলিশ। তাকে বাবুদিদি টেলিফোনে খবর দিয়েছিলেন। তিনি দুপুরবেলা এসে বাবুদিদিকে নিয়ে আবার থানায় গেছেন।—বলে প্রৌঢ়া আমাদের দিকে তাকাল।

সুবিমল বলল,—এনারা কলকাতার সায়েব। এখানে বেড়াতে এসেছেন। আমি যেখানে কাজ করি, সেই বাংলোতে উঠেছেন। স্যার! সরলামাসির জেলেপাড়ায় বাড়ি। দেখলে বুঝবেন না মাসির কী ক্ষমতা! ওদের মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অফিসে দিনের বেলা ডাকাত পড়েছিল। মাছ বিক্রির টাকা সেদিন বিলি হওয়ার কথা। খবর পেয়ে নৌকায় চেপে ডাকাত এসেছিল। আর এই মাসি এক ডাকাতকে ধরে উপুড় করে ফেলেছিল। বেগতিক দেখে অন্য ডাকাতরা পালিয়ে যায়।

সরলা বলল,—ওসব কথা থাক বাবা সুবিমল। এই বিপদ নিয়ে আমার মাথার ঠিক নেই। অ্যাদ্দিন বাবুদাদা যেখানে যেতেন জুতো হারিয়ে আসতেন। ছেলেছোকরারা ঠাট্টা-তামাশা করত। এখন বাবুদাদা নিজেই কোথায় হারিয়ে গেলেন! রানাঘাট হাসপাতাল থেকে বাবুগঞ্জ পর্যন্ত যত ছোট-বড় হাসপাতাল আছে খোঁজ নিয়েছে পুলিশ। পাত্তা নেই।

কর্নেল বললেন,—জয়গোপালবাবুর কি কোনো শত্রু আছে এখানে?

—অমন ভোলাভালা মানুষের কে শত্রু থাকবে সায়েববাবা? বাবুদাদা রেলের চাকরি শেষ করে নিজের বাবার বাড়িতে এসে ঠাঁই নিয়েছিলেন। ওনার বোন অ্যাদ্দিন বাড়িখানা যত্ন করে আগলে রেখেছেন। ধরুন, বাবুদিদিরও তো বয়েস হয়েছে। ছেলেপুলে নেই। আর কদ্দিন চাকরি করবেন? আপদে-বিপদে পড়লে আমাকে খবর পাঠান, আসি। পাশে এসে দাঁড়ালে উনিও মনে জোর পান। কিন্তু এ কী হল বুঝতে পারছি না।

কর্নেল বললেন,—সুবিমল! এই বাড়ির দরজায় কারা নাকি কুকুরের মুন্ডু কেটে ঝুলিয়ে ছিল—তুমিই বলছিলে!

সুবিমল কিছু বলার আগেই সরলা বলল,—আজ্ঞে হ্যাঁ সায়েববাবা। বাবুদিদির পোষা কুকুর। কালো রঙের জন্য কালু নামে তাকে ডাকতেন। রাতবিরেতে বাড়ি পাহারা দিত, পেল্লায় কুকুর গো! বাঘের মতো গজরাত।

কর্নেল বললেন,—সুবিমল বলছিল দুষ্টু ছেলে-ছোকরাদের কীর্তি।

সরলা চোখ বড় করে ক্রুদ্ধস্বরে বলল,—ছেলে-ছোকরাদের সাধ্য কী রাত্তিরে তার কাছে যায়? সায়েববাবা! এ কাজ বজ্জাত লোকেদের। পাশেই দশকাঠা জায়গা গিলে খেয়ে আশ মেটেনি। এখন বাড়িখানা গিলে খাওয়ার মতলব করেছে।

সুবিমল বলল,—কালুকে মেরে বাড়ি দখল করবে কী করে? সরলামাসি! তুমি কী বলছ?

সরলা চাপাস্বরে বলল,—বাবুদিদি বলছিল, কালুকে মারার পর রোজ রাত্তিরে জানালার পিছনে কারা এসে ভূতপেরেতের গলায় কীসব বলে। তখন বাবুদিদি বাড়িতে ইলেকটিরি আলো জ্বেলে দিয়ে বাবুদাদাকে ডাকাডাকি করেন। বুঝলে বাবারা? কাল সন্ধে হয়ে গেল, বাবুদাদা কলকাতা থেকে ফিরলেন না। তখন ওই গলির মুখে মন্ডলবাবুর ছেলে বিট্টুকে বাবুদিদি পাঠিয়েছিলেন। ওঁর ছাত্তর বিট্টু। সে আমায় ডেকে এনেছিল। তারপর রাত্তিরে ওই ভূতপেরেতের উৎপাত। জানলা খুলেই টর্চবাতি জ্বালালুম। কাকেও দেখতে পেলুম না, দৌড়ে পালানোর শব্দ শুনলুম। তখন চেঁচিয়ে বললুম, ওরে বদমাশের দল! আমি সেই ডাকাত-ধরা মেয়ে সল্লা-মেছুনি! এবার চেপে ধরব না, মাছবেঁধা করে বিঁধব।

কর্নেল বললেন,—ভূতপেরেতের গলায় কী বলছিল তারা, বুঝতে পেরেছ?

সরলা বলল,—সবকথা বুঝতে পারিনি। একটা কথা কানে আসছিল। জুতো।

—জুতো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ সায়েববাবা! জুতো!

সুবিমল হাসল,—তাহলে দুষ্টু ছেলেদের কাজ!

—ছেলেদের অমন গলার স্বর হয় না। আর পায়ের শব্দও অত জোরালো হয় না। পিছনের দিকে গলির মুখে ততক্ষণে আলো জ্বলে উঠেছে। কাছে ও দূরে শাঁখ বাজছিল।

কর্নেল বললেন,—সরলা! বাড়ির আলো জ্বালবে না?

সরলা এতক্ষণে কাপড়ের আড়াল থেকে টর্চ আর একটা ধারাল হেঁসো বের করে বলল, —ঘরের ভেতর আলোর সুইচ। বাবুদিদি সব ঘরে তালা এঁটে গিয়েছেন।

বলেই সে আঙুল তুলল,—ওই বাবুদিদিরা আসছেন!

ঘুরে দেখলুম, সরলার বয়সি এক মহিলা আর একজন প্যান্ট-শার্ট-সোয়েটার পরা ভদ্রলোক গলিপথে এগিয়ে আসছেন। কাছে এসে সেই ভদ্রলোক কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন,—স্যার আপনি?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ পরেশ! জয়গোপালবাবুর নিখোঁজ হওয়ার খবর শুনে সেচবাংলো থেকে চলে এসেছি!

বুঝলুম, ইনিই কলকাতা পুলিশের সেই সাব-ইন্সপেক্টর পরেশবাবু। তিনি বললেন,—হিমিদি! ইনিই সেই কর্নেলসাহেব। আর ইনি কর্নেলসাহেবের সঙ্গী সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী।

হৈমন্তী আমাদের নমস্কার করে দ্রুত এগিয়ে গেলেন। সরলা তাঁকে অনুসরণ করল। কর্নেল বললেন,—তোমরা থানায় গিয়েছিলে শুনলুম।

—সব বলছি স্যার! এখানে এত মশার মধ্যে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন। ভিতরে চলুন।

এই সময় সামনের একটা ঘরের দরজা খুলে গেল। ভিতরে উজ্জ্বল আলো। হৈমন্তী ডাকলেন, —পরেশ! কর্নেলসায়েবদের এই ঘরে নিয়ে এসো।

ঘরের সামনে একটুকরো বারান্দা আছে। বাইরের এই বারান্দায় উঠে কর্নেল থমকে দাঁড়ালেন। পরেশবাবু বললেন,—কী হল স্যার?

কর্নেল পকেট থেকে তাঁর খুদে কিন্তু জোরালো টর্চের আলো পায়ের কাছে ফেললেন। দেখলুম ছোট্ট একটুকরো ইটের সঙ্গে বাঁধা ভাঁজকরা একটা হলদে কাগজ। কর্নেল সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন,—এটা সরলা বা তোমাদের চোখের পড়ার মতো জায়গায় কখন কেউ রেখে গেছে। দেখা যাক, এতে কী আছে।

ঘরে ঢুকে দেখলুম একপাশে একটা তক্তাপোশ। তাতে সতরঞ্চি বিছানো আছে। আর একটা পুরোনো নড়বড়ে টেবিল, চারটে তেমনই নড়বড়ে চেয়ার। দেওয়ালে পুরোনো একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। দেওয়ালের তাকে ঠাসাঠাসি কী সব বই। পরেশেরই কথায় আমরা তক্তাপোশে বসলুম। কর্নেলের তাগড়াই শরীরের চাপে চেয়ার যে ভেঙে যেত, তা পরেশবাবু বিলক্ষণ জানেন মনে হল।

হৈমন্তী ও সরলা দুজনে ততক্ষণে সম্ভবত রান্নাঘরে আমাদের জন্য চা করতে গেছেন। বাবুগঞ্জের শীতটা এতক্ষণে আমাকে বাগে পেয়েছে। জ্যাকেটের জিপ টেনে দিলুম।

কর্নেল ইটের টুকরো থেকে সাবধানে ভাঁজ করা কাগজটা খুলে ফেলেছেন। চোখ বুলিয়ে তিনি পরেশবাবুকে দিলেন। পরেশবাবু পড়ার পর বললেন,—কাদের এত স্পর্ধা? এভাবে চিঠি লিখে হিমিদিকে হুমকি দিয়েছে!

সুবিমল ব্যস্তভাবে চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করল,—কী লিখেছে? কী লিখেছে?

আমিও না বলে পারলুম না,—চিঠিটা একবার দেখতে পারি?

পরেশবাবু চিঠিটা আমাকে দিলেন। দেখলুম, হলদে কাগজটার উল্টোপিঠে কীটনাশক ওষুধের বিজ্ঞাপন। খালি পিঠে লাল কালিতে লেখা আছে। ইংরাজিতে একটা লাইন।

HE ME BONETK

এই লাইনটা পড়ে বললুম,—কর্নেল! লোকটা রসিক। ইংরাজিতে যা লিখেছে, তা পড়লে হবে 'হিমি বোনটিকে'। অদ্ভুত রসিকতা তো!

পরেশবাবু বললেন,—এবার বাকিটা পড়ুন। রসিকতা না স্পর্ধা বুঝতে পারবেন।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—জয়গোপালবাবুর মতোই ছিটগ্রস্ত।

সুবিমল আগের মতো ব্যস্তভাবে বলল,—পড়ুন না জয়ন্তবাবু, কী লিখেছে?

বললুম,—পদ্য বলে মনে হচ্ছে।

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। তুমি পদ্যের মতো পড়ো। এই যে হৈমন্তীদেবীও এসে পড়েছেন। আমরা চা খাই। আপনি পদ্য শুনুন। সরলা কোথায়? তাকেও ডাকা উচিত।

হৈমন্তী বললেন,—শ্মশানঘাটের সাধুবাবাকে চা পাঠাতে দেরি হয়েছে। সরলা তাঁকে চা দিতে গেল।

—শ্মশানঘাটের সাধুবাবা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি রাত্তিরে এখানে দু-মুঠো খেয়ে এই ঘরে শুয়ে থাকেন। আবার ভোরবেলা চলে যান। সারাদিন তপ-জপ করেন। ওঁর সেবাযত্ন আমিই করছি। তা কর্নেলসায়েব পদ্যের কথা বলছেন। কী পদ্য?

পরেশবাবু বললেন,—কোনো বজ্জাত তোমাকে হুমকি দিয়ে পদ্য লিখেছে। ওই কাগজটা সুতোয় জড়িয়ে ইটের টুকরোতে বেঁধে বারান্দায় কখন সে রেখে গিয়েছিল।

কর্নেল বললেন,—আপনাকে লেখা চিঠি আপনি পাবেন। আগে কানে শুনে নিন। পড়ো জয়ন্ত!

চিঠিটাতে লেখা পদ্য ছন্দ মিলিয়ে পড়তে শুরু করলুম।

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার
তাঁহাকে ডাকার কী দরকার
প্রাণ যদি চাও গোপালদার
সিন্দুক খুলবে ঠাকুরদার
দর্শন পাবে দুই পাদুকার
জঙ্গলে পোড়ো-ভিটে সাধুখাঁর
নিশিরাতে ঠিকঠাই রাখবার
হুঁশিয়ার পুলিশকে ডাকবার
চেষ্টাটি করলে গোপালদার
মুন্ডুটি ধড় ছেড়ে যাবে তার
হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার

কর্নেল বললেন,—চিঠিটা ওঁকে দাও জয়ন্ত!

হৈমন্তীদেবীর হাতে চিঠিটা দিয়ে চায়ে চুমুক দিলুম। তারপর লক্ষ করলুম, হৈমন্তী চিঠিটাতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে বললেন,—কর্নেলসায়েব! এ তো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার! গোলমেলে ঠেকছে।

কর্নেল বললেন,—আগে বলুন কোথায় জঙ্গলে কোনো সাধুখাঁর পোড়ো-ভিটে আছে নিশ্চয় আপনি জানেন?

—হ্যাঁ। পুরোনো জমিদারবাড়ির ওধারে হরনাথ সাধুখাঁ নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়ি ছিল। এখন তো সেই জমিদারবাড়ি ধ্বংসস্তূপ। হরনাথবাবু এখন বাজারে এসে বাড়ি করেছেন। চাল-ডাল এসবের আড়তদারি ব্যবসা করেন তিনি।

—আপনার ঠাকুরদার সিন্দুক কোথায় আছে?

হৈমন্তীদেবী কর্নেলের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ নামালেন। তারপর মাথা নেড়ে আস্তে বললেন,—জানি না।

—আপনার ঠাকুরদার উইল আমি আপনার দাদার কাছ থেকে নিয়ে দেখেছি। তাতে একটা প্রাচীন সিন্দুকের কথা আছে। কিন্তু অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করলুম। আপনাদের তিনকামরা বাড়িটা একতলা। অথচ উইলে লেখা আছে, বাড়ির একটা অংশ দোতলা। সেই অংশের একতলায় সিন্দুকটা আছে।

পরেশবাবু বললেন,—আমি তো এ বাড়িতে ছোটবেলায় কতবার এসেছি। দোতলায় কোনো ঘর দেখিনি। যদি আমার জন্মের আগে কোনো অংশ দোতলা থাকত, সে কথা নিশ্চয় জানতে পারতুম।

হৈমন্তীদেবী গম্ভীরমুখে বললেন,—দোতলা ঘর থাকলে তা ভেঙে যাওয়ার কোনো চিহ্ন থাকত। আমি উইল দেখেছি। ওটা যে মুহুরিবাবু লিখেছিলেন, তাঁরই ভুল বলে আমার ধারণা।

কর্নেল বললেন,—আপনার দাদার কী ধারণা, জানেন?

—দাদার বিশ্বাস, সিন্দুকটা কোনো ঘরে পোঁতা আছে।

—আপনার ঠাকুরদার পাদুকা অর্থাৎ জুতোর ব্যাপারটা কী, আপনি জানেন?

—নাঃ! দাদা আসবার পর তার অনেকগুলো জুতো হারিয়েছিল। তারপর দাদা নিজেই হারিয়ে গেল। শেষে এই চিঠি। কে বা কারা দাদাকে কোথায় বন্দি করে রেখে ঠাকুরদার জুতো দাবি করছে—কিছু বুঝছি না।

—পরেশ! পুলিশ কি জয়গোপালবাবুর অন্তর্ধানের কোনো হদিস পেয়েছে?

পরেশবাবু বললেন,—বাবুগঞ্জে হরেন নামে একজন গোয়ালা আছে। সে দুধের কারবার করে। রোজ কলকাতা যাতায়াত করে সে। সে পুলিশকে বলেছে, প্ল্যাটফর্মে ভিড়ের মধ্যে গোপালদাকে সে দেখেছিল। আর মকবুল নামে একটা লোক ডিমের কারবারি। সে স্টেশনের পিছনে বাসে চাপবার সময় গোপালদাকে দেখতে পেয়েছিল। গোপালদা হন্তদন্ত হেঁটে একটা প্রাইভেট কারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন বাস ছেড়ে দেয়। কাজেই মকবুল আর কিছু দেখতে পায়নি। কাজেই পুলিশ ঠিকই সন্দেহ করেছে, গোপালদা কারও প্রাইভেট কারে চেপেছিলেন। সে-ই তাঁকে সুযোগ পেয়ে অপহরণ করেছে।

—গাড়ির রং বা কী গাড়ি, তা কি মকবুল লক্ষ করেছিল?

—গাড়িটার যা বর্ণনা মকবুল দিয়েছে, তাতে অ্যামবাসাডার বলে মনে হয়েছে। গাড়িটার রং তত সাদা নয়। মেটে রঙের। এখন সমস্যা হল, বাবুগঞ্জে আজকাল অসংখ্য গাড়ি আছে। হিমিদির সন্দেহ অবনী মুখুজ্যের গাড়ি। কিন্তু তাঁর অ্যামবাসাডার গাড়ি নেই। সাদা রঙের মারুতি আছে।

বলে পরেশবাবু ঘড়ি দেখলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—হিমিদি! আমাকে সাড়ে সাতটার বাসে কলকাতা ফিরতে হবে। কর্নেলসায়েব! আমি একদিনের ছুটি নিয়ে এসেছিলুম। আপনি যখন এসে গেছেন, আমি নিশ্চিন্ত! বাবুগঞ্জ থানার ও.সি. বাসুদেব ঘোষ এখানে আপনার আসবার কথা জানেন। পুলিশ সুপার তাঁকে খবর দিয়েছেন। বাসুদেববাবু সেচ-বাংলোয় আপনার সঙ্গে আজ রাত্রেই দেখা করতে যাবেন।

পরেশবাবু হৈমন্তীদেবীর সঙ্গে বাড়ির ভিতরে গেলেন। সেই সময় সুবিমল চাপাস্বরে বলল, —স্যার! আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।

কর্নেল বললেন,—কী সন্দেহ?

—হিমিদির ঠাকুরদার সিন্দুক কোথায় লুকোনো আছে তা হিমিদি হয়তো জানেন।

—কী করে বুঝলে?

—হিমিদির চোখ-মুখ দেখে। সিন্দুকের কথা শুনেই উনি কেমন যেন চমকে উঠেছিলেন।

কর্নেল কিছু বলার আগেই একটা ব্রিফকেস হাতে নিয়ে পরেশবাবু এলেন। তারপর আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। হৈমন্তীদেবী বাইরের বারান্দায় গিয়ে তাঁকে বললেন, —তোমাকে টেলিফোন করে সব জানাব পরেশ। তিনি ভিতরে এলে কর্নেল বললেন, —হৈমন্তীদেবী! ওই পদ্যে লেখা চিঠিটা আমার দরকার। আপনার দাদাকে উদ্ধার করার জন্য ওটা একটা মূল্যবান সূত্র। তবে একটা কথা। পুলিশকে এই চিঠির কথা যেন জানাবেন না।

চিঠিটা হৈমন্তীদেবীর হাতের মুঠোয় ছিল। তিনি কর্নেলকে সেটা দিলেন। এই সময় সরলার সাড়া পাওয়া গেল। সে বাইরের বারান্দায় উঠে ঘরে ঢুকল। তার হাতে ছোট একটা কেটলি আর কাচের গেলাস। সে বলল,—গিয়ে দেখি শ্মশানঘাটে ধুনির আগুন আছে। কিন্তু সাধুবাবু নেই। ডাকাডাকি করে সাড়া পেলুম না।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—সাধু-সন্ন্যাসীদের স্বভাবই এরকম। কোথায় কখন থাকেন। আবার উধাও হয়ে যান। আচ্ছা চলি। চিন্তা করবেন না। আপনার দাদাকে আশা করি শিগগির উদ্ধার করে দেব।

যে পথে গিয়েছিলুম, সেচ-বাংলোয় সেই পথেই এসেছিলুম। ঠান্ডায় আমার হাত-পা প্রায় নিঃসাড়। সুবিমল ঠাক্‌মশাইকে কফির তাগিদ দিয়ে রুমহিটারের সুইচ অন করে দিল। তারপর সে বেরিয়ে গেল। তখন কর্নেলকে চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করলুম,—হালদারমশাইয়ের কানে কী ফুসমন্তর দিলেন যে উনি শ্মশানঘাট থেকে উধাও হয়ে গেলেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—কাল বাবুগঞ্জে এসেই হালদারমশাই শ্মশানঘাটের ওদিকে ঝোপের আড়ালে সাধু সেজে গিয়েছিলেন। তারপর শ্মশানঘাটের বটতলায় ধুনি জ্বেলে বসে ছিলেন। তাঁর বরাত ভালো। হৈমন্তীর সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি খুব ভক্তি আছে। সেটা অবশ্য তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তবে তাঁর দেখাদেখি সরলারও একইরকম ভক্তি আছে। সরলা কাল বিকেলে শ্মশানঘাটে এক সাধুবাবাকে দেখে হৈমন্তীকে খবর দিয়েছিল। ব্যস্! শীতের রাতে শ্মশানঘাটে কাটানো সম্ভব ছিল না বলব না। কারণ হালদারমশাইয়ের পক্ষে পুলিশজীবনে অমন অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু ওখানে বসে থেকে কষ্ট করে রাত কাটিয়ে তাঁর লাভটা কী? তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জয়গোপালবাবুর বাড়ির আনাচেকানাচে ওত পেতে দুর্বৃত্তদের পাকড়াও করা। কাজেই হৈমন্তী তাঁর সেবাযত্ন করতে চাইলে প্রত্যাখ্যান করবেন কেন?

—তাহলে গতরাতে গোয়েন্দামশাই দুর্বৃত্তদের সঙ্গে লড়াইয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন?

—নাঃ! তারা আড়াল থেকে সম্ভবত দেখেছিল ত্রিশূলধারী এক সাধুবাবা হৈমন্তীর অতিথি!

—তা উনি আজ হঠাৎ বেপাত্তা হলেন কেন? আপনার পরামর্শে?

—হ্যাঁ। হালদারমশাই আমাকে খবর দিলেন, জয়গোপালবাবু বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ। তাঁর বোন থানা-পুলিশ করে বেড়াচ্ছেন। কথাটা শুনেই আমি ওঁকে পরামর্শ দিলুম, প্রাক্তন জমিদারপরিবারের ঠাকুরবাড়িতে চলে যান। খুব হুঙ্কার ছাড়বেন। তন্ত্রমন্ত্র আওড়াবেন।

—তাতে কী লাভ!

—মুখুজ্যেবাড়ির লোকজনের গতিবিধির খবর দৈবাৎ মিলতেও পারে।

—জয়গোপালবাবুর নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে মুখুজ্যেদের কোনো যোগাযোগ আছে বলে মনে করছেন?

—জানি না। তবে চান্স নিলে ক্ষতি কী?

এই সময় ঠাক্‌মশাই ট্রেতে কফি আর পাঁপড়ভাজা এনে টেবিলে রাখলেন। তারপর বললেন, —সাহেবকে থানা থেকে ফোন করেছিল কেউ। চণ্ডী ফোন ধরেছিল।

—চণ্ডী কোথায়?

—আজ্ঞে সে বাড়ি চলে গেছে। কাল সকালে ইঞ্জিনিয়ারসাহেবকে জিপগাড়িতে চাপিয়ে সে কোথায় নিয়ে যাবে। গ্যারেজ থেকে জিপগাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেছে চণ্ডী। বুঝলেন স্যার? জিপগাড়িটা ইঞ্জিনিয়ারসায়েব আপনাদের জন্যই পাঠিয়েছিলেন। আপনারা গাড়ি এনেছেন শুনে ইঞ্জিনিয়ারসায়েব জিপগাড়িটা চণ্ডীকে নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

ঠাক্‌মশাই মাথায় মাফলার জড়িয়েছেন এবং গায়ে আস্ত একখানা কম্বল। তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পর বললুম,—একটা ব্যাপার ভারি অদ্ভুত লাগছে।

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—বলো!

—কিডন্যাপার হুমকি দিয়ে পদ্য লিখল কেন? সে এও জানে স্বয়ং কর্নেল নীলাদ্রি সরকার জয়গোপালবাবুর কেস নিয়েছেন এবং এখানে এসেছেন। লোকটাকে রসিক মনে হচ্ছে।

কর্নেল হাসলেন,—পল্লীকবিও বলতে পারো। ছন্দ আর মিল দেখে মনে হচ্ছে, সে অনেকদিন ধরে পদ্য লেখে। অবশ্য আমার তো মনে হয়, বাঙালিরা জাতকবি।

—আচ্ছা কর্নেল, আপনি কখনও কবিতা লিখেছেন?

বাইরে সুবিমলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—কার সঙ্গে কথা বলছ জগাই।

—এক ভদ্রলোক সায়েবদের সঙ্গে দেখা করতে চান।

কর্নেল বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে বললেন,—কী আশ্চর্য! হালদারমশাই যে! আসুন! আসুন! সুবিমল! গেট খুলে দিতে বলো!

আমি চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু বাইরে গেলাম না। কর্নেলকে বলতে শুনলাম,—সুবিমল! পটে প্রচুর কফি আছে। একটা কাপ নিয়ে এসো!

কর্নেলের পিছনে হালদারমশাই ঢুকলেন। সাধুবাবার বেশে নয়, প্যান্ট-শার্ট-সোয়েটার-কোট-হনুমানের টুপি পরে এবং কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে। বললুম,—কর্নেল বলছিলেন আপনি মুখুজ্যেদের ঠাকুরবাড়িতে—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে হালদারমশাই বললেন,—পরে কইতাছি। আগে রেস্ট লই।

কর্নেল চুপচাপ বসে কফিপানে মন দিলেন। একটু পরে সুবিমল একটা কাপ-প্লেট আনল। কর্নেল বললেন,—সুবিমল! ইনি আমার বন্ধু—ওঃ হো তুমি তো দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় জয়ন্তর ক্রাইম-রিপোর্টাজ পড়ো। তাহলে অনুমান করো নি কে?

হালদারমশাই কাপে কফি ঢালতে-ঢালতে বললেন,—আইজ রাতে হেভি শীত পড়ছে।

সুবিমল মুচকি হেসে বলল,—মনে পড়েছে। আপনি হালদারমশাই বলে ডাকলেন, তখন আমার অত খেয়াল ছিল না। নমস্কার স্যার। আমি বাংলোর কেয়ারটেকার সুবিমল হাজরা।

গোয়েন্দা এবার হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—বয়সে পোলাপান! আপনি কমু ক্যান? তুমিই কমু!

—নিশ্চয় স্যার! আপনাদের তিনজনকে একত্রে চর্মচক্ষে দেখতে পাব তা কল্পনাও করিনি।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন,—সুবিমল! বিকেলে শ্মশানঘাটে এঁকেই তুমি নমো করেছিল!

সুবিমল চমকে উঠে বলল,—কী অদ্ভুত! ইনিই সাধুবাধা সেজে শ্মশানঘাটে বসেছিলেন!

—হ্যাঁ, ওই প্রকাণ্ড ব্যাগে ওঁর জটাজুট দাড়ি-টাড়ি আছে। কিন্তু ত্রিশূল? হালদারমশাই! ত্রিশূল কোথায় ফেলে এলেন?

—সব কমু। কফি খাইয়া লই। হেভি ফাইট দিছি। টায়ার্ড।

কর্নেল বললেন,—সুবিমল! হালদারমশাইয়ের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

সুবিমল বলল,—কোনো অসুবিধে নেই স্যার। ইঞ্জিনিয়ার সেনসায়েব এসে যে ঘরে থাকেন, সেই ঘরে ওঁর থাকার ব্যবস্থা করছি। আর ঠাক্‌মশাইকে বলে আসি, একজন গেস্ট এসেছেন।

সে বেরিয়ে যাওয়ার পর হালদারমশাই ফুঁ দিয়ে দ্রুত কফি শেষ করলেন। তারপর যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই :

কর্নেলের কথামতো সন্ধ্যায় হালদারমশাই শ্মশানঘাট থেকে উঠে বাবুগঞ্জের ভিতর দিয়ে হেঁটে যান। তাঁর নিজস্ব হিন্দিতে জমিদারদের ঠাকুরবাড়ির পথ জিজ্ঞেস করে চলতে থাকেন। তারপর নিজের খেয়ালে সোজা ঠাকুরবাড়িতে না ঢুকে পিছনে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঢুকে পড়েন। ততক্ষণে সন্ধ্যারতি শেষ হয়েছে। হালদারমশাই পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির ভিতরের চত্বরে উজ্জ্বল আলো। তিনি কী করবেন ভাবছেন, হঠাৎ পিছন থেকে টর্চের আলো এসে তাঁর ওপর পড়ে। বেগতিক দেখে তিনি ত্রিশূল তুলে হুঙ্কার দিয়ে তেড়ে যান। কিন্তু তাঁর পিছন থেকে কেউ তাঁকে জাপটে ধরে। জোর ধস্তাধস্তি চলতে থাকে। মরিয়া হয়ে হালদারমশাই তাঁর লাইসেন্সড রিভলভার বের করে টর্চের দিকে গুলি ছোড়েন। টর্চের কাচ গুঁড়ো হয়ে টর্চ ছিটকে পড়ে। সামনের লোকটা আর্তনাদ করে ওঠে। এদিকে যে পিছন থেকে তাঁকে জাপটে ধরে মাটিতে ফেলেছিল, সে হালদারমশাইয়ের হাতে রিভলভার দেখে এবং গুলির শব্দ শুনে বাপ্‌রে! বাপ্‌রে! ডাকাত! ডাকাত! বলে চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে রাস্তার দিকে ছুটে যায়। লোকেরা লাঠিসোটা-বল্লম নিয়ে

ছুটে আসতে পারে ভেবে হালদারমশাই ত্রিশূলের কথা ভুলে গিয়ে তাঁর ওই ঝোলাটি চেপে ধরে দৌড়তে থাকেন। নাক বরাবর দৌড়ে নির্জন পিচরাস্তা পেয়ে যান। তারপর টর্চের আলো জ্বেলে সামনে শালের জঙ্গল দেখে ঢুকে পড়েন। জঙ্গলের ভিতরে সাধুবাবার বেশ বদলে প্যান্টশার্ট-সোয়েটার-কোট আর হনুমান টুপি পরে জঙ্গল থেকে বেরুচ্ছেন, সেই সময় দেখতে পান, পাশের একটা মোরামরাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি আসছে। তিনি লক্ষ করেন ওটা জিপগাড়ি। হাত তুলে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তিনি সেচ-বাংলোর কথা জিজ্ঞেস করেন। জিপের চালক বলে, এই মোরামরাস্তা ধরে চলে যান।

কর্নেল বললেন,—ইঞ্জিনিয়ার মিঃ সেনের জিপগাড়ি। চণ্ডী গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছিল। যাই হোক, বোঝা যাচ্ছে, আমাকে তো বটেই, আপনাকেও শত্রুপক্ষ চেনে। এটা একটা ভাববার কথা। তো ওসব পরে ভাবা যাবে। আপনি বাথরুমে ঢুকে অন্তত মুখহাত ধুয়ে ফেলুন। গরমজলের ব্যবস্থা আছে। আপনার মুখে এখনও ছাইয়ের ময়লা লেগে আছে। রুমালে চিতার ছাই মোছা যায় না। আর কপালের লাল রংগুলোও ধুয়ে ফেলবেন।

বললুম,—ছ্যা-ছ্যা! মড়াপোড়া ছাই মুখে ঘষেছিলেন হালদারমশাই?

গোয়েন্দাপ্রবর কোট এবং সোয়েটার খোলার পর খিখি করে হেসে বললেন,—সে-ছাই না। কাঠ কুড়াইয়া ধুনি জ্বালছিলাম, সেই ছাই।

সুবিমল এসে বলল,—থানা থেকে ও.সি. বাসুদেববাবু কর্নেলসায়েবকে ফোন করেছেন!

কর্নেল বললেন,—ফোন কি তোমার অফিসঘরে?

—হ্যাঁ স্যার!

কিছুক্ষণ পরে হালদারমশাই মুখ-হাত ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, —শার্ট-গেঞ্জি-প্যান্ট খুললে অনেক ময়লা বাইরাইব। রাত্রে আর স্নান করুম না। কাইল সকালে স্নান কইর‍্যা সব সাফ করুম।

তিনি চেয়ারে বসে হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন,—ওই যাঃ।

—কী হল হালদারমশাই?

—বাঘছালখান জঙ্গলে ফ্যালাইয়া আইছি।

—কাল দিনে গিয়ে খুঁজে পাবেন।

এইসময় কর্নেল ফিরে এলেন। জিজ্ঞেস করলুম,—ও.সি. ভদ্রলোককে কেমন বুঝলেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—মজার কথা শোনো। হালদারমশাইও শুনুন। ও.সি. বাসুদেব ঘোষ কথাপ্রসঙ্গে বললেন, একটু আগে অবনী মুখার্জি নামে এক ভদ্রলোক তাঁর একজন কাজের লোককে সঙ্গে নিয়ে থানায় গিয়েছিলেন। হৈমন্তীদেবী নাকি কলকাতা থেকে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এনেছেন। সেই ডিটেকটিভ সাধুবাবার ছদ্মবেশে মুখার্জিবাবুদের ঠাকুরবাড়িতে ঢোকার জন্য উঁকি দিচ্ছিলেন। অবনীবাবুর দুজন লোক তা দেখতে পেয়ে তাঁকে তাড়া করে। ঠাকুরবাড়িতে ডিটেকটিভ ঢুকবে কোন সাহসে? তো ডিটেকটিভ তাঁর এই লোকটাকে লক্ষ করে গুলি ছোড়েন। ভাগ্যিস গুলি এর টর্চের মাথায় লেগে কাচ গুঁড়িয়ে গেছে। কাজেই সেই সাধুবেশী ডিটেকটিভ আর হৈমন্তীদেবীর নামে এফ. আই. আর. করতে চান অবনীবাবু। ও.সি. তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ব্যাপারটা তদন্ত করবেন বলে বিদায় করেছেন।

হালদারমশাই গুলি-গুলি চোখে তাকিয়ে শুনছিলেন। বললেন,—খাইসে!

—নাঃ! খায়নি। বাসুদেববাবু আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, আমি এ বিষয়ে কিছু জানি কি না? বললুম, জানি। প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ কে. কে. হালদার একজন প্রাক্তন পুলিশ ইন্সপেক্টর। তাঁর

আত্মরক্ষার জন্য লাইসেন্সড্ ফায়ার আর্মস আছে। তবে চরম অবস্থায় পড়লে অর্থাৎ আততায়ী তাঁকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করলে তিনি শূন্যে গুলি ছুড়ে ভয় দেখান। মিঃ হালদার দায়িত্বজ্ঞানহীন নন। অবনীবাবুর দুজন লোক তাঁর মুন্ডু কাটতে চেষ্টা করছিল—যেভাবে হৈমন্তীর কালুর মুন্ডু কাটা হয়েছিল।

হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে বললেন,—ঠিক কইছেন কর্নেলস্যার! একজন আমারে জাপটাইয়া মাটিতে ফেলছিল। অন্যজনের এক হাতে টর্চ ছিল। অন্য হাতে লম্বামতো কী একটা ছিল। দাও হইতে পারে। কুত্তাটার মতন আমার মুন্ডু কাইট্যা ফেলত।

বললুম,—তাহলে অবনী মুখুজ্যেই হৈমন্তীদেবীর পিছনে লেগেছেন! জয়গোপালবাবুকে তিনিই কিডন্যাপ করে লুকিয়ে রেখেছেন।

কর্নেল এতক্ষণে চুরুট ধরিয়ে বললেন,—আগে খোঁজ নিয়ে দেখা যাক অবনীবাবু পদ্য লিখতে পারেন কি না।

হালদারমশাই নড়ে বসলেন,—পইদ্য? পইদ্যের কথা ক্যান কর্নেলস্যার?

কর্নেল জ্যাকেটের ভিতর হাত ভরে সেই হলুদ কাগজটা বের করলেন। তারপর বললেন, —আজ বিকেলে জয়গোপালবাবুদের বাড়ির বারান্দায় এটা রাখা ছিল। জয়ন্ত! পড়ে শোনাও। হালদারমশাই কী বলেন শোনা যাক।

আমি পদ্যটা পড়তে থাকলুম :

'কর্নেল ডাকার কী দরকার
প্রাণ যদি চাও গোপালদার
সিন্দুক খুলবে ঠাকুরদার
দর্শন পাবে দুই পাদুকার
জঙ্গলে পোড়োভিটে সাধুখাঁর
নিশিরাতে ঠিকঠাই রাখবার
হুঁশিয়ার পুলিশকে ডাকবার
চেষ্টাটি করলে গোপালদার
মুন্ডুটি ধড় ছেড়ে যাবে তার
হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার

হালদারমশাইয়ের গোঁফের দুই ডগা তিরতির করে যথারীতি কাঁপছিল। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন,—ঠাকুরদার সিন্দুক! দুই পাদুকা! মানে দুইখান জুতা! জয়গোপালবাবুর পাঁচজোড়া জুতা চুরি গেছে। জুতা! ঠাকুরদার জুতা! জুতা চায় ক্যান? জুতায় কী আছে?

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে বললেন,—১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট বিপ্লব!

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন,—কী কইলেন? কী কইলেন?

—বাবুগঞ্জের জমিদারের খাজাঞ্চিখানা লুঠ হয়েছিল।

—অ্যাঁ?

—প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি চলছিল কয়েকদিন ধরে। সেই সময় খাজাঞ্চিখানা লুঠ।

হালদারমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—কর্নেলস্যার কী কইতাছেন জয়ন্তবাবু?

বললুম,—জয়গোপালবাবু কী বলেছিলেন আপনি ভুলে গেছেন হালদারমশাই! উনি বলছিলেন না, ওঁর ঠাকুরদা জমিদারবাড়ির খাজাঞ্চি ছিলেন।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ হাসলেন,—হঃ! মনে পড়ছে। কর্নেলস্যার কইছিলেন খাজাঞ্চি মানে ট্রেজারার। তা ট্রেজারার ভদ্রলোকের জুতা অ্যাদ্দিন পরে চায় কারা? ক্যান চায়?

বললুম,—আমার ধারণা...

কথায় বাধা পড়ল। পর্দা তুলে সুবিমল ঢুকে বলল,—আপনারা নটায় ডিনার খেয়ে নিলে ভালো হয় স্যার। ঠাক্‌মশাই বড্ড শীতকাতুরে মানুষ। বয়সও হয়েছে।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন,—ঠিক আছে। নটায় আমরা খেয়ে নেব।

সুবিমল বেরিয়ে গেলে হালদারমশাই বললেন,—জয়ন্তবাবু কী কইতাছিলেন য্যান?

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে আমার দিকে তাকালেন,—রাতবিরেতে জুতোর কথা বললেই ভূতপ্রেতের দল জানালার কাছে এসে জুতো চাইবে। সাবধান জয়ন্ত।

হালদারমশাই খিখি করে হেসে উঠলেন।...

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙেছিল ঠাক্‌মশাইয়ের ডাকে। তাঁর হাতে চায়ের কাপ-প্লেট। ঠাক্‌মশাই কাঁচুমাচু হেসে বললেন,—স্যারের ঘুম ভাঙালুম। কিন্তু বুড়োসায়েব ভোরবেলা আমাকে বলে গেছেন, আপনার বিছানায় বসে বাসিমুখে চা খাওয়ার অভ্যেস।

কর্নেল সর্বত্র এই ব্যবস্থাটা করে প্রাতঃভ্রমণে বের হন। আমার বেড-টি না খেলে বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। চা নিয়ে জিজ্ঞেস করলুম,—ঠাক্‌মশাই! কাল রাত্রে যিনি এসেছেন, সেই হালদারসায়েব কি ওঠেননি?

—উঠেছেন। বুড়োসায়েব বেরিয়ে যাওয়ার পর উনি উঠে আমার কাছে চা চাইলেন। ওঁকে চা দিয়ে আপনাকে দিতে এলুম।

ঠাক্‌মশাই বেরিয়ে যাওয়ার পর চা খেয়ে বাথরুমে গেলুম। প্রাতঃকৃত্যের পর দাড়ি কেটে প্যান্ট-শার্ট-জ্যাকেট পরে বারান্দায় গিয়ে বসলুম। সেই সময় সুবিমলবাবু সাইকেলে থলে ঝুলিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম,—হালদারমশাই কী করছেন?

সুবিমল বলল,—উনি কিছুক্ষণ আগে বেরুলেন। আমি বাজার করে শিগগির ফিরে আসছি।

তখনও রোদ আর কুয়াশায় চারদিক রহস্যময় দেখাচ্ছিল। সাড়ে সাতটা বাজে। কিছুটা দূরে পূর্ব-দক্ষিণে সেই সরকারি অরণ্য কুয়াশায় ঢাকা। কিন্তু পুবের ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে নদী পেরিয়ে ম্লান রোদ এসে বাংলোর ফুলবাগানকে ঈষৎ উজ্জ্বল করেছে। হালদারমশাই তো কর্নেলের সঙ্গে বেরোননি। পরে বেরিয়েছেন। কোথায় গেলেন তিনি?

একটু পরে মনে পড়ল, সরকারি শালের বনে বাঘছাল ফেলে এসেছিলেন। সম্ভবত তিনি সেই বাঘছাল খুঁজে আনতে গেছেন। গোয়েন্দাপ্রবর আমাকে বলেছিলেন, ছদ্মবেশের জিনিসপত্র তিনি চিৎপুর এলাকায় যাত্রা-থিয়েটারের সাজপোশাকের দোকান থেকে কেনেন। বাঘছালটা চিৎপুরে কেনা নকল জিনিস হলেও ওটা তো তাঁকে পয়সা দিয়ে কিনতে হয়েছে। কাজেই ওটা জঙ্গলে ফেলে রাখবেন কেন?

প্রায় নটায় কর্নেল ফিরলেন। সেই ট্যুরিস্টের বেশ! মাথায় টুপি, পিঠে কিটব্যাগ আঁটা। কোমর থেকে ফ্লাস্ক ঝুলছে। গলা থেকে বাইনোকুলার আর ক্যামেরা। তিনি যথারীতি সম্ভাষণ করলেন, —মর্নিং জয়ন্ত! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে!

—মর্নিং কর্নেল! বেঘোরে ঘুমিয়েছি। কতদূর ঘুরলেন?

—প্রমথ মুখুজ্যের ফার্মের পাশ দিয়ে হেঁটে দোমোহানি জলাধার পর্যন্ত। কিন্তু কুয়াশা কাটতে দেরি হচ্ছিল। বাইনোকুলার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। তাই ফিরে এলুম। পরে দেখা যাবে। হালদারমশাই কোথায়?

—উনি সম্ভবত সরকারি জঙ্গলে ওঁর বাঘছাল খুঁজতে গেছেন। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

ততক্ষণে সুবিমল বাজার করে ফিরে এসেছিল। ঠাক্‌মশাই ট্রেতে কফি আর স্ন্যাক্স আনছিলেন। তাঁর সঙ্গে সুবিমলও এল। সে বলল,—আপনি কি পায়ে হেঁটে ড্যাম অব্দি গিয়েছিলেন স্যার?

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—হ্যাঁ। কিন্তু বড্ড কুয়াশা। ওবেলায় গাড়িতে যাব বরং।

—বড় মুখুজ্যের ফার্ম দেখলেন?

—দেখলুম। নিচু পাঁচিলের ওপর কাঁটাতারের বেড়া। বাইনোকুলারে যতটা দেখা যায়, দেখলুম।

ঠাক্‌মশাই চলে গিয়েছিলেন। সুবিমল এবার চাপাস্বরে বলল,—দোমোহানির এক মেছুনির নাম রানি। তাকে রানিদি বলে ডাকি। পথে তার সঙ্গে দেখা হল। তার কাছে হাফকিলো পাবদা মাছ ছিল। মাছগুলো দিয়ে রানিদি বলল, প্রায় দেড় কিলো পাবদা ছিল। আসবার পথে বড় মুখুজ্যের ডাকে ফার্মে ঢুকেছিল সে। মাছ ওজন করার সময় রানিদি একপলকের জন্য নাকি জয়গোপালকে দেখেছে। ঘর থেকে বেরিয়েই ঘরে ঢুকে গেল। রানিদি জানে, জয়গোপালবাবুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সুবিমলের কথা শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু কর্নেল একটু হেসে বললেন,—তোমার রানিদি জয়গোপালবাবুকে একপলক দেখেছে। আমি বাইনোকুলারে মিনিটতিনেক দেখেছি। ফার্মের পশ্চিমে গেট। গেটের ভিতর ঢুকলে বাঁদিকে প্রমথবাবুর বাংলো। একেবারে মডার্ন ফার্ম। প্রমথবাবুও পোশাকে আমার চেয়ে বেশি সায়েব। ড্রেসিং গাউন পরে বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে গায়ে রোদ নিচ্ছিলেন। আমি দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পাঁচিলের মাথায় বাইনোকুলার রেখে তাঁকে দেখছিলুম। আর তাঁর পাশে একটা চেয়ারে বসে আদি অকৃত্রিম জয়গোপালবাবু চা-পান করছিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ দেখা হল না। একটা তাগড়াই অ্যালসেশিয়ান কুকুর টের পেয়ে দৌড়ে আসছিল। আমি রাস্তার অন্যপাশে একটা আখের জমিতে ঢুকে পড়লুম। অ্যালসেশিয়ানের মুখের পাশে একটা ষণ্ডামার্কা লোকের মুখ দেখলুম। পিচরাস্তায় কাকেও না দেখতে পেয়ে সে কুকুরটাকে নিয়ে অদৃশ্য হল।

সুবিমল বলল,—অদ্ভুত ব্যাপার স্যার! জয়গোপালদা নিজেকে নিজেই লুকিয়ে রেখেছেন তাহলে!

—চেপে যাও। আর ঠাক্‌মশাইকে বলো, আমরা সাড়ে নটায় ব্রেকফাস্ট করে গাড়িতে বেরুব।

সুবিমল চলে গেলে বললুম,—কর্নেল! এমন তো হতেই পারে, রানাঘাট স্টেশনে জয়গোপালবাবুকে গাড়িতে লিফ্‌ট দেওয়ার ছলে প্রমথবাবু বা তাঁর লোকেরা তাঁকে কিডন্যাপ করে ফার্মহাউসে রেখেছে। প্রাণের ভয়ে বেচারা চুপচাপ আছেন!

—এবং চেয়ারে বসে চা-ও খাচ্ছেন! রানি মেছুনিকে দেখেই লুকিয়ে পড়েছেন।

কর্নেল মিটিমিটি হাসছিলেন। আমি বললুম,—আহা! ভিতু গোবেচারা লোক। প্রাণের দায়ে মানুষ অনেক কিছু করে।

—এবং পদ্য লিখে ঠাকুরদার সিন্দুকে রাখা জুতো দুটো সাধুখাঁর পোড়ো-ভিটেয় রেখে আসতে বলে!

অবাক হয়ে বললুম,—কর্নেল! আপনি কি সিরিয়াসলি বলছেন?

কর্নেল তাঁর প্রসিদ্ধ অট্টহাসি-হাসলেন। তারপর বললেন,—নাঃ! তোমার কথায় যুক্তি আছে। জয়গোপালবাবু সম্ভবত পদ্যচর্চা করতেন। তাঁর ওপর তিনি একটু ছিটগ্রস্ত। প্রমথবাবুর কথায় তিনি পদ্যটা লিখতেও পারেন।

—কিন্তু হৈমন্তীদেবী তো তাঁর ঠাকুরদার সিন্দুক কোথায় আছে জানেন না! তাহলে?

কর্নেল আমার কথার জবাব দিলেন না। কফি শেষ করে চুরুট ধরিয়ে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেলেন। সুবিমলকে অফিস থেকে বেরুতে দেখলুম। তারপর কর্নেল তার সঙ্গে অফিসে ঢুকলেন।

সাড়ে নটায় আমরা ব্রেকফাস্ট করলুম। তখনও হালদারমশাইয়ের পাত্তা নেই। কর্নেল বললেন, —বলা যায় না। জঙ্গলে বাঘছাল খুঁজতে গিয়ে হালদারমশাই গোয়েন্দাগিরি করতে প্রমথবাবুর ফার্মের আনাচে-কানাচে হয়তো ওত পেতে বসে আছেন। কিন্তু সমস্যা হল, অ্যালসেশিয়ানের পাল্লায় পড়ে ফায়ার আর্মস থেকে গুলি ছুড়লে কী হবে?

ব্রেকফাস্টের পর সুবিমলও আমাদের সঙ্গে আসতে চাইল। কর্নেল একটু হেসে বললেন, —আমরা কিন্তু হালদারমশাইয়ের মতো গোয়েন্দাগিরি করতে যাচ্ছি না। কাজেই তুমি আসতে পারো। তাছাড়া তোমার আসবার অধিকার আছে। কারণ তুমি আপাতদৃষ্টে জটিল রহস্যে ভরা একটা ঘটনার এমন মূল্যবান সূত্র দিয়েছ, যা দিয়ে এই ঘটনার সব জট খুলে যাবে।

মনে-মনে অবাক হলেও কিছু বললুম না। রহস্যের জট খোলার কী মূল্যবান সূত্র দিয়েছে সুবিমল, কে জানে!

মোরামরাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে বাঁদিকে সেই শাল-সেগুনের সরকারি জঙ্গল পেরিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত! গাড়ি থামাও।

গাড়ি দাঁড় করিয়ে বললুম, —কী ব্যাপার?

কর্নেল গাড়ি থেকে নেমে বললেন,—যা ভেবেছিলুম, তাই ঘটেছে সম্ভবত। জঙ্গলের মধ্যে কুকুরের হাঁকডাক কানে আসছে। সুবিমল গাড়িতে বসে থাকো। জয়ন্ত! আমার সঙ্গে এসো তো!

আমারও কানে এল জঙ্গলের মধ্যে কুকুরের প্রচণ্ড চ্যাঁচামেচি। কর্নেলকে অনুসরণ করে জঙ্গলে ঢুকলাম। শুকনো পাতার ওপর নিঃশব্দে চলা কঠিন। কুকুরের গজরানি লক্ষ করে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে চোখে পড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্য! একটা ষণ্ডামার্কা গুঁফো লোকের হাতের চেনে আটকানো প্রকাণ্ড একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর। লোকটা ওপরদিকে তাকিয়ে আছে। আর কুকুরটাও ওপরদিকে মুখ তুলে বিকট হাঁকডাক করছে।

তারপরই দেখতে পেলুম একটা শালগাছের উঁচু ডালে বসে আছেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই। তাঁর হাতে কোনো ফায়ার আর্মস নেই।

গুঁড়ি মেরে দুজনে এগিয়ে গেলুম। ষণ্ডামার্কা গুঁফো লোকটা দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে। আর হালদারমশাই ধমক দিচ্ছেন,—হালার কুত্তারে গুলি কইর‍্যা মারুম! অরে লইয়া যাও কইতাছি! সত্যই গুলি করুম!

কর্নেল এবং তাঁর পিছনে আমি একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালুম। তারপর কর্নেল ধমক দিয়ে বললেন, —এ কী হচ্ছে? এক্ষুনি অ্যারেস্ট করব বলে দিচ্ছি। কুকুর নিয়ে ফার্মে চলে যাও। গিয়ে দেখো, এতক্ষণ সেখানে পুলিশ বড় মুখুজ্যেবাবু আর জয়গোপালবাবুকে পাকড়াও করেছে।

লোকটা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল,—কে আপনি? ওই বাবুর মতো আপনাকেও টমকে দিয়ে গাছে চড়িয়ে ছাড়ব। ওসব পুলিশ-টুলিশ আমি পরোয়া করি না!

এবার কুকুরটা আমাদের দিকে ঘুরে গজরাতে থাকল। কর্নেল এক পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, —তাহলে আগে কুকুরটা তারপর তোমার মুণ্ডুটা গুলি করে উড়িয়ে দিই।

বলে তিনি সত্যিই জ্যাকেটের ভিতর থেকে রিভলভার বের করলেন। গাছের ওপর থেকে গোয়েন্দাপ্রবর চেঁচিয়ে উঠলেন,—আমার রিভলভারটা সঙ্গে আনি নাই। হালার কুত্তার মাথা ফুটা কইর‍্যা দ্যান কর্নেলস্যার!

লোকটা রিভলভার দেখে আঁতকে উঠে কুকুরের চেন ছেড়ে দিয়ে গুলতির মতো উধাও হয়ে গেল। কুকুরটাও কী বুঝল কে জানে, তখনই তার পিছনে দৌড়ে অদৃশ্য হল। কর্নেল বললেন, —হালদারমশাই! আপনি শালগাছে চড়লেন কী করে?

হালদারমশাই সোজা গুঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এসে সামনে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলুম, —আপনার পেট অত মোটা কেন?

হালদারমশাই সোয়েটারের ভিতর থেকে তাঁর বাঘছালটা বের করে সহাস্যে বললেন,—কুত্তার তাড়া খাইয়াও বাঘছাল ফেলি নাই। শুধু একখান ভুল, ফায়ার আর্মস আনি নাই।

কর্নেল বললেন,—আপনি বাঘছাল খুঁজতে কি প্রমথবাবুর ফার্মে গিয়েছিলেন?

—না! বাঘছাল ঠিক জায়গায় ছিল। কুড়াইয়া লইয়া ভাবছিলাম, এই জঙ্গলের ওধারে বড় মুখার্জির ফার্ম। তাই সেখানে গিয়া আড়াল থেইক্যা লক্ষ রাখছিলাম। অমনই কুত্তাটা ট্যার পাইছিল।

বুঝেছি।—বলে কর্নেল ঘুরে মোরামরাস্তার দিকে পা বাড়ালেন।

হালদারমশাই আমাদের অনুসরণ করলেন। আমি বললুম,—ভাগ্যিস গাছে চড়েছিলেন। নইলে কুকুরটা আপনার অবস্থা শোচনীয় করে ফেলত।

হালদারমশাই হাসিমুখে বললেন,—কইছিলাম না? পঁয়তিরিশ বৎসর পুলিশের চাকরি করছি। তো কর্নেলস্যার পুলিশের কথা কইছিলেন ক্যান?

সুবিমল বলল,—হিমিদি স্কুলে চলে গেলে ওঁকে ডেকে আনতে হবে।

কর্নেল বললেন,—না। উনি ক'দিনের জন্য ছুটি নিয়েছেন।

মোরামরাস্তা যেখানে পিচরাস্তার সঙ্গে মিশেছে, তার আগে শালের জঙ্গলটা শুরু হয়েছে। তাই আমাদের সামনে জঙ্গলের কিছুটা আড়াল ছিল। কিন্তু গাছের ফাঁক দিয়ে দেখলুম, পিচরাস্তায় একটা পুলিশের জিপ আর পিছনে কালো রঙের পুলিশভ্যান দ্রুত বাবুগঞ্জের দিকে চলে গেল। বললুম, —কর্নেল! পুলিশের গাড়ি গেল।

কর্নেল একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন,—এখন পুলিশ নয়, ঠাকুরদার সিন্দুক। আর সিন্দুকের মধ্যে জুতো।

পিছন থেকে হালদারমশাই বললেন,—কী কইলেন? কী কইলেন?

—আগস্ট বিপ্লব। সুবিমলকে জিজ্ঞেস করুন! সে জানে।

হালদারমশাই সুবিমলকে নিয়ে পড়লেন। সুবিমল তাঁকে বাবুগঞ্জের বাড়িতে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে ঝড়বৃষ্টির কাহিনি শোনাতে থাকল।

বাজারে এখনই ভিড়। হালদারমশাইকে একটা খাবারের দোকানের কাছে নামিয়ে দিলুম। সুবিমল বলল,—মিঃ হালদার! হিমিদির বাড়ি চিনতে পারবেন তো?

হালদারমশাই বললেন,—হঃ। চিন্তা করবেন না। কুত্তার তাড়া খাইয়া ক্ষুধা পাইছে। কিছু খাইয়া লই।

কর্নেল সুবিমলকে শর্টকাটে পৌঁছনোর পথ দেখাতে বলেছিলেন। গলিপথে ঘুরপাক খেতে-খেতে নদীর ব্রিজের কাছে সেই বাজারে গিয়ে সেখান থেকে ডাইনে ঘুরে আবার একটা গলিতে ঢুকেই জয়গোপালবাবুদের বাড়িটা চিনতে পারলুম। গাড়ির শব্দ শুনে কাচ্চাবাচ্চারা ভিড় করেছিল। সুবিমল ধমক দিয়ে তাদের হটিয়ে দিল।

হৈমন্তী বেরিয়ে নমস্কার করে বললেন,—ভিতরে আসুন আপনারা। আমি গেনুদাকে ডেকে বলে আসি, গাড়ি পাহারা দেবে। সুবিমল! ভিতরে গিয়ে বসার ঘরে দরজা খুলে দাও।

কাল রাতে যে ঘরে বসেছিলুম, সেই ঘরে আমি ও কর্নেল বসলুম। একটু পরে হৈমন্তী ফিরে এলেন। কর্নেল বললেন,—গতরাতে কোনো উৎপাত হয়নি তো?

হৈমন্তী বললেন,—না। তবে প্রবোধদা—তাকে চেনেন কি না জানি না—

—চিনি। বলুন।

—আপনারা চলে যাওয়ার পর প্রবোধদা মাতলামি করছিল।

—কিছু বলছিলেন কি উনি?

—মাতলামি করে গান গাইছিল। গোপাল আছে শিবের কোলে। সরলামাসি ওকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিল। তবে গানটা শুনে খটকা লেগেছিল।

কর্নেল হাসলেন,—প্রবোধবাবু ঠিকই বলেছিলেন।

—তার মানে?

—পরে বলছি। আপনি বাইরের দরজা বন্ধ করে একবার বাড়ির ভিতরে চলুন।

ভিতরে ঢুকে দেখলুম, বাড়িটার গড়ন ইংরেজি এল অক্ষরের মতো। যে ঘরে বসেছিলুম, সেটার ভিতরের দরজা পশ্চিমমুখী। এটার সংলগ্ন দুটো ঘর দক্ষিণমুখী। উঠোনের দুটো দিকে পাঁচিল। পাঁচিলের উত্তর অংশে শেষ ঘরটার সংলগ্ন টালির চালের রান্নাঘর।

কর্নেল বললেন,—আপনার দাদা সম্ভবত এই ঘরটায় থাকতেন। আর আপনি থাকেন রান্নাঘরের পাশে শেষ প্রান্তের ঘরে। তাই না।

হৈমন্তী একটু চমকে উঠে বললেন,—হ্যাঁ। আপনাকে কি দাদা এসব কথা বলেছিল?

কর্নেল তাঁর কথার জবাব না দিয়ে বললেন,—আপনার দাদার ঘরে তালা আঁটা দেখছি। ওটার ডুপ্লিকেট চাবি নেই?

হৈমন্তী গম্ভীরমুখে বললেন,—না। দাদা নিজের ঘরের চাবি নিজের কাছেই রাখে।

কর্নেল জ্যাকেটের ভিতর থেকে একটা সাদা খাম বের করে বললেন,—এর মধ্যে আপনার ঠাকুরদার উইল আছে। উইলের একটা অংশ পড়ে আমার খটকা লেগেছে। পড়ে শোনাচ্ছি।

বলে তিনি সাদা খামের ভিতর থেকে আরেকটা জীর্ণ খাম বের করলেন। তার ভিতর থেকে সাবধানে এক পাতার একটা পুরু কাগজ বের করলেন। ওপরের দিকটায় স্ট্যাম্প আছে। কত টাকার স্ট্যাম্প দেখতে পেলুম না। হলুদ হয়ে যাওয়া এবং ভাঁজ ছিঁড়ে যাওয়া কাগজটা যে উইল, তা বোঝা গেল। রেজেস্ট্রি করা উইল। কর্নেল প্যান্টের পকেট থেকে আতশ কাচ বের করে একটা অংশ পড়লেন।

'...এতদ্‌ব্যতীত দালানবাটীর পশ্চিমে শেষাংশে দ্বিতলের নিম্নতলে সুরক্ষিত সিন্দুক এবং তন্মধ্যে সংরক্ষিত যাবতীয় দ্রব্য আমার পুত্র শ্রীমান হরগোপাল রায় পাইবে।'

কর্নেল বললেন,—হরগোপাল রায় আপনার বাবা। আপনার ঠাকুরদা 'দ্বিতলের' লিখে 'নিম্নতল' লিখেছেন। কিন্তু শেষাংশ দ্বিতল নয়। দোতলা নয়। একতলা। তাহলে 'নিম্নতল' কথাটার একটাই মানে হয়। তাই না হৈমন্তীদেবী?

হৈমন্তী মুখ নামিয়ে বললেন,—কিছু বুঝতে পারছি না।

—পশ্চিমে শেষাংশে আপনার ঘর। প্লিজ! আপনার ঘরে চলুন!

হৈমন্তী একটু ইতস্তত করে নিজের ঘরে গিয়ে তালা খুলে দিলেন। তারপর ভিতরে ঢুকে পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণের জানালা খুললেন। আমরা বারান্দায় জুতো খুলে ঘরে ঢুকলুম। দেখলুম, দেওয়ালের পশ্চিমে সেকেলে একটা উঁচু পালঙ্ক। অন্যদিকে আলমারি। র‍্যাকে সাজানো বই। এককোণে ছোট্ট বেঞ্চিতে কভারে ঢাকা বাক্স-প্যাঁটরা।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—'দ্বিতলের নিম্নতল' কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি হৈমন্তীদেবী! এই ঘরের তলায় একটা ঘর আছে। ইংরাজিতে যাকে বলে বেসমেন্ট। আগের দিনে বলা হত 'তয়খানা'। সেখানে দামি জিনিস রাখা হত। আপনার খাটের মাথার দিকে ছোট্ট বেঞ্চে বাক্স-প্যাঁটরা রাখা আছে।

বলে কর্নেল প্যান্টের পকেট থেকে তাঁর খুদে কিন্তু জোরালো আলোর টর্চ বের করে জ্বাললেন। তারপর একটু ঝুঁকে দেখে নিয়ে বললেন,—বেঞ্চের তলায় পেতলের বালতিটা সরাচ্ছি। আমাকে বাধা দেবেন না প্লিজ!

কর্নেল পেতলের বালতি সরাতেই দেখা গেল একটা মোটা লোহার আংটা। কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—হৈমন্তীদেবী! লোহার ওই আংটা ধরে জোরে টান দিলে লোহার চৌকো একটা পাত উঠে আসবে। নীচে সিঁড়ি আছে। নেমে গেলেই সিন্দুকটা পাওয়া যাবে।

হৈমন্তী কান্নাজড়ানো গলায় বললেন,—কিন্তু গোপালদাকে সিন্দুকের খোঁজ দিলে সে ঠাকুরদার জুতো দুটো বের করবে। জুতো দুটোর হিলে কী আছে তা কি আপনি জানেন?

কর্নেল বললেন,—জানি! তার মানে, এই সুবিমলের মুখে একটা ঘটনা শোনার পর তা আমি যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করেছি। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে ঝড়বৃষ্টির রাতে স্বদেশি বিপ্লবীরা জমিদারের খাজাঞ্চিখানা লুঠ করেছিলেন। আপনার ঠাকুরদা ছিলেন খাজাঞ্চি। তাঁকে বেঁধে রেখে ধনরত্ন লুঠ করা হয়েছিল। যেভাবে হোক, বাঁধন খুলে আপনার ঠাকুরদা পালিয়ে আসার সময়—হ্যাঁ, আমার অনুমান ঠিক, দৈবাৎ দুটি দামি রত্ন দেখতে পান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রত্নদুটি হিরে। তাই বিদ্যুতের আলোয় তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার জন্য হিরের দুটি খণ্ড আপনার ঠাকুরদা কুড়িয়ে পান। এর পরের কাহিনি আপনার জানা। সুবিমল আমাকে বলেছে, আপনার ঠাকুরদাকে জেল খাটানোর চেষ্টা করেছিলেন জমিদারবাবু। আট বছর তিনি লুকিয়ে থাকার পর ফিরে আসেন।

হৈমন্তী বললেন,—আমি সব জানি। বাবার কাছে শুনেছি। কিন্তু দাদা এতদিনে রেলের চাকরি থেকে রিটায়ার করে আসার পর মুখুজ্যেদের পাল্লায় পড়েছে, তা বুঝতে পেরেছিলুম। দাদাকে টাকার লোভ দেখিয়ে মুখুজ্যেরা হিরে দুটো হাতাতে চায়। তাই মিথ্যা করে জুতোচুরির গল্প শোনায়।

কর্নেল হাসলেন,—আপনি জানেন তাহলে?

হৈমন্তী চোখ আঁচলে মুছে বললেন,—আগে একটু সন্দেহ হয়েছিল। গতরাতে ওই পদ্য পড়েই বুঝেছিলুম, এটা দাদার পদ্য। হাতের লেখা অন্যের। দাদার পদ্য লেখার অভ্যাস আছে।

হালদারমশাই ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন,—খাইসে!

এই সময় বাইরে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। কর্নেল বললেন,—আপনার দাদা নিখোঁজ হয়েছিলেন। ওঁকে প্রমথ মুখুজ্যের ফার্ম থেকে পুলিশ উদ্ধার করে এনেছে। শিগগির এ ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে তালা এঁটে দিন। আমি বাইরে যাচ্ছি।

পুলিশের জিপ থেকে একজন অফিসার নেমে এসে করজোড়ে কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন,—আমার সৌভাগ্য, কিংবদন্তি পুরুষ কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। আমি ও. সি. বাসুদেব ঘোষ।

কর্নেল বললেন,—জয়গোপালবাবুকে এনেছেন তো?

—হ্যাঁ। প্রমথবাবুর ফার্মে দিব্যি বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন। আমাদের দেখে অবাক হয়ে, পরে বললেন, আমি নিখোঁজ হব কোন দুঃখে? বড় মুখুজ্যেবাবু জামাই-আদরে রানাঘাট স্টেশন থেকে গাড়ি চাপিয়ে ফার্মে নিয়ে এসেছেন। খাচ্ছি-দাচ্ছি! দিব্যি আছি!

জয়গোপালবাবু জিপের পিছনদিক থেকে একলাফে নেমে এলেন। হাসিমুখে কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন,—আপনি এসে পড়েছেন তাহলে?

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—পাঁচজোড়া জুতোর মধ্যে প্রথমজোড়া ছিল আপনার। বাকি চারজোড়া জুতো কি বড় মুখুজ্যে কিনে দিয়েছিলেন?

জয়গোপালবাবু জিভ কেটে বললেন,—ছ্যা-ছ্যা! আমার কি জুতো কেনার পয়সা নেই? আপনার দিব্যি! মা কালীর দিব্যি! পুলিশস্যারের দিব্যি! আমার পাঁচজোড়া জুতো সত্যি চুরি গিয়েছিল। সেই জুতোগুলো আজ সকালে বড় মুখুজ্যের ফার্মের পাঁচিলের গোড়ায় ঘাসের মধ্যে দেখেছি। সবগুলোর হিল ওপড়ানো। খাপ্পা হয়ে বললুম, বড় মুখুজ্যেদা! এ কী করেছ? বড় মুখুজ্যের এক কথা। ঠাকুরদার জুতোজোড়া এনে দাও। তবে ছাড়া পাবে! তারপর কাল দুপুরবেলা আমাকে দিয়ে পদ্য লিখিয়ে ছাড়ল। না লিখলে অ্যালসেশিয়ান দিয়ে আমাকে খাওয়াবে বলল। শেষে বলল, কালুর মতো মুণ্ডু কেটে এই বাড়ির দরজায় ঝুলিয়ে রাখব। করি কী বলুন?

—প্রবোধবাবু আপনাকে দেখতে পেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ বড় মুখুজ্যে তাকে পেট ভরে মদ খাইয়ে ছেড়ে দিলেন!

—তাই তিনি আপনার বোনকে বলে গেছেন, 'গোপাল আছে শিবের কোলে'। প্রমথ শিবের একটি নাম।

ও.সি. বাসুদেব ঘোষ বললেন,—প্রমথ মুখুজ্যের বিরুদ্ধে 'রংফুল কনসাইনমেন্ট'-এর বেআইনি আটকের চার্জে এফ. আই. আর. করেছি। জয়গোপালবাবুর কথা শুনেই বুঝেছিলাম, ভদ্রলোক ওঁর সরলতার সুযোগ নিয়েছিলেন।

জয়গোপালবাবু করজোড়ে বললেন,—মামলা করে কী হবে? ঠাকুরদার জুতো তো কেউ হিমির কাছ থেকে হাতাতে পারবে না। হিমি! বিশ্বাস কর আমাকে। আমি কখনও তোকে ঠাকুরদার সিন্দুকের কথা জিজ্ঞেস করব না।

ও.সি. বললেন,—ঠাকুরদার সিন্দুক। সেটা কী?

কর্নেল বললেন,—পরে সব বলব। আমি সেচ-বাংলোয় আরও একটা দিন থাকছি। দোমোহানি ড্যামে সাইবেরিয়ান হাঁসের ছবি না তুলে যাচ্ছি না। যাই হোক, আপাতত ভাই-বোনকে আশা করি একটু প্রোটেকশন দেবেন। অবনী মুখুজ্যে কেমন লোক আমি জানি না।

হালদারমশাই কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। বুঝলুম, গতরাতে অবনী মুখুজ্যের দুটো লোকের পাল্লায় পড়ে হেনস্থা হওয়ার কথা বলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তাঁকে থামতে হল ও. সি. বাসুদেববাবুর কথায়,—সম্ভবত ইনিই সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ? আপনার বিরুদ্ধে অবনীবাবু নালিশ করতে গিয়েছিলেন।

হালদারমশাই স্মার্ট হয়ে পকেট থেকে তাঁর ডিটেকটিভ এজেন্সির পরিচয়পত্র দেখিয়ে বললেন, —আমারে দাও দিয়ে অ্যাটাক করছিল অবনীবাবুর দুইজন লোক। লোক না গুণ্ডা! আমি প্রোফেশনের কাজে যেখানে ঘুরি, অগো কী?

ও.সি. হাসতে-হাসতে জিপে উঠে বললেন,—দিনে সময় হবে না। সন্ধ্যা সাতটায় কর্নেলসাহেবের সঙ্গে সেচ-বাংলোয় গিয়ে ঠাকুরদার সিন্দুকের গল্প শুনব। নমস্কার!

ও.সি. চলে গেলে হৈমন্তী বললেন,—কর্নেলসায়েব! দাদাকে বলে দিন, কখনও যেন আর ঠাকুরদার সিন্দুকের নাম না করে।

জয়গোপালবাবু করুণমুখে বললেন,—কিন্তু ঠাকুরদার দু-পাটি জুতোর একপাটি আমার প্রাপ্য কি না বল হিমি।

হৈমন্তী বললেন,—জুতো নিয়ে কী করবে তুমি? তার চেয়ে অবনী মুখুজ্যের জবরদখল জমিটা তুমি আর আমি আইনত মালিক হিসেবে গার্লস স্কুলের নামে দান করে দেব!

—দিলুম! তারপর?

—দু'পাটি জুতো বিক্রি করে সেই টাকায় গার্লস স্কুলের বাড়ি তৈরি করে দেব।

—জুতো বিক্রি করে? হ্যাঁ? বলিস কী হিমি? কর্নেলসায়েব! এ কী অদ্ভুত কথা!

সুবিমল মুখ ফসকে বলতে যাচ্ছিল জুতোর হিলের মধ্যে কী আছে, কর্নেল তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—জয়গোপালবাবু! অদ্ভুত কথার মানে যথাসময়ে জানতে পারবেন। কিন্তু আপনি নিজের জুতো নিজে চুরি না করলেও প্রমথবাবুর প্ররোচনায় একটা খারাপ কাজ করেছেন!

জয়গোপালবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন,—আজ্ঞে?

—কালু নামে কুকুরটা আপনাকে দেখলে বা আপনি তার কাছে গেলে চ্যাঁচাত না। কারণ আপনাদের বাড়িরই পোষা কুকুর। এবার বলুন কালুকে আপনি কি কোলে তুলে বা কোনোভাবে প্রমথবাবুর লোক দিয়েছিলেন? জয়গোপালবাবু! আপনার সাহায্য ছাড়া কারও সাধ্য ছিল না যে কালুর মুন্ডু কাটবে।

জয়গোপালবাবু ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠলেন। তারপর বললেন, —আমি কেমন করে জানব গণশা আমার কোল থেকে তাকে আচমকা কেড়ে নেবে আর কেষ্টা তার মুন্ডু কাটবে? অন্ধকার রাত্তির। আমাকে গণশা আর কেষ্টা ক্লাব থেকে এগিয়ে দেওয়ার ছলে সঙ্গে এসেছিল। তারপর বলল, কালুকে নিয়ে একটা মজার খেলা খেলবে! আমি কি জানতুম কী মজা?

হৈমন্তী বললেন,—তুমি কেন একথা লুকিয়ে রেখেছিলে?

—ভয়ে। তোর দিব্যি। কর্নেলস্যারের দিব্যি। গণশা-কেষ্টা শাসিয়ে গিয়েছিল, তাদের নাম বলে দিলে আমার মুন্ডু কাটবে।

কর্নেল বললেন,—হৈমন্তীদেবী! দাদাকে বাড়ি নিয়ে যান। যথাসময়ে এসে আপনার ঠাকুরদার সিন্দুক আর জুতো দেখব। চিন্তা করবেন না। আপনার প্ল্যানটা ভালো। বাবুগঞ্জে সৎ-ভদ্রমানুষও তো কম নেই। তাঁরা আপনাকে সাহায্য করবেন। গার্লস হাইস্কুল হবে আপনার ঠাকুরদার নামে। আচ্ছা চলি।

রায়বাড়ির প্রতিমা রহস্য

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে কর্নেলকে নমস্কার করলেন। নমস্কারের সময় তাঁর ছড়িটা ডানদিকে বগলের সঙ্গে আটকে রেখেছিলেন। তারপর বললেন, —আমি সুদর্শন রায়। গতরাতে কনকপুর থেকে আপনাকে ট্রাঙ্ককল করেছিলুম।

কর্নেল বললেন, —বসুন সুদর্শনবাবু।

সুদর্শন রায় সোফায় বসলেন। তাঁর ছড়িটা পাশে ঠেস দিয়ে রেখে বললেন,—ট্রাঙ্ককলে একটা কথা বলা হয়নি। একে তো বিচ্ছিরি কীসব শব্দ। তারপর হঠাৎ লাইনটা কেটে গেল। ভবানীপুরে আমার মাসতুতো ভাই জয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরিই আমাকে আপনার কাছে আসতে বলেছিল।

—হ্যাঁ। জয়কৃষ্ণবাবু আমাকে গতকাল টেলিফোনে আপনার কথা বলেছেন।

বলেছে?—ভদ্রলোক উৎসাহে একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন।—তা হলে আপনার কাছে আমার আসবার কারণও নিশ্চয় জানিয়েছে?

কর্নেলের হাতে অনেকগুলো পোস্টকার্ড সাইজের রঙিন ছবি ছিল। ছবিগুলো প্রজাপতির। গত অক্টোবরে সরডিহার জঙ্গলে অনেক ঘোরাঘুরি করে ক্যামেরায় দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির প্রজাপতির ছবি তুলে এনেছিলেন। এতক্ষণ সেই ছবিগুলো দেখিয়ে তিনি আমাদের কান ঝালাপালা করছিলেন। অবশ্য প্রাইভেট ডিটেকটিভ কৃতান্তকুমার হালদার—আমাদের প্রিয় হালদারমশাই মনোযোগী ছাত্রের মতো শুনছিলেন। কী বুঝছিলেন তা তিনিই জানেন!

এমন একটা অবস্থায় কোন কনকপুরের সুদর্শন রায় এসে বাঁচালেন। ভদ্রলোক বয়সে প্রৌঢ়। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ আছে। সিঁথি-করা কাঁচাপাকা চুল আর পুরু গোঁফে শৌখিনতার ছাপও স্পষ্ট। গায়ে সার্জের পাঞ্জাবি, পরনে ধুতি। হাঁটু অবধি পশমের মোজা। কাঁধে ভাঁজ করা নকশাদার কাশ্মীরি শাল। অনুমান করলুম, নভেম্বরের শেষাশেষি কলকাতায় ফ্যান চললেও তাঁদের কনকপুরে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে এবং টুপি বা মাফলার নিশ্চয় তাঁর কাঁধের সুদৃশ্য পুষ্ট ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছেন। শুধু তাঁর ছড়িটা সাদাসিধে রকমের। দেখে বোঝা যায় মোটা বেতের ছড়ি এবং মাথাটা ছাতার বাঁটের মতো ঘোরালো। কালো রঙের বাঁট। হালদারমশাই গুলি-গুলি চোখে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে হাসি পেল। কিন্তু এখন আবহাওয়া গুরুগম্ভীর।

যাই হোক, ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরে কর্নেল বললেন,—জয়কৃষ্ণবাবু কিছুটা জানিয়েছেন। তবে টেলিফোনে শুধু ওইটুকু জানা যথেষ্ট নয়। উনি আমার পুরোনো বন্ধু। আমার মতো ওঁরও কিছু বাতিক আছে। পাখি দেখা, অর্কিড সংগ্রহ, ক্যাকটাসের বাগান করা।

সুদর্শনবাবু বললেন,—হ্যাঁ, জয়কৃষ্ণ একসময় নাম করা শিকারিও ছিল। আমার ঠাকুরদা ছিলেন কনকপুরের জমিদার। কনকপুরের পুর্বে পাঁচখালি নামে একটা মহাল ছিল তাঁর আমলে। ওই মহালটা জলজঙ্গলে কিছুটা দুর্গম ছিল। এখনও ওদিকটায় তত উন্নতি হয়নি। জয়কৃষ্ণ বাইশ বছর বয়সে পাঁচখালির জঙ্গলে একটা বাঘ মেরেছিল। তারপর তো পশুপাখি মারা আইন করে নিষিদ্ধ হল। তবু জয়কৃষ্ণ—ওর ডাকনাম আপনি হয়তো জানেন.....

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ঝন্টুবাবু।

—তো ঝন্টু পাঁচখালির জঙ্গলমহলে যাওয়া ছাড়েনি। ওই তল্লাটের মানুষজন ওকে দেবতার মতো ভক্তি করে। আজকাল আর তত যায় না।

এই সময় ষষ্ঠীচরণ কফি আনল। কর্নেল বললেন,—কফি খান সুদর্শনবাবু। কফি নার্ভ চাঙ্গা করে।

সুদর্শনবাবু কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—ঝন্টু আপনাকে কতটুকু জানিয়েছে জানি না। তবে ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়।

কথাটা বলে সুদর্শনবাবু আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। কর্নেল বললেন,—আলাপ করিয়ে দিই। এ আমার তরুণ বন্ধু খ্যাতিমান সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি। আর উনি মিঃ কে. কে. হালদার। প্রাক্তন পুলিশ ইন্সপেক্টর। রিটায়ার করার পর প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন। এঁরা দুজনেই আমার বিশ্বস্ত সহচর।

সুদর্শনবাবু আমাদের নমস্কার করলেন। তারপর বললেন,—ঘটনার পর আমি কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে যাওয়ার কথা ভেবেছিলুম। কিন্তু আমার দাদা সুরঞ্জন পুলিশের উপরতলায় কাকেও ধরার পক্ষপাতী। ঝন্টুর পুলিশমহলে জানাশোনা আছে। কিন্তু সে আপনার কাছে আসবার জন্য পরামর্শ দিয়েছিল।

কর্নেল বললেন,—আপনি এঁদের সামনে স্বচ্ছন্দে ঘটনাটা জানাতে পারেন।

সুদর্শনবাবু একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—আমাদের রায়পরিবারের গৃহদেবী মহালক্ষ্মী। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে ঘরে-ঘরে লক্ষ্মীপুজো হয়। আমাদের দেবী মহালক্ষ্মীরও ওই রাত্রে পুজো হয়। সারা বছর ওই রাত্রিটা বাদে প্রতিমা রাখা হয় আমাদের দোতলা বাড়ির ওপরতলায় বিশেষভাবে তৈরি একটা ঘরের দেওয়ালসংলগ্ন আয়রনচেস্টে। ঘরের দরজার তালা আর ওই আয়রনচেস্টের তালার দুটো করে চারটে চাবি ছিল। বাবা মৃত্যুর আগে দুটো চাবি আমাকে আর দুটো চাবি আমার দাদা সুরঞ্জনকে দিয়েছিলেন। এবার ব্যাপারটা খুলে বলি। দরজার তালা খুলতে হলে প্রথমে দাদার চাবিটা ঢুকিয়ে একপাক ডাইনে ঘোরাতে হবে। তারপর আমার চাবিটা তালায় ঢুকিয়ে বাঁদিকে একপাক ঘোরাতে হবে। তবেই দরজার তালা খুলবে।

হালদারমশাই অবাক হয়ে বললেন,—কন কী? একখান চাবি দিয়া তালা খুলব না?

—না। এরপর আয়রনচেস্ট খুলতে হলেও আগে দাদার চাবি তারপর আমার চাবি ঢুকিয়ে একইভাবে ঘোরাতে হবে। তবেই আয়রনচেস্ট খুলবে। তারপর আমরা দুভাই রুপোর থালায় মহালক্ষ্মীকে বের করব। আয়রনচেস্ট একইভাবে বন্ধ করব। ঘর থেকে বেরিয়ে দেবীকে তুলে দেব আমাদের পুরুতঠাকুর দেবনারায়ণ মুখুজ্যের হাতে। দুভাই মিলে এবার ঘরের দরজার তালা আটকে দেব। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি বাড়ির মাঝামাঝি জায়গায়। সিঁড়ির নীচে অপেক্ষা করবে বাড়ির লোকজন। আমরা সবাই যাব ঠাকুরবাড়িতে। সেখানে মন্দিরের বেদিতে দেবীকে রেখে পুজোআচ্চা শুরু হবে। মোটামুটি এতবছর ধরে এটাই নিয়ম।

কর্নেল বললেন,—বুঝলুম। কিন্তু ঘটনাটা কী?

সুদর্শনবাবু জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন,—অক্টোবর মাসে কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে দাদা আর আমি আয়রনচেস্ট থেকে দেবীকে বের করে দেখি, মাথার মুকুট নেই। গলার জড়োয়া নেকলেস নেই। দেখামাত্র আমাদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। দাদা ঠান্ডামাথার মানুষ। কিন্তু আমি মাথার ঠিক রাখতে পারিনি। চিৎকার, চ্যাঁচামেচি করে হইচই বাধিয়ে দিলুম। খবর রটতে দেরি হয়নি। পাড়ার ভদ্রলোকেরা ছুটে এসেছিলেন। তারপর পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল। থানার অফিসার

ইন-চার্জ আমাদের দুভাইকে পৃথকভাবে জেরা করে শেষে খুব হম্বিতম্বি শুরু করলেন। দাদা, না হয় আমি, যে-কোনো একজন চুরি করেছি--এই তাঁর মত।

কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন,—আপনার দাদা কোথায় চাবি রাখতেন, সে কথা আপনি নিশ্চয় জানতেন না?

সুদর্শনবাবু বিষণ্ণমুখে বললেন,—কর্নেলসায়েব! আপনিও থানার বড়বাবুর মতো কথা বলছেন!

—না। এটা নিছক একটা প্রশ্ন। তা ছাড়া, আমি কখনওই বলছি না আপনার দাদা কোথায় চাবি রাখতেন, তা আপনার জানা ছিল। যাই হোক, এবার বলুন আপনার চাবি আপনি কোথায় রাখতেন?

সুদর্শনবাবু তাঁর বেতের মোটা ছড়িটা হাতে নিয়ে বললেন,—এই ছড়ির ভেতরে।

বলে তিনি কালো রঙের অর্ধবৃত্তাকার বাঁটটা ঘোরাতে শুরু করলেন। বাঁটটা খুলে গেল। তারপর ছড়িটা তুলে তিনি একটু নাড়া দিতেই খুদে রিঙে আটকানো দুটো চাবি ছিটকে নীচে পড়ল। চাবিদুটো কুড়িয়ে নিয়ে তিনি বললেন,—কী ধাতুতে তৈরি জানি না। তবে চাবি দুটোর ওজন আছে।

কর্নেল বললেন,—চাবি দুটো একটু দেখতে চাই।

সুদর্শনবাবু তাঁর হাতে চাবি দিলেন। চাবিদুটোর গড়ন দুরকমের। একটা ইঞ্চিতিনেক লম্বা, অন্যটা তার চেয়ে ছোট। কর্নেল টেবিলের ড্রয়ার থেকে আতশকাচ বের করে টেবিলল্যাম্প জ্বেলে দিলেন। তারপর আতশকাচ দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে চাবিদুটো সুদর্শনবাবুকে ফেরত দিলেন। সুদর্শনবাবু চাবিদুটো ছড়ির গর্তে ঢুকিয়ে ঘোরালো বাঁটটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আঁট করে দিলেন।

কর্নেল বললেন,—এই বেতের ছড়িটা আপনি কতদিন আগে কিনেছিলেন? আমার ধারণা এটা অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন। তাই না?

—ঠিক ধরেছেন। আগে চাবিদুটো আমি আমার ঘরে আলমারির লকারে রাখতুম। বছর তিনেক আগে পাঁচখালি এলাকার একটা বসতিতে দশরথ নামে একটা লোককে দিয়ে ছড়িটা তৈরি করিয়েছিলুম। ওদের ডোম বলা হয়। পাঁচখালি এলাকায় বেতের জঙ্গল আছে। ডোমেরা বেতের তৈরি ধামা, ধান-চাল মাপবার পাত্র, চুপড়ি, দোলনা এইসব জিনিস তৈরি করে কনকপুরে চৈত্রসংক্রান্তির গাজনের মেলায় বেচতে আসে। দশরথ খুব পাকা কারিগর। আমাদের ছোটবেলায় বাবা দশরথকে দিয়ে বেতের এক সেট টেবিল-চেয়ার তৈরি করিয়েছিলেন। সেগুলো এখনও আছে।

—আপনি বেতের ছড়িতে চাবি রাখা নিরাপদ মনে করেছিলেন। এর কি কোনো বিশেষ কারণ ছিল?

সুদর্শনবাবু একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—গ্রামে আমার ঠাকুরদার প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুল আছে। একটা লাইব্রেরিও আছে। ঠাকুরমার নামে নাম। রত্নময়ী পাঠাগার। বাবা লাইব্রেরিঘরের সঙ্গে আরও একটা ঘর তৈরি করে দিয়েছিলেন। ওই ঘরে তাস, ক্যারাম, দাবা এইসব খেলার আসর বসত। বিকেল চারটে থেকে রাত্রি নটা অবধি সেখানে খেলা চলত। দাবা খেলার নেশা আমার আছে। এদিকে আমার শোওয়ার ঘরে সেই আলমারি আছে। বছর দিনেক আগে রাত সাড়ে নটায় বাড়ি ফিরে দেখি, শোওয়ার ঘরের দরজার তালা ভাঙা। আমার যা স্বভাব। চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করে হুলস্থূল বাধিয়েছিলুম। দাদা এসে আমাকে বললেন, ঘরে ঢুকে দেখেছ

কিছু চুরি গেছে কি না? তারপর নিজেই ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন। আমি ঘরে ঢুকে দেখলুম, সবকিছু ঠিকঠাক আছে।

হালদারমশাই একটু হেসে বললেন,—চোর তালা ভাঙছিল। কিন্তু চুরির সময় পায় নাই।

কর্নেল বললেন,—আপনার ফ্যামিলি, মানে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা?

সুদর্শনবাবু আস্তে বললেন,—আমি বিয়ে করেছিলুম। কিন্তু আমার স্ত্রী ব্লাডক্যান্সারে মারা যান। তারপর আর বিয়ে করিনি। জমি-পুকুর-বাগান দেখাশোনা এসব নিয়েই থাকতুম। শুধু সন্ধ্যা থেকে দাবা।

—তা হলে আপনি সেই ঘটনার পর এই ছড়ি তৈরি করিয়েছিলেন?

—ঠিক ধরেছেন। ছড়িটা বাইরে গেলে সবসময় হাতে থাকবে। আবার দাবার আসরে বসলেও ছড়িটা আমার হাতের পাশে রাখা থাকবে। কোলে ফেলে রাখতেও অসুবিধে নেই।

—আপনার দাদা কী করেন?

—আপনাকে বলেছি, জমিসম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব আমি নিয়েছিলুম। কারণ ছোটবেলা থেকে পড়াশোনায় আমার মন ছিল না। ঝন্টুকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন। আর দাদার কথা জিজ্ঞেস করছেন? দাদা পড়াশুনায় খুব ভালো ছিল। কনকপুর হাইস্কুলে দাদা মাস্টারি করত। দুবছর আগে রিটায়ার করেছে। শোভা-বউদিকে আমি মায়ের মতো শ্রদ্ধা করি।

—আপনার দাদার ছেলেমেয়ে?

—এক মেয়ে এক ছেলে। মেয়ের বিয়ে হয়েছিল বহরমপুরে। তার স্বামী সরকারি অফিসার। তার বদলির চাকরি। এখন সুনন্দা শিলিগুড়িতে থাকে। তার একটি মেয়ে আছে। দাদার ছেলে গৌতম ঝন্টুর বাড়িতে থেকে কোনো কলেজে পড়ত। ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। ঝন্টুর তদ্বিরে সে আমেরিকাতে পড়তে গেছে। কর্নেলসায়েব! দাদা-বউদির প্রতি আমার এতটুকু ঈর্ষা নেই। অথচ বজ্জাত লোকেরা এখন কতরকম আজেবাজে কথা রটাচ্ছে।

—এবার কোজাগরী পূর্ণিমার দিন কি আপনার দাদার মেয়ে-জামাই-নাতনি সবাই এসেছিল?

—হ্যাঁ। তা ছাড়া, আরও কিছু আত্মীয়স্বজনও এসেছিল। প্রতিবছর ওই একটা দিন আমাদের রায়পরিবারে একটা বড় উৎসব। পরদিন কাঙালিভোজন, বস্ত্রদান এসবও হয়। এবার কিছুই হয়নি।

—এখন বাড়িতে কারা আছে?

—দাদা-বউদি। বাবার আমলের কাজের লোক হরিপদ আর গোবিন্দ। গোবিন্দ জমিসম্পত্তি দেখাশোনার কাজে আমাকে সাহায্য করে। সে আমার বিশ্বস্ত লোক। হরিপদ বাড়ির সব ফাইফরমাশ খাটে। রান্না করে মোনাঠাকুর। সে-ই হাটবাজার করে। আর আছে কাজের মেয়ে শৈলবালা। আমি দুধের জন্য একটা গাইগরু পুষেছি। গোরুর দেখাশোনা, দুধ দোহানো এসব কাজও শৈল করে।

—একটু ভেবে বলুন সুদর্শনবাবু! কোজাগরী পূর্ণিমার দিন আপনি ঘুম থেকে ওঠার পর সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত আপনার এই ছড়িটা কোথায় ছিল?

সুদর্শনবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন—আমি ঘরে থাকলে ছড়িটা ব্র্যাকেটে ঝোলানো থাকে। দোতলা থেকে নীচে কোনো কাজে নামলে ঘরে নতুন দামি তালাটা এঁটে দিই। বাড়ি থেকে বাইরে বেরুলে ছড়িটা আমার হাতেই থাকে। সেদিও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

কর্নেল এতক্ষণ পরে চুরুট ধরালেন। তারপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—তা হলে আপনার এবং আপনার দাদার চাবি প্রতিবছর কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন ওই একবার বের করতে হয় দুজনকে। তাই তো?

—হ্যাঁ। ওই একবার।

—বছরের অন্যসময়, ধরুন গত একবছরে কখনও কি আপনি ছড়ির বাঁট খুলে চাবিদুটো আছে কি না দেখে নিয়েছেন?

—খুলে দেখার দরকার হয় না। কেন জানেন? ছড়িটা হাতে নিয়ে মাটিতে ঠেকিয়ে হাঁটতে হয়। আমি অভ্যাসবশে ঠিক বুঝতে পারি ভিতরে চাবি আছে কি না।

—তার মানে, আবছা শব্দ শুনতে পান?

—ঠিক ধরেছেন কর্নেলসায়েব!

—আর-একটা কথা। আপনি দোতলায় থাকেন। আপনার দাদা-বউদি?

—দোতলায়। বুঝিয়ে বলি। দোতলায় মোট ছখানা ঘর। সিঁড়িটা মাঝখানে। তিনটে করে ঘর তার দুধারে। টানা বারান্দা আছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকে, মানে পূর্বের প্রথম ঘরটাতে থাকেন মহালক্ষ্মী। পরের ঘরে জমিদারি আমলের দামি আসবাবপত্র রাখা আছে। পূর্বের শেষ ঘরটাতে থাকে দাদা-বউদি। কনকপুরে বিদ্যুৎ আসবার পর বারান্দার ওদিকটায় দেওয়াল তুলে অ্যাটাচড্ বাথরুম করা হয়েছে। আর আমি থাকি পশ্চিমের একেবারে শেষ ঘরটাতে। বাকি দুটো ঘরের মধ্যে আমার পাশের দুটো ঘর আত্মীয়স্বজন বা কোনো বিশেষ অতিথি এলে তাঁদের জন্য রাখা হয়েছে। ঝন্টু গেলে আমার পাশের ঘরে শোয়।

—এবার কোজাগরী পূর্ণিমার কদিন আগে আপনার দাদার মেয়ে-জামাই-নাতনি এসেছিলেন?

—দুর্গাপুজোর আগেই এসেছিল। ষষ্ঠীর দিন।

—তাঁরা আপনার পাশের ঘরে, নাকি অন্য ঘরে ছিলেন?

—আমার পাশের ঘরে। দাদার নাতনি পিংকি আমার কাছে ভূতের গল্প শুনতে চায়। সে আমার বিছানায় শুতো।

—তার পরের ঘরে কেউ ছিলেন ওই সময়?

—আমাদের মামাতো ভাই পরেশ। সে থাকে রাঁচিতে। ল্যাব রিসার্চের অফিসে চাকরি করে। সত্যি বলতে কী, মহালক্ষ্মীপুজোর সব কাজের ঝামেলা সে-ই সামলায়।

—পরেশবাবু সম্পর্কে আপনার কোনো সন্দেহের কারণ নেই তা হলে?

—না। পুলিশ তাকে খুব জেরা করেছিল। কিন্তু তাকে অ্যারেস্ট করেনি।

—তা হলে পুলিশ কাকে অ্যারেস্ট করেছে?

—পুলিশের যা নিয়ম! খামোকা গোবিন্দ আর হরিপদকে দিন পাঁচেক আটকে রেখেছিল। দাদা আর আমি বড়বাবুকে ধরাধরি করে বেচারাদের ছাড়িয়ে এনেছিলুম।

—আচ্ছা সুদর্শনবাবু, আপনাদের গৃহদেবী মহালক্ষ্মীর কি কোনো ছবি তোলা হয়েছিল?

—হ্যাঁ। কনকপুর এখন প্রায় টাউন হয়ে উঠেছে। ছবি তোলার স্টুডিয়োও আছে। গতবছর কোজাগরী পূর্ণিমার দিন দাদা কমলা স্টুডিয়ো থেকে রামবাবুকে ডেকে এনেছিল। প্রতিমার ছবি খুব সুন্দর তুলেছিল রামবাবু। রঙিন ছবি। অনেকগুলো কপি করে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে দাদা বিলি করেছিল। আর নীচের তলায় বসার ঘরের জন্য একটা ছবি বড় করে বাঁধানো হয়েছিল। আমার কপিখানা দেখাচ্ছি।

বলে সুদর্শনবাবু তাঁর ব্যাগ থেকে বাঁধানো প্রায় ৯ ইঞ্চি লম্বা আর ৬ ইঞ্চি চওড়া ফ্রেমে বাঁধা একটা রঙিন ছবি বের করে দিলেন। ছবিটা কর্নেল দেখে নিয়ে হালদারমশাইকে দিলেন। তিনি দেখার পর আমাকে দেখতে দিলেন। দেখে মনে হল, মূর্তিটা প্রাচীন। কষ্টিপাথরে তৈরি। মাথায় রত্নখচিত মুকুট। গলায় জড়োয়ার হার।

কর্নেল বললেন,—একমিনিট। আমি এই ছবি থেকে আমার ক্যামেরায় ছবি তুলে নিচ্ছি। দরকার হতে পারে।

কর্নেল তাঁর ক্যামেরায় ছবি তুলে নেওয়ার পর বললেন,—ঠিক আছে সুদর্শনবাবু! আমি আপনাদের গৃহদেবী মহালক্ষ্মীর চুরি যাওয়া অলংকার উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। বাড়ি ফেরার পথে আপনি মিঃ রায়চৌধুরিকে জানিয়ে যেতে পারেন, আমি আপনাদের সাহায্য করতে চেয়েছি।

সুদর্শনবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—ঝন্টুর বাড়ি গেলে শেয়ালদা স্টেশনে সাড়ে এগারোটার ট্রেন ফেল করব। মাঠে পাকা ধান কাটা শুরু হয়েছে। আমাকে দুপুরের মধ্যেই পৌঁছতে হবে। আপনি কবে কনকপুর যাচ্ছেন তাই বলুন!

কর্নেল বললেন,—যত শিগগির পারি, যাব। কিন্তু একটা শর্ত। আপনার দাদা আর আপনি ছাড়া ওখানকার কেউ যেন জানতে না পারে, আমি কেন কনকপুরে গেছি। আর-একটা কথা। আপনাদের বাড়িতে আমরা উঠব না। মিঃ রায়চৌধুরির কাছে শুনেছি, কনকপুরের কাছাকাছি ইরিগেশন বিভাগের একটা বাংলো আছে। সেখান থেকে আপনার সঙ্গে যথাসময়ে যোগাযোগ করব।

সুদর্শনবাবু বললেন,—আপনার ইচ্ছা। তারপর আমাদের সবাইকে নমস্কার করার পর ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বেতের ছড়িটা মুঠোয় ধরে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন—হেভি মিস্ট্রি।

কর্নেল এইসময় একটু ঝুঁকে সোফার নীচে থেকে একটা ছোট্ট কার্ড কুড়িয়ে নিলেন। তারপর সেটা দেখে নিয়ে পকেটস্থ করে বললেন,—হ্যাঁ। হেভি মিস্ট্রিই বটে। সুদর্শনবাবুর ব্যাগ থেকে ছবি বের করার সময় এই কার্ডটা ছিটকে পড়েছিল মনে হচ্ছে। কার্ডটা কলকাতার এক জুয়েলারি কোম্পানির।

হালদারমশাই ও আমি দুজনেই চমকে উঠেছিলুম। দুজনে একই সঙ্গে বলে উঠলুম,—জুয়েলারি কোম্পানির কার্ড?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ, চন্দ্র জুয়েলার্স কোম্পানি। চৌরঙ্গিতে এঁদের বিশাল দোকান। এই কোম্পানি কলকাতার অন্যতম সেরা রত্নব্যবসায়ী। কিন্তু এঁদের কার্ড সুদর্শনবাবু পকেটে না রেখে ব্যাগে রেখেছিলেন কেন?

গোয়েন্দাপ্রবর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—ভদ্রলোকরে ফলো করুম!

তারপর তিনি সবেগে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল কিছু বললেন না। আমি ব্যস্তভাবে বললুম,—হালদারমশাইকে নিষেধ করা উচিত ছিল। আপনার কথা নিশ্চয় শুনতেন। অথচ আপনি ওঁকে বাধা দিলেন না?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—তুমি তো জানো, হালদারমশাই গোয়েন্দাগিরির সুযোগ পেলে ছাড়তে চান না। তা ছাড়া, ইদানীং ওঁর হাতে কোনো কেস নেই। এমন একটা অদ্ভুত রহস্যের গন্ধ পেয়ে উনি চুপচাপ বসে থাকার পাত্র নন। তা ছাড়া, হালদারমশাই পঁয়ত্রিশ বছর পুলিশে চাকরি করেছেন। ওঁকে নিয়ে তোমার উদ্বেগের কারণ নেই।

বললুম,—কিন্তু সুদর্শনবাবুদের মহালক্ষ্মীদেবীর মুকুট আর জড়োয়া নেকলেস চুরি গেছে। এই অবস্থায় সুদর্শনবাবুর কাছে একজন বিখ্যাত রত্নব্যবসায়ীর কার্ড!

—আবার বলছি। কার্ড সবাই পকেটে রাখে। সুদর্শনবাবু কার্ডটা তাঁর ব্যাগে ছবিটার সঙ্গে গুঁজে রেখেছিলেন। কেন ওখানে রেখেছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর তিনিই দিতে পারেন। বরং চলো! এগারোটা বাজে। আমরা এক চক্কর ঘুরে আসি।

—কোথায় যাবেন?

—আমি পোশাক বদলে আসি। তারপর বলব।

কর্নেলের তিনতলার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে নীচে নেমে আমার গাড়িতে উঠে বসলুম। কর্নেল যথারীতি আমার বাঁদিকে বসলেন। গেট পেরিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বললেন,—পার্ক স্ট্রিট হয়ে চৌরঙ্গি। তারপর সোজা দক্ষিণে।

রবিবার বলে রাস্তায় গাড়ির ভিড় ছিল না। চৌরঙ্গিতে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে বললুম,—সোজা দক্ষিণেই যাচ্ছি। কিন্তু পৌঁছুব কোথায়?

কর্নেল বললেন, —ভবানীপুরে।

—তাই বলুন। সুদর্শনবাবুর মাসতুতো ভাইয়ের বাড়ি!

—নাঃ! চলো তো! আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

হাজরা রোডের মোড় পেরিয়ে কর্নেলের নির্দেশে ডাইনে একটা রাস্তায় গাড়ি ঘোরালুম। তারপর বাঁদিকে আঁকাবাঁকা গলি রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে একটা চওড়া রাস্তার মোড়ে পৌঁছুনোর পর কর্নেল বললেন,—এসে গেছি। ডানদিকের ওই বড় বাড়িটা। গেটের সামনে হর্ন বাজাবে।

গেটে দারোয়ান ছিল। সে গেট খুলে দিল। নুড়িবিছানো পথের দুধারে দেশি-বিদেশি গাছপালা, আর মরশুমি ফুলের উজ্জ্বলতা। গাড়িবারান্দার তলায় পৌঁছুলে পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম। কর্নেল নামতেই তিনি নমস্কার করে সহাস্যে বললেন,—আমার সৌভাগ্য! অনেকদিন পরে আপনার দর্শন পেলুম।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—সৌভাগ্য আমারই। কারণ টেলিফোন যিনি ধরেছিলেন, তিনি বললেন, আপনি সাড়ে বারোটার মধ্যে বেরোবেন। তাই আমার তরুণ সাংবাদিক বন্ধু জয়ন্তের গাড়িতে এসে গেলুম।

আমি গাড়ি পার্ক করার জন্য একটু এগিয়ে যেতেই ভদ্রলোক বললেন, —আপনি গাড়ি থেকে নেমে আসুন। আমার লোক গাড়ি ঠিক জায়গায় রেখে আপনাকে চাবি ফেরত দেবে।

গাড়ি থেকে নেমে গেলুম। কর্নেল আলাপ করিয়ে দিলেন। —জয়ন্ত! ইনি কলকাতা কেন, সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ রত্নবিশারদ মিঃ অবনীমোহন চন্দ্র। চৌরঙ্গিতে এঁদের চন্দ্র জুয়েলার্স কোম্পানি প্রায় দুশো বছর ধরে ব্যবসা করছেন। তুমি শুনলে অবাক হবে, ব্রিটেনের রাজপরিবারে এঁর পূর্বপুরুষ প্রাচীন ভারতীয় ডিজাইনের অনেক অলঙ্কার সাপ্লাই করতেন।

ততক্ষণে আমি বুঝে গেছি, হঠাৎ কর্নেলের এখানে আসবার উদ্দেশ্যটা কী। পোশাক বদলাতে ঘরে ঢুকে কর্নেল টেলিফোন করেই এখানে এসেছেন। চার ধাপ সিঁড়ির উপর বারান্দায় উঠেছি, সেই সময় উর্দি পরা একটা লোক আমার গাড়ির চাবি দিয়ে গেল। আধুনিক রীতিতে সাজানো প্রশস্ত ঘরে মিঃ চন্দ্র আমাদের বসিয়ে কর্নেলের মুখোমুখি বসলেন। তিনি বললেন,—সাড়ে বারোটা নাগাদ আমার বেরুনোর কথা। যাই হোক, আপনার জন্য কফি করতে বলেছি। কফি খেতে-খেতে কথা হবে।

দেখলুম, পাশের ঘরের পর্দা তুলে একজন পরিচারক এগিয়ে এল। সে সেলাম ঠুকে সোফার সেন্টার টেবিলে একটা ট্রে রেখে গেল। আমার আর কফি পানের ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কফির পেয়ালা তুলে নিতেই হল। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে আস্তে বললেন,—আপনার কোম্পানির একটা কার্ড পেয়েছি। কোথায় পেয়েছি বা কী করে পেয়েছি, এখন তা বলতে চাইনে। সময়মতো নিশ্চয় তা আপনাকে জানাব।

মিঃ চন্দ্র যেন একটু অবাক হয়েছিলেন। বললেন,—আমাদের কোম্পানির কার্ড তো আমরা যাকে-তাকে দিই না। কেউ কোনো অলঙ্কার যত বেশি টাকারই কিনুন না কেন, তাঁকেও আমরা কার্ড দিই না। ক্যাশমেমোই যথেষ্ট। তবে বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে কার্ড দিতে হয়।

—কোন ক্ষেত্রে?

—ধরুন, কোথাও গিয়ে কোনো পয়সাওয়ালা লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল এবং তিনি তাঁর পরিবারে কারও বিয়ে উপলক্ষে বিশেষ অর্ডার দিয়ে অলঙ্কার কিনতে চান, তাঁকে কার্ড দিই, আবার কলকাতার কোনো ধনী পুরুষ বা মহিলা আমাদের দোকানে এলেন এবং তাঁদের টাকার দরকার আছে বলে দামি অলঙ্কার বিক্রি করতে চাইলেন, তাঁদের কার্ড দিতে হয়। তাঁরা তো সঙ্গে করে সেই অলঙ্কার নিয়ে যান না। কারণ আজকাল সঙ্গে দামি অলঙ্কার নিয়ে বেরুনোর রিস্ক আছে। তাঁরা কার্ড চেয়ে বলেন টেলিফোনে তাঁরা জানাবেন, কখন আমার কোম্পানির এক্সপার্টরা গিয়ে সেই অলঙ্কার পরীক্ষা করে দরদাম স্থির করবেন।

—বুঝলুম। এ ছাড়া আর কাউকে....

মিঃ চন্দ্র কর্নেলের কথার উপর একটু থেমে বললেন,—খুলেই বলি। গত বছর আমাদের দোকানে অতবড় একটা চুরির কিনারায় পুলিশ যখন হিমশিম খাচ্ছিল, তখন আপনার সাহায্য নিলুম। আপনি দুদিনেই পাঁচলক্ষ টাকার নেকলেস-সহ চোরকে ধরে দিয়েছিলেন। আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ কর্নেলসায়েব!

কর্নেল দ্রুত বললেন,—ও কথা থাক। কী খুলে বলতে চাইছিলেন, বলুন।

—নানা দেশের রত্নকারবারিদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। খাঁটি মুক্তো আমরা এজেন্ট মারফত কুয়েত, আবু ধাবি, কাতার এইসব আরব দেশ থেকে আমদানি করি। আপনার কাছে লুকোনোর কারণ নেই। কাস্টমসের চোখ এড়িয়ে গোপনে এই লেনদেন হয়। এজেন্টের কাছে আমাদের কার্ড থাকে। আবার হংকংয়ে আমাদের এজেন্ট আছে। হংকং সবরকমের রত্নের বাজার। হংকংয়ের এজেন্টের কাছে আমাদের কার্ড আছে।

—তা হলে আপনার কোম্পানির কার্ডের একটা গুরুত্ব আছে! সেই কার্ড যে-ভাবে হোক, আমার হাতে এসে গেছে। দেখাচ্ছি, তবে কার্ডটা আপনাকে দেব না। আগেই সেটা বলে রাখলুম।

বলে কর্নেল বুকপকেট থেকে সেই কার্ডটা বের করে মিঃ চন্দ্রের হাতে দিলেন। মিঃ চন্দ্র কার্ডটা দেখার পর বললেন,—কী আশ্চর্য! এই কার্ডটা আমাদের কোম্পানির কার্ড। এই যে দেখছেন, তলার দিকে ছোট্ট গোল রবার সিলের ছাপ, তার উপর আমার হাতে 'এ এম সি' সই করা আছে কালো কালিতে। এটা কোনোভাবে মোছা যাবে না। কারণ পেনের এই কালিটা বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি। কর্নেলসায়েব! এই কার্ড নিশ্চয় আমার কোম্পানির কোনো এজেন্টের কাছে ছিল। এতে একটা নাম্বার আছে, খালি চোখে তা দেখা যাবে না। হাতে সময় কম। তা না হলে নাম্বার পরীক্ষা করে রেজিস্টারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে এই এজেন্টের নাম-ঠিকানা বলে দিতুম।

—এজেন্টের কার্ড দৈবাৎ হারিয়ে গেলে তিনি নিশ্চয় আপনাকে জানাবেন?

মিঃ চন্দ্র জোর দিয়ে বললেন,—অবশ্যই জানাবেন। কিন্তু এখনও তো কেউ জানাননি! এটাই অবাক লাগছে।

—তিনি বা আপনি কার্ড হারানোর জন্য পুলিশকে নিশ্চয় জানাবেন। ডায়রি করবেন থানায়।

মিঃ চন্দ্র হঠাৎ একটু দমে গেলেন যেন। আস্তে বললেন,—না, তার অসুবিধে আছে। কারণ আপনি আশা করি অনুমান করতে পারছেন। রত্নব্যবসায়ীদের অনেক ঝক্কি আছে। অনেকসময় এজেন্ট জেনে বা না জেনে এমন জুয়েলস বিক্রেতার খবর দিল, যিনি আয়কর ফাঁকি দিতে চান

কিংবা জুয়েলস চোরাই মাল। তা ছাড়া, বিদেশ থেকে গোপনে রত্ন আমদানির কথাও আপনাকে বলেছি। কাস্টমস বা রেভেনিউ ইনটেলিজেন্সের গোয়েন্দাদের সূত্রে পুলিশ ওই এজেন্টের খবর পেলে বিপদের ঝুঁকি আছে।

কর্নেল তাঁর হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে বললেন,—সব বুঝলুম। আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি উঠি। শুধু একটা অনুরোধ। কোন এজেন্টের কার্ড কোথায় কীভাবে হারিয়েছে, সেই খবর আপনি নিশ্চয় পাবেন। পাওয়ার পর আমাকে তা জানাবেন। আমি কথা দিচ্ছি, এতে আপনাদের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেই দায়িত্ব আমার। চলি মিঃ চন্দ্র। নমস্কার।....

কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে স্নানাহারের পর ড্রয়িংরুমের ডিভানে গড়িয়ে পড়েছিলুম। ভাত-ঘুমের অভ্যাস। কর্নেল যথারীতি ইজিচেয়ারে বসে চুরুট টানছিলেন।

আমার চোখে ভাসছিল, আমরা চলে আসবার সময় অবনীমোহন চন্দ্রের গম্ভীর ও উদ্বিগ্ন মুখ। এটা স্পষ্ট, তাঁর এজেন্টরা আসলে কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবেই কাজ করেন। অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে রিপ্রেজেন্টেটিভ। কিন্তু বিদেশি অনেক কোম্পানির মতো চন্দ্র জুয়েলার্স এজেন্ট শব্দটাই ব্যবহার করেন। তা ছাড়া, তাঁরা চোরাই জুয়েলারিও কেনেন। কনকপুরে রায়বাড়ির গৃহদেবী মহালক্ষ্মীর রত্নখচিত সোনার মুকুট আর জড়োয়া নেকলেস যে-ই চুরি করুক, সুদর্শনবাবুর সঙ্গে চন্দ্র জুয়েলার্সের কোনো এজেন্ট গোপনে যোগাযোগ করেছে, নাকি সুদর্শনবাবু নিজেই সবার অগোচরে চন্দ্র জুয়েলারি কোম্পানির এজেন্ট? অমন ধোপদুরস্ত পোশাক-আশাক আর চেহারা দেখে মনে হয় না তিনি জমিজমা সম্পত্তির দেখাশোনা করেন! চাষবাস-পুকুর-বাগান নিয়ে যাঁরা থাকেন, তাঁদের চেহারায় রুক্ষ ছাপ পড়তে বাধ্য।

উত্তেজনায় আমার ভাত-ঘুমের রেশ ছিঁড়ে গেল। কথাটা কর্নেলকে বলার জন্য উঠে বসলুম। সেই সময় টেলিফোন বাজল।

কর্নেল হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন। ...হ্যাঁ। বলছি।... বলুন মিঃ চন্দ্র! ...এক মিনিট! আমি লিখে নিচ্ছি। কর্নেল টেবিল থেকে ছোট্ট প্যাড আর ডটপেন নিয়ে বললেন—বলুন। কে. কে. সেন! পুরো নাম বললে ভালো হয়। কাঞ্চনকুমার সেন। ঠিকানা? মানে ওঁর বাড়ির ঠিকানা...ঠিক আছে। এখন আপনি কোথায় আছেন?... মিঃ সেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন কীভাবে?... বুঝেছি। ব্যবসার স্বার্থে এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা করে রাখতেই হয়। ...হ্যাঁ। আমি আছি। মিঃ সেনকে আমার কাছে পাঠাতে পারেন। তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে চাই। ...না, না। আপনার আসবার দরকার হবে না। আপনি একটা চিঠি লিখে দেবেন ওঁকে। আপনার হাতের লেখা চিনতে অসুবিধে হবে না। ...ঠিক আছে। রাখছি।

কর্নেল রিসিভার রেখে আমার দিকে ঘুরলেন। মুখে মিটিমিটি হাসি। উঠে গিয়ে তাঁর কাছাকাছি সোফায় বসলুম। বললুম,—সব বুঝে গেছি। এখন শুধু কাঞ্চনকুমার সেন নামে চন্দ্র জুয়েলার্সের এজেন্টের প্রতীক্ষা। তবে শুধু একটা প্রশ্ন। এই ভদ্রলোকের ঠিকানা কী?

কর্নেল প্যাডটা দিলেন। দেখলুম, লেখা আছে ১৩-বি, রামপদ শেঠ লেন, কলকাতা ৭। বললুম,—কলকাতা ৭ কোন এলাকা?

—বড়বাজার। বলে কর্নেল হাত বাড়িয়ে টেবিলের কোনায় রাখা টেলিফোন গাইডের উপর থেকে একটা আকার ছোট কিন্তু মোটাসোটা বই টেনে নিলেন। লক্ষ করলুম, বইটার নাম কলকাতার পথ নির্দেশিকা। কর্নেল পাতা উল্টে খুঁজে দেখার পর বললেন,—গলিটা আপার চিৎপুর রোড থেকে শুরু হয়েছে। এটা অনেক পুরোনো স্ট্রিট গাইড। তা হোক। রামপদ শেঠ লেন খুঁজে বের করার অসুবিধে নেই। আপার চিৎপুর রোডে ঢুকলেই পেয়ে যাব।

অবাক হয়ে বললুম,—কাঞ্চনবাবু তো আসছেন। তাঁর বাড়ি খুঁজতে যাওয়ার কথা বলছেন কেন?

কর্নেল গাইড বুকটা যথাস্থানে রেখে আস্তে বললেন,—দরকার হতেও পারে।

এই সময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল অভ্যাসমতো হাঁক দিলেন,—ষষ্ঠী!

একটু পরে যিনি সবেগে ঘরে ঢুকলেন, তিনি কাঞ্চন সেন নন। আমাদের হালদারমশাই। তিনি সোফায় বসে বললেন,—সুদর্শনবাবুকে ফলো করছিলাম। উনি ট্যাক্সি ধরছিলেন। আমিও একখান ট্যাক্সি ধরলাম। উনি কইছিলেন শেয়ালদা স্টেশনে ট্রেন ধরবেন। কিন্তু উনি চললেন উল্টাদিকে। এক্কেরে ভবানীপুরে। বাড়িটার নাম...

কর্নেল বললেন,—মাতৃধাম?

অবাক হয়ে গোয়েন্দাপ্রবর বললেন,—আপনি জানলেন ক্যামনে?

কর্নেল হাসলেন। ওটা ওঁর মাসতুতো ভাই ঝন্টু অর্থাৎ আমার বন্ধু জয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরির বাড়ি। বোঝা যাচ্ছে, আমার এখান থেকে বেরিয়ে সুদর্শনবাবু শেষপর্যন্ত আমার কথা মেনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তো আপনি এখন সম্ভবত শেয়ালদা স্টেশন থেকে আসছেন?

হালদারমশাই শ্বাস ছেড়ে বললেন, —হুঁঃ!

—আপনার খাওয়াদাওয়া?

—স্টেশনের কাছে একটা হোটেলে খাইয়া লইলাম।

আবার ডোরবেল বাজল। কর্নেল ষষ্ঠীর উদ্দেশে হাঁক দেওয়ার পর আস্তে বললেন, —হালদারমশাই! সম্ভবত এমন কেউ আসছেন, যাঁর সঙ্গে শুধু আমিই কথা বলব। আপনারা দুজনে বরং ডিভানে বসে পত্র-পত্রিকা পড়ার ভান করুন।

হালদারমশাই ও আমি ডিভানে গিয়ে বসলুম। হালদারমশাই দেওয়ালে হেলান দিয়ে খবরের কাগজ খুলে পা ছড়িয়ে বসলেন। আমি একটা রঙিন পত্রিকা খুলে বসলুম। তারপর দেখলুম, একজন রোগাটে গড়নের টাই-স্যুট পরা ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। তার বাঁ-হাতে ব্রিফকেস। তিনি নমস্কার করে বললেন,—আমি কে. কে. সেন। মিঃ এ. এম. চন্দ্রের কাছ থেকে আসছি। এই তাঁর চিঠি।

কর্নেল চিঠিটা পড়ে দেখে বললেন,—দাঁড়িয়ে কেন? বসুন মিঃ সেন!

ইনিই তাহলে সেই 'এজেন্ট'। সোফায় বসে তিনি মৃদুস্বরে বললেন,—গত শুক্রবার আমাকে একটা কাজে বাইরে যেতে হয়েছিল। যে ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলুম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর বাড়িতেই আমার কার্ডটা কীভাবে দৈবাৎ পড়ে গিয়েছিল। পরদিন অর্থাৎ গতকাল শনিবার ফিরে গিয়ে তাঁকে ব্যাপারটা জানালুম। তিনি তন্নতন্ন খুঁজলেন। বাড়ির সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু কার্ডের খোঁজ মিলল না। সেই কার্ড আপনার হাতে কীভাবে এল?

কর্নেল বললেন,—যেভাবেই আসুক, আপনার কার্ড আপনি ফেরত পাবেন। কিন্তু আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন।

—বলুন!

—এই ধরনের সাধারণ কার্ডের বদলে কোম্পানি আপনাদের আইডেন্টিটি কার্ড দেয় না কেন?

—অসুবিধে আছে। কী ধরনের অসুবিধে, তা আপনি মিঃ চন্দ্রের কাছে জেনে নিতে পারেন। এজেন্টদের অনেকসময় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়।

—মিঃ চন্দ্রের কাছে জানবার দরকার মনে করছি না। তবে আমার ধারণা, চোরাই জুয়েলারি বেচা-কেনার ক্ষেত্রে এজেন্টদের ব্যক্তিগত পরিচয় গোপন রাখা উচিত। দৈবাৎ পুলিশ এজেন্টের আইডেন্টিটি কার্ড পেয়ে গেলেই বিপদ। তাতে এজেন্টের ছবি থাকে। কাজেই এই কার্ড নিরাপদ।

—ঠিক বলেছেন স্যার।

—এবার আমি জানতে চাই, আপনি শুক্রবার কোথায় গিয়েছিলেন এবং কার কাছে গিয়েছিলেন! মুখে বলার দরকার নেই। আপনি লিখে দিন। মিঃ চন্দ্রের খাতিরে একথা আমি গোপন রাখব।

কাঞ্চন সেনের মুখে উদ্বেগ ও অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল। বললেন, —কোম্পানির স্বার্থে এসব কথা আমাদের গোপন রাখতে হয়। প্লিজ স্যার, কার্ড ফিরে না পেলে আমাকে মিঃ চন্দ্র কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবেন। এ বাজারে এমন বেশি মাইনের চাকরি—তা ছাড়া, কমিশনেরও ব্যবস্থা আছে, এটা চলে গেলে বিপদে পড়ব।

আপনি কেন বা কী কাজে সেই ভদ্রলোকের কাছে গিয়েছিলেন, আমি তা জানতে চাইছি না। আপনাকে তো কথা দিচ্ছি, মিঃ চন্দ্র আমার খুব চেনাজানা মানুষ—তাঁর খাতিরে আমি ওকথা গোপন রাখব। হ্যাঁ—আগে আপনাকে কার্ডটা দেখাই। —বলে কর্নেল বুকপকেট থেকে কার্ডটা বের করে দেখালেন।

কাঞ্চন সেন একটু ইতস্তত করে বললেন,—কার্ডটা আপনি কি কোথাও কুড়িয়ে পেয়েছেন স্যার?

—হ্যাঁ। কুড়িয়ে পেয়েছি।

—কোথায় বলুন তো স্যার?

—যদি বলি, আপনি যেখানে পাদুটো রেকেছেন, সেখানে?

কাঞ্চন সেন নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে বললেন,—এটা স্যার অসম্ভব ব্যাপার।

—কেন অসম্ভব? ধরুন, শুক্রবার আপনি যে ভদ্রলোকের কাছে গিয়েছিলেন, তিনি কোনো কারণে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন এবং দৈবাৎ পকেট থেকে কিছু বের করতে গিয়ে কার্ডটা পড়ে গিয়েছিল। তিনি চলে যাওয়ার পর আমি ওটা দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে রেখেছি। তারপর মিঃ চন্দ্রের কাছে গিয়েছি।

কাঞ্চন সেন এবার চাপাস্বরে বললেন,—অসম্ভব ব্যাপার স্যার। জোর দিয়ে বলছি, এটা অসম্ভব। আমাকে যিনি গোপনে খবর দিয়ে যেতে বলেছিলেন, আপনার কাছে তাঁর আসবার কথা নয়। মিঃ চন্দ্রের কাছে আপনার পরিচয় পেয়েছি স্যার!

—ঠিক আছে। আপনি সেই ভদ্রলোকের নাম-ঠিকানা এই কাগজে লিখে দিন। আপনার টেলিফোন নাম্বারও লিখবেন। আমি আজ রাত্রের মধ্যে আপনার কথার সত্যতা আমার বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে কোনো কৌশলে যাচাই করে নেব। আপনার কথা সত্য হলে আপনি কার্ড পাবেন। আমি আপনার টেলিফোনে আপনাকে খবর দেব।

কাঞ্চন সেন ঠোঁট কামড়ে ধরে কিছু ভেবে নিলেন। তারপর কর্নেলের দেওয়া কাগজে কিছু লিখে কর্নেলকে দিলেন। তারপর করুণ মুখে ভাঙা গলায় বললেন,—স্যার! দয়া করে শুধু একটা কথা মনে রাখবেন। আমার প্রাণ এখন আপনার হাতে।

কথাটা বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল কাগজটা ভাঁজ করে বুকপকেটে ঢোকালেন। তারপর হালদারমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে বললেন—আপনার কথা ঠিক হালদারমশাই! হেভি মিস্ট্রি।

কাঞ্চন সেন চলে যাওয়ার পর আমি ও হালদারমশাই কর্নেলের কাছে সেই নাম-ঠিকানা জানতে চেয়েছিলুম। কিন্তু কর্নেল গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, —ভদ্রলোককে কথা দিয়েছি এটা গোপন থাকবে। কাজেই এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন নয়।

হালদারমশাই বলেছিলেন—আপনিও কইলেন হেভি মিস্ট্রি। তা হইলে এবার আমি কী করুম কন কর্নেলস্যার!

এ কথা শুনে কর্নেলের গাম্ভীর্য চিড় খেয়েছিল। সহাস্যে বলেছিলেন,—আমার মতো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ঠিক হবে না হালদারমশাই! অবশ্য বনের মোষ তাড়াতে গিয়ে দুর্লভ প্রজাতির পাখি, প্রজাপতি বা অর্কিডের খোঁজ পেলে আমার বরং লাভই হয়। তো আপনার সাহায্য নিশ্চয় আমার দরকার। এক মিনিট।

বলে তিনি টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করেছিলেন। তারপর সাড়া পেয়ে বলেছিলেন—মিঃ রায়চৌধুরি? কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি। ...হ্যাঁ। সুদর্শনবাবু এসেছিলেন। ফেরার সময় আপনার সঙ্গে দেখা করেও গেছেন। ...না। উনি আমাকে বলেননি। তবে আমার হাতে সে-খবরও আছে। বলে কর্নেল হেসে উঠলেন। তারপর বললেন,—যথাসময়ে বলব। এখন একটা জরুরি কাজের কথা বলতে চাই। আপনি তো বুঝতেই পারছেন, আমার বয়স থেমে নেই। এই বৃদ্ধ বয়সে আগের মতো একা কোনো কাজে নামতে ভরসা পাই না। আমাকে সাহায্য করেন একজন ধুরন্ধর ডিটেকটিভ। তিনি প্রাক্তন পুলিশ অফিসার। রিটায়ার করার পর প্রাইভেট ডিটেকটিভ। এজেন্সি খুলেছেন। তাঁর নাম মিঃ কে. কে. হালদার। ...তা হলে সুদর্শনবাবু তাঁর কথা আপনাকে বলেছেন? এবার শুনুন। সুদর্শনবাবুকে তখনই যে-কথা বলা দরকার ছিল, বলিনি। কিন্তু ইতিমধ্যে কিছু তথ্য আমার হাতে এসে গেছে। তাতে মনে হচ্ছে, কেসটা জটিল। ...বললুম তো! যথাসময়ে জানতে পারবেন। আপনাকে আমি একটা অনুরোধ করছি। সুদর্শনবাবুকে ট্রাঙ্ককলে জানিয়ে দিন, কাল সোমবার যে-কোনো সময়ে মিঃ হালদার তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। মিঃ হালদারের ডিটেকটিভ এজেন্সির কনট্র্যাক্ট ফর্মে তাঁকে একটা সই করতে হবে। এই ফর্মালিটিজ উভয়ের স্বার্থেই মেনে চলা দরকার। তবে চুক্তিপত্রে সইয়ের ব্যাপারটা গোপনে হওয়া উচিত। ঘুণাক্ষরে কেউ যেন টের না পায়। চুক্তিপত্রে সই করলে সুদর্শনবাবু হবেন মিঃ হালদারের ক্লায়েন্ট। ...হ্যাঁ, টাকার প্রশ্ন আছে। তবে টাকার অঙ্ক যাই হোক, সুদর্শনবাবু যেন সই করতে দ্বিধা না করেন। তবে নেহাৎ অ্যাডভান্স হিসেবে আপাতত একশো টাকা না দিলে মিঃ হালদারের অসুবিধে হবে।...হ্যাঁ। তা হলে আপনি বরং একটা চিঠি লিখে দেবেন মিঃ হালদারকে। এখনই আপনার কাছে মিঃ হালদারকে পাঠাচ্ছি। তবে আপনি ট্রাঙ্ককলে সুদর্শনবাবুকে শুধু জানিয়ে রাখবেন, তাঁর পরিচিত এক ভদ্রলোক আমার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে যাবেন। ব্যস!... ধন্যবাদ মিঃ রায়চৌধুরি। মিঃ হালদার তাঁর সরকারি আইডেন্টিটি কার্ড নিয়েই আপনার কাছে যাচ্ছেন। ...ঠিক আছে। রাখছি।...

ইতিমধ্যে ষষ্ঠীচরণ কফি এনেছিল। কফি পানের পর হালদারমশাই যথেষ্ট চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলেন। কর্নেল বলেছিলেন,—মিঃ জয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরির বাড়ি আপনি ভবানীপুরে দেখে এসেছেন।

হঃ। দেখছি। —বলে গোয়েন্দাপ্রবর সবেগে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন।

কর্নেল বলেছিলেন,—একটা কথা হালদারমশাই!

—কন কর্নেলস্যার!

—আপনার আর আমার কাছে আসবার দরকার নেই। মিঃ রায়চৌধুরির সঙ্গে দেখা করার পর বাড়ি ফিরে আমাকে টেলিফোনে শুধু জানিয়ে দেবেন, কনকপুরে কাল কোন ট্রেনে যাচ্ছেন। কীভাবে যেতে হবে, তা মিঃ রায়চৌধুরির কাছে জানতে পারবেন। কনকপুরে হোটেল থাকা সম্ভব। না থাকলে সুদর্শনবাবুর বন্ধু হিসেবে রায়বাড়িতে থাকতে পারবেন। আমরা দুজনে উঠব সেচদফতরের বাংলোতে। দরকার হলে গোপনে সেখানে যোগাযোগ করবেন। কিন্তু সাবধান

হালদারমশাই! কনকপুরে আমরা আপনার অপরিচিত। এই কথাটা সবসময় মনে রাখবেন। বুঝলেন তো?

—বুঝেছি কর্নেলস্যার!

বলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ পর্দা ফুঁড়ে উধাও হয়ে গেলেন।

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ হালদারমশাইয়ের ফোন এল। জয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরি তাঁকে সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটের ট্রেনে কনকপুর যেতে পরামর্শ দিয়েছেন। কনকপুর স্টেশন থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে। সাইকেলরিকশা, বাস, অটো সবই পাওয়া যায়।

কর্নেল সেচদফতরের এক কর্তাব্যক্তির বাড়িতে টেলিফোন করে কনকপুর ইরিগেশন বাংলোয় থাকার ব্যবস্থা করে নিলেন।

পাঁচটায় দ্বিতীয় দফার কফি দিয়ে গেল ষষ্ঠীচরণ। তখন আলো জ্বলে উঠেছে। শীত না পড়লেও ততক্ষণে সন্ধ্যার আমেজ এসে গেছে। কফি খেতে-খেতে বললুম,—আচ্ছা কর্নেল, আপনি কাঞ্চন সেনের কথার সত্যতা যাচাই করবেন বলছিলেন। কীভাবে করবেন?

কর্নেল হাসলেন। —করব না।

—সে কী! তা হলে ভদ্রলোককে কার্ডটা তখনই ফেরত দিলেই পারতেন।

—জয়ন্ত! কাঞ্চন সেন আমাকে মিথ্যা ঠিকানা দিলে আমার শর্ত শোনার পর দ্বিধায় পড়ে যেতেন। ওঁর মুখে কোনো দ্বিধার চিহ্ন দেখতে পাইনি। তা ছাড়া, উনি ওঁর মালিকের কাছে আমার পরিচয় পেয়েছেন। আমার সঙ্গে ছলচাতুরির সাহস ওঁর নেই।

—কী আশ্চর্য! তা হলে কার্ডটা...

আমাকে থামিয়ে দিয়ে কর্নেল বললেন,—তবু আমি রিস্ক নিতে চাইনি। যেন সত্যিই আমি ওঁর দেওয়া নাম-ঠিকানার সত্যতা যাচাই করব, এ জন্য আমার সময় দরকার—এই কৌশলটুকু এক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেই হয়েছে।

একটু ইতস্তত করে বললুম—কাঞ্চন সেন সুদর্শনবাবুর নাম-ঠিকানা দেননি এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন,—তোমার নিশ্চিত হওয়ার কারণ?

—কার্ড রাখার কথা পকেটে। ব্যাগের ভিতরে কেউ কার্ড রাখে না।

—কিন্তু সুদর্শনবাবুর ব্যাগ থেকেই কার্ডটা নীচে পড়েছিল।

—কনকপুর গিয়ে সুদর্শনবাবুকে জিজ্ঞেস করা উচিত।

—চেপে যাও জয়ন্ত! এর পর সুদর্শনবাবুর সঙ্গে দেখা হলে যেন কখনও কার্ডের কথা তুলবে না।

—হালদারমশাইকে নিষেধ করেননি। কিন্তু উনি যদি জিগ্যেস করেন?

—হঠকারী হলেও হালদারমশাই বুদ্ধিমান। বিচক্ষণ পুলিশ অফিসার ছিলেন। তুমি ওঁকে নিয়ে যতই কৌতুক করো, নিজের কাজে উনি যথেষ্ট সিরিয়াস।

বলে কর্নেল ড্রয়ার থেকে প্রজাপতির রঙিন ছবির খাম বের করলেন। সকালে এই ছবিগুলো আমাদের তিনি দেখাচ্ছিলেন। বক্তৃতা শোনার ভয়ে আমি সটান বাথরুমে গেলুম। তারপর ফিরে আসার সময় একটা বুকশেলফের উপর অগোছালো অবস্থায় পড়ে থাকা কয়েকটা বই খুঁজে অবিশ্বাস্যভাবে একটা মলাটছেঁড়া ইংরেজি গোয়েন্দা উপন্যাস পেয়ে গেলুম।

কিন্তু কর্নেল নিজের কাজে ব্যস্ত। একেকটা ছবি টেবিলল্যাম্পের আলোয় রেখে আতশকাচ দিয়ে কী দেখে-টেখে একটা প্যাড়ে কী সব লিখে চলেছেন। বুঝলুম, এর পর সময়মতো একটা প্রবন্ধ লিখে ছবিগুলো সঙ্গে দিয়ে কোনো বিদেশি পত্রিকায় পাঠাবেন। শুনেছি, তাঁর এসব প্রবন্ধের বাজারদর কমপক্ষে একশো মার্কিন ডলার।

রাত নটার মধ্যে তাঁর কাজ শেষ হল। তারপর ছবি ও কাগজপত্র গুছিয়ে ড্রয়ারে ভরার পর তিনি চুরুট ধরালেন। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুরুট টানার পর হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন এবং টেলিফোনটা কাছে টেনে আনলেন। বুকপকেট থেকে ভাঁজকরা একটা কাগজ খুলে দেখে রিসিভার তুলে কর্নেল ডায়াল করতে থাকলেন।

বুঝলুম, এনগেজড টোন। কর্নেল কয়েকবার ডায়াল করার পর বিরক্ত হয়ে রিসিভার রেখে দিলেন। বললুম,—সম্ভবত কাঞ্চন সেনকে ফোনে পাচ্ছেন না।

কর্নেল ঘুরে আমার দিকে তাকালেন। তুম্বো মুখে বললেন,—আমার হাতে ব্যথা ধরে গেছে জয়ন্ত! এখানে এসো। এই নাম্বারটা ধরে দাও।

তাঁর কাছাকাছি সোফায় বসে তাঁর নির্দেশমতো একটা নাম্বার ডায়াল করলুম। এনগেজড। মিনিট তিনেক পরে আবার ডায়াল করলুম। এনগেজড। তৃতীয়বার চেষ্টার পর বললুম—টেলিফোনটা খারাপ।

কর্নেল এবার নিজে রিসিভার তুলে একটা নাম্বার ডায়াল করলেন। সাড়া এলে বললেন,—মিঃ এ. এম. চন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ...আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি। ...মিঃ চন্দ্র! আপনার কোম্পানির এজেন্ট কাঞ্চন সেন...ও মাই গড! বলেন কী? কখন?...জাস্ট আ মিনিট মিঃ চন্দ্র! পুলিশকে কি আপনি তাঁর কার্ড সম্পর্কে কিছু বলেছেন?...আপনি বুদ্ধিমান। ...ও. কে.! ও. কে.! আমি দেখছি।...হ্যাঁ। আমি ওঁর বাড়িতে এখনই যাচ্ছি। ...হ্যাঁ। পুলিশকে জানিয়েই যাচ্ছি।... আপনি ভাববেন না। কার্ড আপনি যথাসময়ে ফেরত পাবেন। রাখছি।

হতবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলুম। বললুম,—কাঞ্চন সেনের কী হয়েছে?

কর্নেল ডায়াল করতে-করতে বললেন,—কাঞ্চনবাবুকে কেউ তাঁর ঘরে গুলি করে মেরেছে।

তারপর তিনি টেলিফোনে সাড়া পেয়ে বললেন,—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি! ও. সি. হোমিসাইড মিঃ সান্যালের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ... বেরিয়েছেন? ঠিক আছে।

টেলিফোন ছেড়ে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—জয়ন্ত! রেডি হয়ে নাও। কুইক! আমি পোশাক বদলে নিয়ে আসছি।

কিছুক্ষণ পরে আমরা নীচে গেলুম। তারপর গাড়িতে চেপে বললুম,—কনকপুরের রায়বাড়ির অদ্ভুত কেসে হাত দিতে না দিতেই একটা বডি পড়ে গেল!

কর্নেল আমার কথা কানে নিলেন বলে মনে হল না। বললেন,—পার্ক স্ট্রিট হয়ে ডাইনে ঘুরে গিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ হয়ে চলো। তারপর হ্যারিসন রোড—সরি, পুরোনো নামটা মাথায় গেঁথে আছে—

—বুঝেছি। মহাত্মা গান্ধী রোডে পৌঁছে চিৎপুরের দিকে এগোব। তবে ওই এলাকায় রবিবারে বলে কিছু নেই। জ্যামে পড়তেই হবে।

কর্নেল কোনো কথা বললেন না। আপার চিৎপুর রোড এখন রবীন্দ্র সরণি। কর্নেল নাম্বার লক্ষ করছিলেন। সংকীর্ণ রাস্তায় ট্রাম বাস ট্রাক ঠেলাগাড়ি রিকশার ভিড়। কর্নেল রাস্তায় একটা লোককে রামপদ শেঠ লেনের কথা জিজ্ঞেস করলে সে সামনের দিকে তর্জনী তুলল। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে গলিটার মোড়ে পৌঁছলুম। গলির ভিতরে ল্যাম্পপোস্টের টিমটিমে আলো। কিন্তু পুলিশ লাঠি

উঁচিয়ে প্রাণপণে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করছে। আমার গাড়িতে 'প্রেস' স্টিকার লাগানো দেখে একজন কনস্টেবল বাঁ-দিকের এক চিলতে ফুটপাতের উপর গাড়ি দাঁড় করাতে বলল। বাঁ-দিকে দুটো চাকা সেই ফুটপাতে ওঠালুম। কর্নেল নেমে গিয়ে বললেন,—গাড়ি লক করে এসো! একজন চেনা পুলিশ অফিসারকে দেখতে পাচ্ছি।

পুলিশের একটা বেতার ভ্যান আর দুটো জিপ ডানদিকে একটা ছ'তলা বাড়ির সামনে দাঁড় করানো ছিল। কর্নেলকে দেখে সেই পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে নমস্কার করলেন। তারপর একটু হেসে বললেন,—স্যার! আপনি এখানে?

—প্রণব! তোমাদের বড়বাবু আর লালবাজারের ও. সি. হোমিসাইড কোথায়?

—ওঁরা একটু আগে চলে গেছেন স্যার!

—ভিকটিমের বডি?

—আধঘণ্টা আগে মর্গে পাঠানো হয়েছে।

—আমি ভিকটিমের ফ্ল্যাটটা দেখতে চাই। লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের কেউ আসেননি?

প্রণববাবু কথা বলতে-বলতে সিঁড়িতে উঠছিলেন। বললেন,—ডি. ডি. থেকে এস. আই. নরেশবাবু আর দুজন অফিসার এসেছেন। ভিকটিম বিখ্যাত জুয়েলারি কোম্পানির কর্মচারী। কাজেই কর্নেলসায়েবের আবির্ভাবে আমি অবাক হইনি। নরেশবাবুরাও হবেন না!

বললুম—ছ'তলা বাড়ি। লিফট নেই?

—প্রাচীন আমলের বাড়ি। তবে ভিকটিম ভদ্রলোক থাকতেন তিনতলার একটা ঘরে। ফ্ল্যাটবাড়ি বলা যায় না। তবে অ্যাটাচড বাথরুম আছে।

তিনতলার টানা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যেতেই নরেশ ধরকে দেখতে পেলুম। তিনি কর্নেলকে দেখে বললেন,—হুঁ, যা ভেবেছিলুম। চন্দ্রসায়েবের একটা কেসে স্বনামধন্য কর্নেলসায়েব লড়েছিলেন। অতএব এই কেসে তাঁকে দেখতে পাব, এটা স্বাভাবিক।

কর্নেল হাসলেন। —আশা করি অরিজিতের কানেও খবরটা মিঃ চন্দ্র তুলেছেন?

—ডি. সি. ডি. ডি. সায়েবের তাড়া খেয়েই আমাদের ছুটে আসতে হয়েছে। উনি আপনাকেও নিশ্চয় একটু উঁকি মারতে বলেছেন?

—না নরেশবাবু। অরিজিৎ লাহিড়ি এই বৃদ্ধের দাড়ি ধরে টানেননি। যাকগে। চলুন। ঘরটা একটু দেখে নিই।

নরেশবাবুর পিছনে কর্নেল ও আমি মোটামুটি চওড়া ঘুরে ঢুকলুম। দুজন অফিসার ঘরের ভিতর কিছু করছিলেন। আমাদের দেখে তাঁরা ভুরু কুঁচকে তাকালেন। নরেশবাবু বললেন—ওহে আলম! এঁকে চিনতে পারছ কি?

একজন অফিসার কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন—আমার সৌভাগ্য! কর্নেলসায়েবের সঙ্গে আলাপের সুযোগ পেলুম।

অন্যজন নমস্কার করে বললেন,—কর্নেলসায়েব আমাকে হয়তো চিনতে পারবেন। আমি মানিক দত্ত। এন্টালি থানায় ছিলুম।

কর্নেল ঘরের ভিতর চোখ বুলিয়ে বললেন,—কাঞ্চনবাবু একা থাকতেন?

নরেশবাবু বললেন,—হ্যাঁ। কথায় বলে, একা না বোকা!

কর্নেল ডানদিকে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন,—মার্ডার এখানেই হয়েছে। নরেশবাবু! বডি কী অবস্থায় ছিল?

—বাথরুমের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন ভদ্রলোক। পা-দুটো বাথরুমের দরজার বাইরে। মাথার পিছনে প্রায় পয়েন্টব্ল্যাংক রেঞ্জে গুলি করেছে খুনি।

—পাশের ঘরের কেউ গুলির শব্দ শোনেনি?

—পাশের দুটো ঘরে দুজন করে চারজন থাকেন। ও দুটো ঘরকে মেস বলা যায়। চারজনই বাঙালি। হুগলি, হাওড়া, বর্ধমানে বাড়ি। বিভিন্ন দোকানের কর্মচারী ওঁরা। শনিবার বিকেলে বাড়ি চলে যান। ফেরেন সোমবার সকালে। তার ওপাশে সিঁড়ি। তারপর চারটে ঘরে এক মারোয়াড়ি ফ্যামিলি থাকেন। কাঞ্চনবাবুর ঘরে সকাল-সন্ধ্যা লোকজন আসতে দেখেছেন ওঁরা। আর গুলির শব্দ শুনতে পাওয়া এই এলাকায় আজ রোববারেও সম্ভব নয়, তা নিজেই বুঝে নিন। মোটরসাইকেলের শব্দ তো সব সময়। তার ওপর নীচের তলায় একটা লোহালক্কড়ের দোকান। রোববারেও লোহার পাত কাটার শব্দ শুনছিলুম। বিরক্ত হয়ে বন্ধ করতে বলেছি।

কর্নেল কোণের দিকে খাটের পাশে টেবিলে একজন মহিলার ছবি দেখে বললেন, —কাঞ্চনবাবুর স্ত্রী সম্ভবত।

নরেশবাবু বললেন,—হ্যাঁ, সম্ভবত। কাঞ্চনবাবুর দেশের বাড়ির ঠিকানায় খোঁজ নিলে জানা যাবে।

—দেশের বাড়ির ঠিকানা পেয়েছেন তা হলে?

—একটা চিঠি থেকে পাওয়া গেছে। কাঞ্চনবাবুর দাদা প্রাণকান্তবাবুর চিঠি। ভাইকে পুজোর সময় বাড়ি যেতে লিখেছেন। টাকাকড়িও চেয়েছেন।

—ঠিকানাটা দিতে আপত্তি আছে?

নরেশবাবু হাসলেন। —কক্ষনও না। ডি. সি. ডি. ডি. সায়েব শুনলে আমার চাকরি যাবে। লিখে নেবেন কি?

কর্নেল পকেট থেকে খুদে নোটবই আর ডটপেন বের করলেন। —বলুন।

—গ্রাম রানিপুর, পোস্ট অফিস কনকপুর, জেলা নদিয়া।

কনকপুর শুনে আমি চমকে উঠেছিলুম। কর্নেল নির্বিকারমুখে নাম-ঠিকানা লিখে বললেন, —ছোট একটা সোফাসেট আছে দেখছি। সেন্টার টেবিলে দুটো চায়ের কাপ। চা শেষ করে কাঞ্চনবাবু বাথরুমে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁর গেস্ট তাঁকে গুলি করেছে। তো ডেডবডি প্রথম কে দেখেছিল?

নরেশবাবু বললেন,—মারোয়াড়ি ফ্যামিলির একটা বাচ্চা ওদের বারান্দায় খেলনা ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে খেলছিল। তার দিদি সিঁড়ির মাথা থেকে বল ছুড়ছিল। তারপর বলটা এই ঘরের বারান্দায় এসে পড়েছিল। কিন্তু এখানে বারান্দায় তখন আলো ছিল না। তাই ওরা এখানে আসতে ভয় পাচ্ছিল। তখন মেয়েটির দাদা মোহনলাল বল কুড়োতে আসে। দরজা অর্ধেক খোলা। অথচ ভিতরে অন্ধকার। তার সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।

কর্নেল টেলিফোন দেখিয়ে বললেন,—ওটা কি ডেড?

নরেশবাবু টেবিলের পিছন থেকে ছেঁড়া তার তুলে দেখলেন। —খুব হুঁশিয়ার খুনি। ঘরের আলোও নিভিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু দরজার কপাট পুরো লাগানোর হয়তো সময় পায়নি।

কর্নেল সোফার কাছে হাঁটু মুড়ে বসে টর্চ জ্বাললেন। তারপর আতশকাচ দিয়ে কিছুক্ষণ কী সব পরীক্ষা করলেন, তিনিই জানেন। নরেশবাবু মুচকি হেসে বললেন,—ফরেন্সিক এক্সপার্টদের জন্য অপেক্ষা করছি। দেখা যাক, তার আগে কর্নেলসায়েবের শ্যেনচক্ষুতে খুনির কোনো ক্লু মেলে কি না।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—ধনবান রত্নব্যবসায়ীর কর্মচারী। কাজেই ফরেন্সিক এক্সপার্টরা আসবেন বইকি। আমি নিছক হাতুড়ে এসব ব্যাপারে।

—হাতের তাস আপনি দেখাবেন না। তা জানি!

কর্নেল হাসলেন। —দেখলুম, লোকটার কাপ থেকে একটুখানি চা পড়ে গিয়েছিল। খুব গরম চা ফুঁ দিয়ে খেতে গেলে এমনটা হতেই পারে। আসলে সে শিগগির চা খেয়ে নিয়ে হাতের কাজ শেষ করতে চেয়েছিল।

নরেশবাবু বললেন,—কাঞ্চনবাবু নিজেই চা তৈরি করে খেতেন। কেরোসিন কুকার আর চায়ের সরঞ্জাম দেখেই তা বোঝা যায়। খেতেন হোটেলে। কারণ চাল-ডাল বা রান্নার পাত্র দেখছি না।

কর্নেল ঘরের ভিতর আবার একবার ঘুরে দেখে নিয়ে বললেন,—নরেশবাবু! কেউ কাঞ্চন সেনের ঘর থেকে কিছু নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে খুন করেনি। সে কাঞ্চনবাবুকে খুন করতেই এসেছিল। আর-একটা কথা। সে এই কাজের জন্য রবিবার সন্ধ্যাটা বেছে নিয়েছিল। খুনের নিরাপদ জায়গা কাঞ্চনবাবুর এই ঘর, তা সে বুঝতে পেরেছিল।

—আপনি কি বলতে চান, খুনি আগে থেকে টেলিফোনে কাঞ্চনবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করেই এসেছিল?

—তা আর বলতে? আচ্ছা, চলি নরেশবাবু! বলে কর্নেল ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকলেন। তাঁকে অনুসরণ করতে আমার অবস্থা শোচনীয় বললে ভুল হয় না।...

সে-রাত্রে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে ফেরার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, —কাঞ্চন সেনকে কারও খুন করার মোটিভ কি থাকতে পারে? আমার ধারণা, কেউ কোনো বিষয়ে তাঁর মুখ চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। তাই না?

কর্নেলকে বড় বেশি গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন,—আমি অন্তর্যামী নই, জয়ন্ত!

—কী আশ্চর্য, আপনি যেন কোনো কারণে বেজায় চটে গেছেন! খুনির প্রতি, নাকি আমার প্রতি?

আমি কৌতুকের মেজাজেই বলেছিলুম কথাটা। লক্ষ করেছিলুম, কর্নেলের স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের মেজাজও নেই। তিনি বলেছিলেন,—জয়ন্ত! আমি নিজের প্রতি নিজেই চটে গেছি।

—সে কি!

—একচক্ষু হরিণের গল্পটা নিশ্চয় তুমি জানো! আমি হঠাৎ কী করে একচক্ষু হরিণ হয়ে গিয়েছিলুম বুঝতে পারছি না।

—একটু খুলে বলবেন কি?

—খিদে পেয়েছে। ষষ্ঠী! এগারোটা বাজতে চলল! খেয়াল আছে?

ষষ্ঠী পর্দার পিছনেই ছিল। উঁকি মেরে বলল, —আপনি বসে-বসে চুরুট খাচ্ছেন বাবামশাই! আপনিই বলেন, চুরুট খাওয়ার সময় আমি যেন আপনাকে ডিসটাপ না করি!

কর্নেল তখনই চুরুট অ্যাশট্রেতে ঘষে নিভিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। —চুপ হতভাগা! খাওয়ার সময় পেরিয়ে গেলে এবার থেকে ডিসটাপ করবি। উঠে পড়ো জয়ন্ত! নাকি তোমাকে ডিসটাপ করে ফেললুম?

এবার স্বাভাবিক আবহাওয়া ফিরে এসেছিল। বলেছিলুম,—ষষ্ঠীকে আপনি বাংলা পড়িয়েছেন। ইংরেজিও নাকি পড়াতে চান। তার আগে ওর ডিসটাপ-টা শুধরে দেবেন।

—তোমাকে ওই দায়িত্বটা দিলুম। বলে কর্নেল বাথরুমে ঢুকেছিলেন।

সে-রাতে বিছানায় শুয়ে কাঞ্চন সেনের হত্যাকাণ্ডে কর্নেলের নিজের প্রতি চটে যাওয়া এবং নিজেকে একচক্ষু হরিণ বলার কারণ খুঁজতে নাকাল হয়েছিলুম। শুধু এটুকু বোঝা যায়, কাঞ্চন সেনকে কেউ খুন করতে পারে, কর্নেল নিশ্চয় তা ভাবেননি। কিন্তু কাঞ্চন সেন খুন হওয়ার পর তাঁর হয়তো মনে হয়েছে, এরকম একটা শোচনীয় সম্ভাবনার কথা তাঁর মাথায় এলেও যে-কোনো কারণে হোক, সেটা তিনি তখন গ্রাহ্য করেননি। পরে তাই তাঁর অনুশোচনা হয়েছে।

কর্নেল তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে আমার রাত্রিবাসের সময় একবার বলেছিলেন,—ডার্লিং! ইংরেজিতে একটা প্রবচন আছে, তার মোদ্দা মানেটা হল : রাত্রিকালে যে-সব চিন্তাভাবনা আসে, সেগুলোর বিরুদ্ধে সতর্ক থেকো "Beware of the thoughts, come in night।" সতর্ক না থাকলে অনিদ্রার রোগে ভুগবে।

লাইনটা মনে পড়ে গেলে সতর্ক হয়েছিলুম বটে, কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ নয়। সকাল থেকে রাত্রি—পুরো একটা রবিবার ঘটনার পর ঘটনার ধাক্কায় এ যাবৎ অসংখ্যবার বিপর্যস্ত হয়েছি। এটা নতুন কিছু নয়। তবু শুধু মনে ভেসে উঠছিল, কাঞ্চন সেনের করুণ মুখে বলা শেষ কথাটা : স্যার! দয়া করে শুধু একটা কথা মনে রাখবেন। আমার প্রাণ এখন আপনার হাতে!

কর্নেলের একসময় একটা লালরঙের ল্যান্ডরোভার গাড়ি ছিল। গাড়িটা কবে বেচে দিয়েছেন। কিন্তু গ্যারেজটা কাউকে ভাড়া না দিয়ে খালি রেখেছেন। আমার ফিয়াট গাড়িটা সেখানেই রাত্রিযাপন করে। গ্যারেজের চাবি ষষ্ঠীর জিম্মায় থাকে।

পরদিন সকাল নটায় ব্রেকফাস্টের পর কর্নেল বললেন,—তুমি তোমার সল্টলেকের ফ্ল্যাটে গিয়ে সোয়েটার-জ্যাকেট-টুপি-মাফলার এইসব গরম পোশাক-আশাক নিয়ে এসো। তোমার লাইসেন্সড আর্মস সঙ্গে থাকা দরকার। তোমার গাড়িতেই ফিরে আসব। গাড়িটা আমার গ্যারেজে থাকবে। ট্যাক্সির ওপর ভরসা করা ঠিক হবে না।....

শেয়ালদা স্টেশনে এগারোটা পঁচিশের ট্রেনে তত বেশি ভিড় ছিল না। কর্নেলের সেই চিরাচরিত ট্যুরিস্টের বেশ। পরনে জ্যাকেট, পায়ে হান্টিং বুটজুতো। গলা থেকে ঝুলন্ত ক্যামেরা আর বাইনোকুলার পিঠে সাঁটা সেই কালো কিটব্যাগ, যেটার মাথার দিকে প্রজাপতিধরা জালের হাতল বেরিয়ে তাঁর বাঁ-কাঁধের ওপর দিয়ে বেখাপ্পা খুদে ছড়ির মতো দেখাচ্ছিল। আর-একটা ব্যাগ তাঁর পোশাক-আশাক ইত্যাদিতে ঠাসা। লক্ষ করছিলুম, যাত্রীরা তাঁকে লক্ষবস্তু করে ফেলেছে। এটা অবশ্য সবখানেই দেখে আসছি।

একটা নাগাদ কনকপুর স্টেশনে নেমে দেখলুম, পিছনের চত্বরে বাস, সাইকেলরিকশার ভিড়। এক্কা ঘোড়ার গাড়িও চোখে পড়ল। ছোট্ট একটা বাজার আছে। কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত! আমাদের পক্ষে এক্কাগাড়িই ভালো। সাইকেলরিকশায় ঠাসাঠাসি হবে। তা ছাড়া, লক্ষ করো, বেচারা এক্কাওয়ালারা যাত্রী পাচ্ছে না। ক্রমশ গ্রামাঞ্চলের মানুষ নেহাৎ দায়ে না ঠেকলে সেকেলে যানবাহনের প্রতি অবহেলা দেখাতে শুরু করেছে।

ট্রেনে আসবার সময় শীতের হিম টের পাচ্ছিলুম। চত্বরে নেমে রোদ্দুর আরাম দিল। তারপর যা হয়, বিদেশি ট্যুরিস্ট ভেবে সাইকেলরিকশাওয়ালারা ঘিরে ধরেছিল। কর্নেল সোজা গিয়ে একটা এক্কাগাড়িতে উঠে বসলেন। বিহার অঞ্চলে কর্নেলের সঙ্গে এক্কাগাড়িতে চাপার অভিজ্ঞতা আমার আছে। ঘোড়াটার পাঁজরের হাড় গোনা যায়। কিন্তু এক্কাওয়ালা মহানন্দে তাকে পক্ষিরাজে রূপান্তরিত করতে চাইছিল। কর্নেল তাকে বললেন, —তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। ইরিগেশন বাংলোয় যেতে কনকপুরের বাইরে দিয়ে একটা রাস্তা আছে শুনেছি। সেই রাস্তায় চলো।

একাওয়ালা কর্নেলের মুখে বাংলা কথা শোনার আশা করেনি। সে একবার ঘুরে কর্নেলকে দেখে নিয়ে বলল,—সায়েবরা কি বলকাতা থেকে আসছেন সার?

—হ্যাঁ। তোমার নাম কী?

—আমার নাম মকবুল সার।

—কনকপুরের লোক তুমি?

—না সার! ডুবো জায়গায় বাড়ি ছিল। বানবন্যায় নাকাল হয়ে ইস্টিশানের কাছে বসত করেছি।

—ডুবো জায়গাটা কোথায়?

—পাঁচখালি। এখান থেকে অনেকটা দূর। খালবিল নদীনালা আর জঙ্গল। গরমেন বাঁধ বেঁধেছিল। বাঁধ বারবার ভেঙে যায়। কনটেকটারবাবু টাকা লুঠেপুটে খায়। বেশি কী বলব সার?

—লোকজনের বসতি নেই ওই অঞ্চলে?

—তা আছে সার! বেদে আছে। সাঁওতাল আছে। আমার মতো কত গরিব-গুরবোও আছে।

—আচ্ছা, ওদিকে শুনেছি বেতের জঙ্গল ছিল একসময়। বেতের আসবাবপত্র নাকি কলকাতায় চালান যেত?

—এখনও আছে! কালুখালিতে কয়েকঘর ডোম আছে। তারাই বেতের কাজ করে।

—মকবুল! তুমি তো একসময় ওই এলাকায় ছিলে। কালুখালিতে দশরথ নামে একটা লোক ছিল জানো?

মকবুল হাসল। —সায়েবরা তা হলে আগে এসেছেন এ তল্লাটে?

—হ্যাঁ। আমার এক শিকারি বন্ধুর সঙ্গে এসেছিলুম। উনি দশরথকে আমার জন্য একটা বেতের চেয়ার তৈরি করে দিতে বলেছিলেন। লোকটার হাতের কাজ খুব সুন্দর!

—দশরথ এখন বুড়ো হয়ে গেছে। তা হলেও তার হাতের কাজ খুব পাকা।

—ওহে মকবুল! আমার মনে হচ্ছে, ডাইনের রাস্তায় যেতে হবে।

—সার! দুধারে জঙ্গল। কাঁচা রাস্তায় ঘোড়াটার কষ্টও হবে।

—ঠিক আছে। একটু আস্তেই না হয় চলো। আমরা তো জল-জঙ্গলে ঘুরতেই এসেছি। বখশিস পাবে!

বখশিসের লোভে এক্কাগাড়ি ডাইনের রাস্তায় নিয়ে গেল মকবুল। কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে হয়তো পাখি-প্রজাপতি বা গাছের ডালে পরজীবী অর্কিড খুঁজতে মন দিলেন। মাটির রাস্তাটা সংকীর্ণ। মাঝবরাবর হলুদরঙের ঘাস এবং তার দুপাশে ধুলোয় মোটরগাড়ির টায়ারের দাগ। জিজ্ঞেস করলে মকবুল আমাকে বলল,—চোরেরা রাতবিরেতে জঙ্গলের গাছ কাটে। কাঠগোলা থেকে লরি এসে সেই কাঠ নিয়ে যায়। কখনও থানাপুলিশ হয় সার! অভাবী লোকেরা পেটের দায়ে চোর হতেই পারে। কিন্তু আসল চোর তো কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা নিয়ে বসে আছে। তাদের ধরে কে?

প্রায় এক কিলোমিটার চলার পর কাঁচারাস্তাটা ডাইনে বাঁক নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। এক্কাগাড়িটা এবার পিচরাস্তায় উঠল। কর্নেল বাইনোকুলারে সামনেটা দেখে নিয়ে বললেন, —ইরিগেশন বাংলো দেখা যাচ্ছে। জয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরির সঙ্গে বছর তিনেক আগে ওই বাংলোতে উঠেছিলুম।

বললুম,—তা হলে তো আপনার চেনা জায়গা!

—কতকটা। নৌকো করেই ঘুরেছিলুম। সেটা ছিল ডিসেম্বর মাস। সাইবেরিয়ান হাঁস দেখেছিলুম। ছবি তোলার সুযোগ পাইনি। তা ছাড়া, কনকপুরেও যাওয়া হয়নি। মিঃ রায়চৌধুরিও বলেননি, কনকপুরে তাঁর আত্মীয় আছেন। গত পরশু তাঁর টেলিফোন পেয়ে সেটা জেনেছি।

—ভদ্রলোক সম্ভবত তাঁর মাসতুতো দাদাদের এড়িয়ে চলেন। তাই না?

কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—তা-ই বা বলি কেমন করে? রায়বাড়ির রহস্যজনক চুরির ঘটনা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ লক্ষ করেছি। পুলিশের উঁচুতলায় তাঁর প্রভাব সত্ত্বেও সুদর্শনবাবুকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন।

এবার আমাদের ওপর উত্তরের বাতাস এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। মকবুলের মন এখন তার হাড়জিরজিরে টাট্টুর দিকে। প্রবল বাতাস ঠেলে পা বাড়াতে বেচারার কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কর্নেল মকবুলকে বারবার বলছিলেন,—তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ইচ্ছেমতো ওকে চলতে দাও!

বললুম,—জঙ্গল এলাকাটা বিশাল মনে হচ্ছে।

কর্নেল বললেন,—সরকারি বনসৃজন স্কিমের ব্যাপার। এখানকার মাটি খুব উর্বর। সেবার এসে এত ঘন জঙ্গল দেখিনি।

—তা হলে ফরেস্টবাংলো নিশ্চয় কোথাও আছে?

—আছে। ওই কাঁচারাস্তা দিয়ে এগোলে কমপক্ষে তিন কিলোমিটার দূরে। রাস্তার অবস্থা তো দেখলে! রাস্তা পাকা হতে কত বছর লাগবে কে জানে! সরকারি ব্যাপার।

পিছন ফিরে দেখে নিয়ে বললুম,—কনকপুর দেখা যাচ্ছে। জঙ্গল ঘুরে না এলে কখন পৌঁছে যেতুম।

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। রাস্তার বাঁদিকে পশ্চিমে বিস্তীর্ণ ধানখেতে পাকা ধান কাটছে লোকেরা। ডানদিকে জঙ্গল থেকে একটা জলভরা খাল বেরিয়ে রাস্তার সমান্তরালে চলেছে। বাংলোটা মনোরম। পিছনের দিকে, উত্তরে ও পূর্বে বিশাল জলাধার। বাতাসে উত্তরঙ্গ সেই জলাধারে দূরে কয়েকটা নৌকো দেখা যাচ্ছিল।

গেটের সামনে এক্কাগাড়ি দাঁড় করাল মকবুল। একজন প্যান্ট-শার্ট সোয়েটার পরা ভদ্রলোক ততক্ষণে গেটের কাছে এসে গেছেন। তিনি করজোড়ে নমস্কার করে বললেন,—ভেরি-ভেরি সরি স্যার। ইঞ্জিনিয়ারসায়েব স্টেশনে জিপগাড়ি পাঠাতে বলেছিলেন। কিন্তু গাড়িটা মাঝপথে বিগড়ে গিয়েছিল। মেকানিক ডেকে আনতে দেরি দেখে পাঁচুবাবুর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে ফোন করেছিলুম। ওরা বলল,—এত শিগগির গাড়ি দিতে পারব না। আমার অপরাধ নেবেন না স্যার!

কর্নেল হাসলেন। —না। আপনার উদ্বেগের কারণ নেই। আমরা মকবুলের গাড়িতে চেপে খুব আনন্দ পেয়েছি। আপনি বুঝি বাংলোর কেয়ারটেকার?

—আজ্ঞে! আমার নাম সুখরঞ্জন দাশ। বলে তিনি হাঁক দিলেন,—অ্যাই ভোঁদা। ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস হতভাগা? সায়েবরা এসে গেছেন! মালপত্তর নিয়ে যা!

কর্নেল মকবুলের হাতে একটা ভাঁজকরা নোট গুঁজে দিলেন। তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে সেলাম ঠুকে কর্নেল ও আমার ব্যাগদুটো নামাল। ভোঁদা নামে বেঁটে একজন যুবক এসে ব্যাগদুটো নিয়ে এগিয়ে গেল। গেটের পর মোরামবিছানো পথ। সরকারি বাংলো যেমন হয়। ফুলে ও সুন্দর গাছপালা-লতা-গুল্মে সাজানো। পশ্চিমপ্রান্তে তিনটে একতলা ঘর। তার মধ্যে একটা গাড়ি রাখার গ্যারেজ।

একজন মালি খুরপি দিয়ে একটা ঝোপের গোড়ার মাটি খুঁড়ছিল। সে সটান উঠে দাঁড়িয়ে কর্নেলের উদ্দেশে সেলাম ঠুকল। একতলা ঘরের বারান্দায় সম্ভবত তার বউ পা ছড়িয়ে বসে ভাত খাচ্ছিল। বউটি ঘোমটা টেনে পিছন ফিরে বসল।

দোতলা বাংলোর বাঁদিকে সিঁড়ি। সুখরঞ্জনবাবু, তাঁর পিছনে ভোঁদা সবেগে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যাওয়ার পর আস্তে-সুস্থে কর্নেল ও আমি ওপরে গেলুম। ওপরে শেষপ্রান্তের ঘরটিতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্নেল ঘরে ঢুকে বললেন—সুখরঞ্জনবাবু! বছর তিনেক আগে আমি আর আমার বন্ধু এই ঘরে ছিলুম।

সুখরঞ্জনবাবু বললেন,—আজ্ঞে স্যার! আমি একবছর হল জয়েন করেছি। তখন কেয়ারটেকার ছিলেন নিত্যগোপাল মুখুজ্যে।

—হ্যাঁ! নিত্যগোপালবাবু! নামটা মনে পড়ল।

—হঠাৎ স্ট্রোকে উনি মারা যান। বলে সুখরঞ্জনবাবু তেড়ে গেলেন ভোঁদার দিকে। —হাঁ করে দেখছিস কী? ঠাক্‌মশাই বোধ করি লেপের তলায় ঢুকে পড়েছে। গিয়ে বল সায়েবরা এসে গেছেন। দুটো বাজতে চলল।

ভোঁদা তখনই দুপদাপ শব্দ করতে-করতে চলে গেল। হোঁৎকা মোটা বেঁটে যুবকটিকে দেখে ন্যালা-ভোলা মনে হচ্ছিল। কর্নেল বললেন,—সেবার রান্নার লোক ছিল না। মুখুজ্যেমশাই নিজেই আমাদের রান্না করে খাইয়েছিলেন।

—আজ্ঞে স্যার! অমন মানুষ আজকাল খুঁজে পাওয়াই কঠিন। যাক্‌গে। এত বেলায় স্নান না করাই ভালো। বাথরুমে গিজার আছে। গরমজলে হাত-মুখ ধুয়ে নিন। খাবার এখানে পাঠিয়ে দেব, নাকি...

কর্নেল হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন। —আমরা নীচের ডাইনিং ঘরেই খাব। আপনার ব্যস্ত হওয়ার কারণ নেই।

সুখরঞ্জন বেরিয়ে গেলেন। বললুম,—বাপস! এ যে বিহারের পাহাড়ি শীত! জানলাও খোলা যাবে না।

কর্নেল বাথরুমে ঢুকে গেলেন। আমি উত্তরের পর্দা সরিয়ে কাচের জানলা একটুখানি ফাঁক করে দেখে নিলুম। নীচের দিকে জলাধারের তীরে বাঁধানো ঘাট। সেখানে একটা সাদা রঙের বোট বাঁধা আছে। কিন্তু ঠান্ডা হিম জলাধারে রোয়িং করা অসম্ভব। অবশ্য কর্নেলের কথা আলাদা। তাঁর মিলিটারি শরীর।

একটু পরে আমরা ঘরের দরজায় তালা এঁটে নীচে ডাইনিংরুমে গেলুম। ঠাকমশাই করজোড়ে নমস্কার করলেন। কর্নেল প্রশ্ন করে জেনে নিলেন, তাঁর নাম বাসুদেব ঠাকুর। তাঁর বাড়ি রানিপুর। কথায়-কথায় জানা গেল, প্রাণকান্ত সেনকে তিনি চেনেন। প্রাণকান্তবাবুর ভাই কাঞ্চন সেন কলকাতায় বড় একটি চাকরি করে। গরিব দাদাকে পাইপয়সা সাহায্য করে না। দাদার বাড়ি আসেও না।

সুখরঞ্জনবাবু একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন,—আমার বাড়ি কনকপুরে। কাঞ্চন কনকপুর হাইস্কুলে আমার ক্লাসফ্রেন্ড ছিল স্যার! আপনি তাকে চেনেন?

কর্নেল বললেন,—আমার এক বন্ধুর কোম্পানিতে ভদ্রলোক চাকরি করেন। সেই সূত্রে একটু আলাপ হয়েছিল। আমার তো পাখিটাখি দেখার বাতিক আছে। কাঞ্চনবাবু বলেছিলেন, তাঁদের গ্রামের ওদিকে বিশাল বিল আছে। সেখানে শীতের সময় প্রচুর জলচর পাখি আসে। তাঁর কাছে

খবর পেয়েই সেবার আমি এখানে পাখি দেখতে এসেছিলুম। তবে উনি বিল বলেছিলেন। আমি এসে দেখেছিলুম, ওয়াটারড্যাম।

ভোঁদা বারান্দায় রোদে বসেছিল। সে জড়ানো গলায় অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে বলে উঠল,—কাঁছনবাবু না? এই তো সেদিন—কঁকপুরে এসেছিল। বাঁছুবাবু না? বাঁছুবাবুর সঙ্গে বাজারে না? একসঙ্গে রিকশাতে চেঁপেছিল।

সুখরঞ্জনবাবু হাসতে-হাসতে তাকে ধমক দিলেন। —চুপ হতভাগা! স্পষ্ট করে একটা কথা বলতে পারে না। জানেন স্যার? রাতবিরেতে ওর কথা শুনলে আঁতকে উঠতে হয়। আস্ত ভূত!

কর্নেল বললেন,—ওর বাড়ি কোথায়?

ঠাকমশাই বললেন,—আমার গ্রামের ছেলে স্যার! বাবা-মা নেই। কনকপুর বাস্ট্যান্ডে মোট বইত। এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে ফাইফরমাশ খাটত। ইঞ্জিনিয়ারসায়েব ওকে এখানে চাকরি দিয়েছিলেন।

খাওয়ার পর ওপরের ঘরে গিয়ে বসেছিলুম,—কর্নেল! ভোঁদা কোন বাঁছুবাবুর সঙ্গে ক'দিন আগে কনকপুর বাজারে কাঞ্চন সেনকে দেখেছে। বাঁছুবাবুটি কে জেনে নিলেন না কেন?

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বলেছিলেন,—কম্বলে ঢুকে ভাতঘুম দিয়ে নিতে পারো।

—ইচ্ছে তো করছে। কিন্তু রোদ দেখে লোভ হচ্ছে।

তা হলে বারান্দায় রোদে বসতে পারো। —বলে তিনি একটা চেয়ার নিয়ে বারান্দায় গেলেন। তারপর দেখলুম, বাইনোকুলারে তিনি সম্ভবত কনকপুর দর্শন করছেন।

রোদের আরাম না কম্বলের আরাম, এই টানাটানির খেলায় শেষপর্যন্ত কম্বল জিতে গেল। আমি কম্বলের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিলুম।

তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি। ঘুম ভেঙেছিল ঠাকমশাইয়ের ডাকে। তিনি চায়ের কাপ-প্লেট হাতে নিয়ে ডাকছিলেন। দেখেই বুঝেছিলুম কর্নেলের নির্দেশ। ঠাকমশাই সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলেন। বললেন,—বড়সায়েব ভোঁদাকে নিয়ে পাখি দেখতে বেরিয়ে গেছেন।

চায়ের কাপ-প্লেট নিয়ে বারান্দায় গিয়ে দেখি, দূর পশ্চিমে অর্ধবৃত্তাকার গাঢ় নীল সূর্য যথাসাধ্য রং ছড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু প্রাকসন্ধ্যার ধূসরতা দ্রুত লাল রংটা মুছে ফেলছে। পূর্ব-দক্ষিণে সেই সরকারি জঙ্গলের গায়ে দেখতে-দেখতে ঘন নীল কুয়াশা জমে উঠল। চা শেষ করতে-করতে দক্ষিণে কনকপুরের আলোর বিন্দু ফুটে উঠতে দেখলুম। বারান্দার চেয়ারে বসে আমার প্রকৃতি দর্শনের একটু পরেই বাংলোর নীচের তলায় আলো জ্বলে উঠল। গেটের দিকে আলো পড়তেই কর্নেল আর ভোঁদাকে দেখতে পেলুম।

একটু পরে কর্নেল উঠে এসে যথারীতি সম্ভাষণ করলেন,—গুড ইভনিং জয়ন্ত! আশা করি ভাতঘুমটা ভালোই হয়েছে।

বললুম,—গুড ইভনিং বস! ভোঁদাকে নিয়ে কতদূর ঘুরলেন?

কর্নেল বারান্দার আলোর সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলেন। তারপর ভিতরে তাঁর কিটব্যাগ, ক্যামেরা আর বাইনোকুলার রেখে একটা চেয়ার নিয়ে এলেন। তিনি চেয়ারে বসে আস্তে বললেন, —ইচ্ছে করেই একটা রিস্ক নিয়েছিলুম। সাংঘাতিক কিছু ঘটে যেতে পারত। তৈরি ছিলুম বলে ঘটেনি। অবশ্য ভোঁদা ছেলেটি সত্যিই যাকে বলে হাঁদারাম। কী ঘটল তা বুঝতে পারেনি।

কথাটা শুনেই চমকে উঠেছিলুম। বললুম, —কেউ হামলা করেছিল। তাই না?

কর্নেল হাসলেন। —ড্যামের ধারে উঁচু বাঁধের পথে হাঁটছিলুম। বাঁধের দুধারেই গাছপালা ঝোপঝাড়। ডাইনে খানিকটা ঢালু জমির নীচে সেই খালটা। আসবার সময় খালটা তুমি দেখেছ।

তো আগেই ঢালু জমিতে একটা বটগাছ লক্ষ করেছিলুম। কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটা লোককে গুঁড়ির ওধারে আড়ালে যেতে দেখেছিলুম। ভোঁদা হাঁটছিল আমার বাঁদিকে। বটগাছটার কাছাকাছি বাঁধের পথে পৌঁছুনোর আগেই দেখি, লোকটা গুঁড়ি মেরে ঢালু জমিতে ঝোপের মধ্যে বসে পড়েছে। তার হাতে কী একটা ছিল—সম্ভবত দেশি পিস্তল। আমার উপায় ছিল না, ঝোপটার গোড়া লক্ষ্য করে এক রাউন্ড ফায়ার করতেই হল। অমনই লোকটা বটগাছের আড়াল দিয়ে উধাও হয়ে গেল। ভোঁদা ভেবেছিল, আমি পাখি মারবার চেষ্টা করলুম। তার কথায় পরে আসছি। নেমে গিয়ে বটগাছটার কাছে বাইনোকুলারে দেখলুম, লোকটা খালের ধারে-ধারে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে পড়ি-কি-মরি করে দৌড়ে পালাচ্ছে। কাঁচারাস্তায় পৌঁছে সে একবার ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। তারপর আমাকে দেখতে পেয়ে আবার দৌড়ে উধাও হয়ে গেল। ভোঁদা তখনও বাঁধে দাঁড়িয়ে ছিল। দেখার মতো মূর্তি। চোখ বড়। জিভ খানিকটা বেরিয়ে আছে। ফিরে গিয়ে বললুম, পাখিটা মারতে পারলুম না ভোঁদা! ভোঁদা তার বুলিতে যা বলতে চাইছিল, তা বুঝলুম। এদিকটায় বনমুরগি চরে বেড়ায়। কিন্তু তারা বেজায় চালাক।

এইসময় কফি আর স্ন্যাক্স ট্রেতে করে নিয়ে এলেন ঠাকমশাই। তাঁর পিছনে ভোঁদা। ভোঁদা ঘর থেকে বেতের টেবিল এনে রাখল। ঠাকমশাই সহাস্যে বললেন,—বড়সায়েব বনমুরগিকে গুলি করেছিলেন শুনলুম। ভোঁদা তো হেসে অস্থির। বনমুরগি ফাঁদ পেতে ধরতে হয়। বুঝলেন স্যার? আগের দিনে মুমহররা এসে বনমুরগি ধরত। আজকাল আর তাদের দেখতে পাই না!

ভোঁদা অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ভুতুড়ে হাসি হাসল। তারপর ঠাকমশাইয়ের তাড়া খেয়ে চলে গেল।

ঠাকমশাই বনমুরগি এবং মুমহরদের সম্পর্কে আরও কিছু বলতেন। গেটের দিকে তাকিয়ে কর্নেল বললেন,—ঠাকমশাই! আমার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের দেখা করতে আসার কথা। মনে হচ্ছে, তিনি এসে গেছেন। ওঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। পটে যা কফি আছে, এতেই হবে। আপনি শুধু একটা কাপ-প্লেট পাঠিয়ে দেবেন।

বাসুদেব ঠাকুর চলে গেলেন। গেটের কাছে হালদারমশাইকে দেখা যাচ্ছিল। মাথায় হনুমানটুপি, পরনে প্যান্ট আর গায়ে সোয়েটারের ওপর কোট চাপানো।

আমাদের দেখতে পেয়ে তিনি হাত নাড়ছিলেন। একটু পরে ভোঁদা তাঁকে পৌঁছে দিয়ে গেল। তারপর ঠাকমশাই কাপ-প্লেট নিয়ে এলেন। হালদারমশাইকে বিনীতভাবে নমস্কার করে চলে গেলেন।

গোয়েন্দাপ্রবরকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। কর্নেল বললেন,—কফি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিন হালদারমশাই।

আমি বললুম,—আপনি এলেন কীসে?

হালদারমশাই বললেন,—রিকশোওলারা সন্ধ্যার পর এদিকে আইতেই চায় না। একজন হাঁকল তিরিশ টাকা লাগব। হঃ! দুইখান পাও থাকতে অগো সাধাসাধি করুম ক্যান?

কর্নেল তাঁর হাতে কফির কাপ তুলে দিয়ে বললেন,—উঠেছেন কোথায়?

—উঠছি তো রায়বাড়িতে। সুদর্শনবাবু ওনার দাদা সুরঞ্জনবাবুর লগে আমার পরিচয় দিছেন। উনিও খুশি হইয়া কন্ট্রাক্ট ফর্মে সই করছেন। প্রথমে এট্টুখানি হেজিটেট করছিলেন ভদ্রলোক। তখন সুদর্শনবাবু মিঃ রায়চৌধুরির লেটারখান ওনারে পড়তে দিছিলেন। দোতলায় সুদর্শনবাবুর পাশের ঘরে আছি।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—কতদূর এগোলেন বলুন!

প্রাইভেট ডিটেকটিভ চাপা স্বরে বললেন,—সুরঞ্জনবাবু কোথায় চাবি লুকাইয়া রাখেন, তা দেখছি। সুদর্শনবাবু তখন বাইরে গিছলেন। ওনার বউদি ভদ্রমহিলা ছিলেন নীচের তলায়। সুরঞ্জনবাবু আমার ঘরে বইয়্যা ওনাদের ফ্যামিলি হিসটরি কইতাছিলেন। সেইসময় কথাটা তুলছিলাম।

—বাঃ! তারপর?

—উনি নিজের বেডরুমে লইয়া গিছলেন। খাটের মাথার দিকের দেওয়ালে ওনার ঠাকুরদার একখান পোর্ট্রেট টাঙানো আছে। ছবিটার পিছনে দেওয়ালে ছোট্ট তাক আছে। একসময় সেখানে ওনাদের মহালক্ষ্মী দেবীর নকলে তৈরি মাটির ছোট্ট প্রতিমা থাকত। ওনার ঠাকুরদার পোর্ট্রেটখান থাকত অন্য দেওয়ালে। চাবি লুকাইয়া রাখতেন সেই প্রতিমার তলায়। পরে প্রতিমা আলমারির মাথায় রাইখ্যা তাকের মাপে লোহার একখান চৌখুপি বানাইয়া আনছিলেন। বাঁদিকে একখানে আঙুলে চাপ দিলে কপাটের মতন সামনেটা খুইল্যা যাইত। ভিতরে হাবিজাবি জিনিসের মধ্যে চাবি দুইখান লুকাইয়া রাখতেন। চৌখুপির সামনের পাতে দেওয়ালে রঙ করা ছিল। তার ওপরে ঠাকুরদার পোর্ট্রেট। পোর্ট্রেটের তলায় ময়লা দাগ পড়নের কথা। কেউ ছবিখান সরাইলে দাগ দেইখ্যা জানা যাইব। তাই কি না?

—ঠিক বলেছেন।

হালদারমশাই বললেন, —সুদর্শনবাবুর ঘরের তালা কেউ একবার ভাঙছিল, তা তো অলরেডি শুনছেন! তারপর সুরঞ্জনবাবুও সতর্ক হইয়া তাঁর চাবিদুইখান এমন জায়গায় রাখছিলেন, ভাবা যায় না। বলে হালদারমশাই খিখি করে হেসে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলুম,—কোথায় রেখেছিলেন?

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন,—ওনার ঘরে বইপত্তরের মধ্যে পুরোনো পঞ্জিকা আছে অনেকগুলি। একখান পুরোনো অ্যাত্তো মোটা পঞ্জিকার মাঝখানে চৌকো এট্টুখানি গর্ত করছেন।

কর্নেল বললেন,—পাতা কেটে গর্ত?

—ঠিক কইছেন কর্নেলস্যার। ব্লেড দিয়া এক ইঞ্চিরও বেশি গর্ত করছেন। চৌকো গর্ত। তার মধ্যে দুইখান চাবি।

হালদারমশাই আবার খিখি করে হেসে উঠলেন। বললুম,—অদ্ভুত ব্যাপার তো!

—হঃ! কার সাইধ্য ট্যার পায়, পুরোনো পঞ্জিকার মধ্যে গুপ্তধন লুকাইয়া আছে! হালদারমশাই কণ্ঠস্বর আরও চাপা করলেন। —কাজটা কিন্তু সহজ নয়। চিন্তা করেন কর্নেলস্যার! ব্লেড দিয়া অতগুলি পাতা কাটতে সময় কত লাগছে? তিনইঞ্চির বেশি লম্বা আর আধা ইঞ্চি চওড়া কইর‍্যা পাতা কাটছেন।

বললুম,—এক ইঞ্চিরও বেশি গভীর করতে হলে পঞ্জিকাটা খুবই মোটা হওয়া উচিত।

কর্নেল বললেন,—আগের দিনে কিছু প্রকাশক প্রকাণ্ড শাস্ত্রীয় পঞ্জিকা প্রকাশ করতেন। সঙ্গে জ্যোতিষচর্চা, মেয়েদের ব্রতকথা, শাস্ত্রীয় পাঁচালি পুরে দিতেন। সস্তা নিউজপ্রিন্ট কাগজে ছাপা এ সব আট-নশো পৃষ্ঠার পঞ্জিকা আমি দেখেছি। আমার এক বন্ধুর পঞ্জিকাসংগ্রহের বাতিক আছে।

কর্নেলের কথার ওপর হালদারমশাই বললেন—বেশিক্ষণ থাকুম না। দুইখান ইমপর্ট্যান্ট কথা আছে।

—বলুন!

—আইজ সকালে বাজার এরিয়ায় গিছলাম। বড় বেশি ঠান্ডা! রাস্তার ধারে রৌদ্রে খাড়াইয়া চা খাইলাম। তারপর ভিড়ের মধ্যে ক-পাও হাঁটছি, পিছন থেইক্যা কে আমার হাতে কী একখান

দিলা। ঘুইর‍্যা দেখি এক পোলাপান। সে কইল, এক বাবু আমারে দিতে কইছে। তারপরই সে পলাইয়া গেল। তারে তাড়া করলে মাইনষেরা ভিড় করবে। জিগাইবে কী ব্যাপার। তাই মাথা ঠান্ডা রাখলাম। এই দ্যাখেন কী কাণ্ড!

হালদারমশাই কোটের ভিতর পকেট থেকে ভাঁজকরা একটুকরো কাগজ বের করে কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল চোখ বুলিয়ে দেখার পর গম্ভীর মুখে বললেন,—ক্রমশ একটু-একটু করে ঘটনাটা স্পষ্ট হচ্ছে। রায়বাড়ির গৃহদেবীর জুয়েলস চুরি করে চোর। অথচ তা কনকপুর থেকে নিয়ে যেতে পারেনি এবং বেচতেও পারেনি।

কর্নেলের হাত থেকে প্রায় দলাপাকানো কাগজের টুকরোটা চেয়ে নিলুম। কাগজে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা আছে :

'টিকটিকির লেজ কাটিয়া দিলেও লেজ গজাইতে পারে। মস্তক কাটিলে কী হইবে?'

হালদারমশাই বললেন,—কর্নেলস্যার! পঁয়তিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করেছি। আমারে কয় টিকটিকি? আইজ বেলা বারোটা পর্যন্ত বাজার এরিয়ায় এখানে-সেখানে ঘুরছি। পোলাটারে খুঁজছি। দেখা পাই নাই!

বললুম,—ভদ্রপরিবারের ছেলে, নাকি সাধারণ ঘরের?

—নাঃ! নোংরা পোশাক! পরনে ছেঁড়া হাফপ্যান্ট। জুতা নাই।

কর্নেল বললেন,—ঘটনাটা কি আপনার মক্কেলদের জানিয়েছেন?

—কক্ষনও না। অগো কমু ক্যান?

—ঠিক করেছেন। আর কী কথা বলতে চাইছিলেন, এবার বলুন!

হালদারমশাই সম্ভবত উত্তেজনায় নস্যি নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। এবার একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন—সুদর্শনবাবু বিকালে ওনাগো ক্লাবে যাইতে কইছিলেন। আমি ওনারে কইলাম, বাইরে আপনাগো লগে মেলামেশা করনের অসুবিধা আছে। উনি যাওয়ার পর আমি আবার বাজার এরিয়ায় গেলাম। পোলাটারে খুঁজছিলাম। শেষে ঠিক করলাম, আপনার লগে কনসাল্টের দরকার আছে। তারপর একটা চৌরাস্তার মোড়ে খাড়াইয়া ওয়েট করছিলাম। ক্যান কী, আপনি কইছিলেন সন্ধ্যার পর আমি য্যান গোপনে এই বাংলোয় আসি।

কর্নেল বললেন,—হালদারমশাই! এবার কথাটা কী বলুন!

গোয়েন্দপ্রবর চাপা স্বরে বললেন,—বাঁ-দিকে মোড়ের মুখে একখান দোতলা বাড়ি থেইক্যা সুরঞ্জনবাবু আর-একটা লোকেরে বারাইতে দেখলাম। ওনারা আমারে লক্ষ করেন নাই। ততক্ষণে আলো জ্বলছে। সুরঞ্জনবাবুরে দেইখ্যা মনে হইল, কিছু ঘটছে। দুইজনে সাইকেলরিকশোতে চাপলেন। কিন্তু ওনারা বাড়ির দিকে গেলেন না। উল্টাদিকে গেলেন। আমার খটকা বাধছে।

—কিছু ঘটে থাকলে রায়বাড়ি ফিরেই জানতে পারবেন। সুরঞ্জনবাবুর সঙ্গের লোকটার চেহারা, পোশাক নিশ্চয় লক্ষ করেছেন?

—করছি। বয়স তিরিশ-বত্রিশের বেশি না। গোঁফ আছে। মাথায় মাফলার জড়ানো ছিল। গায়ে অ্যাশকালার ফুলহাতা সোয়েটার। পরনে মেটে রঙের টাইট প্যান্ট। জুতা লক্ষ করি নাই।

এই সময় বাংলোর দিকে একটা গাড়ি এগিয়ে আসতে দেখলাম। বাংলোর গেটের কাছে আসতেই চোখে পড়ল একটা জিপগাড়ি। ভোঁদা থপথপ করে এগিয়ে গিয়ে খুলে দিল। জিপগাড়িটা লন পেরিয়ে নীচে এসে থামল। কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, —ইঞ্জিনিয়ারসায়েবের গাড়ি। এতক্ষণে বোধহয় মেকানিকরা গাড়িটা সচল করে দিয়েছে।

একটু পরে একজন টাই-স্যুট এবং কানঢাকা টুপি পরা এক ভদ্রলোক এবং তাঁর পিছনে কেয়ারটেকার সুখরঞ্জনবাবু এগিয়ে এলেন। সুখরঞ্জনবাবু বললেন,—স্যার! আমাদের ইঞ্জিনিয়ারসায়েব!

ইঞ্জিনিয়ারসায়েব নমস্কার করে কর্নেলকে বললেন—কর্নেলসায়েবের খুব কষ্ট হয়েছে বুঝতে পারছি। কিন্তু সরকারি গাড়ির অবস্থা কী আর বলব?

সুখরঞ্জনবাবু একটা চেয়ার এনে দিলে তিনি বসলেন। কর্নেল বললেন,—আলাপ করিয়ে দিই। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি। আর ইনি আমার বন্ধু মিঃ কে. কে. হালদার। অবশ্য মিঃ হালদার কনকপুর রায়বাড়ির গেস্ট!

—আমি এ. কে. গোস্বামী। চিফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ কে. এল. বোস আমাকে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন, আপনার যেন কোনো অসুবিধা না হয়। কিন্তু প্রথমেই অসুবিধা ঘটিয়ে ফেলেছি। ক্ষমা করবেন।

—ও কিছু না। বছর তিনেক আগে ডিসেম্বরে আমি মিঃ জয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরির সঙ্গে এই বাংলোয় এসে কয়েকটা দিন ছিলুম।

আমি তখন ফরাক্কায় ছিলুম। —বলে মিঃ গোস্বামী ঘড়ি দেখলেন। —আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আর কৈফিয়ত দিতে এসেছিলুম। মিঃ বোস বলে দিয়েছেন, আপনার গাড়ির দরকার হলে যেন ব্যবস্থা করে দিই। জিপগাড়িটা আমাকে আমার কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে বাংলোয় থাকবে।

কর্নেল বললেন,—ধন্যবাদ মিঃ গোস্বামী। আমার গাড়ির দরকার হবে না। আমি জল-জঙ্গলে ঘুরতে এসেছি। আমার কিছু হবি আছে। পাখি, প্রজাপতি, অর্কিডের খোঁজে ঘুরে বেড়াই। নৌকোর ব্যবস্থা করে নেব। আমার এই কার্ডটা রাখুন!

কর্নেল তাঁর নেমকার্ড দিলেন। মিঃ গোস্বামী কার্ডটা দেখে নিয়ে পকেটে ঢোকালেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—রোয়িং করার একটা ছোট্ট বোট আছে। তবে এখন যা অবস্থা, রোয়িং করার রিস্ক আছে। সুখরঞ্জনবাবুকে বললে নৌকোর ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি চলি কর্নেলসায়েব! ফিশারিজ কো-অপারেটিভের একটা আর্জেন্ট মিটিং শেষ করে আসছি। কো-অপারেটিভের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারিকে বসিয়ে রেখে এসেছি। কিছু কাজ এখনও শেষ হয়নি।

কর্নেল বললেন,—মিঃ গোস্বামী! তা হলে একটা অনুরোধ। আমার বন্ধু মিঃ হালদারকে রায়বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিলে খুশি হব। আপনি না এলে ওঁকে কষ্ট করে হেঁটে যেতে হত।

—নিশ্চয় পৌঁছে দেব। চলুন মিঃ হালদার!

গোয়েন্দাপ্রবরের আরও কিছুক্ষণ হয়তো থাকার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এই শীতে জিপগাড়িতে ফেরার সুযোগ পেয়ে উনি খুশিই হলেন।

একটু পরে আমরা ঘরে গিয়ে বসলুম। কিছুক্ষণ পরে কর্নেলের নির্দেশে এবার ভোঁদা কফির ট্রে রেখে গেল। বোঝা যাচ্ছিল কর্নেলকে তার ভালো লেগেছে। তাঁর সেবা করতে পারলে সে যেন ধন্য হয়ে যাবে।

কফি খেতে-খেতে কর্নেল হালদারমশাইয়ের সেই কাগজটা টেবিলল্যাম্পের আলোতে আতশকাচ দিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তারপর তিনি টেবিলল্যাম্প নিভিয়ে দরজার পর্দা তুলে বাইরেটা দেখে এলেন। চেয়ারে বসে তিনি আস্তে বললেন—হালদারমশাই সুদর্শনবাবুকে কার্ডটার কথা বলেননি। আবার সুদর্শনবাবুরও কার্ডটা সম্বন্ধে মাথাব্যথা থাকলে হালদারমশাইকে

জানাতেন। এ থেকে আমার ধারণা কার্ডটা কেউ ইচ্ছে করেই সুদর্শনবাবুর ব্যাগের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

—কেন?

—প্রশ্নের আগে তুমি চিন্তা করো, কখন কার্ডটা ঢোকানো হয়েছিল? কলকাতা যাওয়ার জন্য উনি ব্যাগে মহালক্ষ্মীর ফোটো এবং কিছু জিনিসপত্র ঢুকিয়েছিলেন। তারপরই কার্ডটা ঢোকানো হয়েছিল। বাড়িতে এটা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই স্টেশনে যাওয়ার সময় বাসের ভিড়ে অথবা ট্রেনে ওঠার পর কেউ কার্ডটা ব্যাগে ঢুকিয়ে দেয়। তুমি লক্ষ করে থাকবে, দুদিকে বোতাম আঁটা কাপড়ের ব্যাগ। এবার তোমার প্রশ্নের একটা উত্তর দেওয়া যায়। সে জানত, সুদর্শনবাবু কোথায় যাচ্ছেন এবং কেন যাচ্ছেন। বাঁধানো ফোটো বের করলেই কার্ডটা বেরিয়ে পড়ার কথা। ওঁর হইচই বাধানোর স্বভাব। কার্ড দেখতে পেলেই উনি আমাকে দেখাতেন। লোকটা ভেবেছিল, উনি যা-ই বলুন, চন্দ্র জুয়েলার্সের কার্ড দেখলে আমার মনে ওঁর প্রতি সন্দেহ জাগবে। আমি ওঁকে অবিশ্বাস করব। তখনই ঘর থেকে বের করে দেব। নয়তো ওঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেব। কারণ ওঁর ব্যাগ থেকে কার্ডটা ছবির সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে! আমি কার্ডটা প্রখ্যাত রত্নব্যবসায়ী চন্দ্র জুয়েলারি কোম্পানির।

হাসি পেল কথাগুলো শুনে। বললুম,—কার্ডটা ঠিকই বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সুদর্শনবাবুর দৃষ্টি তখন আপনার দিকে ছিল।

কর্নেলও হাসলেন। —সুদর্শনবাবুর অজান্তে কার্ডটা পড়ার ফলে তাঁর প্রতি আমার সন্দেহ আরও প্রবল হওয়ার কথা। কিন্তু এটাই অদ্ভুত ব্যাপার জয়ন্ত, চালাকির মাত্রাটা বেশি হলেই চালাক নিজের ফাঁদে নিজেই পড়ে। কার্ড লোকে বুকপকেটে রাখে। সুদর্শনবাবুর বুকপকেটে ভিড়ের মধ্যে কার্ডটা সে ঢুকিয়ে দিতেও পারত। তা দেয়নি। কারণ সে চেয়েছিল, কার্ডটা মহালক্ষ্মীর ফোটোর সঙ্গে থাকলে ওটা ছিটকে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য।

—তা হলে সে জানত সুদর্শনবাবুর ব্যাগে মহালক্ষ্মীর বাঁধানো ছবি আছে?

—নিশ্চয়ই জানত।

—কর্নেল! এবার বলুন ভোঁদার মুখে শোনা বাঁছুবাবুটি কে?

—তুমি সুখরঞ্জনবাবু বা ঠাকমশাইকে জিগ্যেস করোনি কেন?

—ঠিক আছে। খাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করব। কাঞ্চনবাবু আপনাকে যার নাম-ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন, তিনি নিশ্চয় সেই লোক।

কর্নেল চুরুটের একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে বললেন,—গ্যারান্টি দিতে পারছি না।

—তার মানে ওটা আপনার ট্রাম্পকার্ড। তুরুপের তাস?

কর্নেল চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিলেন। কিছুক্ষণ পরে বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে সুখরঞ্জনবাবু বললেন,—আসতে পারি স্যার?

বললুম,—আসুন সুখরঞ্জনবাবু!

—আপনারা কখন ডিনার খাবেন জানতে এলুম!

কর্নেল বললেন,—শীতের রাত্রে আপনাদের কষ্ট দেব না। নটায় খেয়ে নেব।

সুখরঞ্জনবাবু চলে যাচ্ছিলেন। বললুম,—একটা কথা সুখরঞ্জনবাবু!

—বলুন স্যার?

—তখন ভোঁদা আপনার ক্লাসফ্রেন্ড কাঞ্চনবাবুর সঙ্গে কাকে দেখেছিল, তা-ই নিয়ে কর্নেলসায়েবের সঙ্গে আমার তর্ক হয়েছে। কর্নেল বলছেন, ভদ্রলোকের নাম বাঞ্ছাবাবু। লোকে বলে বাঞ্ছুবাবু। আমি বলছি বাচ্চুবাবু। কারটা ঠিক?

সুখরঞ্জনবাবু হাসতে-হাসতে বললেন,—কনকপুরে বাঞ্ছুবাবুও আছেন। বাচ্চুবাবুও আছেন। বাঞ্ছুবাবুর নাম বাঞ্ছারাম দত্ত। নামকরা ব্যবসায়ী। আর বাচ্চুবাবুর নাম বিশ্বনাথ সিংহ। বাচ্চুবাবু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। ভোঁদাকে নিয়ে প্রবলেম আছে স্যার। ও কার নাম বলছে, তা বোঝার সাধ্য কারও নেই। লোকটিকে দেখিয়ে দিলে তবে বোঝা যাবে ভোঁদা কার নাম বলছে।

—কাঞ্চনবাবুর সঙ্গে দুজনের মধ্যে কার সম্পর্ক থাকতে পারে?

—কাঞ্চন বড় চাকরি করে। সায়েব সেজে থাকে, তা-ও শুনেছি। সে ওই দুজনের সঙ্গে এক রিকশোতে বসে কোথায় যাবে? ভোঁদার একটা বদভ্যাস আছে স্যার। ওর সামনে কারও কথা নিয়ে আলোচনা করলে ও বলবে, তাকে অমুক জায়গায় দেখেছে।

কর্নেল হাসলেন। —ভোঁদা দিব্যদর্শী!

আজ্ঞে স্যার! ছেলেটা এমনিতে খুব ভালো। সরল। বিশ্বাসী। শুধু একটাই দোষ। বিশ্বসুদ্ধু লোককে ও চেনে। —বলে সুখরঞ্জনবাবু হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরে বললুম, —কর্নেল! সুখরঞ্জনবাবু দুটো গুলি ছুড়ে গেলেন। টার্গেটে কোনটা বিঁধল!

কর্নেল আস্তে বললেন,—কোনওটাই টার্গেটে বেঁধেনি।...

প্রচণ্ড শীতের আরামও আছে। সকাল আটটায় আমার ঘুম ভেঙেছিল ঠাকমশাইয়ের ডাকে। তাঁর হাতে চায়ের কাপ-প্লেট। ঠাকমশাই বিনীতভাবে বললেন—বড়সায়েব বলে গেছেন, আপনি বেড-টি খান।

বিছানায় বসে বেড-টি খাওয়ার মতো আনন্দ আর কীসে আসে, বিশেষ করে এমন শীতের সময়? চা নিয়ে বললুম,—বড়সায়েব কখন বেরিয়েছেন!

—আজ্ঞে সেই ছটায়। ফ্লাস্কে কফি তৈরি রেখেছিলুম। উনি ভোঁদাকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন!

—সুখরঞ্জনবাবু কী করছেন?

—উনি নৌকোর ব্যবস্থা করতে গেছেন। বড়সায়েব গতরাত্রে নৌকোর কথা বলছিলেন না?

বলে বাসুদেব ঠাকুর চলে গেলেন। তারপর বাথরুমে গিয়ে দাড়ি কামিয়ে বেরুলুম। রাত-পোশাক ছেড়ে প্যান্ট-শার্ট-জ্যাকেট পরে বারান্দায় গিয়ে বসলুম। নীল কুয়াশা দূরে সরিয়ে রোদ নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে, যতদূর দেখা যায়।

ন'টা নাগাদ কর্নেল ফিরে এলেন। সঙ্গে অনুগত ভোঁদা। কর্নেল ওপরে এসে যথারীতি সম্ভাষণ করলেন,—মর্নিং জয়ন্ত! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে।

—মর্নিং বস! আশা করি আজ কোথাও আরেক রাউন্ড ফায়ার করার দরকার হয়নি?

কর্নেল হাসলেন। —ভোঁদা আজ সত্যি একটা বনমুরগি আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু তাকে নিরাশ হতে হয়েছে। ওকে বললুম, দেখছ না বেচারা রোগে ভুগে আধমরা হয়ে গেছে?

বলে তিনি ঘরে ঢুকলেন। বাথরুম সেরে তিনি শুধু প্যান্টটা বদলে নিলেন। হান্টিং বুট ব্রাশ দিয়ে সাফ করলেন। টুপি থেকে মাকড়সার জালের ছেঁড়া কিছু অংশ সাফসুতরো করে বললেন, —এখনও সুখরঞ্জনবাবু ফেরেননি। দেখা যাক। ঠাকমশাইকে বলে এলুম, দশটায় ব্রেকফাস্ট করার পর কফি খাব।

সুখরঞ্জনবাবু ফিরে এলেন প্রায় আধঘন্টা পরে। খবর দিলেন,—ছই নৌকো পাওয়া গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে এসে যাবে। ওই যে বাঁধের ডাইনে খাল আছে, ওই খাল বেয়ে আসবে। বড্ড বেশি দর হাঁকছিল বেচু। ষাট টাকায় রফা হয়েছে।

ব্রেকফাস্টের পর কফি খাওয়া হল। কর্নেলের কথামতো আবার ফ্লাস্কভর্তি কফির ব্যবস্থা করলেন ঠাকমশাই। লক্ষ করলুম, একটা খাবার প্যাকেটও তৈরি হয়ে আছে। ভোঁদা খালের ধারে

গিয়ে অপেক্ষা করছিল। পৌনে এগারোটায় সে থপথপ করে ভালুকের মতো হেঁটে এসে খবর দিল, নৌকো এসে গেছে।

নৌকোটা ছোট। বেচুমাঝি কর্নেলকে হাঁ করে দেখছিল। কর্নেল বললেন, —তোমার নাম বেচু?

—আজ্ঞে হুজুর!

—তোমার নৌকোয় তো হাল বা দাঁড় নেই দেখছি!

বেচু একটু হেসে বলল,—ওসবের দরকার হয় না হুজুর। এই যে লগি দেখছেন, এই যথেষ্ট। নৌকো তো ড্যামে ঢুকবে না। এই খাল দিয়ে গিয়ে ডাকিনিতলার ঝিলে পড়বে। ঝিলে তত বেশি জল নেই। তারপর আবার খাল। হুজুর কালুখালি যাবেন শুনলুম। তা আজ্ঞে, দু-ঘণ্টা তো লাগবে।

নৌকোয় ছইয়ের সামনে বসলেন কর্নেল। ভোঁদা বসল তাঁর সামনে নৌকোর ডগায়, আমি ছইয়ের মুখে বসলুম। বেচু ভোঁদাকে চেনে দেখে অবাক হইনি। সে ভোঁদাকে বলল,—এই ভোঁদারাম! তোর নীচে ফাঁক দিয়ে দ্যাখ, একখানা দা আছে। বের করে হাতে রাখ। হুজুরদের মাথায় ঝোপঝাড়ের ডাল-লতাপাতা ঠেকতে পারে। আগেই দায়ে কেটে ফেলবি।

ভোঁদা নৌকোর তলা থেকে একটা লম্বা চকচকে দা বের করে রাখল। তার মুখে হাসি।

কর্নেল মুখে ভয়ের ছাপ ফুটিয়ে বললেন,—কী সর্বনাশ! দেখো বাবা ভোঁদা, যেন আমার মাথায় কোপ দিয়ো না।

ভোঁদা বলল,—নাঁ ছাঁর! এ কাঁছ খুঁব পাঁরি। আঁমি নাঁ? আঁমি আঁমনার ছাঁর উলথোঁ দিঁকে বঁসে নাঁ? কোঁপ—কোঁপ মাঁরব!

নৌকোর পিছনে দাঁড়িয়ে বেচু লগি ডুবিয়ে ঠেলে দিল। তারপর কখনও ছইয়ের বাঁ-পাশ, কখনও ডানপাশ দিয়ে হেঁটে নৌকো এগিয়ে নিয়ে চলল। একটু পরে কর্নেলকে চাপাস্বরে ইংরেজিতে বললুম—অন্য একটা কাজে এসে নিজের বাতিকে মেতে উঠলেন! হালদারমশাইয়ের জন্য আমার উদ্বেগ হচ্ছে! আপনার এই জলজঙ্গলে নৌযাত্রা কি পরে করা যেত না?

কর্নেল চুরুট টানছিলেন। ধোঁয়া ছেড়ে ইংরেজিতে বললেন,—জয়ন্ত! সব চেয়ে সেরা রহস্য প্রকৃতির ভিতরে লুকিয়ে আছে।

—কিন্তু এটা ক্লান্তিকর। একঘেয়ে!

—প্রকৃতিতে কত বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে তুমি জানো না!

সেই সময় খালের ওপর ঝুঁকে পড়া ঝোপের ডালে ভোঁদা দায়ের কোপ মারতেই কী একটা পাখি উড়ে গেল। কর্নেল বাইনোকুলার তুলে দেখে নিয়ে উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, —উডডাক! জয়ন্ত! দেখলে তো?

উডডাক দুর্লভ প্রজাতির পাখি। অবিকল হাঁসের মতো দেখতে। কিন্তু এ পাখি জলচর নয়। কর্নেলের পাল্লায় পড়ে উডডাকের কথা শুধু শুনেছি তা-ই নয়, তার পিছনে কতবার পাহাড়ি বনজঙ্গলে হন্যে হয়ে ঘুরেছি। ভোঁদা তার ভাষায় কী সব আওড়াল বুঝলুম না।

বেচু বলল,—ভাগ্যি ভালো হুজুর! এখন শীতের সময়। অন্যসময় হলে সাপের দেখাও পাওয়া যেত!

কর্নেল বললেন,—তুমি কোথায় থাকো?

—শেতলপুরে হুজুর! ওই যে বলছিলুম ডাকিনিতলার ঝিল। তার কাছাকাছি। এই খাল বেয়ে নৌকো আনা সহজ নয় আজ্ঞে! সুখরঞ্জনবাবু বললেন, কলকাতা থেকে সায়েবরা এসেছেন। তাই—অ্যাই ভোঁদা!

ভোঁদা খালে ঝুঁকে পড়া লতাপাতার একটা ঝালর কেটে ফেলল।

কর্নেল বললেন,—ওহে বেচু! তা হলে দেখছি, জঙ্গলের এই খাল বেয়ে নৌকো আনতে তোমার খুব কষ্ট হয়েছে।

বেচু হাসল,—আমার কী কষ্ট বড়হুজুর? আমি পাঁচখালি তল্লাটের লোক। কনকপুর তল্লাটের লোকে আমাদের বলে বুনো। অ্যাই ভোঁদা!

ভোঁদা দুদিক থেকে খালে ঝুঁকে পড়া ডাল-লতাপাতায় কোপ মারল। কর্নেল বললেন,—ভোঁদা তুমি এদিকে সরে এসো। আমাকে দা-খানা দাও! যা বলছি শোনো!

বেচু মজা পেয়ে হেসে উঠল। আমি বললুম,—বেচু! উনি একসময় মিলিটারিতে ছিলেন। মিলিটারি বোঝো?

—বুঝব না কেন ছোটহুজুর? পাঁচখালি থেকে বাংলাদেশের বডার তত দূরে নয়। ছোটবেলা থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে মিলিটারি দেখেছি।

কর্নেলকে দেখিয়ে বললুম,—ইনি সেই মিলিটারি অফিসার। ইনি কর্নেলসায়েব। জঙ্গলে-পাহাড়ে যুদ্ধ করে জীবন কাটিয়েছেন। জঙ্গলের মধ্যে যুদ্ধ করতে হলে ঝোপঝাড় কেটে এগোতে হয়। কাজেই এ কাজে ওঁর হাত পাকা।

বেচু আরও সমীহ করে বলল, —আজ্ঞে! সুখরঞ্জনবাবু যেন তা-ই বলছিলেন বটে! হ্যাঁ, হ্যাঁ। কম্লেলসায়েব!

ভোঁদা ভুতুড়ে হাসি হেসে বলল,—আঁমি দাঁনি-দাঁনি! কঁনেল সাঁয়েম!

তার 'কঁনেল সাঁয়েম' তখনই ডানধারের উঁচু গাছ থেকে ঝুলে পড়া লতার একটা বিশাল ঝালর প্রায় নিঃশব্দে কেটে ফেললেন। আমি জানি ওঁর পিঠে আঁটা কিটব্যাগে ভাঁজ করা ধারালো জঙ্গল-নাইফ আছে, তবে বেচুর দা তার চেয়ে সাংঘাতিক।

ওয়াটারড্যামের উঁচু বাঁধ বাঁদিকে রেখে অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার পর নৌকো চলল ডানদিকে। জঙ্গলের ভিতরে শীতের ঝরাপাতার স্তূপ দেখা যাচ্ছিল। প্রায় এক ঘণ্টা ক্লান্তিকর যাত্রার পর বেচু বলল,—ডাকিনিতলার ঝিলের কাছে এসে পড়েছি হুজুর!

কিছুক্ষণ পরে সামনে বিশাল আকাশ চোখে পড়ল। ঝিলের গড়ন ধনুকের মতো বাঁকা। কোথাও-কোথাও ঘন কচুরিপানার ঝাঁক। কর্নেল বললেন,—এবার কফির তৃষ্ণা পেয়েছে। ভোঁদা ওই ব্যাগটা এগিয়ে দে বাবা! জয়ন্ত! তুমি ব্যাগ থেকে কাপটা বের করো। ভোঁদা কফি খেতে পারে না। ওকে আর বেচুকে বরং বিস্কুট বের করে দাও।

দূরে ধানখেত আর ধূসর গ্রাম চোখে পড়ছিল। কফি খেতে-খেতে রোদে এতক্ষণে চাঙ্গা হয়ে উঠলুম। ঝিলের জলের একধারে কোথাও জাল পাতা আছে। ডাইনে উঁচু জমির উপর মাঝে-মাঝে কয়েকঘর করে বসতি দেখা যাচ্ছিল। ঝিলের ঘাটে ছেলেমেয়েরা জল ছিটিয়ে স্নান করছিল। আমাদের দেখে—অবশ্য কর্নেলকে দেখেই বলা উচিত, নিস্পন্দ পুতুল হয়ে যাচ্ছিল।

তারপর আবার একটা কচুরিপানাভরা খালে নৌকো ঢুকল। কর্নেল বাইনোকুলারে একটা গাছের ডালে সারসের ঝাঁক দেখার পর দ্রুত ক্যামেরার টেলিলেন্স ফিট করে ফেললেন। তারপর কয়েকটা ছবি তুললেন। ঘাটে বাঁধা ছোট-ছোট নৌকো কোথাও। বিদেশি ছবিতে দেখা অবিকল ক্যানো। সেই ক্যানো বেয়ে চলেছে কোনও মেয়ে। কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলুম,—এখানে ক্যানো দেখছি! আশ্চর্য তো!

কর্নেল মিটিমিটি হাসলেন শুধু। বেচু বলল, —হুজুর! ওগুলোকে বলে ডোঙ্গা। তালগাছের গুঁড়ি খোদাই করে তৈরি।

আবার একটা খালে নৌকো ঢুকল। দুধারে ঘন জঙ্গল। কর্নেল বললেন,—বেচু! কালুখালি আর কতদূর?

বেচু বলল,—এসে গেছি বড়হুজুর। এই খাল থেকেই কালুখালি গ্রাম। সামনে যে বাঁক দেখছেন, তার মুখেই ডাইনে-বাঁয়ে দুটো বসতি।

—তুমি দশরথকে চেনো?

কথাটা শুনেই চমকে উঠলুম। বেচু বলল,—খুব চিনি বড়হুজুর। দশরথ কেন যে এখানে পড়ে আছে কে জানে? ওর হাতের বেতের কাজ কলকাতা অব্দি একসময় চালান যেত। কনকপুরের দত্তবাবুরা ওকে দিয়ে নৌকোবোঝাই মাল নিয়ে যেতেন। তা হুজুর, দশরথের অবিশ্যি দোষ নেইকো। বুড়ো হয়ে গেল। এ তল্লাটে বেতের জঙ্গলও কমে এল। বড়জোর ধামা, চুপড়ি এইসব জিনিস তৈরি করে ওরা কনকপুরে চৈত-সংক্রান্তির গাজনের মেলায় বেচতে যায়। এ সব জিনিস সরু বেতে তৈরি হয়। আগে দশরথরা তৈরি করত মোটা বেতের চেয়ার-টেবিল। এখন অমন বেত খুঁজে পাওয়াই কঠিন।

বাঁকের মুখে গিয়ে ডানদিকের ঘাটে নৌকো রাখল বেচু। একটা গাছের গুঁড়িতে দড়ি দিয়ে নৌকোর ডগার দিকটা বেঁধে দিল। কর্নেল একলাফে নেমে গিয়ে বললেন,—ভোঁদা! ব্যাগটা নিয়ে এসো।

নৌকোর ডগা টলমল করছিল। বেচু তার বাঁশের লগি আমাকে ধরতে বলল। টাল সামলে নেমে গেলুম। কর্নেল বললেন, —বেচু! তুমি তোমার নৌকোয় বসে থাকো। আমরা বেশি দেরি করব না।

ঘড়ি দেখলুম। একটা বেজে গেছে। ঢালু পাড় বেয়ে উপরে উঠে দেখি, একদল নানাবয়সি নর-নারী, কাচ্চা-বাচ্চা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেল একজনকে বললেন,—দশরথ কোথায়?

অবাকচোখে কর্নেলকে সবাই দেখছিল। যে লোকটাকে কর্নেল দশরথের কথা জিজ্ঞেস করলেন, সে শুধু আঙুল তুলে একটা কুঁড়েঘরের সামনে একটা গাছের তলায় বাঁশের মাচানে বসে থাকা এক বৃদ্ধকে দেখাল।

আমরা তার কাছে যেতেই সে চোখ তুলে তাকাল। কর্নেল বললেন, —তুমি দশরথ?

দশরথের পরনে খাটো ধুতি। খালি গা। মোটাসোটা মানুষ। সে বলল,—কে বলছেন আজ্ঞে? চোখে ভালো দেখতে পাইনে।

সেই লোকটা বলল,—দুই সায়েব তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন দাশুখুড়ো!

কর্নেল বললেন,—কলকাতা থেকে এসেছি!

দশরথ মাচা থেকে নেমে ঝুঁকে প্রণাম করে বলল,—আমার সৌভাগ্য সার! ও রঘু! সারদের বসতে দে। মাদুরখানা এনে মাচানে পেতে দে শিগগির!

কর্নেল দশরথের কাঁধে হাত রেখে বললেন,—তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না দশরথ! আমি বসব না। শোনো! আমার এক বন্ধুর হাতে তোমার তৈরি ছড়ি দেখেছিলুম। সেই ছড়ি দেখে আমার খুব লোভ হয়েছে। বুঝলে? মোটা বেতের ছড়ি। মাথার দিকটা ছাতার বাঁটের মতো বাঁকানো। কালো রঙের বাঁট। বাঁটটা ঘোরালে খুলে যায়। কনকপুরের জমিদারবাড়ির সুদর্শনবাবুকে তুমি ওইরকম একটা ছড়ি তৈরি করে দিয়েছিলে। তাই না?

—আজ্ঞে সার! বুঝেছি! তবে ওরকম বেত খুঁজে পাওয়া আজকাল কঠিন!

—তোমাকে আমি অগ্রিম পুরো টাকাই দিয়ে যাব। বলো, কত টাকা দিতে হবে!

দশরথ হাসবার চেষ্টা করে বলল, —কথা দিয়ে যদি কথা রাখতে না পারি সার?

—তুমি পারবে। ওইরকম বেত খুঁজতে হলে তুমি এ বয়সে একা তো পারবে না।

—আজ্ঞে! আমার নাতি কানু এসব খোঁজখবর রাখে!

—তাকে বখশিস দেব। কোথায় সে?

একজন লোক বলল,—কানু আমার ছেলে সার। উনি আমার বাবা। কানু বেত কাটতেই গেছে। আমাদের সার বেত নিয়েই কাজ। দলবেঁধে ওরা জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। খুব কষ্টের কাজ।

কর্নেল আমাকে অবাক করে দশরথের হাতে একটা একশোটাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, —একশোটাকা রাখো। ছড়ি তৈরি হলে তোমার নাতিকে দিয়ে ইরিগেশন বাংলোর সুখরঞ্জনবাবুকে পৌঁছে দিয়ো। উনি আমাকে কলকাতায় ছড়িটা পৌঁছে দেবেন। ইরিগেশন বাংলো তুমি নিশ্চয় চেনো?

দশরথকে চঞ্চল দেখাচ্ছিল। সে বলল,—চিনি বইকি সার! তবে আগাম টাকা—

কর্নেল তাকে বাধা দিয়ে বললেন,—টাকা নিয়ে ভেবো না। শুনেছি তুমি কমাস আগে কনকপুরের এক ভদ্রলোককেও ওইরকম ছড়ি তৈরি করে দিয়েছ?

দশরথ হাসল। —আজ্ঞে সার! দিয়েছি বটে। অনেক খুঁজে মোটা বেতখানা পেয়েছিলুম।

—কী যেন নাম ভদ্রলোকের?

—দত্তবাবু। বাঞ্ছারাম দত্ত। দশ-বারো বছর আগে ওনাকে মোটা বেতের চেয়ার-টেবিল তৈরি করে দিতুম। নৌকো বোঝাই করে নিয়ে যেতেন। কলকাতায় চালান দিতেন।...

সেচবাংলোয় ফিরতে বিকেল চারটে বেজে গিয়েছিল। সুখরঞ্জনবাবু কর্নেলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,—দশরথের সঙ্গে দেখা হল স্যার? কী বলল?

কর্নেল বললেন,—অ্যাডভান্স দিয়ে এসেছি। ছড়ি তৈরি হলে আপনার কাছে পৌঁছে দেবে। আপনি যখন সময় পাবেন, কলকাতা গেলে আমাকে দিয়ে আসবেন।

আমি বলেছিলুম,—লোকটা এখনও গরিব থেকে গেছে কেন, বোঝা গেল না!

সুখরঞ্জনবাবু বলেছিলেন,—বন্যা স্যার! দু-একটা বছর অন্তর বন্যা! বন্যায় ওদের ঘর-সংসারের সবকিছু ভেসে যায়। তবু ওখানে না থেকেও ওদের উপায় নেই। শুধু বেত নয়, ওই এলাকায় বাঁশঝাড়ও প্রচুর। বাঁশ থেকেও ওরা কতরকম জিনিস তৈরি করে। বাঁশ অবশ্য কিনতে হয়। বেত কিনতে হয় না। তবে স্যার বলতে নেই—এই ওয়াটারড্যাম করেই বন্যা বেড়ে গেছে। বেশি বৃষ্টি হলেই জল ছেড়ে দেওয়ার অর্ডার আসে। হিতে বিপরীত হয়েছে। তা স্যার, আপনাদের খাওয়াদাওয়া?

কর্নেল বলেছিলেন,—ডাকিনিতলার ঝিলের ধারে নৌকো বেঁধে লুচি-আলুরদমের শ্রাদ্ধ করেছি। বেচু অবশ্য কাছেই তার বাড়িতে খেতে গিয়েছিল।

সুখরঞ্জনবাবু পা বাড়িয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন, চাপাগলায় বলেছিলেন,—দুপুরে কনকপুর বাজারে গিয়েছিলুম। রানিপুরের একজন চেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁর কাছেই একটা সাংঘাতিক কথা শুনলুম স্যার!

—সাংঘাতিক কথা মানে?

—কাঞ্চনকে কলকাতায় কারা নাকি মার্ডার করেছে। আজ সকালে ওর দাদা প্রাণকান্তবাবুর কাছে খবর এসেছিল। উনি খবর পেয়েই কলকাতা গেছেন।

—বলেন কী? কাঞ্চনবাবুর সঙ্গে আমার তত বেশি চেনাজানা ছিল না। কিন্তু ভদ্রলোক খুন হয়ে গেলেন! আশ্চর্য তো!

—স্যার! আমিও খুব অবাক হয়েছি। খারাপ লাগছে। আফটার অল একসময় আমার ক্লাসফ্রেন্ড ছিল। একটু চাপা স্বভাবের ছেলে ছিল। তবে ওকে ব্যাড বয়দের দলে ফেলা যেত না।

—যাকগে! আমরা ক্লান্ত। ঠাকমশাইকে কফির তাগিদ দিন। হ্যাঁ—একটা কথা শুনে যান। আপনাদের ভোঁদার কানে যেন ওই খারাপ খবরটা না পৌঁছয়।

—আমার মাথাখারাপ স্যার? ভোঁদা বলছিল, কদিন আগে নাকি তাকে কার সঙ্গে কনকপুর বাজারে দেখেছে! ভোঁদার স্বভাব বড্ড বাজে। পুলিশের কানে গেলে ওকে লক-আপে ঝোলাবে না?

—ঠাকমশাই রানিপুরের লোক। তাঁকে বলেছেন নিশ্চয়?

—বলেছি। উনিও অবাক।

—উনি ভোঁদার কানে খবরটা তুলবেন না তো?

সুরঞ্জনবাবু মাথা নেড়ে বললেন,—আমি অলরেডি ঠাকমশাইকে সাবধান করে দিয়েছি।

—বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছেন।

সুখরঞ্জনবাবু চলে গিয়েছিলেন। আমি বাথরুমে ঢুকে গরমজলে হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়েছিলুম। কিছুক্ষণ পরে বারান্দা থেকে কর্নেল ডাকলেন,—জয়ন্ত! কফি! নার্ভ চাঙ্গা করে নাও।

বারান্দায় গিয়ে বসলুম। কফিতে চুমুক দিয়ে বললুম,—প্রশ্নটা করার সুযোগ পাইনি। হঠাৎ আপনার মাথায় বেতের ছড়ির বাতিক চাগিয়ে উঠল কেন? আপনার ঘরে অনেক সুন্দর ছড়ি দেখেছি। একটাও ব্যবহার করতে আজ পর্যন্ত দেখিনি। সুদর্শনবাবুর ছড়িটা নেহাত ছড়ি।

—কুটিরশিল্পের সৌন্দর্য তুমি বুঝবে না জয়ন্ত! তাই ও নিয়ে কোনো কথা নয়। কফি খেয়ে তৈরি হয়ে নাও। বেরুব।

—সর্বনাশ! আবার কোথায় যাবেন?

—কনকপুর!

—পায়ে হেঁটে!

—পায়ে হেঁটে। নৌকোয় পাঁচ-ছঘণ্টা বসে পায়ে বাত ধরে গেছে। পেশি সচল করা দরকার।

—কিন্তু এখনই তো সন্ধ্যা হয়ে এল!

—তাতে কী? কনকপুর পর্যন্ত দুধারে লাইটপোস্ট আছে। ওই দেখো, আলো জ্বলে উঠল।

—কাল সন্ধ্যায় এই আলোগুলো জ্বলতে দেখিনি!

বোধহয় বিদ্যুতের যে ফেস থেকে এই রাস্তার আলো জ্বলে, সেটা খারাপ ছিল। যাই হোক, আলো নিয়ে আলোচনায় লাভ নেই। —কর্নেল হাসতে-হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ঘরে গিয়ে বললেন,—টর্চ নেবে। লোডেড ফায়ার আর্মস সঙ্গে নেবে।

ভিতরে গিয়ে বললুম,—আপনার সেই বনমুরগি বাঁদিকের বন থেকে সাড়া দেবে না তো?

কর্নেল হাসলেন। —কাল এসেই বাইনোকুলারে দেখে হিসেব করে নিয়েছি। কনকপুরগামী পিচরাস্তা থেকে বাঁদিকের জঙ্গলের দূরত্ব অন্তত একশো মিটারের বেশি। ডানদিকে অনেকদূর অবধি ধানক্ষেত। তারপর কনকপুরের আগে ডানদিকে বিদ্যুতের সাবস্টেশন। আলোয়-আলোয় ছয়লাপ। তার চেয়ে বড় কথা, চন্দ্র জুয়েলার্স কোম্পানির এজেন্ট কাঞ্চন সেন খুন হয়ে যাওয়ার খবর ইতিমধ্যে রটে গেছে। আর কিছু বলার দরকার আছে কি?

—নাঃ! আমাদের প্রতিপক্ষ সতর্ক হয়ে গেছে।...

ভোঁদা আমাদের সঙ্গী হতে চেয়েছিল। সুখরঞ্জনবাবুও বলেছিলেন,—ওকে নিয়ে যান স্যার। যেখানে যেতে চান, ও সেখানে পৌঁছে দেবে। রিকশোওয়ালারা কাছের জায়গাকে দূর বানিয়ে ছাড়বে।

কর্নেল বললেন,—কনকপুর আমার চেনা জায়গা। ভোঁদাকে দরকার হবে না।

প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা একেবারে জনহীন। বিদ্যুতের সাবস্টেশন পেরিয়ে গিয়ে বাঁদিকে খেলার মাঠ। ক্রিকেট ব্যাট হাতে একদল ছেলে তখনও দাঁড়িয়ে কী নিয়ে তর্কাতর্কি করছে। ডাইনে দোতলা বাড়িটার শীর্ষে আলো জ্বলছিল দেখলুম, বড়-বড় হরফে লেখা আছে 'ফণিভূষণ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়।'

একটু পরে মানুষজন আর সাইকেলরিকশোর আনাগোনা দেখা গেল। একটা সাইকেলরিকশো দাঁড় করিয়ে কর্নেল বললেন,—থানায় যাব।

রিকশোওয়ালা বলল,—দশ টাকা লাগবে সার!

কর্নেল উঠে বসলেন। তাঁর তাগড়াই গড়নের জন্য পুরো গদিটাই দরকার ছিল। ঠাসাঠাসি চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে বসলুম। কর্নেল রিকশোর হুড তুলে দিলেন। বসতি এলাকার বড় রাস্তায় এই শীতসন্ধ্যাতেও যানবাহন আর মানুষের ভিড়। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ছোট রাস্তায় একটার পর একটা ঝাঁক নিতে-নিতে যেখানে পৌঁছলুম, সেখানে ঘন বসতি নেই। গাছপালার ফাঁকে বাড়িগুলোকে দেখে সরকারি অফিসের কোয়ার্টার মনে হচ্ছিল। তারপর একটা চওড়া রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে রিকশো থামল। রিকশোওয়ালা বলল,—এসে গেছি সার!

ডাকদিকে থানার গেট। গেটে বেয়নেট লাগানো বন্দুক হাতে সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে ছিল। আগে কর্নেল, তারপর আমি নামলুম। রিকশোওয়ালা টাকা পেয়ে সেলাম ঠুকে বলল,—সায়েবদের দেরি না হলে আমি এখানে অপেক্ষা করব। বলুন সার!

কর্নেল বললেন,—তুমি চলে যাও। আমাদের অনেক দেরি হবে।

রিকশোওয়ালা রিকশো ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। কর্নেলকে অনুসরণ করলুম। কয়েকধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে সদর দরজায় পৌঁছে কর্নেল বেঞ্চে বসে থাকা একজন কনস্টেবলকে বললেন,—ও. সি. মিঃ ভাদুড়ির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

কনস্টেবল তর্জনী তুলে কোনার একটি ঘর দেখিয়ে দিল। সেই ঘরের দরজার পর্দা তুলে কর্নেল বললেন,—আসতে পারি? আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

—আপনিই কর্নেল নীলাদ্রি সরকার? আসুন! আসুন স্যার!

কর্নেলের সঙ্গে ভিতরে ঢুকলুম। কর্নেল তাঁর নেমকার্ড এগিয়ে দিলেন। টেবিলের ওধারে একজন মধ্যবয়সি উর্দিপরা অফিসার কার্ডটি দেখার পর উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে কর্নেলের সঙ্গে করমর্দন করলেন। সামনের চেয়ারে একজন ধুতিপাঞ্জাবি পরা স্থূলকায় ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁর গায়ে শাল এবং মাথায় মাফলার জড়ানো। তিনি কর্নেলকে দেখছিলেন। কর্নেল বললেন,—পরিচয় করিয়ে দিই। আমার তরুণ বন্ধু সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি।

ও. সি. মিঃ ভাদুড়ি আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন,—আপনারা বসুন প্লিজ! তারপর সেই ভদ্রলোকের দিকে ঘুরে তিনি বললেন,—ঠিক আছে অমলবাবু! আমি দেখব কী করা যায়। আপনি কাল বেলা এগারোটার পর একবার টেলিফোন করবেন। আসবার দরকার নেই। নমস্কার।

ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন। তাঁর কাছাকাছি বাঁদিকের চেয়ারে একজন পুলিশ অফিসার ফাইল হাতে বসেছিলেন। মিঃ ভাদুড়ি বললেন, —রমেনবাবু! স্বনামধন্য কর্নেলসায়েবের কথা আপনাকে বলেছি। আপনি গেস্টদের পথ্য কফি আর স্ন্যাকসের ব্যবস্থা করুন। ফাইল রেখে যান।

রমেনবাবু তখনই উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে কর্নেলকে তারপর আমাকে নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন। তারপর মিঃ ভাদুড়ি বললেন,—পুলিশ সুপারের মেসেজ পেয়েছি আজ দুপুরে। বিকেলে ভাবছিলুম, ইরিগেশন বাংলোয় আপনার সঙ্গে দেখা করে আসব। আসলে আমার ব্যক্তিগত কৌতূহল। ও. সি. হাসলেন। —আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলুম আমার এক কলিগের কাছে। তিনি আই. বি.-তে ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—গুজবে কান দেবেন না। তো প্রথমেই একটা কথা জেনে নিই। কলকাতা থেকে প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ কে. কে. হালদার এসেছেন। উনি কি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন?

—হ্যাঁ স্যার! আজ দুপুরে এসেছিলেন উনি। ওঁকে প্রয়োজনে সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছি। উনি তো একেবারে ঘটনাস্থলে গেস্ট হয়ে আছেন। ওঁকে সাবধানে থাকতে বলেছি। উনি একটা লোকের চেহারা আর পোশাকের বর্ণনা দিয়েছেন। আমাদের সোর্সকে বলেছি, তাকে শনাক্ত করবে।

—আর-একটা কথা। আপনার এরিয়ায় রানিপুর গ্রামের এক ভদ্রলোক কলকাতায় চাকরি করতেন। কলকাতায় তাঁর ঘরেই কেউ তাঁকে গত পরশু রবিবার সন্ধ্যায় মার্ডার করেছে।

মিঃ ভাদুড়ি আস্তে বললেন,—হ্যাঁ স্যার। ডি. আই. জি. সায়েবের মাধ্যমে একটা কেস ফাইল হয়েছিল। পুলিশ সুপার ফাইলটা আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

—কাঞ্চন সেন সম্পর্কে?

ও. সি. একটু হেসে বললেন,—আপনি সম্ভবত আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছেন স্যার!

—জানি না। শুধু জানতে চাইছি, কাঞ্চনবাবু সম্পর্কে খোঁজখবর আপনারা নিয়েছেন কি না।

—কাঞ্চনবাবু ক'দিন আগে কনকপুর এসেছিলেন। আমাদের সোর্স থেকে এ খবর পেয়েছি।

এই সময় একজন কনস্টেবল ও সেই পুলিশ অফিসার ট্রেতে কফি আর পটাটোচিপস, চানাচুর নিয়ে এলেন। ও. সি. বললেন,—রমেনবাবু! আমরা কিছু কনফিডেনশিয়াল কথা সেরে নিই। কেমন?

রমেনবাবু ও কনস্টেবলটি তখনই বেরিয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন, —আমার ধারণা, মিঃ হালদার যে লোকটির পরিচয় জানতে চেয়েছেন, রায়বাড়িতে তার অবাধ গতিবিধি আছে। তা ছাড়া, লোকটা সম্ভবত স্থানীয় ব্যবসায়ী বাঞ্ছারাম দত্তের কর্মচারী। আমার ধারণার ভিত্তি আছে মিঃ ভাদুড়ি।

মিঃ ভাদুড়ি নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিলেন। আস্তে বললেন,—আই সি!

—আরও বলছি। সে রবিবার সকালের ট্রেনে কলকাতা গিয়েছিল। সেদিন সে কলকাতায় ছিল। সন্ধ্যায় কাঞ্চন সেনকে খুন করে সে সেই রাত্রে কনকপুরে ফিরে এসেছিল। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, আমি তাকে দেখেছি।

—মাই গুডনেস! কোথায় দেখেছেন তাকে?

—গতকাল বিকেলে ইরিগেশন বাংলো থেকে ওয়াটারড্যামের বাঁধের পথে আমি যাচ্ছিলুম। আমার সঙ্গে বাংলোর ভোঁদা নামে একটি ছেলে ছিল। লোকটা আমাকে গুলি করে মারার জন্য ডানদিকের ঢালু জমিতে ঝোপের আড়ালে বসে পড়ার আগেই তাকে আমি দেখে ফেলেছিলুম। আমার সামরিক জীবনের অভ্যাস মিঃ ভাদুড়ি! বিশেষ করে বনজঙ্গলে চলার সময় আমি ১৮০ ডিগ্রি বরাবর নজর রাখি।

—তারপর?

—সে তৈরি হওয়ার আগেই আমার লাইসেন্সড সিক্সরাউন্ডার রিভলভার থেকে ঝোপের গোড়ায় এক রাউন্ড ফায়ার করেছিলুম। অমনই সে গুঁড়ি মেরে ঝোপের আড়াল দিয়ে পালিয়ে যায়। বাইনোকুলারে একটু পরে তাকে জঙ্গলে গা ঢাকা দিতে দেখি। ভোঁদা একটু বোকাসোকা। তাকে বলেছিলুম, বনমুরগি মারতে গুলি করলুম। বনমুরগিটা পালিয়ে গেল।

—ও মাই গড! কর্নেলসায়েব! শয়তানটা কে আমি তা বুঝতে পেরেছি। আজ রাতেই তাকে লক-আপে ঢোকাব। আপনি প্লিজ ঘটনাটা উল্লেখ করে একটা ডায়রি করুন। কারণ তার গার্জেন প্রভাবশালী লোক।

—করছি। এবার বলুন, রায়বাড়ির গৃহদেবীর মুকুট আর জড়োয়া নেকলেস চুরির কেসে কি এগোতে পারছেন না?

—সমস্যা হল, প্রাথমিক তদন্তের পর মনে হয়েছিল ওঁদের দুই ভাইয়ের মধ্যে যে-কোনো একজন চুরি করে জুয়েলস বিক্রি করে দিয়েছেন। দুই ভাইকে জেরা করা হয়েছে প্রথমে পৃথক-পৃথকভাবে। পরে দুজনকে একসঙ্গে পাশাপাশি বসিয়ে জেরা করা হয়েছে। এতটুকু সন্দেহজনক কথার আভাস মেলেনি। দ্বিতীয় দফায় ওঁদের কাজের লোক গোবিন্দ ও হরিপদকে সরাসরি অ্যারেস্ট করেছিলুম। কিন্তু তাদের কাছেও কোনো সন্দেহজনক সূত্র পাইনি। অগত্যা আপাতত জামিনে ছেড়ে দিয়েছি। তবে একটা ক্ষীণ সূত্র ওঁদের কাজের মেয়ে শৈলবালার কাছে পেয়েছিলুম। বছর তিনেক আগের কথা। সন্ধ্যা থেকেই লোডশেডিং ছিল। সুদর্শনবাবুর ঘরের তালা সেই সুযোগে কেউ ভাঙছিল। শৈলবালা নাকি চাপা শব্দটা শুনেই উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে চুপি-চুপি উঠে যাচ্ছিল। সিঁড়িতে কেউ তাকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়।

—কিন্তু তারপরও তো মহালক্ষ্মীর জুয়েলস চুরি যায়নি।

—যায়নি। তবে শৈলবালার সন্দেহ, সে-ই পরে জুয়েলস চুরি করেছে।

—লোকটাকে কি শৈলবালা চিনতে পেরেছিল?

—আবছা আঁধারে লোকটাকে চেনা মনে হয়েছিল তার। কিন্তু সাহস করে কাউকে বলতে পারেনি। যদি সত্যিই সেই লোকটা না হয়?

মিঃ ভাদুড়ি হেসে উঠলেন। কর্নেল বললেন,—আপনাদের কি সে বলেছে, কোন লোকটার কথা সে ভেবেছিল?

মিঃ ভাদুড়ি আরও হাসলেন। তারপর বললেন,—শৈলবালা ভেবেছিল সুদর্শনবাবুই তাকে সিঁড়িতে ধাক্কা মেরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। বিদ্যুৎ আসার পর তিনিই নাকি বাড়ি ফিরে এসে হইচই বাধান!

কর্নেলও হাসলেন। —নিজেই নিজের ঘরের তালা কেন ভেঙেছিলেন সুদর্শনবাবু, এ বিষয়ে শৈলবালার কী ধারণা?

—আপনাকে বলেছি, শৈলবালার সন্দেহ অনুসারে সুদর্শনবাবুই চোর। জেরার পর শৈলবালা বলেছে, আগে থেকে নিজেকে—শৈলবালার ভাষায় 'নিদুষি'—অর্থাৎ নির্দোষ সাব্যস্ত করে রাখার মতলবে কাজটা তাদের ছোটবাবু করে থাকতে পারেন।

—ছোটবাবু, মানে সুদর্শনবাবু?

—হ্যাঁ। শৈলবালার কথার অর্থ দাঁড়ায় : এভাবে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করে রেখেছিলেন ছোটবাবু! পয়েন্টটা অবশ্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হুঁ। যায় না। —কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরালেন।—এর সঙ্গে কাঞ্চন সেনের সম্প্রতি কনকপুরে আসার ব্যাপারটা জুড়ে দিলে একটা কেস দাঁড় করানো যায়!

মিঃ ভাদুড়ি আস্তে বললেন,—আপনি কাঞ্চন সেনের ব্যাকগ্রাউন্ড জেনে এসেছেন বলে আমার ধারণা। ভদ্রলোক কলকাতার এক বিখ্যাত জুয়েলারি কোম্পানিতে চাকরি করতেন।

—চন্দ্র জুয়েলার্স কোম্পানির এজেন্ট ছিলেন। চোরাই জুয়েলস কেনা-বেচার যোগসূত্র এই এজেন্টরা। মিঃ ভাদুড়ি! কাঞ্চন সেন এখানে এসে রায়বাড়িতে ওঠেননি, এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

—আপনি সিওর?

—হ্যাঁ, আমার হাতে তথ্য আছে, কাঞ্চন সেন গত শুক্রবার এসে সেদিনই কলকাতা ফিরে যান। তারপর আবার শনিবার এখানে আসেন এবং সেদিনই কলকাতা ফিরে যান। রবিবার সন্ধ্যায় তাঁকে মার্ডার করা হয়। আগেই বলেছি, তাঁর চেনা লোক তাঁকে মার্ডার করেছে।

—খুনিকে আজ রাত্রেই ধরে ফেলব।

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—অবশ্য যদি সে কনকপুরে থাকে!

—দেখা যাক।

—কাঞ্চন সেনের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আমার একটা অতিরিক্ত দায়িত্ব আছে। আমি অনুশোচনায় ভুগছি মিঃ ভাদুড়ি! সেই কারণে তার খুনি শিগগির ধরা পড়ুক, এটা আমি চাই। হাতের কার্ড আমি নাকি পুলিশকে দেখাই না বলে পুলিশমহলে একটা ধারণা আছে। আমি আপনাকে অন্তত এ ব্যাপারে আমার হাতের কার্ড দেখাতে চাই।

মিঃ ভাদুড়িকে বিস্মিত লক্ষ করছিলুম। আমিও বিস্মিত। কারণ কর্নেলের মধ্যে এমন ভাবাবেগ আমি কখনও দেখিনি। মিঃ ভাদুড়ি বললেন,—বলুন স্যার! আমার পক্ষ থেকে যতটা করা সম্ভব আমি করব।

কর্নেল জ্যাকেটের ভিতর থেকে কাঞ্চন সেনের সেই কার্ডটা মিঃ ভাদুড়িকে দেখতে দিলেন। তারপর তিনি কার্ডটা ফেরত নিয়ে গত রবিবার বিকেলে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে কাঞ্চন সেনের কার্ড ফেরত নিতে আসার ঘটনা সবটাই বললেন। কিন্তু কার্ডটা কীভাবে তাঁর হাতে এসেছিল, সেই অংশটা চেপে গেলেন। —মিঃ ভাদুড়ি! কাঞ্চন সেন আমাকে যে নাম-ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন, তা এখনই আপনাকে জানাচ্ছি না। আমার বিশ্বাস, এই নাম-ঠিকানা আপনারা নিজেরাই পেয়ে যাবেন। কাঞ্চন সেনের খুনি নিশ্চয় আমার বাড়ি পর্যন্ত গোপনে তাঁকে ফলো করে গিয়েছিল। তারপর সে কাঞ্চন সেনের ঘরে তাঁর সঙ্গে দেখা করার ছলে যায়। আমার পরিচয় খুনি তার মালিকের কাছে আগেই পেয়েছিল।

—আপনি সিওর হলেন কী করে?

—যথাসময়ে জানতে পারবেন। এরপর খুনি কাঞ্চন সেনের কাছে যায়। কার্ড হারিয়ে চাকরি যাওয়ার আশঙ্কায় কাঞ্চন সেনের মানসিক অবস্থা সুস্থ থাকার কথা নয়। আমার ধারণা, খুনির সঙ্গে তাঁর বন্ধুতার সম্পর্ক ছিল। কারণ কনকপুর হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন কাঞ্চনবাবু। এমন হতেই পারে, কথায়-কথায় তিনি খুনিকে জানিয়েছিলেন, কার্ড আমার কাছে আছে। তা ফেরত পাওয়ার শর্তও মুখ ফসকে তিনি বলে ফেলেছিলেন। কাজেই মালিকের নির্দেশমতো খুনি চিরকালের জন্য তাঁর মুখ বন্ধ করে দেয়। তারপর—

মিঃ ভাদুড়ি কর্নেলের কথার ওপর বললেন,—তারপর সে চিরকালের জন্য আপনার মুখও বন্ধ করার জন্য ওয়াটারড্যামের কাছে জঙ্গলে ওত পেতে বসে ছিল।

ঠিক তা-ই। —বলে কর্নেল ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালেন। —একটা কথা। রায়বাড়ির দুই ভাই কে কোথায় চাবি লুকিয়ে রেখেছিলেন, তা জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?

ও. সি. মিঃ ভাদুড়িও উঠে দাঁড়ালেন। একটু হেসে বললেন, —হ্যাঁ। তবে ওঁরা একে অন্যকে লুকিয়ে গোপনে আমাকে জানিয়েছেন। দেখিয়েছেনও।

কর্নেল হাসলেন। —বড়বাবু পুরোনো শাস্ত্রীয় বৃহৎ পঞ্জিকার ভিতরে গর্ত কেটে আর ছোটবাবু তাঁর ছড়ির ভিতরে চাবি লুকিয়ে রাখতেন।

—আমি আপনার কথায় অবাক হচ্ছি না স্যার! শুনেছি, পিছনেও আপনার একটা চোখ আছে।

—নাঃ। প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ হালদার আমার সোর্স, মিঃ ভাদুড়ি!

মিঃ ভাদুড়ি চেয়ার থেকে উঠে এলেন। —আপনারা এখন কি সেচ-বাংলোয় ফিরে যাবেন?

—হ্যাঁ। দেখি, কোনো রিকশোওয়ালাকে রাজি করাতে পারি নাকি!

—ওদের তো একটা জিপগাড়ি আছে! আপনি বললেই নিশ্চয় পেতেন।

—ইঞ্জিনিয়ার মিঃ গোস্বামী গাড়িটা দিতে চেয়েছিলেন। আমি নিইনি।

—ঠিক আছে। রমেনবাবুকে বলছি, আমাদের গাড়িতে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন। শীতের রাত্রে ইরিগেশন বাংলোতে যেতে কোনো রিকশোওয়ালাই রাজি হবে বলে মনে হয় না।

পা বাড়িয়ে হঠাৎ কর্নেল ঘুরে দাঁড়ালেন। আস্তে বললেন,—কাল সকাল দশটা থেকে তৈরি থাকবেন। যে-কোনো সময় আপনার সদলবলে রায়বাড়ি যাওয়ার দরকার হতে পারে।

মিঃ ভাদুড়ি হাসলেন। —আবার বলছি, অবাক হচ্ছি না স্যার! পুলিশ সুপার মিঃ রাজেশ কুমার আমাকে প্রায় হুমকি দিয়ে রেখেছেন, আপনার কাছে যা-কিছুই শুনি, যেন মাথা ঠিক রাখি। মাই গুডনেস! এক মিনিট স্যার! আপনাকে একটা ডায়রি করতে বলেছিলুম। ভুলে গেছি। স্বার্থটা আমারই। একটা আইনগত ভিত্তি থাকা দরকার।

তিনি টেবিলের কাছে গিয়ে একটা প্যাড টেনে নিলেন। —আপনি সংক্ষেপে চিঠির মতো করে ঘটনাটা লিখে দিয়ে সই করুন। আমাকে অ্যাড্রেস করে লিখবেন। ততক্ষণে আমি রমেনবাবুকে জিপের ব্যবস্থা করতে বলি।...

সেচবাংলোয় ফিরে গিয়ে দেখি, হালদারমশাই নীচের ঘরে সোফায় বসে আছেন। পাশে একটা মাঝারি সাইজের ব্যাগ। আমাদের দেখে তিনি তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন—ওপরে চলেন কর্নেলস্যার। সব কইতাছি।

দোতলায় আমাদের ঘরে ঢুকে তিনি শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বললেন, —সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ দুই ভাইয়ে কী লইয়া ঝগড়া বাধছিল। আমি থামাইতে গেছলাম। দুইজনেই আমারে কইলেন, ওনাগো ডিটেকটিভের দরকার নাই। আমিই নাকি ওনাগোর মইধ্যে গণ্ডগোল বাধাইতে আইছি। কর্নেলস্যার! আমারে অকারণে দুইজনে ইনসাল্ট করল। হেভি মিস্ট্রি!...

হালদারমশাইয়ের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল আমাদের পাশের ঘরে। সকাল আটটায় বাসুদেব ঠাকুর বেড-টি এনে আমার ঘুম ভাঙিয়েছিলেন। তিনি বললেন,—বড়সায়েব আর হালদারসায়েব ভোরবেলা বেড়াতে বেরিয়েছেন। ভোঁদাকে সঙ্গে নেননি বলে বেচারা মনমরা হয়ে বসে আছে।

ঠাকমশাই হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বেড-টি খেতে-খেতে মনে পড়েছিল গত রাত্রে কর্নেল ও. সি. মিঃ ভাদুড়িকে আজ সকাল দশটা থেকে তৈরি থাকতে বলেছেন। যে-কোনো সময়ে তাঁকে সদলবলে রায়বাড়ি যেতে হতে পারে। তা হলে কি আজ হালদারমশাই-কথিত 'হেভি মিস্ট্রি'-র পর্দা তুলবেন কর্নেল?

উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিলুম। বাথরুম সেরে সেজেগুজে বারান্দায় গিয়ে বসেছিলুম। কিছুক্ষণ পরে কর্নেল ও গোয়েন্দাপ্রবরকে গেটে ঢুকতে দেখলুম। ওপরে এসে কর্নেল অভ্যাসমতো সম্ভাষণ করলেন, —মর্নিং জয়ন্ত! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে।

বললুম,—মর্নিং কর্নেল! হাড়কাঁপানো শীতের ভোরে হালদারমশাইকে ওয়াটারড্যামের হিম খাইয়ে জব্দ করেছেন। তাই না হালদারমশাই?

হালদারমশাই সহাস্যে বললেন,—আমাদের জব্দ করে কেডা? পঁয়তিরিশ বৎসরের পুলিশ-লাইফে অনেক ড্যাঞ্জারাস হিম খাইছি।

তিনি আমার পাশের চেয়ারে বসলেন। কর্নেল ঘরে ঢুকে গেলেন। বললুম,—প্রাতঃকৃত্য করবেন না?

—প্রাতঃকৃত্য কইরাই বাইরাইছিলাম।

চুপি-চুপি বললুম,—কর্নেল বলেননি, আজ দশটায় রায় বাড়ি যাবেন?

প্রাইভেট ডিটেকটিভ হাসিমুখে বললেন,—ওয়েট অ্যান্ড সি।

একটু পরে ভোঁদা কফি আর স্ন্যাক্সের ট্রে এনে টেবিলে রাখল। তার মুখটা বেজায় গম্ভীর। সে চলে যাচ্ছিল। কর্নেল বেরিয়ে এসে ডাকলেন,—ভোঁদা! তুমি খেয়েদেয়ে তৈরি থেকো। আমরা সাড়ে ন'টা নাগাদ বেরুব। আর শোনো! আমাকে যে জিনিসগুলো দেখিয়েছিলে, সেগুলো একটা চটের ব্যাগে ঢুকিয়ে নেবে। রাত্রে সুখরঞ্জনবাবুকে বলে রেখেছি। তাঁর কাছে চটের থলে পেয়ে যাবে।

ভোঁদার মুখে হাসি ফুটল। সে বলল,—সুঁকুবাঁবু কঁকপুরে পাঁজা কঁত্তে না? ছাঁইকেঁলে না?

—বুঝেছি। নটার মধ্যে উনি এসে যাবেন।

ভোঁদা থপথপ করে চলে গেল। বললুম,—কী ব্যাপার? ভোঁদা চটের ব্যাগে কী নেবে?

কর্নেল চেয়ারে বসে কফির পেয়ালা তুলে চুমুক দিলেন। তারপর বললেন,—হেভি মিস্ট্রি! কী বলেন হালদারমশাই?

গোয়েন্দাপ্রবর শুধু বললেন, —হঃ!...

বেলা ন'টায় কর্নেলের নির্দেশমতো তৈরি হয়ে নীচে ডাইনিংরুমে গেলুম। আমাদের ব্রেকফাস্টের সময় সুখরঞ্জনবাবু সাইকেলে থলে ভর্তি বাজার করে ফিরলেন। তিনি হাসিমুখে ঘোষণা করলেন,—ঠাকমশাই! আজ সায়েবদের পাতে তা-বড় তা-বড় পাবদা মাছ সার্ভ করতে পারবেন। ভাগ্যিস, কেতো-জেলেকে বাজারে ঢোকার মুখেই ধরে ফেলেছিলুম।

ভোঁদা বলল,—সুঁকুবাঁবু! ছঁ-ছঁ-ছঁটের ব্যাঁ—

সুখরঞ্জনবাবু কপট চোখ রাঙিয়ে বললেন,—এই ভোঁদড়টাকে নিয়ে পারা যায় না!

ব্রেকফাস্টের পর আমরা বেরিয়ে পড়লুম। ভোঁদার হাতে চটের থলেতে কী আছে কে জানে! সে যে কর্নেলের কাছ ঘেঁষে ভালুকের মতো হেঁটে চলল। আমরা প্রায় অর্ধেক রাস্তায় পৌঁছেছি, একটা জিপগাড়ি আসতে দেখলুম। কাছাকাছি এসে গাড়িটা দাঁড়াল। সাব-ইন্সপেক্টর রমেনবাবু নেমে ড্রাইভারকে গাড়ি ঘোরাতে নির্দেশ দিলেন। তারপর কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন,—ও. সি. সায়েব আপনাকে খবর দিতে বলেছেন, যে লোকটার কথা আপনি বলেছিলেন, তাকে গত রাত্রে তিনটে নাগাদ অ্যারেস্ট করা হয়েছে।

—কোথায়?

—কৃষ্ণগঞ্জে। আমাদের সোর্স তাকে পরশু বিকেলে বাসস্ট্যান্ডে কৃষ্ণগঞ্জের বাসে চাপতে দেখেছিল। সেখানে ওর একটা ডেরা আছে।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—হালদারমশাই! আপনি খুশি হতে পারেন।

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন, —আমি যার কথা কইছিলাম, সে ধরা পড়ছে?

—হ্যাঁ। ঠিক আছে রমেনবাবু! আমরা পায়ে হেঁটেই যাব। আপনি মিঃ ভাদুড়িকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

রমেনবাবু বললেন,—গাড়ি থাকতে হাঁটবেন কেন স্যার?

—একটু সতর্কতা দরকার।

—বেশ তো! পাওয়ার সাবস্টেশনের কাছে আপনাদের নামিয়ে দিয়ে যাব। বলে রমেনবাবু ভোঁদার দিকে তাকালেন। —এ কোথায় যাবে? মনে হচ্ছে, ইরিগেশন বাংলোতে একে দেখেছি।

—রমেনবাবু! এর নাম ভোঁদা। আমার ভাগ্য! একজন বিশ্বস্ত সহযোগী পেয়ে গেছি।

রমেনবাবু হাসতে-হাসতে বললেন,—আমরা পিছনে বসছি! জয়ন্তবাবু! মিঃ হালদার! আমাদের পিছনে বসতে হবে। ভোঁদা! তোর হাতে ওটা কী?

কর্নেল বললেন,—অ্যাটম বোমা রমেনবাবু! ওটা ছোঁবেন না প্লিজ!

কর্নেল সামনে বসলেন। আমরা পিছনে। এই জিপগাড়িটা গত রাতেরটা নয়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা বিদ্যুৎ সাবস্টেশনের কাছে পৌঁছে গেলুম। আমাদের নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা বাঁদিকে বাঁক নিয়ে উধাও হয়ে গেল। কর্নেল বললেন,—হালদারমশাই আমাদের গাইড।

হালদারমশাই বললেন,—আপনারে যা কইছি কর্নেলস্যার! একটু দূরের থেইক্যা বাড়িখান দেখাইয়া দিমু। আমারে দেখলে ওনারা হয়তো আবার ইনসাল্ট করবেন!

—ঠিক আছে। তবে আপনাকে যেতে হবে ও-বাড়ি। আপনি লক্ষ রাখবেন। জয়ন্ত একসময়ে বেরিয়ে একটুখানি দাঁড়াবে। আপনি ঠিক তখনই সোজা গিয়ে ঢুকবেন।

খেলার মাঠের ডানদিক ঘুরে ছোট রাস্তা, তারপর বড় রাস্তা দিয়ে মিনিট দশেক হাঁটার পর হালদারমশাইয়ের নির্দেশমতো বাঁদিকে ঘুরে কিছুটা এগিয়ে গেলুম। এদিকটা কনকপুরের শেষপ্রান্ত মনে হচ্ছিল। একটা বিশাল বটগাছের তলায় শিবমন্দির। সেখানে দাঁড়িয়ে হালদারমশাই চাপাস্বরে বললেন,—ডাইনে রাস্তায় আউগাইয়া কারেও জিগাইবেন। গেট আছে। পুরানো দোতলা বাড়ি। উঁচা বাউন্ডারিওয়াল আছে। দ্যাখলেই বোঝবেন। গেটে 'রায়ভবন' লেখা আছে। আর কী কমু?

ডাইনে রাস্তাটা একসময় পিচে মোড়া ছিল। এখন খানা-খন্দে শ্রীহীন অবস্থা। পশ্চিমে এগিয়ে বাড়িটা চোখে পড়ল। দক্ষিণমুখী পুরোনো দোতলা বাড়ি। মাঝামাঝি গেট। ফাটলধরা গেটের মার্বেলফলকে 'রায়ভবন' লেখা। ওপরে বুগেনভেলিয়ার ঝাঁপি। গেটের মরচে ধরা গরাদের সামনে কর্নেল দাঁড়াতেই একটা লোক এসে বলল,—সায়েবদের কোথা থেকে আসা হচ্ছে আজ্ঞে?

কর্নেল বললেন,—কলকাতা থেকে। সুদর্শনবাবুকে খবর দাও!

—ছোটবাবু ওদিকে পুকুরের মাছ ধরাচ্ছেন সার! বড়বাবুকে ডাকব?

—তাই ডাকো।

ওপর থেকে কেউ বলল,—কে রে হরিপদ?

—বড়বাবু! এনারা কলকাতা থেকে এসেছেন।

বুগেনভেলিয়ার ঘন ঝাঁপির জন্য গেট থেকে দোতলা দেখা যাচ্ছিল না। কর্নেল বললেন,—এই কার্ডটা নিয়ে গিয়ে বড়বাবুকে দেখাও হরিপদ।

হরিপদ গেট খুলল না। গরাদের ফাঁক দিয়ে সে কর্নেলের হাত থেকে তাঁর নেমকার্ড নিয়ে চলে গেল। বললুম,—অদ্ভুত তো!

কর্নেল হাসলেন। —অদ্ভুত কিছু নয়। মুখ বুজে থাকবে।

প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এবং গায়ে শালজড়ানো একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখা গেল। তিনি করজোড়ে নমস্কার করে বললেন,—নমস্কার! নমস্কার! তা হলে

সত্যিই কর্নেলসায়েবের পায়ের ধুলো পড়ল রায়বাড়িতে? ও হরিপদ! গেট খুলিসনি কেন হতভাগা! সায়েবকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস?

হরিপদ গেট খুলল। আমরা ভিতরে ঢুকলুম। কর্নেল বললেন,—আপনি সুরঞ্জনবাবু?

—হ্যাঁ কর্নেলসায়েব! ইনি বুঝি সেই সাংবাদিক ভদ্রলোক? গত রাত্রে কলকাতা থেকে ঝন্টু ট্রাঙ্ককল করেছিল। আপনি পৌঁছেছেন কি না জিজ্ঞেস করছিল। আরে! এটা আবার কে?

কর্নেল বললেন,—আমি ইরিগেশন বাংলোয় উঠেছি। ছেলেটি সেখানে কাজ করে। আমাদের রায়ভবন চিনিয়ে দেবে বলে একে নিয়ে এলুম। এর নাম ভোঁদা!

সুরঞ্জনবাবু বললেন,—অ্যাই ভোঁদা! বাড়ি চিনিয়ে দিয়েছিস, বেশ করেছিস! তা সায়েবদের সঙ্গে তুই ঢুকলি কেন? বেরো বলছি!

কর্নেল একটু হেসে বললেন, —ভোঁদা আমার সারাক্ষণের সঙ্গী। আসবার পথে কিছু কেনাকাটা করেছি। ওর চটের ব্যাগে রাখা আছে।

সুরঞ্জনবাবু ঘুরে বললেন,—হরিপদ! হাঁ করে কী দেখছিস! বসবার ঘরের দরজা খুলে দে শিগগির! আসুন কর্নেলসায়েব! আর আপনার নামটা কী যেন?

আমি পকেট থেকে আমার একটা নেমকার্ড বের করে দিলুম। উনি পড়ে দেখে বললেন,—হ্যাঁ, জয়ন্ত চৌধুরি। ঝন্টুই বলেছিল। আসুন! দেখতেই পাচ্ছেন, কী অবস্থায় বেঁচে আছি। স্কুল থেকে রিটায়ার করেছি দুবছর আগে। এখনও পেন্ডিং-এর ফাইল আটকে আছে। ভাগ্যিস কিছু জমিজমা, বাগান-পুকুর বাবা রেখে গিয়েছিলেন।

গাড়িবারান্দা দেখে বোঝা গেল, একসময় রায় পরিবারের গাড়ি ছিল। গাড়িবারান্দার তলা দিয়ে কয়েকধাপ সিঁড়ি বেয়ে গোলাকার ছোট্ট বারান্দায় উঠলুম। হরিপদ দরজা খুলে দিয়েছিল ততক্ষণে। ভিতরে ঢুকে দেখি প্রশস্ত একটা ঘর। একপাশে পুরোনো সোফাসেট। দেওয়ালে টাঙানো পূর্বপুরুষদের অয়েলপেন্টিং অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তারপর চোখে পড়ল দুদিকের দেওয়াল ঘেঁষে কয়েকটা আলমারি। তাতে বাঁধানো প্রকাণ্ড সব বই ঠাসা আছে। কর্নেল সোফায় বসে বললেন—আপনার কাকা ওকালতি করতেন শুনেছি। আইনের বইগুলো যত্ন করে রেখে দিয়েছেন।

সুরঞ্জনবাবু বললেন,—হ্যাঁ। কাকাবাবু কৃষ্ণনগর জনকোর্টে অ্যাডভোকেট ছিলেন। তাঁর গাড়ি ছিল। এখান থেকে গাড়িতে যাতায়াত করতেন। বাইশ কিলোমিটার দূরত্ব। বাবা নিষেধ করতেন। কৃষ্ণনগরে একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু কাকা একটু জেদি মানুষ ছিলেন। আমাদের বংশের এই রোগটা আছে। তো শেষ অব্দি গাড়িই তাঁকে খেল।

—অ্যাকসিডেন্ট?

—হ্যাঁ। হরিপদ! বললুম না নান্টুকে খবর দে! আর মোনাঠাকুরকে বলে যা, সায়েবদের জন্য চা-টা শিগগির নিয়ে আসে যেন।

—আপনি বসুন!

—বসব। তা যা বলছিলুম। কাকাবাবু আসলে ভাবতেন, কনকপুর ছেড়ে দূরে থাকলে বাবা একা সব সম্পত্তি ভোগ করবেন।

—আপনার কাকাবাবুর ফ্যামিলি?

—সেটাই বলতে যাচ্ছিলুম। খুব ট্র্যাজিক ঘটনা। অ্যাকসিডেন্টের সময় তাঁর গাড়িতেই কাকিমা আর তাঁর ছেলে ছিল। বছর তিনেক বয়স। কাকিমার বাপের বাড়ি চণ্ডীতলায় পৌঁছে দিয়ে কাকাবাবুর কৃষ্ণনগর যাওয়ার কথা ছিল। আর কী বলব?

সুরঞ্জনবাবু জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন, —আপনারা বসুন! আমি আসছি।

তিনি ভিতরের দরজা দিয়ে চলে গেলেন। দেখলুম, ভোঁদা দরজার পাশে হাঁটুমুড়ে বসে আছে। কর্নেল ঘরের ভিতরটা দেখছিলেন। আস্তে বললেন,—এই আইনের বইগুলোর দাম অন্তত সে-আমলেই লক্ষাধিক টাকা। এত বই! অথচ ভদ্রলোক এখানে বসেই ওকালতি করতেন!

বললুম,—এই এরিয়ার সব মক্কেল নিশ্চয় ওঁর হাতে ছিল।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে চাপাস্বরে বললেন,—নাকি পূর্বপুরুষের মহালক্ষ্মীর জুয়েলস ওঁর এখানে থাকার কারণ? জয়ন্ত! সম্ভবত সুদর্শনবাবু জানেন না, দু-জোড়া চাবি ওঁর ঠাকুরদাই তাঁর দুই ছেলের জন্য তৈরি করিয়েছিলেন।

বলে তিনি ছবিগুলো দেখতে গেলেন। ডাইনে ও বাঁয়ে আলমারির ওপরে উঁচুতে ছবিগুলো টাঙানো আছে। আর আলমারিগুলোর জন্য দুপাশের দেওয়াল ঢাকা পড়েছে। ওদিকে সম্ভবত কোনো জানলা নেই। কর্নেল ছবিগুলো দেখার পর সোফায় এসে বসলেন।

সেইসময় হন্তদন্ত হয়ে সুদর্শনবাবু ঘরে ঢুকলেন। —কী আশ্চর্য! নমস্কার কর্নেলসায়েব! আপনি আসছেন না! এদিকে আপনার প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোক কাল একটা ঝামেলা বাধিয়ে এক কাণ্ড করে বসেছিলেন।

—কী কাণ্ড বলুন তো?

—এ বাড়ির কে নাকি ওঁকে গোপনে বলেছে, তিনবছর আগে আমার ঘরের তালা আমি নাকি নিজেই ভেঙেছিলুম। কিন্তু তার চেয়ে সাংঘাতিক কথা—গত মহালয়ার আগের দিন শৈলবালা পাঁচিলের কাছে একটা সাপ দেখে চ্যাঁচামেচি করছিল। তখন আমি নীচে নেমে গিয়েছিলুম। সেইসময় দাদা নাকি আমার ঘর থেকে আমার ছড়িটা নিয়ে সাপ মারতে আসছিল। হালদারবাবুকে কে এসব কথা বলেছে, জানি না। আমার মেজাজ তো জানেন! আপনাকে অলরেডি বলেছি সে কথা!

—আপনি আপনার দাদাকে চার্জ করে বসলেন?

—হ্যাঁ। তারপর দু-ভায়ে প্রায় হাতাহাতির উপক্রম। সেই সময় বাঙ্কুদা নামে এক ভদ্রলোক—দাদার বন্ধু উনি—এসে পড়ে মিটিয়ে দিলেন। ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের পরিচয় দিতুম না। কিন্তু রাগের বশে—বুঝতেই পারছেন!

—বাঙ্কুবাবুই কি মিঃ হালদারকে চলে যেতে বললেন?

—উনি কী করে বলবেন? উনি দাদাকে যত, আমাকে তত বকাবকি করে চলে গেলেন। পুলিশ যা পারল না, একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ তা পারে? বাঙ্কুদা ঠিকই বলেছেন মনে হল। সাপ মারবার জন্য দাদা আমার ঘর থেকে মোটা বেতের ছড়িটা আনতে যেতেও পারেন, এই ভেবে আমি দাদাকে খামোকা চার্জ করেছিলুম। কারণ সাপটা হরিপদ মারার পর আমার ঘরে গিয়ে ছড়িটা ব্র্যাকেটে একই অবস্থায় ঝোলানো দেখেছিলুম।

—আর সেই চাবির চাপা শব্দ শুনতে পেতেন তো!

—হ্যাঁ। বিকেলে ক্লাবে যাওয়ার সময় অভ্যাসমতো শব্দটা টের পেয়েছি।

—বাড়ির লোকেদের আপনারা জিজ্ঞেস করেননি, কে মিঃ হালদারকে এসব কথা বলেছে।

—করব না আবার? প্রত্যেকে মহালক্ষ্মীর দিব্যি কেটে বলেছে, সে বলেনি।

এইসময় শীর্ণকায় যে লোকটি চা-টা নিয়ে এলেন, তিনিই মোনাঠাকুর। সুদর্শনবাবু তাঁকে বললেন,—চা না কফি?

ঠাকুরমশাই বললেন,—বড়বাবু চা পাঠাতে বলেছিলেন! বলে তিনি চলে গেলেন।

সুদর্শনবাবু বললেন,—সরি কর্নেলসায়েব! আমার ঘরে আপনার জন্য কফি এনে রেখেছি।

—ঠিক আছে। চা-ই খাওয়া যাক। আপনার পুকুরে মাছ ধরার কাজ শেষ হয়েছে?

—দাদাকে যেতে বললুম। মাছের ব্যাপারীকে ওজন করে দিতে হবে। এদিকে আপনারা এসেছেন। এ বেলা দু-মুঠো—

বলে তাঁর চোখ পড়ল ভোঁদার দিকে। —এই! কে রে তুই?

কর্নেল বললেন,—ইরিগেশন বাংলোয় কাজ করে ছেলেটা। আমি সঙ্গে এনেছি। কিছু কেনাকাটার ব্যাপার ছিল। তো আপনার কি মাছের ব্যাপারীর কাছে যাওয়া দরকার?

—একটুখানি দরকার বইকি। আপনারা চা খান। আমি শিগগির আসছি।

বলে সুদর্শনবাবু আবার হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। চায়ের কাপ হাতে কর্নেল উঠে গিয়ে আবার সেই ছবিগুলো দেখতে-দেখতে কখনও একটু থেমে, কখনও কয়েক-পা এগিয়ে আবার পিছিয়ে এসে একটু থেমে, ডাইনে থেকে বাঁদিকে ঘোরাঘুরির পরে সোফায় এসে বসলেন। আমি বললুম,—ছবিগুলো আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কেন বলুন তো?

কর্নেল সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন,—তুমি বেরিয়ে গিয়ে গেটের ওখানে একটু দাঁড়িয়ে চলে এসো। গেট খুলে রাখবে। হালদারমশাই না এসে পড়লে নাটক জমবে না।

একটু দ্বিধার সঙ্গে তাঁর নির্দেশ পালন করতে গেলুম।...

গোয়েন্দাপ্রবর ঘরে ঢুকে সোফার এককোণে বসলেন। তারপর কর্নেলকে দেওয়ালে টাঙানো একটা বিশাল ছবি দেখিয়ে বললেন,—রায়বাহাদুর!

কর্নেল বললেন,—বাঁ-দিকে তিননম্বর বলেছিলেন আপনি!

হালদারমশাই বললেন,—ঘরে আলো জ্বালে নাই ক্যান? ওনারা কই গেলেন?

—পুকুরের ধারে মাছ ধরিয়ে বিক্রি করছেন।

হালদারমশাই অমনই উঠে ছবিটার কাছে গেলেন। তখনই ফিরে এসে বললেন,—ভুল করছিলাম। চাইর নম্বর। রাত্রে এট্টুখানি দেখা। হঃ! রায়বাহাদুর। সুদর্শনবাবু আগের দিন কইছিলেন, ওনার ঠাকুরদার ঠাকুরদা রায়বাহাদুর ছিলেন।

ওঁদের এসব কথা বুঝতে পারছিলুম না। একটু পরে মোনাঠাকুর চায়ের সরঞ্জাম নিতে এসে হালদারমশাইকে দেখে কেন কে জানে মুচকি হেসে চলে গেলেন। তারপর এল হরিপদ। সে হালদারমশাইকে দেখে গম্ভীর মুখে বলল,—আপনি আবার এসেছেন বাবুমশাই! আবার ঝামেলা বাধবে।

বলে সে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল। কর্নেল বলবেন,—তোমার কর্তাবাবুদের কাজ শেষ হয়নি হরিপদ?

—হয়েছে আজ্ঞে! ছোটবাবু আমাকে ঘরে আলো জ্বেলে দিতে বললেন। ওনারা এক্ষুনি এসে যাবেন।

সে চলে যাওয়ার একটু পরে দুই ভাই ঘরে ঢুকলেন। তারপর গোয়েন্দাপ্রবরকে দেখে দুজনেই থমকে দাঁড়ালেন। সুরঞ্জনবাবু গম্ভীরমুখে বললেন,—আপনি আবার এসেছেন? কর্নেলসায়েব! ওঁকে চলে যেতে বলুন!

সুদর্শনবাবু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন,—কেলেংকারি হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি! কর্নেলসায়েবের খাতিরে গায়ে হাত তুলছি না। বেরিয়ে যান বলছি। নইলে গোবিন্দকে ডাকব।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—আপনারা মিঃ হালদারের সঙ্গে কন্ট্র্যাক্ট করেছিলেন। কিন্তু লিখিতভাবে কন্ট্র্যাক্ট বাতিল করেননি। প্রাইভেট ডিটেকটিভদের ব্যাপারে একটা সরকারি আইন আছে। আমাকে মিঃ হালদার বলছিলেন, কারণ দেখিয়ে কন্ট্র্যাক্ট বাতিল করতে হয়। তা না হলে উনি ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন।

সুরঞ্জনবাবু বাঁকা হেসে বললেন,—ঠিক আছে! আপনি যখন বলছেন, তা-ই করছি। নান্টু! একটা কাগজ এনে দাও।

সুদর্শনবাবু বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল এবার গম্ভীরমুখে বললেন,—একজন স্থানীয় বিশিষ্ট লোককে ডাকতে হবে। তিনি কন্ট্র্যাক্ট বাতিলের কাগজে সাক্ষী হিসেবে সই করবেন। আপনার বন্ধুদের মধ্যে তেমন কেউ নিশ্চয় আছেন?

সুরঞ্জনবাবু বললেন,—এমন আইন আছে নাকি?

—আছে। আপনি পুলিশকে ফোন করে জেনে নিতে পারেন।

সুদর্শনবাবু এক্সারসাইজ খাতার একটা পাতা ছিঁড়ে এনে সুরঞ্জনবাবুকে দিলেন। সুরঞ্জনবাবু বললেন—নান্টু! কর্নেলসায়েব বলছেন, কন্ট্র্যাক্ট বাতিলের কাগজে কোনো বিশিষ্ট লোককে সাক্ষী রাখতে হবে। এই নাকি আইন।

কর্নেল বললেন, —হ্যাঁ সুদর্শনবাবু! বরং আমার কথা যাচাই করতে থানায় টেলিফোন করুন। পুলিশকে বলুন আমি এখানে আছি। না-না! নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত। আপনি ফোন করে আসুন।

লক্ষ করলুম, কর্নেল সুদর্শনবাবুর দিকে তাকিয়ে কথা বলার সময় চোখের ভঙ্গিতে যেন কী ইশারাও করলেন। সুদর্শনবাবু ফোন করতে যাচ্ছেন দেখে সুরঞ্জনবাবু বললেন,—নান্টু! বাঞ্ছুবাবুকেও একটা ফোন করে এখনই আসতে বলো! ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকছে। বাঞ্ছুরও আসা দরকার।

একপ্রান্তে সুরঞ্জনবাবুর অ্যাডভোকেট কাকার সেক্রেটারিয়েট টেবিল আছে। উল্টোদিকের চেয়ারে বসে তিনি বললেন,—বলুন কর্নেলসায়েব! কী লিখতে হবে।

কর্নেল বললেন,—বেশি কিছু না। বাংলায় লিখলেও চলবে। স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন : প্রাইভেট ডিটেকটিভ শ্রী কে. কে. হালদার মহাশয়ের সহিত আমাদের গৃহদেবী মহালক্ষ্মীর গহনা উদ্ধারের জন্য যে চুক্তি করিয়াছিলাম, তাহা এতদ্বারা বাতিল করিলাম। কারণ তিনি এই কার্য করিতে গিয়া আমাদের পরিবারে অহেতুক মনোমালিন্য ও বিরোধ বাধাইয়া সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন।

কর্নেলের এইসব কথা লিখতে সুরঞ্জনবাবুর মাত্র মিনিট পাঁচেক সময় লাগল। কাগজটা তিনি কর্নেলকে দিয়ে বললেন,—বাইশ বছর স্কুলমাস্টারি করেছি কর্নেলসায়েব! আশা করি বানান ভুল নেই!

কর্নেল কাগজটা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন,—এর তলায় তারিখ দিয়ে আপনি ও সুদর্শনবাবু সই করবেন। বাঁদিকে সাক্ষী সই করবেন।

সুদর্শনবাবু একটু পরে ফিরে এলেন। বললেন,—ও. সি. থানায় ছিলেন। তিনি বললেন, আইনে এইরকম ব্যবস্থা আছে!

সুরঞ্জনবাবু বললেন—বাঞ্ছুবাবুকে পেলে?

—হ্যাঁ। উনি এক্ষুনি আসছেন।

—এসো। আমি সই করেছি। তুমি তলায় সই করো। তারিখ লিখে দিয়ো।

দুজনে সই করার পর কর্নেল একটু হেসে বললেন,—মিঃ হালদার পূর্ববঙ্গের লোক। ওঁর সামনেই বলছি। একসময় পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন। ওঁর দাপটে চোর-ডাকাতরা এলাকা ছেড়ে

পালাত। আইনকানুন ওঁর মুখস্থ। উনি হঠাৎ এসে পড়বেন জানতুম না। এসেই আমাকে বলছিলেন, ক্ষতিপূরণের কেস করবেন আপনাদের বিরুদ্ধে। আমি ওঁকে বুঝিয়ে শান্ত করেছি।

সুরঞ্জনবাবু বললেন,—কাল রাত্রে ঝন্টু ট্রাঙ্ককলে বলছিল, আপনাকে যেন এই কেসের দায়িত্ব দিই। আপনার সঙ্গে কি কন্ট্র্যাক্ট করতে হবে?

—নাঃ! সুদর্শনবাবু! আপনি বসুন। মিঃ হালদারের সঙ্গে নিষ্পত্তি হয়ে গেলে আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলব। তো বাঞ্ছুবাবুর বাড়ি কতদূরে?

সুরঞ্জনবাবু বললেন, —তত কিছু দূরে নয়। ওই মোটরসাইকেলের শব্দ শুনছি। হরিপদ! ও হরিপদ!

হরিপদ দরজায় উঁকি মেরে বলল,—আজ্ঞে বড়বাবু!

—গেট খুলে দে। বাঞ্ছুবাবু আসছেন মনে হচ্ছে।

একটু পরে বাইরে মোটরসাইকেলের শব্দ থেমে গেল। সুরঞ্জনবাবু উঠে গিয়ে বললেন, —এসো বাঞ্ছু! বড্ড ঝামেলায় পড়ে গেছি।

তাঁর সঙ্গে বেঁটে স্থূলকায় একজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। কর্নেলকে দেখেই উনি থমকে দাঁড়ালেন। —এঁরা কারা?

—কলকাতা থেকে ঝন্টু এঁদের পাঠিয়েছেন। উনি কর্নেলসায়েব! পরে বলছি।

—ডিটেকটিভ ভদ্রলোক আবার এসে ঝামেলা পাকিয়েছেন?

সুরঞ্জনবাবু কাগজটা তাঁকে দেখিয়ে বললেন,—এখানে তুমি উইটনেস হিসেবে একটা সই দাও বাঞ্ছু! নান্টু থানায় ফোন করেছিল। ও. সি. সায়েব বলেছেন এটাই নাকি আইন।

বাঞ্ছুবাবু একটা চেয়ারে বসে সই করে দিলেন। সুরঞ্জনবাবু কাগজটা হালদারমশাইকে দিয়ে বললেন,—এবার দয়া করে কেটে পড়ুন মশাই।

হালদারমশাই কাগজটা কর্নেলকে দিয়ে বললেন,—আর-একবার দেইখ্যা দিন কর্নেলস্যার!

কর্নেল কাগজটা হাতে নিয়েছেন, এমনসময় ও. সি. মিঃ ভাদুড়ি, এস. আই. রমেনবাবু এবং আরও একজন অফিসার ঘরে ঢুকলেন। বারান্দায় একদঙ্গল কনস্টেবলও এসে দাঁড়াল।

বাঞ্ছুবাবু আড়ষ্টভাবে হেসে বললেন,—কী ব্যাপার স্যার? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না?

ও. সি. মিঃ ভাদুড়ি বললেন,—আপনার বাড়ি হয়েই আসছি দত্তবাবু! আপনাকে আমাদের দরকার।

বাঞ্ছারাম দত্ত করজোড়ে বললেন,—বলুন স্যার!

—কর্নেলসায়েব! আপনি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আগে কথা বলে নিন।

কর্নেল জ্যাকেটের ভিতর থেকে কাঞ্চন সেনের কার্ডটা বের করে বললেন,—দেখুন তো দত্তবাবু! এই কার্ডটা চিনতে পারেন কি না।

দত্তবাবু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন,—ওটা কীসের কার্ড স্যার?

—কলকাতার বিখ্যাত চন্দ্র জুয়েলারি কোম্পানির এজেন্ট কাঞ্চন সেনের কার্ড। তাঁকে আপনি কয়েক লক্ষ টাকার জুয়েলারি বিক্রির খবর দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। গত সপ্তাহে শুক্রবার কাঞ্চনবাবু আপনার বাড়ি এসেছিলেন। কিন্তু জুয়েলারি তাঁকে সেদিন দেখানোর অসুবিধে ছিল বলেই আমার ধারণা। কারণ ওগুলো তখনও আপনার কাছে পৌঁছয়নি। তা ছাড়া, চোরাই জুয়েলারি। একটা ঝুঁকি ছিল, আপনি তা জানতেন। তাই জুয়েলারি চুরির দায় অন্যের কাঁধে চাপানোর জন্য আপনি কাঞ্চনবাবুর পকেট থেকে কোনো সুযোগে তাঁর কার্ডটা চুরি করেছিলেন। কাঞ্চনবাবু কলকাতা ফিরে গিয়ে টের পান তাঁর এজেন্ট-কার্ড চুরি গেছে। পরদিন শনিবার তিনি

আপনার কাছে এসেছিলেন। কিন্তু কার্ডের হদিস পাননি। রবিবার সুদর্শনবাবু তাঁর মাসতুতো ভাই ঝন্টুবাবুর নির্দেশে কলকাতায় আমার কাছে গিয়েছিলেন। বাসে কিংবা ট্রেনে আপনার লোক তাঁর ব্যাগে কার্ডটা গোপনে ভিড়ের মধ্যে গুঁজে দেয়। হ্যাঁ—সুরঞ্জনবাবু আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুরঞ্জনবাবুই আপনাকে জানিয়েছিলেন, তাঁর ছোটভাই কোথায় যাচ্ছেন। আপনি সুরঞ্জনবাবুর কাছেই জেনে নিয়েছিলেন, সুদর্শনবাবু ব্যাগে মহালক্ষ্মীর ছবি আমাকে দেখাতে নিয়ে যাবেন। সুদর্শনবাবু ছবি বের করলেই চন্দ্র জুয়েলারি কোম্পানির এই বিশেষ কার্ড বেরিয়ে পড়বে। সুদর্শনবাবু কার্ড দেখে চমকে উঠবেন। আমিও কার্ডটা দেখব। এই কার্ড দেখার পর সুদর্শনবাবু আমার সন্দেহভাজন হবেন। কিন্তু ছবি বের করার সময় কার্ডটা ছিটকে পড়েছিল সুদর্শনবাবুর পায়ের নীচে। তিনি তা লক্ষ করেননি। তিনি চলে যাওয়ার পর কার্ডটি আমি দেখতে পেয়েছিলুম। আর-একটা কথা। কাঞ্চনবাবু কার্ড হারানোর পর আমার কাছে গিয়েছিলেন। তিনি নিজের হাতে আপনার নাম-ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন।

ও. সি. মিঃ ভাদুড়ি বললেন,—দত্তবাবুর সেই লোককে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। সে জেরার মুখে সব স্বীকার করেছে। কাঞ্চনবাবু আপনাকে শনিবার এসে কার্ড না পেয়ে হুমকি দিয়ে গিয়েছিলেন, কার্ড না পেলে তিনি আপনাকে চোরাই জুয়েলারির কেসে ফাঁসাবেন। তাই রবিবার আপনার লোক, অর্থাৎ কুখ্যাত বাবু ঘোষকে আপনি কলকাতা পাঠিয়েছিলেন। সে কাঞ্চনবাবুর একসময় ক্লাসফ্রেন্ড ছিল। অনেক চোরাই জুয়েলারি সে কাঞ্চনবাবুর সাহায্যে বিক্রি করেছে। আপনার হুকুম ছিল, বেগতিক দেখলেই তাঁকে যেন বাবু ঘোষ খতম করে। শেষপর্যন্ত বাবু ঘোষ তা করেছে। তাকে আমরা খুনের দায়ে ধরেছি। এবার আপনার পালা! রমেনবাবু! বাঞ্ছারাম দত্তকে অ্যারেস্ট করুন।

রমেনবাবু বাঞ্ছারাম দত্তের কাছে এসে সহাস্যে বললেন,—আপনাকে গ্রেফতার করা হল। আপনি মানী লোক। চলুন! আমাদের গেস্টহাউসে থাকবেন। একটু কষ্ট হবে। কিন্তু উপায় কী?

বলে তিনি কনস্টেবলদের ডাকলেন,—রামভকত! সুরেন্দ্র! এঁকে প্রিজনভ্যানে নিয়ে যাও। একমিনিট। কই দত্তবাবু! শালের ভেতর থেকে হাতদুটো বের করুন।

দত্তবাবুর দুটো হাতে তিনি হ্যান্ডকাফ এঁটে দিলেন। কনস্টেবলরা দত্তবাবুকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ও. সি. মিঃ ভাদুড়ি বললেন,—রামভকত! দত্তবাবুকে একটু পরে নিয়ে যাবে। কর্নেলসায়েব! বলুন!

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—দত্তবাবু! আপনি পাঁচখালি এলাকার কালুখালিতে দশরথের কাছে অর্ডার দিয়ে একটা বেতের ছড়ি তৈরি করেছিলেন! অবিকল সুদর্শনবাবুর মতো ছড়ি।

দত্তবাবু বলার ভিতরে বললেন,—তাতে কী হয়েছে?

কর্নেল সবাইকে অবাক করে ভোঁদাকে বললেন, —ভোঁদা! তোমার থলে দাও!

ভোঁদা চটের থলেটা নিয়ে এল। কর্নেল থলেতে হাত ভরে যে জিনিসগুলো বের করলেন, তা একটা বেতের ছড়ির ভাঙাচোরা খানিকটা অংশ। শুধু ঘোরানো কালো রঙের বাঁটটা আস্ত আছে। কিছু অংশে মাটি লেগে আছে। বোঝা যায়, শুকনো কাদা।

কর্নেল হাসলেন। —এগুলো শ্রীমান ভোঁদার আবিষ্কার। দুর্গাপুজোর কিছুদিন আগে ভোঁদা সন্ধ্যার একটু আগে কনকপুর থেকে সেচবাংলোতে ফেরার সময় দূর থেকে দেখেছিল, দত্তবাবু জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তাঁর মোটরসাইকেলে চেপে তার পাশ দিয়ে চলে গেলেন। এই ছেলেটা স্বভাবে খুব কৌতূহলী! ছোটবেলা থেকে সে সর্বচর। মঙ্গলবার ভোরে মর্নিংওয়াকে আমার সঙ্গে বেরিয়ে সে এই গোপন ঘটনাটা বলেছিল। তার সঙ্গে গিয়ে এগুলো একটা ঝোপের ভিতরে

দেখতে পেলুম। তার ঢোলা প্যান্টের দুই পকেটে ভরে এগুলো তাকে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখতে বললুম। আমার মাথায় একটা থিয়োরি এসেছিল। তার সত্যতা যাচাই করতেই কালুখালিতে দশরথের কাছে গিয়েছিলুম। তার পর সিওর হয়েছিলুম।

সুদর্শনবাবু নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি ফুঁসে উঠলেন। —তা হলে কিছুদিন ধরে আমার ছড়ির বদলে বাঞ্ছুদার ছড়িটা আমার ঘরের ব্র্যাকেটে ঝোলানো ছিল! ডিটেকটিভ ভদ্রলোক ঠিক বলেছিলেন। সাপ মারার দিন কে দেখেছিল, দাদা আমার ঘর থেকে আমার ছড়িটা বের করে আনছিল! দাদা! এখনও বলছি, খুলে বলো! তুমিই ছড়ি বদল করেছিলে! হ্যাঁ—তুমি! তুমি! তুমি!

সুদর্শনবাবু দাপাদাপি জুড়ে দিলেন। ও. সি. মিঃ ভাদুড়ি তাঁকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন,—চুপচাপ বসে থাকুন। চ্যাঁচামেচি পরে করবেন।

কর্নেল বললেন,—হালদারমশাই! আপনার ব্যাগ থেকে এবার আপনার আবিষ্কৃত জিনিসগুলো বের করুন।

গোয়েন্দাপ্রবর তাঁর ব্যাগের চেন খুলে খবরের কাগজের মোড়ক বের করলেন। তারপর তিনি মোড়ক খুললেন। দেখলুম, একগাদা আধপোড়া কাগজ। তিনি বললেন,—এগুলি আমি পাইছিলাম রায়বাবুগো পুকুরের পাড়ে। ঝোপের মইধ্যে লুকানো ছিল।

মিঃ ভাদুড়ি পরীক্ষা করে বললেন,—ছাপানো বইয়ের পাতা মনে হচ্ছে।

কর্নেল উঠে গিয়ে সেই রায়বাহাদুরের ছবির তলায় একটা আলমারির কাচের কপাট হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেললেন। তারপর বললেন,—হালদারমশাইয়ের কুড়িয়ে পাওয়া কাগজগুলো পরীক্ষা করে বুঝতে পেয়েছিলুম, আইনের বইয়ের পাতা। এ ঘরে ঢুকে দেখে নিয়েছি, এই দুটো প্রকাণ্ড বই লাইন থেকে একটু এগিয়ে ও পিছিয়ে আছে। অনেকদিন আগে রাখা বই আলমারির র‍্যাকে রাখলে ময়লার রেখা পড়বে। এই দুটো বই সেই রেখা মুখে দিয়েছে।

দুটো বই বগলদাবা করে তিনি টেবিলে রাখলেন। একটা বইয়ের ভিতরে চৌকো করে কাটা গভীর একটা অর্ধবৃত্তাকার অংশ বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু সেখানে কিছু নেই। কর্নেলকে চঞ্চল ও উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। তিনি দ্বিতীয় বইটা খুললেন। চৌকো গভীর গর্ত দেখা গেল। কিন্তু এটাতেও কিছু নেই।

মিঃ ভাদুড়ি বললেন,—ব্লেড দিয়ে অনেক পরিশ্রম করে কাটা গুপ্তস্থান। কিন্তু শূন্য কেন?

কর্নেল বললেন,—এই বইটার মধ্যে মহালক্ষ্মীর হীরকখচিত সোনার মুকুট লুকানো ছিল। তাই এই বইয়ের গর্তটা অর্ধবৃত্তাকার। আর দ্বিতীয় বইটার মধ্যে মহালক্ষ্মীর জড়োয়া নেকলেস ছিল। এর গর্তটা চৌকো।

বলে কর্নেল ডাকলেন,—সুরঞ্জনবাবু!

সুরঞ্জনবাবু মুখ নামিয়ে বললেন,—বলুন!

—আপনি পুরোনো প্রকাণ্ড শাস্ত্রীয় পঞ্জিকার ভিতরের পাতা কেটে গর্ত করে নিজের চাবিদুটো লুকিয়ে রেখেছিলেন। ও. সি. মিঃ ভাদুড়িকে তা দেখিয়েছিলেন।

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন,—আমারেও তা দ্যাখাইছেন উনি!

কর্নেল বললেন,—এ কাজে আপনার দক্ষতা আছে। কিন্তু আপনার কাকাবাবুর দুটি আইনের বইয়ের ভিতর লুকিয়ে রাখা দুটি জুয়েলস কোথায় গেল?

সুরঞ্জনবাবু ভাঙা গলায় বললেন,—আমি বুঝতে পারছি না। বিশ্বাস করুন! এ কী অদ্ভুত কাণ্ড।

সুদর্শনবাবু গর্জন করলেন,—নিজেরই চুরি করে লুকিয়ে রাখা জিনিস কোথায় গেল বুঝতে পারছ না? ন্যাকা? ও. সি. সায়েব! কর্নেলসায়েব! বাঞ্ছারাম দত্তের বাড়ি সার্চ করলেই মাল বেরিয়ে

পড়বে! কাল বিকেলে ক্লাবে যাওয়ার সময় আমি দেখেছি, আমার মহাপুরুষ দাদা দত্ত-বাড়িতে চুপিচুপি ঢুকে গেল।

সুরঞ্জনবাবু মিনমিনে গলায় বললেন,—না-না! আমারও অবাক লাগছে, এ কাজ কে করল? নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

ও. সি. মিঃ ভাদুড়ি বললেন,—তার মানে আপনি স্বীকার করছেন বইদুটোর মধ্যে মহালক্ষ্মীর মুকুট আর জড়োয়া নেকলেস লুকিয়ে রেখেছিলেন?

সুরঞ্জনবাবু এবার দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলেন।—আমি পাপী। আমি মহাপাপী। ওই বাঙ্কুর প্ররোচনায় আমি ফাঁদে পা দিয়েছিলুম।

এই সময় ভিতর থেকে এক ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর ঘরের ভিতরে চোখ বুলিয়ে সবাইকে দেখে নিয়ে বললেন,—কী হয়েছে? এত কান্নাকাটি কীসের?

সুদর্শনবাবুও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন,—বউদি! আমি কল্পনাও করিনি, আমার দাদা—

তাঁকে ভদ্রমহিলা ধমক দিলেন। —চুপ করো! দাদা-অন্তপ্রাণ একেবারে! তোমাকে সাবধান করে দিইনি, দত্তবাবু কেন দুবেলা রায়বাড়ি আসছে, খোঁজখবর নাও?

বুঝলুম, এই মহিলাই সুরঞ্জনবাবুর স্ত্রী শোভারানি। তিনি দত্তবাবুর দিকে তাকিয়ে বাঁকা হেসে বললেন,—বাঃ! বেশ মানিয়েছে এতদিনে। কত লোককে ফাঁদে ফেলে সর্বনাশ করে এবার নিজেই ফাঁদে পড়েছে বাঙ্কুরাম। কই? কর্নেলসায়েব কোথায়?

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন,—শোভাদেবী! আমি সব বুঝতে পেরেছি। চলুন! রায়বাড়ির গৃহদেবী মহালক্ষ্মীকে এবার আমরা গিয়ে দর্শন করি। হীরকখচিত সোনার মুকুট আর জড়োয়া নেকলেস পরা ছবি আমি দেখেছি। এবার সেই প্রতিমাকে একই বেশে দেখতে পাব। মিঃ ভাদুড়ি! দত্তবাবুকে লক-আপে পাঠিয়ে দিন।

এই সময় হালদারমশাই খুব চাপাস্বরে কর্নেলকে বললেন,—আমারে হুমকি দেওয়া চিঠির হাতের লেখার সঙ্গে সুরঞ্জনবাবুর হাতের লেখার মিল দেখলাম।

কর্নেল হাসলেন। —হ্যাঁ, সেইজন্য এত কাণ্ড করতে হল।

ও. সি. মিঃ ভাদুড়ি এস. আই. রমেনবাবুকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, —তপনবাবু! আমেদসায়েব! আপনারা এখানে থাকুন। আমরা আসছি। চলুন সুরঞ্জনবাবু! আপনার সম্পর্কে কী করা যায়, পরে ভেবে দেখা যাবে। সুদর্শনবাবু! আমার মনে হচ্ছে, এখনই আপনার ঘরে গিয়ে আপনার ছড়িটি পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

সুদর্শনবাবু সবার আগে হন্তদন্ত বেরিয়ে গেলেন।...

দোতলায় উঠে দেখি, সুদর্শনবাবু একহাতে তাঁর বেতের ছড়ি অন্য হাতে ছড়ির কালো বাঁট নিয়ে তেমনই হন্তদন্ত এগিয়ে আসছেন। তিনি হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন—আমার চাবি নেই! আমার চাবিদুটো চুরি গেছে।

শোভাদেবী ধমক দিলেন। —চুপ করো নান্টু! আর চাবি-চাবি কোরো না। তোমরা দুভাই জানো না। কিন্তু শৈলবালা সাক্ষী! মৃত্যুর আগের দিন শ্বশুরমশাই আমাকে দু-জোড়া চাবিই গোপনে দিতে চেয়েছিলেন। তখন আমার বয়স কম। সাহস করে চাবি রাখতে পারিনি। এবার থেকে আমার কাছে চাবি থাকবে।

সুরঞ্জনবাবু মিনমিনে গলায় বললেন,—আমার চাবিজোড়াও নিয়েছ তুমি?

চুপ! একটি কথাও নয়। —বলে তিনি কোমরের কাছ থেকে দুজোড়া চাবি বের করে সিঁড়ির পূর্বের ঘরের দরজা খুললেন। তারপর ভিতরে ঢুকে আলো 'জ্বেলে দিলেন। এঘরের কোনো জানলা নেই। দ্বিতীয় কোনো দরজাও নেই।

দেখলুম আমাদের পিছনে ভোঁদাও উঠে এসেছে। চোখে চোখ পড়লে সে নিঃশব্দে হাসল।

শোভাদেবী দেওয়ালের মধ্যে বসানো আয়রনচেস্ট দুটো চাবির সাহায্যে খুললেন। তারপর মেঝেয় মাথা লুটিয়ে প্রণাম করে দুহাতে রুপোর চৌকো থালায় বসানো দেবী মহালক্ষ্মীকে বের করলেন। কষ্টিপাথরে তৈরি ছোট্ট প্রতিমার মাথায় রত্নখচিত মুকুট আর গলা থেকে হাঁটু অব্দি ঝোলানো জড়োয়া নেকলেস আলোয় ঝলমল করে উঠল।

সুরঞ্জনবাবু আর সুদর্শনবাবু মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলেন। শোভাদেবী বললেন,—ও. সি. সায়েব, কর্নেলসায়েব। এবার আপনারা কী বলবেন, বলুন!

ও. সি. মিঃ ভাদুড়ি একটু হেসে বললেন,—আপনার স্বামী রাজসাক্ষী হবেন! আর কী বলব? আপনার গোয়েন্দাগিরির কাছে হার না মেনে উপায় নেই। কী বলেন কর্নেলসায়েব? মিঃ হালদার?

কর্নেল চুপ করে থাকলেন। হালদারমশাই বললেন,—ঠিক কইছেন মিঃ ভাদুড়ি! এতদিনে বুঝলাম, ওনাগো ক্যান গৃহলক্ষ্মী কয়!

মিঃ ভাদুড়ি আমার দিকে ঘুরে বললেন—জয়ন্তবাবু! আপনি তো সাংবাদিক! আমার ধারণা, পুরো ঘটনাটি আপনি আপনাদের পত্রিকায় লিখবেন। তাই না?

কর্নেল সহাস্যে বললেন,—জয়ন্ত রোমহর্ষক গপ্পো লিখে ফেলবে। ওকে একটু সতর্ক করে দেওয়া উচিত।

বলে তিনি পিছনে ঘুরলেন। —অ্যাই ভোঁদারাম! উঠে পড়ো বাবা! রায়বাড়ির মহালক্ষ্মী দেবী দর্শন করতে চেয়েছিলে। দর্শন হয়ে গেছে। আর কী?

ভোঁদা এতক্ষণ ধরে উপুড় হয়ে মেঝেয় মাথা ঠেকিয়ে ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে সে তেমনই নিঃশব্দে হাসল। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, প্রতিমার মূল্যবান রত্নরাজির চেয়ে একটি অনাথ, সরল ও নিষ্পাপ তরুণের এই হাসি অনেক বেশি উজ্জ্বল। অনেক বেশি মূল্যবান।...

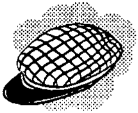

কালিকাপুরের ভূত রহস্য

এক

সেবার ডিসেম্বরেও কলকাতায় তত শীত পড়েনি। এক রবিবারে অভ্যাসমতো কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে আড্ডা দিতে এসেছিলুম। দেখলুম কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে যথারীতি চুরুট টানছেন, আর সোফার কোণের দিকে বসে প্রাইভেট ডিটেকটিভ আমাদের প্রিয় হালদারমশাই ডানহাতে খবরের কাগজ আর বাঁ-হাতে এক টিপ নস্যি নিয়ে বসে আছেন। আর কর্নেলের কাছাকাছি যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কাঁচুমাচু মুখে বসে আছেন, তাঁকে দেখেই বোঝা গেল তিনি মফস্বলের মানুষ। কলকাতার লোকজনের চেহারা আর হাবভাবে বেশ খানিকটা চেকনাই থাকে। এই ভদ্রলোক মুখ তুলে আমাকে দেখে আর-একটু আড়ষ্টভাবে সরে বসলেন। কর্নেলের জাদুঘর সদৃশ ড্রইংরুমে ঢুকেই আমি সম্ভাষণ করেছিলুম,—মর্নিং কর্নেল।

কর্নেল আমার দিকে তাকিয়ে গলার ভেতরে 'মর্নিং' আউড়ে আবার চোখ বুজলেন।

ভদ্রলোকের সামনে দিয়ে এগিয়ে আমি সোফার শেষপ্রান্তে বসলুম। এতক্ষণে হালদারমশাই নস্যি নাকে গুঁজে কাগজ নামিয়ে রেখে মৃদুস্বরে বললেন,—আয়েন জয়ন্তবাবু, বয়েন। আপনাগোর সত্যসেবক পত্রিকায় আইজ তেমন কিসু নাই।

আমি চোখের ইশারায় প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললুম,—আছে। সবকিছু কি কাগজে ছাপা হয়!

আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে গোয়েন্দাপ্রবর বললেন,—হ, ঠিক কইসেন।

ইতিমধ্যে ষষ্ঠি আমার জন্যে এক পেয়ালা কফি দিয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে বললুম, —এবার ডিসেম্বরেও কলকাতায় শীতের দেখা নেই। ফ্যান চালাতে হচ্ছে।

আমার কথা শুনে সেই ভদ্রলোক বলে উঠলেন,—আপনাদের কলকাতা শহরে এসে আমাকে সোয়েটার খুলতে হয়েছে। সোয়েটারের ওপর ওই দেখছেন একখানা শাল, তাও জড়ানো ছিল। আমাদের কালিকাপুরে গেলে কিন্তু শীতের কামড়ে আপনার হাড় নড়িয়ে দেবে।

কর্নেল তো তুম্বো মুখে চোখ বুজে কী ধ্যান করছেন, কে জানে।

কালিকাপুরের ভদ্রলোক কথা বলায় গুমোট ভাবটা কেটে গেল। জিগ্যেস করলুম,—আপনি কালিকাপুর থেকে আসছেন? সেটা কোথায়?

ভদ্রলোক বললেন, আজ্ঞে বেশি দূরে নয়, মোটে ঘণ্টাচারেকের ট্রেন জার্নি। স্টেশন থেকে নেমে এক্কাগাড়ি, সাইকেলরিকশা, বাস—সবই পাওয়া যায়। গঙ্গার ধারে আমাদের গ্রামটা এখন আর গ্রাম নেই। ইলেকট্রিসিটি এসেছে, টেলিফোন এসেছে, নিউ টাউনশিপ হয়েছে।

ভদ্রলোক আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কর্নেল চোখ খুলে বললেন,—আপনার বাড়িতে আপনার বাবা আর কাকা ছাড়া আর কে-কে থাকেন?

ভদ্রলোক বললেন,—আমার এক বিধবা পিসি থাকেন। আমার মা তো অনেক বছর আগে মারা গিয়েছেন। কাকা বিয়ে করেননি। সাধুসন্ন্যাসীর মতো ওঁর চালচলন। আমরা ভাবি কবে

হয়তো কাকা সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে যাবেন। অথচ আপনাকে বলেছি আমার বাবা রুগ্‌ণ মানুষ, বাড়ি থেকে বেরোতেই পারেন না। কিন্তু কাকার শরীর-স্বাস্থ্য খুব ভালো। নিয়মিত যোগব্যায়াম করেন কিনা।

কর্নেল বললেন,—বাড়িতে কাজের লোক নিশ্চয়ই আছে?

ভদ্রলোক বললেন,—হ্যাঁ, তা আছে। মানদা নামে একটি মেয়ে প্রতিদিন ভোরবেলায় আসে, সারাদিন থেকে সন্ধের পর নিজের খাবারটা বেঁধে নিয়ে বাড়ি চলে যায়। আপনাকে তো বলেছি, ব্যাপারটা প্রথম তারই চোখে পড়ে। আপনি হয়তো ভুলে গেছেন কর্নেলসাহেব।

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। আপনি বলেছিলেন বটে। কিন্তু মানদা তখনই ফিরে এসে কথাটা আপনাদের বলেনি কেন? আপনি বলেছিলেন পরদিন সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফেরার সময়েই সে কথাটা আপনার পিসিমাকে বলেছিল—তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলুম। আসলে এমন একটা গোলমেলে ব্যাপার যে ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না। আমাদের বাড়ির পাশের রাস্তাতেই ইলেকট্রিক আলো আছে। গত বছর কালিকাপুরে মিউনিসিপ্যালিটি হয়েছে কিনা! বুঝে দেখুন স্যার, শীতের রাতে এখন ওখানে বড্ড কুয়াশা হয়। তা হলেও মানদা স্পষ্ট চিনতে পেরেছিল লোকটাকে।

হালদারমশাই গুলি-গুলি চোখে তাকিয়ে কথা শুনছিলেন। এবার বলে উঠলেন,—তা হইলে ক্যামনে বুসলেন ওই লোকটাই সেই মরে যাওয়া লোক?

ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বললেন,—আমাদের মানদা স্যার খুব চালাক-চতুর মেয়ে। অন্ধকারেও দেখতে পায়। তা ছাড়া যে লোকটাকে দেখেছিল, সে সম্পর্কে আমারই এক দাদা। মাসতুতো দাদা। পাঁচ বছর আগে তাকে আমরা শ্মশানে চিতায় দাহ করে এসেছি। বাবা-কাকা সবাই ছিলেন শ্মশানে।

কর্নেল বললেন,—আপনার ওই মাসতুতো দাদার নাম বিনোদ মুখুজ্যে তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওরা মুখুজ্যে, আমরা চাটুজ্যে। কথাটা বিশ্বাস করতুম না, কিন্তু আমাদের পাড়ার বামাপদ গোঁসাই হঠাৎ কাল কথায়-কথায় বললেন, হ্যাঁরে শচীন, তোদের বাড়ির কাছে কাল সন্ধেবেলা একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছিলুম। মাত্র হাত দশেক দূরে। দ্যাখা মাত্রই চমকে উঠেছিলাম। এ তো সেই পাগলা বিনোদ!

এবার আমি জিগ্যেস করলুম,—পাগলা বিনোদ মানে?

শচীনবাবু বললেন,—কর্নেলসাহেবকে সবই বলেছি। আমার ওই মাসতুতো দাদার কোনও চালচুলো ছিল না। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াত, মাঝে-মাঝে একটু-আধটু পাগলামি করত। তারপর বেশ কিছুদিন খুব শান্ত আর গম্ভীর হয়ে থাকত। তাই লোকে ওকে বলত বিনোদ পাগলা, বা পাগলা বিনোদ।

কথাটা বলে শচীনবাবু সার্জের পাঞ্জাবির হাতা সরিয়ে ঘড়ি দেখলেন। তারপর করজোড়ে বললেন,—কর্নেলসাহেব, কালিকাপুরের জমিদারবাড়ির চণ্ডীবাবু আপনার কাছে পাঠিয়েছেন—সেকথা তো আগেই বলেছি। আমাদের রাতের ঘুম একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যখন-তখন ওই উৎপাত।

কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে, চণ্ডীবাবুকে গিয়ে বলবেন আমরা যে-কোনও দিন কালিকাপুরে গিয়ে হাজির হব। সেখানে কোথায় উঠব তা আগে থেকে বলতে পারছি না। তবে আপনারা নিশ্চয়ই খবর পাবেন।

কালিকাপুরের শচীনবাবু তাঁর ব্যাগের ভেতর শালটাও যেন খুলে ভরে নিলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—এখনই শিয়ালদায় একটা ট্রেন আছে। ট্যাক্সি করে চলে যাব।

বলে তিনি প্রথমে কর্নেলকে, তারপর আমাদের দুজনকে নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন। সেই সময় লক্ষ করলুম, তিনি যেন একটু লেংচে হাঁটছেন।

তিনি চলে যাওয়ার পর বললুম,—ভদ্রলোকের বাঁ-পায়ে গণ্ডগোল আছে। তা একটা ছড়ি হাতে নিয়ে হাঁটেন না কেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ছড়িটা উনি দরজার বাইরে ঠেকা দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ছড়ি বলা যায় না, আস্ত বাঁশ বললে ভুল হয় না। কিন্তু বেশ পালিশ করা বাঁশের লাঠি। ভদ্রতা-বশে বা যে-কোনও কারণেই হোক ওটা নিয়ে ঘরে ঢোকেননি।

জিগ্যেস করলুম,—ওঁর সেই মাসতুতো দাদা বিনোদ পাগলার ভূত কি প্রতি রাতে উৎপাত করছে?

কর্নেল কিন্তু হাসলেন না। গম্ভীর মুখে বললেন,—প্রতি রাতে নয়, কিন্তু উৎপাত করছে তা বলা যায়। ওঁদের একতলা বাড়ির ছাদে ধুপ-ধাপ করে শব্দ হয়। আবার কখনও উঠোনে অনেকগুলো ঢিল পড়ে। ঢিলগুলো—এটাই আশ্চর্য, দেখতে পাহাড়ি নদীতে পড়ে থাকা নুড়ির মতো।

বলে কর্নেল তাঁর টেবিলের ড্রয়ার থেকে গোটা চারেক নুড়ি বের করলেন। সেগুলো একেবারে নিটোল, কতকটা ডিমের মতো।

হালদারমশাই উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে বললেন,—মাসতুতো দাদারে দাহ করছিল ওগো শ্মশানে। গঙ্গার ধারে শ্মশান, আর তার ভূত পাহাড় অঞ্চলে যাইয়া এগুলান কুড়াইয়া আনসিল ক্যান? কর্নেলস্যার আপনি আমারে যেন সাথে লইবেন।

কর্নেল ঈষৎ কৌতুকে বললেন,—আমার মতো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবেন আপনি? আপনি তো প্রফেশনাল প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

হালদারমশাই বললেন,—তাড়াইমু কর্নেলস্যার। হাতে কোনও ক্যাস নাই। তাই মনটা ভালো নাই। চৌত্রিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করসি। রিটায়ার কইর‍্যা যা পাইসি তাই যথেষ্ট। এদিকে পেনশেনও পাইত্যাসি আপনার মতন।

কর্নেল চুরুটে শেষ টান দিয়ে বললেন,—ঠিক আছে, তাহলে আপনাকে যাওয়ার সময় ডেকে নেব।

ষষ্ঠি আর এক দফা কফি নিয়ে এল। আমি আপত্তি করছিলুম, কিন্তু কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত, কেসটা তো শুনলে। পাঁচবছর আগে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া মানুষ একেবারে জলজ্যান্ত দেহে ফিরে এসেছে, এবং যারা তার সৎকার করেছিল, তাদের ওপর উৎপাত চালাচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝতে হলে নার্ভ আরও চাঙ্গা করা দরকার।

কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে বললুম,—আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে ওখানে শচীনবাবুদের কোনও শত্রুপক্ষ কোনও কারণে তাদের পেছনে লেগেছে। ওসব ভূতপ্রেতের গল্প বোগাস।

হালদারমশাই সায় দিয়ে বললেন,—হ! ঠিক কইসেন জয়ন্তবাবু। ওনাদের শত্রুপক্ষই উৎপাত করত্যাসে।

কর্নেল বললেন,—শচীন চাটুজ্যে আমাকে বেশ বড় গলায় বলেছেন, ওঁদের কোনও শত্রু নেই। শচীনবাবু স্কুল-টিচার ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন। ওঁর বাবা অহীনবাবু রুগ্‌ণ, শয্যাশায়ী।

তিনিও শিক্ষকতা করতেন। ওঁদের কাকা মহীনবাবু সংসারের কোনও সাতে-পাঁচে থাকেননি। তা ছাড়া, ওঁদের বিষয় সম্পত্তিও কিছু নেই। শুধু ওই ভিটে আর তার সংলগ্ন একটা ঠাকুরবাড়ি।

কর্নেল আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিয়ে বললেন,—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি।...চণ্ডীপ্রসাদবাবু? কী ব্যাপার? এইমাত্র আপনার চিঠি নিয়ে এসেছিলেন শচীন চাট্যুজ্যে। তিনি চলে গেছেন। আমি তাঁকে কথা দিয়েছি, কারণ আপনার সঙ্গে এই সুযোগে আবার দেখা হবে...অ্যাঁ? বলেন কী? কখন?...ও মাই গড! ব্যাপারটা তাহলে দেখছি ছেলেখেলা নয়!...ঠিক আছে। আমরা মানে আমি আর আমার তরুণ সাংবাদিক-বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরী—যার কথা আপনাকে একবার বলেছিলুম। আর একজন রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার, যিনি এখন পেশাদার প্রাইভেট ডিটেকটিভ। তিনজনেই সন্ধ্যার ট্রেনে রওনা হব। সম্ভব হলে আপনি...বাঃ! ঠিক আছে।...আচ্ছা, রাখছি।

কর্নেল রিসিভার রেখে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে মাথার প্রশস্ত টাকে একবার হাত বুলিয়ে নিলেন।

লক্ষ করলুম গোয়েন্দাপ্রবরের হাতে কফির পেয়ালা। এবং তিনি গুলিগুলি চোখে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। অভ্যাসমতো দুই চোয়াল তিরতির করে কাঁপছে।

আমি জিগ্যেস করলুম,—কর্নেল, কালিকাপুরে নিশ্চয়ই কোনও অঘটন ঘটেছে—প্লিজ, কথাটা খুলে বলুন।

কর্নেল এবার সোজা হয়ে বসে কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে চুমুক দিলেন। তারপর মৃদু স্বরে বললেন,—একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। শচীনবাবুদের ঠাকুরবাড়ির সামনে অনেকটা জায়গায় রক্ত পড়ে আছে। ওখানে একটা হাড়িকাঠ আছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবমন্দিরের সামনে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

জিগ্যেস করলুম,—কিন্তু কাকে বলি দেওয়া হয়েছে?

শচীনবাবু ভোর ছ'টায় স্টেশনে গিয়েছিলেন। তাঁর বিধবা পিসি কাজের মেয়ে মানদাকে নিয়ে পুকুরঘাটে যাচ্ছিলেন। মন্দিরের সামনেই একটা পুকুর। খিড়কির দরজা দিয়ে বেরুনোমাত্র হাড়িকাঠের পাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে চবচবে রক্ত দেখা যায়। মানদা চেঁচামেচি জুড়ে দেয়, পড়শিরা দৌড়ে আসে। কিন্তু কাকে বলি দেওয়া হয়েছে, তার লাশ পাওয়া যায়নি। পরে সবার খেয়াল হয় শচীনবাবুর কাকা মহীনবাবুর কোনও পাত্তা নেই।

হালদারমশাই বলে উঠলেন,—ওনার সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছা ছিল, শচীনবাবু কইত্যাসিলেন।

কর্নেল বললেন,—এতে স্বভাবতই লোকের সন্দেহ হয়েছে মহীনবাবুকেই কেউ বা কারা কোনও কারণে বলি দিয়ে তাঁর লাশ গুম করে ফেলেছে। পুলিশ এসে তদন্ত করার পর চলে গেছে। জেলে নৌকাগুলোকে নাকি পুলিশ বলেছে গঙ্গায় কোনও লাশ দেখতে পেলে তার যেন পুলিশকে খবর দেয়।

বললুম,—শচীনবাবুর কাকা মহীনবাবুকেই যে বলি দেওয়া হয়েছে, তা প্রমাণ করার জন্য আজ সারাদিন অপেক্ষা করা যেতে পারে। এমন হতেই পারে, তিনি সাধু-সন্ন্যাসী টাইপের মানুষ, বাড়িতে না বলে কোথাও গঙ্গার ধারে কোনও সন্ন্যাসীকে দেখে তার কাছে বসে আছেন।

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—মহীনবাবু ঘরের বারান্দায় একটা খাটিয়ায় শুয়ে থাকতেন। চণ্ডীপ্রসাদবাবু বললেন, ওটা ওঁর কৃচ্ছ্রসাধনের চেষ্টা। মশারি নিতেন না। একটা হালকা তুলোর কম্বল জোর করে তাঁকে দেওয়া হত। কিন্তু আজ তাঁর খাটিয়ার বিছানা এলোমেলো হয়ে পড়েছিল।

তুলোর কম্বলটা পড়েছিল বারান্দার নীচে। শচীনবাবু ট্রেন ধরবার জন্য তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যান। তাই ওটা লক্ষ করেননি। এদিকে তাঁর পিসি সেটা লক্ষ করলেও ভেবেছিলেন, মহীনবাবু রাগ করে তুলোর কম্বল ফেলে দিয়েছে। মাঝে-মাঝে তিনি এই শীতেও ঠান্ডা মেঝেয় শুয়ে থাকতেন।

হালদারমশাই বললেন,—হেভি মিস্ট্রি।

কর্নেল চুপচাপ চা খাওয়ার পর চুরুট-কেস থেকে একটা চুরুট বের করে লাইটার দিয়ে ধরালেন, তারপর ধ্যানস্থ হলেন।

এই সময় আবার টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল দ্রুত সোজা হয়ে বসে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে সাড়া দিলেন।—বলুন চণ্ডীবাবু...পুকুরপাড়ে রক্ত পাওয়া গেছে? আপনি পুলিশকে চাপ দিলে পুলিশ কলকাতার ডগ স্কোয়াড থেকে শিক্ষিত কুকুর নিয়ে যেতে পারে। ওখানে যে স্যান্ডেলটা পাওয়া গেছে, তা যখন মহীনবাবুর না, তখন খুনেদেরই হতে পারে...ঠিক আছে, আপনি বলুন। যদি পুলিশ ইতস্তত করলে আমাকে জানাবেন। আমি লালবাজারে আমার জানা অফিসারদের সাহায্যে একটা ব্যবস্থা করতে পারব।...আমরা রাতের ট্রেনে যাচ্ছি।

দুই

কোনও অভিযানে বেরুনোর আগে লক্ষ করেছি কর্নেল কতকগুলো কাজ করেন। যেখানে যাচ্ছেন সেখানকার পুলিশ কর্তাদের জানিয়ে যান। এটা স্বাভাবিক, কারণ খুনি হোক বা অপরাধী হোক, রহস্যের পরদা তুলে তিনি তাকে দেখিয়ে দিতে পারেন। তাই বলে তাকে গ্রেফতারের ক্ষমতা তো তাঁর নেই। তাই পুলিশ ছাড়া তাঁর চলে না। এদিকে আর-একটা সমস্যা, তাঁর নিজের চেহারা এবং বয়স নিয়ে। রহস্যের পেছনে ছোটা মানে গোয়েন্দাগিরি করা। কর্নেল অঙ্ক কষে রহস্য আঁচ করতে পারেন বটে, কিন্তু সব তথ্য জোগাড় করতে একজন চালাক-চতুর অভিজ্ঞ লোক দরকার। সেই জন্যই অনেক সময়ই তিনি প্রাক্তন পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং বর্তমানে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কৃতান্তকুমার হালদার অর্থাৎ হালদারমশাইকে সঙ্গে নেন। আর আমি তো নেহাত সাংবাদিক! কর্নেলের কীর্তিকলাপ রোমাঞ্চকর করে লিখি বটে, কিন্তু কোনও রহস্যময় ঘটনার সূত্র খুঁজে বের করা আমার সাধ্য নয়।

আরও একটা কথা বলে রাখা দরকার, এ-ধরনের অভিযানে বেরুতে হয় বলে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে আমার জন্য একটা ঘর বরাদ্দ আছে। সেখানে পোশাক-আশাক থেকে শুরু করে দাড়ি কাটার ব্লেড, টুথব্রাশ আর পেস্ট সবই থাকে। কাজেই আমার আর সল্টলেকের ফ্ল্যাটে ফেরা হল না। কর্নেল নীচের তলায় আমার গাড়ি রাখার জন্য একটা গ্যারেজও খালি রেখেছেন। একসময় সেখানে তাঁর একটা ল্যান্ড রোভার গাড়ি ছিল। পুরোনো গাড়ির ঝামেলা অনেক, তাই সেটা লোহা-লক্করের দামে বেচে দিয়েছিলেন।

দুপুরে খাওয়ার পর আমার ভাত-ঘুমের অভ্যাস আছে। ড্রইংরুমের একটা ডিভানে যথারীতি শুয়ে পড়েছিলুম! কর্নেল তাঁর অভ্যাসমতো ইজিচেয়ারে বসে চুরুট টানছিলেন। তারপর একবার কানে গিয়েছিল টেলিফোনে চাপাস্বরে কার সঙ্গে কথা বলছেন।

আমার ভাত-ঘুম ভেঙে ছিল ষষ্ঠিচরণের ডাকে। তার হাতে চায়ের কাপ-প্লেট! দেখলুম কখন আমার গায়ের ওপর কেউ একটা হালকা কম্বল চাপিয়ে দিয়ে গেছে। তার মানে আমার ঘুমটা যাতে ভালো হয়, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উঠে বসে ষষ্ঠির হাত থেকে চা নিয়ে বললুম,—আমার গায়ে এই মড়ার কম্বল চাপাল কে?

ষষ্ঠি খি-খি করে হেসে উঠল। বলল,—বাবামশাই আড়াইটেতে বেরিয়ে গেছেন। যাওয়ার সময় উনিই কম্বলটা আপনার গায়ে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। আর-একটা কাজ করেছেন।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললুম,—তুমি না-বললেও বুঝেছি। আমার প্যান্টের পকেট থেকে গাড়ির চাবি চুরি করে কোথাও উধাও হয়েছেন।

ষষ্ঠি আরও হেসে বলল,—বাবামশাই বলে গেছেন, ঠিক চারটেয় তোর দাদাবাবুকে চা দিবি। আমি তো জানি, আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে বাসিমুখে চা খান। আবার দুপুরে ঘুমুলেও বিছানায় বসে আপনার চা খাওয়ার অভ্যেস আছে।

কথাটা বলে ষষ্ঠিচরণ হন্তদন্ত চলে গেল। বুঝতে পারলুম সে ছাদের বাগানে কাক তাড়াতে যাচ্ছে। কারণ এই শীতের বিকেলে পাশের বাড়ির একটা নিমগাছে কাকেরা ঝগড়া করে। আবার ঝগড়া করতে-করতে ঝাঁক বেঁধে এসে কর্নেলের সাধের বাগানে হামলা করে। সেখানে বিচিত্র প্রজাতির অর্কিড, ক্যাকটাস আর কিম্ভূত-কিমাকার সব বনসাই আছে। ষষ্ঠি হালদারমশাইয়ের পরামর্শে একটা কাকতাড়ুয়া তৈরি করেও কাকের উৎপাত থামাতে পারেননি। এ-হল গিয়ে কলকাতার কাক, কাজেই ষষ্ঠির এখন কাকের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময়।

চা খাওয়ার পর আমি নিজেই কিচেনে গিয়ে চায়ের কাপ-প্লেট রেখে এলুম। তারপর ভাবলুম ছাদের বাগানে ষষ্ঠির যুদ্ধ দেখতে যাব, কিন্তু সেই সময় ডোরবেল বেজে উঠল। কিচেনের পেছন দিয়ে গিয়ে একটা করিডর দিয়ে হেঁটে সদর দরজায় গেলুম। আইহোল-এ চোখ রেখে দেখলুম, হালদারমশাই এসে গেছেন।

এই দরজায় যে ল্যাচ-কি সিসটেম আছে, তাতে ভেতর থেকে দরজা খোলা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে দরজা খুলতে হলে চাবি চাই। আমি দরজা খুলে দিলে হালদারমশাই সহাস্যে বললেন, —ষষ্ঠি গেলে কই?

বললুম,—ষষ্ঠি এখন ছাদের বাগানে কাকের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

এই দরজা দিয়ে ঢুকলে ডানদিকে ডাক্তারবাবুদের যেমন রোগিদের জন্য ছোট্ট ওয়েটিংরুম থাকে, তেমনি ছোট্ট একটা ঘর আছে। এই ঘর দিয়ে এগিয়ে গেল ড্রইংরুম।

আমার সঙ্গে ড্রয়িংরুমে ঢুকে হালদারমশাই বললেন,—কর্নেলস্যার গেলেন কই? তিনিও কি কাকের লগে ফাইট করতে গেছেন?

বললুম,—না, আমি যখন ভাত-ঘুম দিচ্ছিলুম তখন উনি আমার গাড়ি চুরি করে নিপাত্তা হয়ে গেছেন।

গোয়েন্দাপ্রবর খিল-খিল করে হেসে সোফায় বসলেন। দেখলুম তিনি একেবারে সেজেগুজেই এসেছেন। গায়ে অবশ্য হাতকাটা সোয়েটার, কিন্তু হাতে ভাঁজ করা একটা জ্যাকেটও আছে। আর আছে তার কাঁধে ঝোলানো একটা পুষ্ট পলিব্যাগ।

বললুম,—কর্নেল বলছিলেন ট্রেন ছাড়বে সন্ধ্যা সাড়ে-ছ'টায়। তবে ডিসেম্বরে সাড়ে-ছ'টা মানে রাত বলাই ভালো।

হালদারমশাই সায় দিয়ে বললেন,—হ! তাই দেরি করলাম না।

বলে তিনি কণ্ঠস্বর চেপে জিগ্যেস করলেন—আচ্ছা জয়ন্তবাবু, আপনার কি মনে হয় কালিকাপুরের চাটুজ্যে বাড়িতে এমন কোনও দামি জিনিস আছে, যেটা হাতানোর জন্য অগো কেউ ভয় দ্যাখাইতাসে!

বললুম,—সেটা আপনি সেখানে গিয়ে গোয়েন্দাগিরি করে জেনে নেবেন।

বলে আমি সুইচ টিপে ঘরের আলো জ্বেলে দিলুম। কারণ, শীত না পড়লেও অন্ধকার নামতে দেরি করেনি। ওদিকে ততক্ষণে ষষ্ঠিচরণও ছাদ থেকে নেমে এসেছে।

হালদারমশাই বললেন,—কর্নেলস্যার আইলে তখন কফি খামু—কি কন?

আমি সায় দেওয়ার আগেই ড্রইংরুম-সংলগ্ন সেই ছোট্ট ওয়েটিং-রুমে কর্নেলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম,—আমি এসে পড়েছি হালদারমশাই। আর ষষ্ঠিটাও আমাকে করিডরের ওদিক থেকে উঁকি মেরে দেখে ফেলেছে। আমি ভেবেছিলুম চুপিচুপি ঘরে ঢুকে ষষ্ঠিকে চমকে দেব। কিন্তু সে সম্ভবত ছাদের বাগান থেকেই জয়ন্তের গাড়িটা দেখতে পেয়েছিল।

গোয়েন্দাপ্রবর ফিক করে হেসে বললেন,—জয়ন্তবাবু কইসিলেন আপনি ওনার গাড়ি চুরি করসেন।

কর্নেল তাঁর বিখ্যাত অট্টহাসি হেসে ইজিচেয়ারে বসলেন। তারপর আমার গাড়ির চাবিটা বের করে টেবিলে রাখলেন।

জিগ্যেস করলুম,—আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এমন জায়গায় গিয়েছিলেন যেখানে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে অসুবিধে হত, কাজেই জিগ্যেস করছি না কোথায় এবং কেন গিয়েছিলেন।

কর্নেল বললেন,—না, তোমাকে নিয়ে গেলে অসুবিধে হত না, কিন্তু তোমার সুনিদ্রা ভাঙাতে চাইনি।

ষষ্ঠিচরণ ট্রেতে কফির পট, দুধ, চিনি, চায়ের পেয়ালা আর এক প্লেট চানাচুর রেখে গেল। কর্নেল বললেন,—হিস-হিস, হুস-হুস—সব নিজের-নিজের কফি তৈরি করে নাও। হালদারমশাই তো স্পেশাল কফি খান। কাজেই স্বাবলম্বি হওয়াই ভালো। আমরা নিজের-নিজের কফি তৈরি করে নিলুম, হালদারমশাই একটু বেশি দুধ মেশানো কফি অভ্যাস মতো ফুঁ দিয়ে-দিয়ে চুমুক দিতে থাকলেন।

আমি বললুম,—আপনি বলছিলেন সাড়ে-ছ'টায় ট্রেন। এখন পাঁচটা বেজে গেছে। অন্তত এক ঘণ্টা আগে বেরুনো উচিত।

কর্নেল আমার কথার কোনও জবাব দিলেন না। তিনি কফি পান করতে করতে বুক পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন। তারপর সেটা এক হাতেই খুলে টেবিলে রাখলেন। তার ওপর পেপারওয়েটের মতো আমার গাড়ির চাবিগুলো চাপা দিলেন। লক্ষ করলুম হালদারমশাই গুলি-গুলি চোখে কাগজটার দিকে তাকিয়ে আছেন। বললুম,—ওই কাগজটা কোথাও আনতে গিয়েছিলেন?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। ওতে কালিকাপুরের চ্যাটার্জি ফ্যামিলির পূর্ব-পুরুষের লুকিয়ে রাখা গুপ্তধনের খবর আছে।

কথাটা শোনামাত্র হালদারমশাই এত জোরে নড়ে বসলেন, যে তাঁর পেয়ালা থেকে খানিকটা কফি ছিটকে তাঁর প্যান্টের ওপর পড়ল। তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন,—কী কইলেন? কী কইলেন?

কর্নেল তেমনই গম্ভীর মুখে বললেন,—গুপ্তধনের সন্ধান।

হালদারমশাই আমার দিকে ঘুরে বসে বললেন,—ঠিক এই কথাটাই আমার মাথায় আইজ সারা দিন মাসির মতন ভনভন করত্যাসিল।

আমি হাসি চেপে বললুম,—হালদারমশাই, এ-গুপ্তধনটা কর্নেলকে ফাঁকি দিয়ে আপনি আর আমি দুজনে ভাগাভাগি করে নেব—কি বলেন?

কর্নেল কিন্তু হাসলেন না। তেমনই গম্ভীর মুখে বললেন,—তবে গুপ্তধন সব সময়েই যে ধনরত্ন হবে, এমন কিন্তু নয়। একটু খুব পুরোনো, ধরো পাঁচশো বছরের কোনও সাধারণ জিনিসকেও গুপ্তধন বলা যায়।

বললুম,—আপনার ওই কাগজটা কিন্তু মোটেই পুরোনো নয়। একটা ছোট্ট প্যাডের একটা স্লিপ বলেই মনে হচ্ছে।

কর্নেল আমার কথায় কান না দিয়ে কফি শেষ করলেন, তারপর চুরুট ধরিয়ে টেবিলের ড্রয়ার থেকে তাঁর আতস কাচটা বের করলেন। এরপর তিনি টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে আতস কাচের সাহায্যে কাগজের লেখাগুলো খুঁটিয়ে দেখার পর বললেন,—হ্যাঁ, এতে গুপ্তধনের সূত্র লেখা আছে বটে।

হালদারমশাই ব্যস্তভাবে বললেন,—কী লেখা আছে কন তো কর্নেলস্যার।

কর্নেল কাগজটা আমার হাতে দিলেন। দেখলুম এটা একটা ছোট্ট প্যাডের স্লিপই বটে। তাতে লেখা আছে :

হালদারমশাই উঁকি মেরে দেখছিলেন। বললেন,—অম্ল, মানে টক। তারপর হং, মং—এগুলিন কী?

কর্নেল বললেন,—যিনি এটা আমাকে দিয়েছেন, তাঁর কাছেই পাঁচশো বছরের বেশি পুরোনো একটা তুলোট কাগজে এগুলো লেখা আছে।

আমি অবাক হয়ে বললুম,—এটা কে আপনাকে দিল, তা বলতে আপত্তি আছে?

কর্নেল বললেন,—তুমি দুপুরে যখন স্নান করছিলে, তখন টেলিফোনে এক ভদ্রলোক তাঁর নাম ঠিকানা দিয়ে আমাকে শিগগির যেতে বলেন। আমি যথেষ্ট সতর্ক হয়েই গিয়েছিলুম, তারপর তাঁর পরিচয় পেয়ে বুঝতে পারলুম ইনি কালিকাপুরের চাটুজ্যে পরিবারেরই এক জ্ঞাতি। কালিকাপুরের চণ্ডীপ্রসাদ সিংহ তাঁর বন্ধু এবং ছাত্রজীরনের সহপাঠী ছিলেন। চণ্ডীবাবুই তাঁকে ফোন করে সেখানে যা ঘটেছে তা জানিয়েছেন। চণ্ডীবাবু আমার পরিচয় এবং ফোন নম্বর তাঁকে দিয়ে বলেছেন তাঁর কাছে যে অমূল্য প্রাচীন কাগজটা আছে, তা যেন আমাকে তিনি দেন। কিন্তু তাঁর টেলিফোন পেয়ে আমি তাঁর সঙ্গে যখন দেখা করতে গেলুম তখন তিনি সেই কাগজটা থেকে আমাকে দেবনাগরী লিপিতে লেখা ওই শব্দগুলো টুকে নিলেন। আমি অবশ্য মিলিয়ে দেখে নিয়েছি।

জিগ্যেস করলুম,—ভদ্রলোক কে, কোথায় থাকেন?

কর্নেল বললেন,—তাঁর নাম শরদিন্দু চ্যাটার্জি। থাকেন ভবানীপুরে। তাঁর বাবা থাকতেন কালিকাপুরে। তারপর কলকাতায় আসেন। শরদিন্দুবাবুর নেশা পাখি শিকার করা। আজকাল এসব শিকার নিষিদ্ধ। তবু শীতকালে কালিকাপুরের ওদিকে একটা বিশাল বিলে অনেক দেশি-বিদেশি জলচর পাখি আসে। শরদিন্দুবাবু অভ্যাস ছাড়তে পারেননি। গোপনে বুনো হাঁস শিকার করতে যান। তবে জ্ঞাতিদের বাড়িতে ওঠেন না। তাঁর আশ্রয় চণ্ডীবাবু। হাঁস শিকার করতে পারলে সেদিনই তিনি তাঁর ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। তাঁর যাওয়ার কথা ছিল আজ। কিন্তু একটা কাজে আটকে পড়েছেন। তিনি পেশায় একজন আইনজীবী। তাই কোর্টের ছুটি না থাকলে তাঁর কালিকাপুর যাওয়া হয় না।

বললুম,—তাহলে তিনি সেখানে যাচ্ছেন না?

কর্নেল বললেন,—আর কয়েকদিন পরেই তো বড়দিন—পঁচিশে ডিসেম্বর, কাজেই তার আগের দিন তিনি সন্ধ্যার ট্রেনে যাবেন।

হালদারমশাই টান হয়ে শুয়েছিলেন। বললেন,—এই ভদ্রলোকেরে আমার সন্দেহ হইত্যাসে। আইনজীবী হইয়াও তিনি আইন ভঙ্গ করেন।

কর্নেল এতক্ষণে একটু হাসলেন। বললেন,—আপনি কি তিনটে দিন অপেক্ষা করে শরদিন্দুবাবুর গতিবিধির দিকে লক্ষ রাখবেন? তারপর না হয় ওঁকে ফলো করেই কালিকাপুরে যাবেন।

হালদারমশাই কাঁচুমাচু হেসে বললেন,—নাঃ, যখন বারাইয়া পরসি তখন আর কোনও কথা না। তেমন বুসলে আমি কালিকাপুরে থাইক্যা যামু।

এইসব কথাবার্তা হতে-হতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। তারপর কর্নেল কাগজটা নিজের পকেটে ভরে বললেন,—জয়ন্ত এই তোমার গাড়ির চাবি আমি আলমারির লকারে রেখে যাব। যাও তুমি রেডি হয়ে নাও। এই সময়টা রাস্তায় বড্ড জ্যাম হয়। হাতে সময় রেখে বেরুনোই ভালো। তা ছাড়া লোকাল ট্রেন। আমার টিকিট কাটার দরকার হয় না। কিন্তু তোমাদের দুজনের জন্য টিকিটের ব্যবস্থা করতে হবে।

হালদারমশাই আড়মোড়া দিয়ে সোফায় হেলান দিলেন। কর্নেল তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আর আমি ঢুকলুম আমার জন্য সংরক্ষিত ঘরে। শীতকাল বলে আমার ঘরে বাড়তি জ্যাকেট সোয়েটার, কান-ঢাকা-টুপি—সবই রাখা ছিল। তবে আমার পয়েন্ট বাইশ ক্যালিবারের সিক্স রাউন্ডার রিভলভারটা ছিল আমার হ্যান্ড ব্যাগে। ওটা সবসময়েই কর্নেলের উপদেশে আমি সঙ্গে রাখি। একটা বাড়তি ব্যাগে দরকারি জিনিসপত্র পোশাক-আশাক ভরে নিয়ে আমি ড্রইংরুমে এলুম। তারপর এলেন কর্নেল। আর কর্নেলের গলায় দেখলুম যথারীতি বাইনোকুলার আর ক্যামেরা ঝুলছে। তাঁর পিঠে আঁটা কিটব্যাগ, আর হাতে একটা পুষ্ট মোটাসোটা ব্যাগ।

বেরুতে যাচ্ছি টেলিফোনটা বাজল। বিরক্ত হয়ে কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন। তারপর কাকে কৌতুক করে বললেন,—হ্যাঁ বলি হতেই তো যাচ্ছি দাদা!

হালদারমশাই চমকে উঠে বললেন,—কেডা কী কইল?

কর্নেল বললেন,—ও কিছু না, চলুন।

তিন

সে-রাতে কালিকাপুর স্টেশনে যখন ট্রেন পৌঁছেছিল, তখন টের পেয়েছিলুম শীত কাকে বলে! প্রচণ্ড কনকনে শীতের রাতটা সত্যিই একটা অ্যাডভেঞ্চারের পরিবেশ তৈরি করেছিল। কারণ, কর্নেলের বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় কেউ হুমকি দিয়েছিল। কাজেই আমি চারদিকে সতর্ক চোখে লক্ষ করছিলুম। কর্নেল অবশ্য নির্বিকার। হালদারমশাই লোকের ভিড় ঠেলে যেতে-যেতে একবার বলেছিলেন,—কী কাণ্ড! কলকাতায় ফ্যান চলত্যাসে, আর এখানেও ফ্যান চলত্যাসে।

এই ধাঁধার জবাব পেলুম একটু ফাঁকায় গিয়ে। নীচের চত্বরে সাইকেলরিকশা, এক্কাগাড়ি, আর বাস—এইসব যানবাহনের ভিড়। হালদারমশাইকে জিগ্যেস করেছিলুম,—কলকাতা আর এখানে ফ্যান চলছে বলছিলেন—ব্যাপারটা কী?

হালদারমশাই হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—বুজলেন না, ওখানে চলত্যাসে ইলেকট্রিক ফ্যান আর এখানে চলত্যাসে নেচারের ফ্যান।

এতক্ষণে লক্ষ করেছিলুম কথা বলতে গেলেই মুখ দিয়ে বাষ্প বেরুচ্ছে। কর্নেল এদিক-ওদিক ঘুরে চণ্ডীবাবুর পাঠানো গাড়ি খুঁজছিলেন। একটু পরেই যাত্রীদের নিয়ে সব যানবাহন চলে গেল, কিন্তু কোনও প্রাইভেট গাড়ি চোখে পড়ল না।

কর্নেল বললেন,—আবার কোনও গণ্ডগোল হয়নি তো? চণ্ডীবাবুর গাড়ি দেখছি না কেন?

হালদারমশাই বললেন,—কর্নেলস্যার, এই শীতে মাটির ভাঁড়ে চা খাইয়া লই। গাড়ি ঠিক আইয়্যা পড়বে।

হালদারমশাই চায়ের দোকানের দিকে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় হর্ন দিতে-দিতে একটা মেরুন রঙের প্রাইভেট গাড়ি এসে আমাদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে গেল। তারপর ড্রাইভার নেমে কর্নেলকে সেলাম ঠুকে বলল,—পথে একটু দেরি হয়ে গেছে স্যার। বেশি ঠান্ডায় গাড়ির ইঞ্জিন ঠিক মতো কাজ করছিল না। এখন ঠিক হয়ে গেছে, আপনারা উঠে পড়ুন।

কর্নেল সামনের সিটে এবং আমরা দুজনে পেছনের সিটে বসলুম। তারপর ড্রাইভার গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে স্পিড বাড়াল। জানলার কাচ তোলাই ছিল, তবু কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায় জবুথবু হয়ে বসে থাকলুম। রাস্তাটা তত ভালো নয়, তাই ঝাঁকুনির চোটে অস্থির হচ্ছিলুম। দু-ধারে সারবদ্ধ গাছপালা হেডলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছিল। কর্নেল ড্রাইভারের সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলছিলেন, কিন্তু সেদিকে আমার কান ছিল না। কেন যে আমি পুরু জ্যাকেটটা পরে আসিনি! তার বদলে এই হালটা জ্যাকেট আর ভেতরে একটা পাতলা সোয়েটার এখানকার শীতের পক্ষে যথেষ্ট নয়। মিনিট পনেরো পরে লক্ষ করলুম, সামনে গাছপালার ফাঁকে গাঢ় কুয়াশার ভেতরে জোনাকির মতো আলো দেখা যাচ্ছে। জনপদের ভেতর ঢুকে শীতের কামড়টা একটু কমে এল। এটা বাজার এলাকা। এত রাত্রে জনমানবহীন হয়ে আছে। তারপর বাঁক নিয়ে ক্রমাগত এদিক-ওদিক ঘুরতে-ঘুরতে যেখানে পৌঁছুলুম সেদিকটায় রাস্তার আলো নেই। কিন্তু একটা বাড়ির গেটে আলো জ্বলছিল। দারোয়ান গেট খুলে দিল। তারপর লন দিয়ে এগিয়ে গাড়ি পোর্টিকোর তলায় থামল। আমরা নিজের-নিজের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে গাড়ি থেকে নামলুম।

ততক্ষণে কর্নেলও নেমেছেন। দেখলুম সিঁড়ির মাথায় এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। গায়ে সোয়েটার এবং পরনে প্যান্ট। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, প্রায় কর্নেলের বয়সি। এই ভদ্রলোকের মুখে অবশ্য দাড়ি নেই, তবে দেখার মতো গোঁফ আছে। মাথার চুলও সাদা। তিনি কয়েক ধাপ নেমে এসে কর্নেলের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করলেন। তারপর বললেন,—আমি ভাবছিলুম ট্রেন লেট করেছে।

ড্রাইভার গাড়ির ভেতর থেকে বলে উঠল,—না স্যার, পথে ইঞ্জিন গোলমাল করছিল। কালকে একবার গ্যারেজে দেখিয়ে আনতে হবে।

ভদ্রলোক আমাদের দিকে তাকিয়ে নমস্কার করে বললেন,—আসুন।

ভেতরে একটা প্রশস্ত ঘর। সেকেলে আসবাবপত্র। এ-ধরনের বনেদি ধনী পরিবারের বাড়ি কর্নেলের সঙ্গগুণে আমার দেখা আছে। তাঁকে অনুসরণ করে আমরা দরজা দিয়ে করিডরে ঢুকলুম। এতক্ষণে চোখে পড়ল একটা গাঁটগোঁট্টা চেহারার লোক করিডরের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। তার চেহারা প্রচণ্ড কালো। সে দু-হাত জোড় করে সামনের দিকে ঝুঁকে বলল,—কর্নেলসাহেবকে দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে। আপনি আসবেন শোনার পর থেকেই আমি শুধু অপেক্ষা করছিলুম। কর্তামশাই আমাকে নন্দ-ড্রাইভারের সঙ্গে স্টেশনে যেতে দিলেন না।

চণ্ডীবাবু কপট ধমক দিয়ে বললেন,—এই কেতো, যাত্রাদলের পার্ট করবি, না সাহেবদের ঘরে নিয়ে যাবি?

সে পাশের একটা ঘরের পরদা সরিয়ে বলল,—সবকিছু রেডি কর্তামশাই। সাহেবরা বসুন, আমি ঠাকুরমশাইকে দেখি।

চণ্ডীবাবু বললেন,—এক মিনিট। কর্নেলসাহেব এত রাতে কি আর কফি খাবেন?

কর্নেল বললেন,—খাব। তবে ডিনারের পরে। কার্তিক, তুমি ঠাকুরমশাইকে কথাটা মনে করিয়ে দিয়ো।

মোটামুটি প্রশস্ত একটা সাজানো-গোছানো ঘরে আমরা ঢুকেছিলুম। দু-ধারে দুটো খাট। একপাশে সোফা। চণ্ডীবাবু কোণের একটা চওড়া টেবিল দেখিয়ে বললেন,—ব্যাগগুলো ওখানে রেখে কর্নেলসাহেব আরাম করে বসুন। আপনার ইজিচেয়ারটা কিন্তু আমি ওপর থেকে আনিয়ে রেখেছি।

কর্নেল তাঁর পিঠে-আঁটা কিটব্যাগটা খুলে টেবিলে রাখলেন। তারপর ক্যামেরা এবং বাইনোকুলারটা একপাশে রেখে দিলেন। তিনি ইজিচেয়ারে বসে মাথার টুপিটা খুলে দেওয়ালের একটা ব্র্যাকেটে আটকে দিলেন। তারপর ইজিচেয়ারে বসে চওড়া টাকে হাত বুলোতে থাকলেন।

ততক্ষণে আমরা সোফায় বসেছি। ঘরের ভেতরটা বেশ আরামদায়ক।

চণ্ডীবাবু বললেন,—একটা রুম হিটার আছে, জ্বেলে দেব নাকি?

কর্নেল বললেন,—না মিস্টার রায়চৌধুরী। আমার সঙ্গীদের একটু শীতের আরাম পাওয়া দরকার। কলকাতায় এখনও ফ্যান চালাতে হচ্ছে।

চণ্ডীবাবু সোফার একপাশে বসে বললেন,—উনি আপনার তরুণ সাংবাদিক বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরী, তা বোঝা যাচ্ছে। আর ইনিই সেই প্রাক্তন পুলিশ অফিসার এবং প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিস্টার কে কে হালদার। কি? আমি ভুল করিনি তো?

হালদারমশাই সহাস্যে বললেন,—নাঃ, আপনি ঠিক ধরসেন। তবে একসময় আমি পুলিশ লাইফে অনেক গ্রামে ঘুরসি, কিন্তু আপনাগো এখানে শীত ক্যান?

চণ্ডীবাবু বললেন,—শীত বদলায়নি। আসলে বদলে গেছেন আপনি। কলকাতায় থাকলে মানুষের অনেক অদলবদল ঘটে যায়।

কর্নেল বললেন,—আচ্ছা মিস্টার রায়চৌধুরী, চাটুজ্যে বাড়ির কেস সম্পর্কে পুলিশ কতদূর এগিয়েছে? আপনি নিশ্চয়ই জানেন।

চণ্ডীবাবু বললেন,—লালবাজার থেকে আপনার সুপারিশে পুলিশ একটা কুকুর এনেছিল। সান্ডেলটা শুঁকিয়ে কুকুরটাকে শুনেছি কাজে লাগানো হয়েছিল। কিন্তু কুকুরটা পুকুরের পাড় দিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা গলি রাস্তায় গিয়েছিল। তারপর আর সে কোনওদিকে এগোয়নি। বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি ওই গলির পাশে একটা নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। ম্যাটাডোরে বোঝাই করে বাড়ির মালমশলা নিয়ে আসা হচ্ছে। তাই পুলিশের সন্দেহ খুনিরা বা খুনি ওই ম্যাটাডোরে চেপে পালিয়ে গেছে।

হালদারমশাই বলে উঠলেন,—পুলিশ ম্যাটাডোরের ড্রাইভার বা যার বাড়ি হইত্যাসে তাগো জেরা করে নাই?

চণ্ডীবাবু একটু হেসে বললেন,—জেরা করেছে, কিন্তু কোনও সূত্রই বেরিয়ে আসেনি। অবশ্য এমন হতেই পারে প্রাণের ভয়ে ড্রাইভার মুখ খুলতে চায়নি।

কথাটা বলে তিনি ঘড়ি দেখলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—আপনারা বাথরুমে হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিন। গরম জলের ব্যবস্থা আছে। আমি দেখি, খাওয়ার ব্যবস্থা কতটা হল।

তিনি বেরুবার আগেই কার্তিক এসে গেল। সে বলল,—সব রেডি স্যার। আপনারা এখনই আসুন। যা শীত পড়েছে খাবার গরম থাকছে না।

নীচের তলায় ডাইনিংরুমে খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা গেস্টরুমে ফিরে এলুম। তারপর কার্তিক এসে বলল,—একজনের শোওয়ার ব্যবস্থা পাশের ঘরেই হয়েছে। এই ঘর থেকে যাওয়া যায়। ওই দেখুন দরজা।

হালদারমশাই টেবিল থেকে তাঁর ব্যাগ তুলে নিয়ে একটু হেসে বললেন,—আমি ওই ঘরে যাই।

কর্নেল বললেন,—যান, কিন্তু সাবধান। এ-বাড়িতেও ভূতের উৎপাত আছে। বাইরের দিকে কেউ কড়া নাড়লে যেন দরজা খুলে বেরুবেন না।

কার্তিক হালদারমশাইকে আমাদের ঘরের মাঝের দরজা দিয়ে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। সে হালদারমশাইকে সব দেখিয়ে এবং বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের ঘরের ভেতর দিয়ে চলে গেল।

চণ্ডীবাবু পাইপ টানছিলেন। আর কর্নেল অভ্যাসমতো কফি পান করছিলেন। আমি পুরু কম্বলের তলায় ঢুকে পড়েছিলুম। দুজনে চাপা গলায় কথা বলছিলেন, কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলুম না। তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি।

সেই ঘুম ভেঙেছিল কার্তিকের ডাকে। তার হাতে চায়ের কাপ-প্লেট দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম কর্নেলের নির্দেশ সে পালন করছে। সে আমার হাতে চায়ের কাপ-প্লেট তুলে দিয়েই বলল, —আমার কর্তামশাইয়ের সঙ্গে কর্নেলসাহেব আর হালদারসাহেব ভোরবেলা বেরিয়ে গেছেন। কিছু দরকার হলে আমি আছি। ওই বেলটা টিপবেন, তাহলেই আমি এসে যাব।

ঘড়িতে দেখলুম সাড়ে সাতটা বাজে। উলটোদিকের জানলা খোলা। পরদার ফাঁকে ম্লান রোদের আভা। কার্তিক বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি বেড-টি খাওয়ার পর উলটোদিকের দরজা খুলে দেখলুম, এদিকে টানা বারান্দা। আর নীচে রং-বেরঙের ফুলের গাছ। তখনও রোদের সঙ্গে কুয়াশা মিশে আছে। বাউন্ডারি ওয়ালের উঁচু পাঁচিল দেখা যাচ্ছিল। পাঁচিলের ধারে সারবদ্ধ গাছ। কিন্তু ঠান্ডায় বেশিক্ষণ দাঁড়ানো গেল না।

কর্নেলরা যখন ফিরে এলেন, তখন প্রায় ন'টা বাজে। অভ্যাসমতো কর্নেল বললেন,—মর্নিং জয়ন্ত। আশাকরি কোনও অসুবিধে হয়নি?

বললুম,—না। আপনাদের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। আপনারা কি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন?

হালদারমশাই এসেই নিজের ঘরে ঢুকেছিলেন। কর্নেল কিছু বলার আগে তিনি দ্রুত ফিরে এসে ধপাস করে সোফায় বসে বললেন,—আরে কী কাণ্ড!

কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে টুপি, বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা গলা থেকে খুলে পাশের টেবিলে রাখলেন। তারপর বললেন,—হ্যাঁ কাণ্ডই বটে। তবে একটা কথা আপনাকে বলা দরকার হালদারমশাই। অমন করে যেখানে-সেখানে ফায়ার আর্মস বের করবেন না।

গোয়েন্দাপ্রবর কাঁচুমাচু হেসে বললেন,—হ! উচিত হয় নাই। আসলে আমাগো ভূতের ভয় দেখাইতে চায়—এত সাহস!

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—হ্যাঁ। আপনি একসময় পুলিশ অফিসার ছিলেন, আপনার রাগ হওয়ারই কথা। তবে ভাগ্যিস ঢিলগুলো সেইরকম নুড়িপাথর নয়! তাহলে আমাদের চোট লাগত।

জিগ্যেস করলুম,—ব্যাপারটা কী?

কর্নেল বললেন,—গঙ্গার ধারে বাঁধের পথে আমরা যাচ্ছিলুম। হঠাৎ গাছপালার আড়াল থেকে ঢিল এসে পড়তে শুরু করল। তবে মাটির ঢিল। গঙ্গার ধারের মাটি খুব নরম, তাই ঢিলগুলো ভেঙে যাচ্ছিল। চণ্ডীবাবু ছিলেন আগে। তিনি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। আর হালদারমশাই রিভলভার বের করে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন।

বলে কর্নেল তাঁর অনুকরণ করে শোনালেন,—কোন হালা রে! দিমু মাথার খুলি ঝাঁঝরা কইর‍্যা। শুধু তাই নয়, তিনি বাঁধ থেকে নেমে ঝোপজঙ্গল ভেদ করে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তাঁকে চণ্ডীবাবুই পেছন থেকে টেনে ধরেছিলেন। আর জায়গাটা কোথায় জানো?

কালিকাপুরের শ্মশান। তাই ওখানে কোনও বসতি নেই। তা ছাড়া, গঙ্গার ভাঙন রোধে বনদপ্তর থেকে বাঁধের নীচে একটা শালবনও গড়ে তোলা হয়েছে।

হালদারমশাই যে মনে-মনে ক্ষুব্ধ তা বুঝতে পারছিলুম। তিনি নস্যির কৌটো বের করলেন। কিন্তু তখনই কার্তিক একটা বিশাল ট্রেতে কফি এবং স্ন্যাক্স এনে রাখল। তার পেছনে এলেন চণ্ডীবাবু।

কার্তিক চলে গেল। আমরা কফি পানে মন দিলুম। একসময় চণ্ডীবাবু হেসে উঠলেন। তারপর বললেন,—মিস্টার হালদারকে আমি যদি না-আটকাতুম, তাহলে উনি নিশ্চয়ই এক রাউন্ড ফায়ার করে অন্তত একটা ভূতকে ধরাশায়ী করতেন।

হালদারমশাই বললেন,—ঠিক কইসেন। একখান গুলি অন্তত একজন ভূতের হাঁটুর নীচে লাগত।

চণ্ডীবাবু বললেন,—ওই ঘন কুয়াশার মধ্যে আপনারাও কিন্তু বিপদের আশঙ্কা ছিল।

কর্নেল বললেন,—একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে মিস্টার রায়চৌধুরী। কলকাতা থেকেই কেউ বা কারা আমাদের অনুসরণ করেছে। রাত্রে আমরা গাড়িতে আসায় তারা সুবিধে করতে পারেনি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমাদের একটু সতর্ক থাকা ভালো।

হালদারমশাই বললেন,—আর শচীনবাবুও যেমন কেমন বদলাইয়া গেসেন। কলকাতায় ওনাকে মনে হইত্যাসিল খুব সরল মনের মানুষ। কিন্তু এখানে মনে হইল য্যানো কিছু গোপন করবার চেষ্টা করত্যাসেন।

চণ্ডীবাবু জিগ্যেস করলেন,—আপনি অভিজ্ঞ মানুষ, ঠিকই ধরেছেন। ওই শচীনই আমাকে ওর জ্ঞাতি অ্যাডভোকেট শরদিন্দুবাবুর কাছে রক্ষিত ওদের পূর্বপুরুষের একটা দলিলের কথা বলত। কিন্তু কর্নেলসাহেব যখন জানতে চাইলেন উনি কেন নিজে সেটা শরদিন্দুবাবুর কাছে স্বচক্ষে দেখতে চাননি, তখন শচীন ন্যাকা সেজে বলল ওটা তেমন কিছু নয়। তার বাবা নাকি বলেছে ওটার কোনও মূল্যই নেই।

কর্নেল বলে উঠলেন,—হ্যাঁ, শচীনবাবুর কথাটা আমাকেও অবাক করেছে। আমি যখন ওঁকে সেই কাগজটা দেখিয়ে বললুম, এটা তিনি চেনেন কি না, এবং এও বললুম, এটা তাঁদের সেই পূর্বপুরুষের রক্ষিত কাগজে যা লেখা আছে তার কপি, তখন শচীনবাবু একবার চোখ বুলিয়েই বললেন, এটা বাজে। আসল কাগজটা নাকি শরদিন্দুবাবু আমাকে দেখাননি।

এই সময় কার্তিক পরদার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে বলল,—কর্তামশাই, আপনার টেলিফোন এসেছে।

চণ্ডীবাবু তখনই তাঁর কফির কাপে প্লেট ঢাকা দিয়ে আসছি বলে দ্রুত চলে গেলেন।

হালদারমশাই চাপাস্বরে বললেন,—আমার ধারণা, চণ্ডীবাবু আমাগো সঙ্গে থাকায় শচীনবাবু হয়তো মন খুইল্যা কথা কইতে পারেন নাই। কর্নেলস্যার যদি আমারে একটা শচীনবাবুর লগে দেখা করতে কন আমি যামু।

কর্নেল বললেন,—যেতে পারেন, কিন্তু খুব বেগতিক না দেখলে যেন রিভলবার বের করবেন না।

একটু পরে চণ্ডীবাবু ফিরে এসে বললেন,—থানা থেকে ওসি প্রণবেশবাবু ফোন করেছিলেন। উনি কর্নেলসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বললেন।

চার

ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। চণ্ডীবাবু নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে চললেন। কর্নেল তাঁর অভ্যাসমতো সামনের সিটে বসলেন। আমি এবং হালদারমশাই ব্যাক সিটে বসলুম। এই এলাকাটা নিরিবিলি নির্জন। ঘন বসতি এলাকায় পৌঁছে হালদারমশাই বলে উঠলেন,—মিস্টার রায়চৌধুরী, আমাকে এখানেই নামাইয়া দেন।

কর্নেল কিছু বললেন না। কিন্তু চণ্ডীবাবু বললেন,—আপনি কি চাটুজ্যে বাড়ি যেতে চান?

হালদারমশাই বললেন,—হ! আমি একবার নিজের বুদ্ধিতে পা ফালাইয়া দেখতে চাই।

আমি বললুম,—দেখবেন, আড়াল থেকে ভূতের হাতের ইট-পাটকেল যেন না এসে পড়ে।

গোয়েন্দাপ্রবর হাসি মুখে গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। এখন তাঁর মাথায় হনুমান টুপি নেই। গলা-বন্ধ পুরু সোয়েটার আর প্যান্ট পরা ঢ্যাঙা মানুষটি ঠিক পুলিশের ভঙ্গিতেই এগিয়ে গেলেন।

চণ্ডীবাবু গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললেন,—যাই বলুন কর্নেলসাহেব, মিঃ হালদার খুব সাহসী মানুষ। পুলিশ জীবনে উনি সম্ভবত আরও জেদি আর দুঃসাহসী ছিলেন।

কর্নেল বললেন,—ওঁকে নিয়ে একটাই সমস্যা। অনেক সময়েই উনি ভুলে যান যে উনি এখন আর পুলিশ অফিসার নন।

বাজার এলাকা পেরিয়ে বাঁ-দিকের গঙ্গার ধারে এদিকটায় বাঁধের ওপর পিচ রাস্তা করা হয়েছে। সেই রাস্তায় সবরকমের যানবাহন যাতায়াত করছে। আমাদের ডানদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে গঙ্গার ভাঙন রোধ করার জন্য শাল আর শিশু গাছের ঘন জঙ্গল গড়ে তোলা হয়েছে। এদিকটায় ঘরবাড়িগুলো বেশ সাজানো-গোছানো এবং প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে একটা করে ফুলবাগিচা। চণ্ডীবাবু বললেন,—এই দিকটায় নিউ টাউনশিপ গড়ে উঠেছে। এলাকার পয়সাওয়ালা লোকেরা এখানে এসে বাড়ি করেছেন।

কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একটা চওড়া রাস্তায় পৌঁছলুম। দেখলুম ডান দিকে গঙ্গা পারাপারের ঘাট আর বাঁদিকে সেকাল-একালে মেশানো সব দোতলা পাকা বাড়ি। কর্নেল বললেন,—কালিকাপুরের অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু সরকারি অফিসগুলোর অবস্থা দেখছি একইরকম। ওই বাড়িটা সেই ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের অফিস না?

চণ্ডীবাবু বললেন,—ওটার পেছনেই থানা। তবে থানার বাড়িটা দোতলা করা হয়েছে এবং অনেক ভোল ফেরানো হয়েছে।

গাড়ি আবার বাঁ-দিকে ঘুরে যেখানে দাঁড়াল, সেখানে সামনা-সামনি একটা গেট। গেটটা খোলাই ছিল। ভেতরে গাড়ি ঢুকিয়ে একপাশে পার্ক করলেন চণ্ডীবাবু। পুলিশের জিপ আর বেতার ভ্যান দেখে বুঝতে পারলুম, এটাই থানা। গাড়ি থেকে নেমে কর্নেল এবং চণ্ডীবাবু এগিয়ে গেলেন। আমি নেমে গিয়ে চণ্ডীবাবুকে বললুম,—গাড়ি লক করে এলেন না?

চণ্ডীবাবু একটু হেসে বললেন,—আপনি ঠিকই বলেছেন, লক করে আসা উচিত ছিল। ওসি প্রণবেশবাবু নিজেই বলেন,—থানা থেকে চুরির আশঙ্কা বেশি।

একটা ঘরের জানলা দিয়ে দেখলুম, এক ভদ্রলোক সাদা পোশাকে বসে আছেন। চণ্ডীবাবু আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে বললেন,—এই দেখুন, আপনার সেই কিংবদন্তিখ্যাত ব্যক্তি।

তখনই বুঝতে পারলুম ইনিই ওসি মিস্টার প্রণবেশ সেন। তিনি কর্নেলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সকৌতুকে বললেন,—আমি স্বপ্ন দেখছি, না বাস্তব কিছু দেখছি সেটা পরীক্ষা করে নিই।

কর্নেল হাত বাড়িয়ে দিলে তিনি দু-হাতে হাত চেপে ধরে বললেন,—সত্যি আমার জীবন ধন্য হল। আপনার কথা এতকাল উঁচুতলার অফিসারদের মুখে শুনে আসছি, আপনাকে যে স্বচক্ষে দর্শনের সৌভাগ্য হবে কল্পনাও করিনি।

কর্নেল সামনের খালি চেয়ারে বসলেন। তাঁর একপাশে চণ্ডীবাবু অন্যপাশে আমি বসলুম। প্রণবেশবাবু আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন,—আপনি নিশ্চয়ই সেই খ্যাতনামা সাংবাদিক, জয়ন্ত চৌধুরী? এবার আপনাকে ছুঁয়ে দেখি।

অগত্যা আমাকেও উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করতে হল।

প্রণবেশবাবু বললেন,—দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় জয়ন্তবাবুর যা রেপোটার্জ বেরোয়, আমার গিন্নি তা খুঁটিয়ে পড়েন।

এইসব এলোমেলো কথাবার্তার পর ওসি মিস্টার সেনের কোয়ার্টার থেকে একজন কনস্টেবল ট্রেতে কফি আর স্ন্যাকস নিয়ে এল। সে মৃদুস্বরে বলল,—মাইজি সাহেবদের সঙ্গে একবার আলাপ করতে চান।

মিস্টার সেন বললেন,—তোমার মাইজিকে অপেক্ষা করতে বলো। কর্নেলসাহেবরা এসেছেন বিশেষ একটা কাজে।

কনস্টেবল সেলাম ঠুকে চলে গেল।

আমার আর কফি পানের ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু ভদ্রতা রক্ষা করার জন্য কাপটা তুলে নিতেই হল। কারণ এই কফি যিনি তৈরি করে পাঠিয়েছেন, সেই ভদ্রমহিলা আমার লেখার ভক্ত। ওসি মিস্টার সেন কফিতে চুমুক দিয়ে চাপাস্বরে বললেন,—ব্লাড রিপোর্টের সারমর্ম আজ সকালেই টেলিফোনে পেয়ে গেছি। ফরেনসিক এক্সপার্টদের মতে রক্তটা মানুষের নয়।

চণ্ডীবাবু চমকে উঠে বললেন,—মানুষের রক্ত নয়? তাহলে কীসের রক্ত?

ওসি একটু হেসে বললেন,—কোনও মানবেতর প্রাণীর রক্ত। যে কারণেই হোক, কেউ বা কারা চ্যাটার্জিবাবুদের ভয় দেখাতে চেয়েছে। ভূতের উৎপাতে ওঁরা ভয় পাচ্ছেন না দেখেই সম্ভবত একটা সাংঘাতিক ঘটনা সাজিয়েছে।

কর্নেল চুপচাপ শুনছিলেন। চণ্ডীবাবু জিগ্যেস করলেন,—কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, মহীন কোথায় গেল? না কি সে সত্যিই সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেছে, এবং তার ঘনিষ্ঠ কোনো লোককে সে সেকথা জানিয়ে গেছে, এবং তার সূত্রেই চাটুজ্যেদের কোনও শত্রু এই সুযোগটাকে কাজে লাগাচ্ছে।

ওসি বললেন,—হ্যাঁ। এ-ধরনের অনেক সিদ্ধান্তে অবশ্য আসা যায়, তবে সবার আগে শচীনবাবু কিংবা তাঁর বাবা যদি আমাদের কাছে কোনও কথা না লুকিয়ে খোলাখুলি বলে দেন, তাহলে আমাদের এগোতে সুবিধে হয়।

এতক্ষণে কর্নেল বললেন,—আপনারা নিশ্চয়ই হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই।

ওসি বললেন,—না কর্নেলসাহেব, আমাদের তদন্তের কাজ যথারীতি চলছে।

এই সময়েই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—আজ ভোরে গঙ্গার ধারে, বেড়াতে গিয়ে আপনারা কাদের ঢিল খেয়েছেন! তার মানে—

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—আমরা কারুর ঢিল খাব কেন? আমাদের সঙ্গী হালদারমশাইয়ের হাবভাব দেখে কাচ্চা-বাচ্চারা পাগল বলে ঢিল ছুঁড়তেই পারে।

তখনই বুঝতে পারলুম, কথাটা বলা আমার উচিত হয়নি। কর্নেল খুব দরকার না হলে কোনও কেসে নিজের হাতের তাস পুলিশকে দেখাতে চান না।

এদিকে কর্নেলের কথা শুনে চণ্ডীবাবু হেসে উঠেছিলেন। আর ওসি প্রণবেশ সেনও হাসতে-হাসতে বললেন,—হালদারমশাই মানে সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোক? যাঁর কথা জয়ন্তবাবুর রেপোর্টাজে পড়েছি। তিনি তো রিটায়ার্ড পুলিশ ইন্সপেক্টর। তো তাঁকে সঙ্গে আনলেন না কেন?

কর্নেল বললেন,—হালদারমশাই এখানকার ঠান্ডায় একেবারে নেতিয়ে গেছেন। তাই শরীর গরম করার জন্য তিনি পায়ে হেঁটে সারা কালিকাপুর ঘুরে দেখতে চান। এতে নাকি তাঁর শরীর আবার গরম হয়ে উঠবে।

প্রণবেশবাবু হেসে উঠলেন। বললেন,—পায়ে হেঁটে কালিকাপুর পুরোটা ঘুরে দেখতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। যাই হোক, এবার একটা সিরিয়াস কথায় আসছি। শচীনবাবু কাল সন্ধ্যায় থানায় এসেছিলেন। উনি বলেছিলেন ওঁর বাবা নাকি কিছুদিন থেকে প্রায়ই বলছেন এই বাড়ির ওপর কোনও কুপিত গ্রহের দৃষ্টি পড়েছে। বাড়িটা বেচে দিয়ে নিউ টাউনশিপ এলাকায় যাওয়া উচিত। কিন্তু শচীনবাবুর বক্তব্য ওই এলাকায় জমির দাম অনেক বেশি। তা ছাড়া, ঠাকুরবাড়ি ফেলে রেখে অন্য জায়গায় গেলে গৃহদেবতা রুষ্ট হবেন।

চণ্ডীবাবু বললেন,—ক'দিন আগে আমি শচীনের বাবাকে দেখতে গিয়েছিলুম। অহীনকাকা আমার হাত চেপে ধরে বললেন,—চণ্ডী, এই বাড়ি থেকে আমাদের চলে যাওয়া দরকার। তুমি অন্তত একটা ভাড়ার বাড়িও দেখে দাও আমাদের। আজকাল তো কালিকাপুরে অনেক সরকারি অফিস হয়েছে, অনেকে বাড়ি ভাড়া দিচ্ছে শুনেছি।

আমি অহীনকাকুকে বলেছিলুম,—আপনারা তো এখানে ভালোই আছেন। এরকম চারিদিকে মোটামুটি খোলামেলা বাড়ি কোথাও পাবেন না।

তখন অহীনকাকু চাপাস্বরে আমাকে বললেন,—রোজ রাত্রে বিনোদ পাগলার প্রেত এসে হানা দিচ্ছে। ভয় পাবে বলে শচীন বা আমার ভাই মহীনকে কথাটা বলিনি। চণ্ডীবাবু হাসতে-হাসতে আরও বললেন,—অহীনকাকু নাকি ঘরের ভেতরে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। এমনকি তাঁর বোন বাসন্তীও নাকি রাতদুপুরে স্পষ্ট তাকে দেখেছে। মেয়েদের সাহস বেশি, আর বাসন্তীর তো সাহসের সীমা নেই।

ওসি মিস্টার সেন বললেন,—হ্যাঁ, ওই পাড়ায় ভূতের গল্প জোর রটে গেছে। তারপর হঠাৎ এই হাড়িকাঠে রক্তপাত। আফটার অল সব গ্রামের মানুষ তো! সন্ধ্যা হতে-না-হতেই দরজা এঁটে বাড়িতে ঢুকে থাকছে। গত একসপ্তাহ ধরে ওই এলাকায় পুলিশ রাউন্ডে গেছে, কিন্তু রাস্তায় কোনও লোকজন দেখতে পায়নি।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন,—মিস্টার সেন, তাহলে এবার ওঠা যাক।

ওসি মুখে কৌতুক ফুটিয়ে বললেন,—আপনি কি সরেজমিনে তদন্ত করতে চাটুজ্যে বাড়ি যাবেন?

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—একবার যেতে ইচ্ছে করছে। কারণ আপনার মুখে যে সূত্রটা পেলুম সেটা গুরুত্বপূর্ণ। রক্তটা মানুষের যে নয়, কোনও জানোয়ারের, ওটা যখন জানা গিয়েছে তখন ভূতের উপদ্রব কিংবা মহীনবাবুর অন্তর্ধান রহস্য অন্যদিক থেকে ভেবে দেখার দরকার আছে।

ওসি প্রণবেশ সেন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—কর্নেলসাহেব, পুলিশ সুপার আমাকে না বললেও, আমি আপনাকে সবরকমের সাহায্যের জন্য তৈরি থাকব। শুধু একটা অনুরোধ, একবার আপনি

জয়ন্তবাবু এবং মিস্টার হালদারকে আমার গৃহিণীর সামনে উপস্থিত করাবেন। সোজা কথায় বলছি চণ্ডীবাবুসহ আপনাদের তিনজনকে একবার আমার গৃহিণীর হাতের রান্না খেতে হবে।

কর্নেল বললেন,—অবশ্যই। তবে আগে চাটুজ্যে বাড়ির রহস্যটা ফাঁস করতে হবে। আপনার সাহায্যও দরকার হবে। তারপর আপনার নেমন্তন্ন খাওয়া যাবে।

প্রণবেশ সেন আমাদের গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে বিদায় দিলেন। রাস্তায় পৌঁছে আমি বললুম,—ভদ্রলোককে পুলিশ বলে একদমই মনে হল না। অত্যন্ত সরল সাদাসিধে মানুষ।

চণ্ডীবাবু গাড়ির গতি কমিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বাঁকা হেসে বললেন,—জয়ন্তবাবু, আজ অবধি কালিকাপুরে এই ভদ্রলোকের মতো কোনও অফিসার আসেননি। উনি আসার পর একবছরেই এলাকার দাগি অপরাধীরা কেউ জেলে পচছে আবার কেউ এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি এলাকার একজন দাগি অপরাধী কাল্লু মিঞা, সেনসাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে-বলতে একেবারে কাপড়ে-চোপড়ে—

চণ্ডীবাবু মুখ ফিরিয়ে হাসতে থাকলেন। কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত এতদিন ধরে আমার সঙ্গে ঘুরে অসংখ্য পুলিশ অফিসার দেখেছে। তবু এখনও ও পুলিশ সম্পর্কে অজ্ঞ।

অনেক অলিগলি ঘুরে আমাদের গাড়ি যেখানে দাঁড়াল, সেখানে কাছাকাছি কোনও বাড়ি নেই। ডানদিকে একটা আমবাগান আর বাঁ-দিকে একটা পুকুর। পুকুরের পশ্চিমপাড়ে একটা পুরোনো মন্দির। গাড়ি থেকে নেমে বললুম,—আমার ধারণা ওটাই সেই চাটুজ্যে বাড়ির গৃহদেবতার মন্দির।

চণ্ডীবাবু এখানে কিন্তু গাড়ি লক করলেন। ততক্ষণে কর্নেল হনহন করে পুকুরের পাড় দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলুম। মন্দিরের সামনে একটা চত্বর। চত্বরে একটা পশুবলি দেওয়ার হাড়িকাঠ পোঁতা আছে।

হাড়িকাঠে অবশ্য সিঁদুর মাখানো আছে, কিন্তু কোথাও আর রক্তের কোনও চিহ্ন নেই। চণ্ডীবাবু এগিয়ে এসে বললেন,—রক্ত কালই পুলিশ এসে ধুয়ে ফেলেছে। কিছুটা নমুনা অবশ্য নেওয়া হয়েছিল।

মন্দিরের কোনও দরজা দেখলুম না। তবে একটা শিবলিঙ্গ দেখতে পেলুম। কর্নেল মন্দিরের পেছন দিকে ঘুরে আমার সামনে এলেন। সেই সময়েই এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা পাশের বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ালেন। চণ্ডীবাবু বললেন,—বাসন্তীদি, চিনতে পারছ, এঁরা কে?

ভদ্রমহিলা করজোড়ে নমস্কার করে বললেন,—পেরেছি বইকি! শচীনের মুখে কর্নেলসাহেবের কথা শুনেছি। আপনারা দয়া করে বাড়ির ভেতরে আসুন।

বুঝতে পারলুম এই দরজা দিয়ে মন্দির এবং চত্বরের নীচে পুকুরের ঘাটে যাওয়া যায়। বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখলুম, একতলা একটা পুরোনো বাড়ি। অন্যপাশে একটা টালির চালের তিনদিক ঘেরা ঘর। ওটা রান্নাঘর।

বাসন্তী দেবী বললেন,—এই সময় আবার শচীন কোথায় বেরুল কে জানে! আপনারা আসুন। শচীনের ঘরেই আপনাদের বসাচ্ছি।

কর্নেল বললেন,—থাক, আমরা বসব না। একটুখানি আপনাদের এই বাড়ি আর পেছন দিকটা ঘুরে দেখব।

কথাটা বলেই কর্নেল হঠাৎ আমাদের অবাক করে রান্নাঘরের পাশে পাঁচিলটার দিকে দৌড়ে গেলেন। তারপর পাঁচিলের ওপর দিয়ে দু-হাতের সাহায্যে উঁচু হয়ে কী দেখলেন। তারপর ফিরে এসে সহাস্যে বললেন,—দিন-দুপুরে পাঁচিলের ওপর দিয়ে ভূতের মুণ্ডু!

চণ্ডীবাবু বললেন,—ভূতের মুণ্ডু মানে! কেউ উঁকি দিচ্ছিল?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। কুৎসিত মুখোশ পরা একটা মুখ! আমি তেড়ে যেতেই অদৃশ্য। অগত্যা দৌড়ে গিয়ে দেখতে হল ভূতের চেহারাটা কীরকম। কিন্তু ততক্ষণে ভূতটা পেছনের ওই ভেঙেপড়া বাড়িটার আড়ালে লুকিয়ে গেল।

বাসন্তীদেবী চোখ বড় করে বললেন,—এত সাহস! কর্নেলসাহেব দয়া করে একটু বসুন।

পাঁচ

বাসন্তী দেবীর অনুরোধে কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে, যদি আপনার কোনও কথা বলার থাকে, এখানে দাঁড়িয়েই বলতে পারেন।

বাসন্তী দেবী বললেন,—দাদা এখন বাথরুমে আছেন। তা না হলে দাদাই বলতেন। ছোড়দা মহীন প্রায়ই বলত, সে আমাদের পূর্বপুরুষের লুকিয়ে রাখা এক ঘড়া সোনার মোহর কোথায় আছে তা জানে, কিন্তু সে-কথা সে জানাতে পারবে না। কারণ, এক রাত্রে স্বপ্নে তাকে তার ঠাকুরদা নাকি দেখা দিয়ে বলেছেন, তুই যা জেনেছিস তা যেন অন্যে জানতে না পারে। অন্যকে তুই মোহরের ঘড়ার খবর দিলে মুখে রক্ত উঠে মরবি। তাই আমাদের ঠাকুরবাড়িতে হাড়িকাঠের পাশে রক্ত দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার মনে হয়েছিল তাহলে মহীনই হয়তো শচীনকে কথাটা বলে দিয়েছিল। তাই মুখে রক্ত উঠে সে মরেছে। আর শচীন তার লাশটা তুলে কোথাও পুঁতে ফেলেছে।

চণ্ডীবাবু বলে উঠলেন,—কী সর্বনাশ! উনি ওই গোবেচারা শচীনকেই সন্দেহ করে ফেললেন? শচীনের মতো রোগাটে গড়নের লোক তার কাকার লাশ একা ওঠাতে পারে?

বাসন্তী দেবী বিব্রত মুখে বললেন,—না, মানে আমি ভেবেছিলুম শচীনের সঙ্গে তার বন্ধুরাও হয়তো ছিল।

চণ্ডীবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। কর্নেল বললেন,—আপনি কি আপনার বড়দাকে একথা বলেছিলেন? কিংবা কোনও ছলে শচীনকেও এরকম কোনও আভাস দিয়েছিলেন?

বাসন্তী দেবী বললেন,—না, কথাটা আমি কাকেও বলিনি। এমন কথা কি বলা যায়?

কর্নেল বললেন,—তখন আপনার এরকম ধারণা হয়েছিল, এখন আপনার কী ধারণা?

বাসন্তী দেবীর কান্না এসে গেল। আত্মসম্বরণ করে বললেন,—আমার ছোড়দার মতো সন্ন্যাসী সাদাসিধা মানুষকে খুন করার পেছনে আর কী কারণ থাকতে পারে, এবার আপনারাই বলুন। আমার মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই সে দৈবাৎ মুখ ফসকে কোনও দুষ্ট লোককে কথাটা বলে ফেলেছিল। তারপর অভিশাপ লেগে ছোড়দা মুখে রক্ত উঠে মরেছে। তবে আমি কিন্তু আমাদের বাড়ির চারপাশে সব জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, কোথাও কোনও গর্ত খোঁড়া দেখতে পাইনি। তবে এমনও হতে পারে মোহর ভরতি ঘড়া এর বাইরে কোথাও পোঁতা ছিল।

চণ্ডীবাবু বললেন,—পুলিশ তো এই এলাকা তন্নতন্ন খুঁজেছে, যদি কোথাও মহীনকে পুঁতে রাখা হয় তার খোঁজ মিলবে। কিন্তু তেমন কোনও চিহ্নই তারা পায়নি।

এই সময়েই বারান্দার ওপাশে বাথরুম থেকে এক রুগ্‌ণ চেহারার ভদ্রলোক বেরিয়ে আসতেই বাসন্তী দেবী হন্তদন্ত গিয়ে তাঁকে ধরলেন। বললেন,—সাড়া দিলেই তো আমি যেতুম।

ভদ্রলোকের চেহারায় শচীনবাবুর ছাপ স্পষ্ট। উনি তাহলে শচীনবাবুর বাবা অহীনবাবু। বাসন্তী দেবীর কাঁধে ভর দিয়ে একপা-একপা করে এগিয়ে এসে তিনি ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালেন। বললেন, কারা যেন বসে আছে।

বাসন্তী দেবী বললেন,—চণ্ডীদা এসেছেন। আর তাঁর সঙ্গে কলকাতার সেই কর্নেলসাহেবরা এসেছেন। যাঁদের কাছে শচীন গিয়েছিল।

অহীনবাবু ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠলেন। বললেন,—আমার সাদাসিধে সরল ভাইটাকে কারা মেরে ফেলল।

চণ্ডীবাবু উঠে গিয়ে তাঁকে ধরে বললেন,—ঘরে চলুন। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে আপনার কষ্ট হবে।

চণ্ডীবাবু এবং বাসন্তী দেবী অহীনবাবুকে ঘরে তাঁর বিছানায় শুইয়ে রেখে বাইরে এলেন। সেই সময়েই কর্নেল বাসন্তী দেবীকে বললেন,—একটা কথা আমার জানতে ইচ্ছে করছে। শচীনবাবুর একটা পায়ে গণ্ডগোল আছে। আমি লক্ষ করেছি, উনি মোটা ছড়ির সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারেন না।

বাসন্তী দেবী বললেন,—ওঁর বাঁ-পায়ের পাতা জন্ম থেকেই একটু বাঁকা। তাই ছোটবেলা থেকেই খুঁড়িয়ে হাঁটত শচীন। স্কুল যেত একটা মোটাসোটা বেতের ছড়িতে ভর দিয়ে। ছাত্ররা ওকে খোঁড়ামাস্টার বলে আড়ালে ভেংচি কাটত।

চণ্ডীবাবু তখনই হাসতে-হাসতে বললেন,—বেচারা খোঁড়া মাস্টারের ওপর তুমি সন্দেহ করে ভেবেছিলে, সে নাকি তার কাকার লাশ গুম করেছে!

বাসন্তী দেবী জিভ কেটে বললেন,—না-না, মানে ওর দু-একজন বন্ধু আছে, তারা তো ভালো লোক নয়। তুমি তাদের চেনো চণ্ডীদা। কায়েতপাড়ার গোপেন আর ওই যে একচোখা লোকটা—কী যেন নাম। সদগোপপাড়ায় বাড়ি—

চণ্ডীবাবু বললেন,—ভুতুর কথা বলছ?

বাসন্তী দেবী চাপাস্বরে বললেন,—কিছুদিন আগে থেকে গোপেন আর ভুতু ঘনঘন এ-বাড়িতে আসত। শচীনের সঙ্গে আড্ডা দিত। এখন আর আসে না।

কর্নেল বললেন,—পুলিশকে কি আপনি একথা জানিয়েছেন?

বাসন্তীদেবী করজোড়ে চাপাস্বরে বললেন,—মিনতি করে বলছি বাবা, একথা যেন কেউ জানতে না পারে। ওরা দুজনেই খুব বজ্জাত লোক। পুলিশের খাতায় ওদের নাম আছে—তাই না চণ্ডীদা?

চণ্ডীবাবু বললেন,—ওরকম অনেকের নামই পুলিশের খাতায় আছে। যাই হোক, তুমি আর যেন কারুকে মুখ ফসকে এসব কথা বলে ফেলো না।

চাটুজ্যেবাড়ি থেকে রাস্তার দিকের সদর দরজা দিয়ে আমরা বেরিয়ে গেলুম। তারপর কর্নেল বাড়ির পেছনের দিকটা বাইনোকুলারে দেখে নিয়ে বললেন,—রাতবিরেতে ভূতেরা অনায়াসে শচীনবাবুদের বাড়ির ছাদে উঠে দাপাদাপি করতে পারে। ঢিলও ছুড়তে পারে।

এরপর আমরা রাস্তার উত্তরদিকে এগিয়ে বাঁ-দিকের সেই পুকুরপাড়ে গেলাম। তার নীচেই চণ্ডীবাবুর গাড়ি আছে। কতকগুলো বাচ্চা ছেলে আমাদের দেখামাত্র ডানদিকে আমবাগানের ভেতর পালিয়ে গেল। বোঝা গেল তারা মোটর গাড়িটা নিয়ে ইচ্ছে মতো খেলা করছিল। চণ্ডীবাবু গাড়ির লক খুলছেন, এমন সময় কর্নেল বললেন,—একটা অপেক্ষা করুন। আমি পুকুরের পূর্বদিকটা দেখে আসি।

আমি কর্নেলকে অনুসরণ করলুম। পুকুরপাড়ের নীচে একটা পোড়ো জমি। তার একদিকে বাঁশবন। কর্নেল পোড়ো জমি দিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, —এদিকটায় বসতি নেই দেখছি!

কোথাও-কোথাও ফসলের খেত, কোথাও আখচাষ করা হয়েছে। হঠাৎ দেখলুম কর্নেল আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে চাটুজ্যেবাড়ির পাঁচিলের নীচে থেকে দুটো নুড়ি-পাথর কুড়িয়ে নিলেন। বললুম,—কী আশ্চর্য! ভূতের ঢিলগুলো বাড়ির ভেতরে পড়ার কথা। পড়েওছিল। এখানে এই নুড়িগুলো কে রাখল?

কর্নেল তাঁর পিঠে-আঁটা কিটব্যাগের চেন টেনে তার ফাঁক দিয়ে নুড়ি-পাথর তিনটে ভেতরে ঢোকালেন। তারপর চেন টেনে কিটব্যাগের মুখ বন্ধ করলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে বাঁশবনের ভেতরটা একবার দেখে নেওয়ার পর বললেন,—চলো, ফেরা যাক।

তাঁকে অনুসরণ করে বললুম,—ওখানে নুড়ি-পাথর পড়ে থাকাটা খুব রহস্যজনক মনে হচ্ছে।

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ, রহস্য তো এখন আমাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।

বললুম,—বাসন্তীদেবীকে বলা উচিত ছিল হাড়িকাঠের রক্তটা মানুষের নয়।

কর্নেল মুখ ঘুরিয়ে চোখ কটমট করে বললেন,—মুখটি বুজে থাকবে।

গাড়ির কাছে গেলে চণ্ডীবাবু বললেন,—আপনাকে খুব ব্যস্ত দেখাচ্ছিল। অমন করে পাঁচিলের ধারে হুমড়ি খেয়ে কী দেখছিলেন। রক্ত? ওখানেই এক পাটি স্যান্ডেল পাওয়া গেছে।

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—আমি দ্বিতীয় পাটি স্যান্ডেলটা খুঁজে দেখছিলুম।

চণ্ডীবাবু গাড়িতে উঠে বললেন,—আর-এক পাটি জুতো নিশ্চয়ই গঙ্গাগর্ভে ছুঁড়ে ফেলেছে ওরা।

কর্নেল আগের মতো গাড়ির সামনের সিটে বাঁদিকে বসলেন। আমি বসলুম পেছনে। চণ্ডীবাবু স্টার্ট দিয়ে গাড়ির মুখ সবে ঘুরিয়েছেন, এমন সময় আমবাগানের ভেতর থেকে ছুটে আসতে দেখলুম হালদারমশাইকে। তিনি যে এত জোরে ছুটতে পারেন তা দেখার সৌভাগ্য কোনওদিন আমার হয়নি। কর্নেলের কথায় ততক্ষণে চণ্ডীবাবু গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলেন। হালদারমশাইয়ের সোয়েটারে এবং প্যান্টের এখানে-ওখানে কাদার ছোপ। উনি হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন,—আমি কর্নেলসাহেবেরে দেইখ্যাই ছুট দিসিলাম। ওঃ কী কাণ্ড!

আমি দরজা খুলে দিলে তিনি ভেতরে ব্যাক সিটে বসলেন। তারপর পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করে এক টিপ নস্যি নিলেন।

সামনে থেকে কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন,—আপনি কি কারুর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করছিলেন হালদারমশাই। আপনার পোশাকে অত কাদার ছোপ কেন?

গোয়েন্দাপ্রবর নোংরা রুমালে নাক মুছে বললেন,—না কর্নেলস্যার, একজনেরে ফলো কইর‍্যা যাইতেছিলাম। আমবাগানের শেষ দিকটার খানিকটা জায়গা ঝোপজঙ্গলে ঢাকা। তার ওধারে একটা বসতি।

চণ্ডীবাবু বললেন,—ওটা জেলেপাড়া।

হালদারমশাই বললেন,—যারে ফলো করসিলাম, সে একখানে খাড়াইয়া যেন কারো লাইগ্যা ওয়েট করত্যাসিল। তারপর একজন আইয়া তারে কইল—খবর কও। তারপর দুইজনে চাপাস্বরে কী কথা হইল আমি শুনি নাই। তাই সাপের মতন উপুড় হইয়া আউগাইয়া যাইতেসিলাম। তখনই পোশাকে কাদা লাগসে। মাটিটা নরম।

কর্নেল বললেন,—তারপর কিছু শুনতে পেলেন?

হালদারমশাই বললেন,—নাঃ! ওরা দুইজনে সেখান থিক্যা উধাও হইয়া গেল।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—আপনি কাকে ফলো করেছিলেন?

হালদারমশাই বললেন,—তারে চিনি না, কিন্তু আমি বাঁশঝাড়ের ভেতরে যখন আর-এক পাটি

জুতা খুঁজত্যাছিলাম, তখনই লোকটারে চোখে পড়সিল। সে শচীনবাবুগো বাড়ির পাঁচিলের বাহির দিয়া আইত্যাসিল। তারপর একখানে খাড়াইয়া ছিল। আমাকে সে কীভাবে ট্যার পাইল কে জানে। সে আমবাগানের ভেতর দিয়া উধাও হইয়া গেল। কাজেই তারে ফলো না কইর‍্যা উপায় ছিল না।

চণ্ডীবাবু জিগ্যেস করলেন,—লোকটার চেহারা কেমন? পরনে কী পোশাক ছিল?

হালদারমশাই বললেন,—লোকটার চেহারা এক্কেরে ভূতের মতন কালো।

আমি না বলে পারলুম না,—ভূতের গায়ের রং কালো, তা কি আপনার পুলিশ লাইফে দেখেছেন?

হালদারমশাই সহাস্যে বললেন,—না ওটা কথার কথা। লোকটার মুখের চেহারা এমনিতেই কুৎসিত। আর একখানা চক্ষু নাই। পরনে যেমন-তেমন একটা ফুলপ্যান্ট, আর সোয়েটার। মাথায় মাফলার জড়ানো ছিল।

চণ্ডীবাবু বলে উঠলেন,—তাহলে বাসন্তীর কথাই ঠিক। ওই লোকটা সেই একচোখে বজ্জাত ভুতু।

গোয়েন্দাপ্রবর হাসতে-হাসতে বললেন,—এক্কেরে মানানসই। ভূতের নাম ভুতু হইলে সে মানুষ-ভূত। হ্যাঁ, যে লোকটা তারে দেখা করতে আইসিল, তার চেহারা ভদ্রলোকের মতন। কিন্তু তার গোঁফখানা দেইখ্যা মনে হইসিল, লোকটা দাগি আসামি। ওই যে কথায় আসে না, শিকারি বিড়ালের গোঁফ দেখলে চেনা যায়! ওইরকম গোঁফ ভদ্রলোক রাখে না।

কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে, আপনি পুলিশের সামনে যেন মুখ ফসকে এসব কথা বলবেন না।

চণ্ডীবাবু বললেন,—আমার খুব অবাক লাগছে। বাসন্তী তাহলে ঠিকই সন্দেহ করেছিল। দ্বিতীয় লোকটার নাম গোপেন। ওর বাবাকে লোকে বলত পোড়াসিংঘি। কারণ, ওর বাবা গোপাল সিংহের মুখের একটা পাশ ছোটবেলায় পুড়ে গিয়েছিল। কেউ-কেউ অবশ্য পোড়া কায়েতও বলত। তার ছেলে গোপেন যে গুণ্ডামি করে বেড়াবে, এমনকি ডাকাত দলেও নাম লেখাবে, এটা কেউ কল্পনা করতেও পারেনি।

কর্নেল বললেন,—আপনারা শচীনবাবুকে এসব কথা যেন বলবেন না। দরকার হলে আমি শচীনবাবুর সঙ্গে কথা বলে ওই লোকদুটোর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বতার কারণটা খুঁজে বের করব।

চণ্ডীবাবুর বাড়ি পৌঁছুনোর পর হালদারমশাই সোয়েটার এবং প্যান্টের কাদা পরিষ্কার করতে বাথরুমে ঢুকলেন। চণ্ডীবাবু দোতলায় নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। শুধু কার্তিক আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। সে বলল,—সায়েবরা এবার নিশ্চয়ই কফি খাবেন?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ, এক কাপ কফি পেলে ভালো হয়।

কার্তিক চলে যাওয়ার পর কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—জয়ন্ত, এখন তোমার কী মনে হচ্ছে, আমাকে খুলে বলো।

একটু ভেবে নিয়ে বললুম,—আমার মনে হচ্ছে, মহীনবাবুকে কোথাও ওই ভুতু আর গোপেন মিলে জোর করে আটকে রেখেছে। তার ওপর অত্যাচার করে পূর্বপুরুষের লুকিয়ে রাখা সোনার মোহর ভর্তি ঘড়া কোথায় আছে, তা জানার জন্যে ওরা চেষ্টা করছে। আর শচীনবাবু সম্ভবত সেই সোনার মোহরের লোভে ওদের ফাঁদে পা দিয়েছে।

কর্নেল বললেন,—তাহলে শচীনবাবু চণ্ডীবাবুর কাছে পরামর্শ চাইতে গিয়েছিলেন কেন? আর যদি বা গেলেন, তিনি চণ্ডীবাবুর মুখে আমার পরিচয় পেয়েই গিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর মতো একজন খোঁড়া মানুষ এতটা ঝুঁকি নেবেনই বা কেন?

এই সময়েই চণ্ডীবাবু ঘরে ঢুকে বললেন,—কফি আসছে। আর যার জন্য কর্নেল সাহেব মনে-মনে অপেক্ষা করছিলেন, সেই শচীনও তার গাবদা মোটা ছড়িটা নিয়ে গেটে ঢুকছে দেখলুম।

কর্নেল বললেন,—বাঃ, সুখবর। তবে আপনি কফি খেয়েই কাজের অছিলায় এ-ঘর থেকে যেন কেটে পড়বেন।

ছয়

শচীনবাবুকে কার্তিক আমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে শচীনবাবু নমস্কার করে বললেন,—পিসিমার মুখে শুনলুম আপনারা আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন। আমি একটুখানি বাজারের দিকে গিয়েছিলুম। পিসিমার মুখে শুনেই সাইকেলরিকশাতে চেপে চণ্ডীবাবুর বাড়িতে এলুম। দারোয়ান বললেন, হ্যাঁ, কর্নেলসাহেবরা কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসেছেন।

চণ্ডীবাবু বললেন,—বসো শচীন। তোমার জন্যে এক কাপ কফি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শচীনবাবু বললেন,—না কাকাবাবু, এইমাত্র আমি বাজারে চা খেয়ে-খেয়ে মুখ তেতো করে ফেলেছি। আর কিছু খাব না।

চণ্ডীবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—ঠিক আছে। তাহলে তোমরা কথাবার্তা বলো। আমার একটা জরুরি কাজ আছে। কাজটা সেরে নিয়ে আবার আসব।

তিনি চলে যাওয়ার পর কর্নেল বললেন,—আপনাদের বাড়িতে যে ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দিন-দুপুরে পাঁচিলের ওপর দিয়ে কালো কুচ্ছিত একটা বিদঘুটে মুখ উঁকি দিচ্ছিল। আমি তাড়া করে যেতেই অদৃশ্য হল।

শচীনবাবু গম্ভীর মুখে বললেন,—কথাটা পিসিমার কাছে শুনে এলুম। আমার মনে হচ্ছে কলকাতা থেকে আপনার মতো খ্যাতিমান রহস্যভেদী সদলবলে এখানে এসে পড়েছেন, তাই ছোটকাকার খুনিরা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

হালদারমশাই তাঁর সোয়েটার আর প্যান্টের কাদাগুলো জল দিয়ে আলতোভাবে সাফ করে কফির আসরে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বললেন,—আপনাগো বাড়ির লগে একখান বাঁশঝাড় আছে।

শচীনবাবু চমকে উঠে বললেন,—হ্যাঁ আছে। কিন্তু আপনি কি সেখানে সন্দেহজনক কিছু দেখেছেন?

হালদারমশাই কী বলতে যাচ্ছিলেন, কর্নেল তাঁকে থামিয়ে বললেন,—ওসব কিছু না। আপনি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন।

শচীনবাবু বললেন,—নিশ্চয়ই দেব। আমি যা যতটুকু জানি সব বলব।

কর্নেল বললেন,—গোপেন আর ভুতু নামে দুটো লোক আপনারা কাছে নাকি আড্ডা দিতে আসত।

শচীনবাবু চমকে উঠে বললেন,—পিসিমা বলেছেন? আসলে কী হয়েছে জানেন, ওরা দুজনেই এলাকার নামকরা বজ্জাত। শুধু বজ্জাত বললে ভুল হবে, ওরা না-পারে এমন কাজ নেই। কিন্তু আমার স্কুললাইফে ওরা দুজনেই আমার সহপাঠী ছিল। সেই সূত্রে রাস্তাঘাটে দেখা হলে কথাবার্তা বলেছি। কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন থেকে ওরা একরকম জোর করেই আমার ঘরে ঢুকে আড্ডা দিত। বাধ্য হয়ে পিসিমাকে বলে ওদের চা খাওয়াতে হতো। তারপর ক্রমে-ক্রমে বুঝতে পারলুম, আমার

কাছে ওদের আসার একটা উদ্দেশ্য আছে। আমার ধারণা হয়েছিল সম্ভবত সরল সাদাসিধে সন্ন্যাসীটাইপ মানুষ আমার কাকা হয়তো কথায়-কথায় ওদের কাছে জানিয়ে দিয়েছেন, আমাদের পূর্বপুরুষের একঘড়া সোনার মোহর কোথায় পোঁতা আছে, তার খবর তাঁর জানা।

কর্নেলসাহেব, এই কথাটা আমার আপনার কাছে যাওয়ার আগেই মাথায় এসেছিল, কারণ হঠাৎ করে পাগলা বিনোদের মড়া দেখা নিয়ে গুজব আর রাতবিরেতে আমাদের বাড়িতে ভুতুড়ে উৎপাত কেন হচ্ছে। আপনার কাছ থেকে ফিরে এসে যখন আমাদের মন্দিরের হাড়িকাঠের কাছে রক্ত দেখতে পেলুম, তখনই বুঝলুম আমার কাকা হয়তো মোহর ভরতি ঘড়াটা কোথায় আছে তা দেখিয়ে দেয়নি বলেই তাকে ভুতু আর গোপেন মিলে খুন করেছে। তারপর বডিটা গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। কিন্তু আমি ভুতু আর গোপেনের নাম সাহস করে পুলিশকে বলতে পারিনি। ওদের ভালো চেনে, তাই পিসিমাও-মুখ বুজে থেকেছে।

হালদারমশাই বললেন,—ওদের মধ্যে একজনের কি একটা চক্ষু নাই?

শচীনবাবু আবার চমকে উঠে বললেন,—ভুতুর একটা চোখ জন্ম থেকেই নেই। কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন?

আমি বললুম,—আপনি ভুলে গেছেন, উনি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। কাজেই উনি এখানে এসেই এখানে-ওখানে ওত পেতে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

কর্নেল বলে উঠলেন,—ভুতু আর গোপেনের না কি ডাকাতের দল আছে?

শচীনবাবু চাপাস্বরে বললেন,—ছিল। থানায় নতুন ওসি আসার পর থেকে এ-এলাকা ছেড়ে ওদের দলের লোকেরা শুনেছি পালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভুতু আর গোপেনের একজন শক্ত গার্জেন আছে। তাই তারা এখনও বেপরোয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবশ্য ওরা তেমন সাংঘাতিক কাজ করে ফেললে নতুন ওসি ওদের রেহাই দেবেন বলে মনে হয় না।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—সেই প্রভাবশালী গার্জেন কী করেন? তাঁর নাম কী?

শচীনবাবু আবার চাপাস্বরে বললেন,—এসব কথা কানে গেলে লোকটা উলটে আমাকেই পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবে।

কর্নেল একটু বিরক্ত হয়ে বললেন,—আহা, আমি জানতে চাইছি, সে কে? কী করে?

শচীনবাবু এবার ফিসফিস করে বললেন,—তাঁর নাম মনীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। তিনি এই চণ্ডীবাবুদেরই জ্ঞাতি; কিন্তু চণ্ডীবাবুর ঘোর শত্রু। উনি এখানকার একটা রাজনৈতিক দলের নেতা।

কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে। এবার বলুন আপনাদের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি, অ্যাডভোকেট শরদিন্দু চ্যাটার্জির কাছে আপনাদের পূর্বপুরুষের যে দলিলটা আছে, তা কি আপনি কখনও দেখেছেন?

শচীনবাবু বললেন,—আমি দেখিনি। বাবাকে একবার শরদিন্দু জেঠু ওটা দেখিয়েছিলেন। বাবা কিছু বুঝতে পারেননি। কিন্তু চণ্ডীকাকুর সঙ্গে আমার অ্যাডভোকেট জেঠুর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছে। ছুটি পেলে শরদিন্দু জেঠু এখানে চলে আসেন। চণ্ডীকাকুর বাড়িতেই ওঠেন। উনি একসময়কার নামকরা শিকারি। এখনও বিলে বুনো হাঁস মারতে আসেন।

কর্নেল এবার পকেট থেকে সেই প্রাচীন তুলোট কাগজে নাগরি লিপিতে লেখা দলিলের কপিটা শচীনবাবুর হাতে দিয়ে বললেন,—এটা আপনার পূর্বপুরুষের সেই দলিলের কপি।

শচীনবাবু কাগজটা কিছুক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখার পর বললেন,—এটা তো কোনও দলিল নয়, কী সব অং বং হং লেখা আছে। কয়েকটা তীর আঁকা আছে।

কর্নেল বললেন,—এটা দেখে আপনার মাথায় কিছু আসছে না?

শচীনবাবু অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন,—না। বাবাও বলেছিলেন কিছুই মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না।

কর্নেল তাঁর হাত থেকে কাগজটা ফিরিয়ে নিয়ে পকেটে ভাঁজ করে রাখলেন। তারপর বললেন,—ভুতু এবং গোপেনকে আপনি এই কাগজে যা লেখা আছে তার একটা কপি পৌঁছে দিতে পারবেন? না, শুধু পৌঁছে দিলে হবে না, তাদের বলতে হবে, যে-গুপ্তধনের লোভে আপনার কাকুকে খুন করেছে তারা, এই কাগজটা সেই কাকার কাছ থেকে পাওয়া। এতেই গুপ্তধনের খোঁজ পাওয়া যাবে।

শচীনবাবু অবাক চোখে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন,—এটা যদি সত্যি আমাকে পূর্বপুরুষের লেখা হয়, তাহলে এটা কি ওদের হাতে দেওয়া ঠিক হবে?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—হবে। ওদের যা বিদ্যে, তাতে ওরা এটা থেকে কোনও সূত্রই বের করতে পারবে না। কিন্তু ওরা যদি সত্যি গুপ্তধন হাতানোর উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে ভাব জমায়, আর রাত-বিরেতে ভূতুড়ে উৎপাত করে থাকে তাহলে ওরা টোপ গিলবে। অর্থাৎ এটার অর্থ উদ্ধারে কারও সাহায্য নেবে।

শচীনবাবু মাথা নেড়ে বললেন,—না কর্নেলসাহেব, এটা ওদের হাতে দেওয়া ঠিক হবে না। ওরা এটার অর্থ উদ্ধারের জন্যে আমার বা আমার রুগ্ণ বাবার ওপর জুলুম চালাবে। সারাবছর তো পুলিশ আমাদের রক্ষা করবে না।

কর্নেল বললেন,—তাহলে আমাদের যে-কোনও উপায়ে হোক এই টোপটা ওদের গেলাতে হবে। শচীনবাবু, আপনি বুঝতে পারছেন না, এটা একটা ফাঁদ। ঠিক আছে, আপনি এ-বেলা ভেবে দেখার সময় নিন, তারপর বিকেলের দিকে কিংবা রাত্রে আমাদের জানিয়ে দেবেন। কিন্তু একটা কথা, এ-নিয়ে আপনার পিসিমা বা বাবার সঙ্গে কক্ষনো আলোচনা করবেন না।

শচীনবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন,—আচ্ছা কর্নেলসাহেব, আমাদের বাড়িতে রাতবিরেতে যে পাথরের নুড়িগুলো ছোঁড়া হয়, সেগুলো তো পাহাড়ি মুলুকের নদীতে পাওয়া যায়। ভুতু বা গোপেন কখনও অতদূরে কোথাও গেছে বলে মনে হয় না। তাহলে ওরা ওগুলো পেল কোথায়?

কর্নেল বললেন,—আপনার কাকার ঘর তো পুলিশ সার্চ করেছে। তাঁর ঘরে কি কোনও সন্দেহজনক জিনিস, কিংবা ধরুন ওরকম নুড়ি-পাথর পাওয়া গেছে?

শচীনবাবু আবার চাপাস্বরে বললেন,—পিসিমা একদিন কাকার ঘর পরিষ্কার করতে ঢুকেছিল। কাকা তাঁর ঘরে কাউকে ঢুকতে দিতেন না। ওঁর ঘরে সব নানারকম শাস্ত্রীয় বই আর একটা মড়ার খুলি—এইসব নানারকমের অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস থাকে। তা একদিন পিসিমা কাকার ঘরে ঢোকার সুযোগ পেয়েছিল। কাকা দরজায় তালা না দিয়ে বাথরুমে ঢুকেছিলেন। পিসিমা ভেতরে উঁকি মেরে বিছানার পাশে তিনটে ওইরকম ডিমালো নুড়ি দেখতে পেয়েছিলেন। উনি ভেবেছিলেন, ভূতের ঢিলগুলো কুড়িয়ে কাকাই বোধহয় ওখানে রেখেছেন। তাই উনি ঢিল তিনটে কুড়িয়ে নিয়ে রান্নাঘরের পাশের পাঁচিল গলিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন।

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, কর্নেল সেই তিনটে ঢিল আজ কুড়িয়ে পেয়েছেন। কিন্তু কর্নেল যেন কোনও মন্ত্রবলে সেটা টের পেয়েই একবার আমার দিকে চোখ কটমট করে তাকিয়ে নিয়ে তারপর বললেন,—হ্যাঁ আপনার পিসিমার পক্ষে ভূতুড়ে ঢিল দেখে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তারপর কি আপনার কাকা এ-ব্যাপারে কোনও হইচই বাধিয়েছিলেন?

শচীনবাবু বললেন,—না, আপনাকে তো আগেই বলেছি, কাকা সন্ন্যাসীটাইপ মানুষ। খামখেয়ালি। আমরাই বলতুম, কাকার মাথায় ছিট আছে। তা ছাড়া একটু মনভোলা স্বভাবের মানুষও ছিলেন।

কর্নেল বললেন,—এবার একটা কথা। আপনার কাকা কি কখনও তীর্থ করতে গেছেন?

শচীনবাবু বললেন,—হ্যাঁ। কাকা বছরে অন্তত বার দুই-তিনেক তীর্থ করতে যেতেন। প্রতিবারই আমাদের ভয় হত, উনি হয়তো আর বাড়ি ফিরবেন না। কোনও সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে হিমালয়ে গিয়ে বাস করবেন। কিন্তু কাকা ফিরে আসতেন, তারপর তীর্থের গল্প শোনাতেন।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন,—ঠিক আছে। আপনি বাড়ি ফিরে গিয়ে চিন্তাভাবনা করে দেখুন। আমার কথা মতো ওই কাগজের একটা কপি ভুতু আর গোপেনকে দেবেন কি না। এটা কিন্তু খুব জরুরি।

শচীনবাবু উদ্বিগ্ন মুখে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর হাতে সেই মোটা লাঠির মতো ছড়িটা ছিল। সেটাতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতেই বেরিয়ে গেলেন।

হালদারমশাই উঠে গিয়ে দরজায় উঁকি মেরে শচীনবাবুর প্রস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ফিরে এলেন। তারপর উত্তেজিতভাবে বললেন,—আমি এবার শচীনবাবুরে সুযোগ পাইলেই ফলো করুম। ভদ্রলোকেরে আমার আর সরল মানুষ ঠেকত্যাসে না।

জিগ্যেস করলুম,—কেন বলুন তো?

হালদারমশাই বললেন,—সেই একচক্ষু ভুতু আর তার লগে গোপেনেরে আমি কথা কইতে দেখসি। একচক্ষু বজ্জাতটা শচীনবাবুগো বাড়ির পাশ দিয়া বাহির হইয়া হনহন কইর‍্যা আমবাগানের ভেতর দিয়া যাইত্যাসিল। এখন মনে হইত্যাসে বাড়ির পেছন দিকে কোথাও ওই একচক্ষু লোকটা শচীনবাবুর লগে গোপনে পরামর্শ করত্যাসিল। অগো তিনজনের মইধ্যে যোগাযোগ আছে। অরা তিনজনে একখান ত্রিভুজ।

কর্নেল সহাস্যে বললেন,—আপনার এই ত্রিভুজতত্ত্ব উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আমি বললুম,—এযাবৎকালে গুপ্তধন নিয়ে কয়েক ডজন রহস্যের সমাধান কর্নেল করেছেন। গুপ্তধন কোথাও পাওয়া যায়নি, তা ঠিক। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে সত্যি-সত্যি চাটুজ্যেবাড়ির কোথাও-না-কোথাও সোনার মোহর ভরতি একটা ঘড়া পোঁতা আছে। ওই কাগজটার মধ্যেই তার সংকেত আছে।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—তোমাকে একটা কপি দেব, তুমি চেষ্টা করে দেখতে পারো গুপ্তধনের জায়গাটা খুঁজে বের করতে পারো কি না।

চণ্ডীবাবু এতক্ষণে ঘরে ঢুকলেন। হাসতে-হাসতে বললেন,—শচীনের মুখ-চোখ দেখে মনে হল ওকে আপনি ভয় পাইয়ে দিয়েছেন। আমাকে খুলে কিছু বলল না, শুধু গোমড়া মুখে একটা কথা বলল, ওবেলা সে সন্ধ্যার দিকে কর্নেলসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

কর্নেল বললেন,—আচ্ছা মিস্টার রায়চৌধুরী, শচীনের মুখে শুনলুম, আপনাদের এক জ্ঞাতি মণীন্দ্র রায়চৌধুরী—

চণ্ডীবাবু কর্নেলের কথার ওপর বললেন,—শচীন কি মণি সম্পর্কে কিছু বলছিল?

কর্নেল বললেন,—তিনি নাকি একটা রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতা। আপনাদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। একচোখা ভুতু আর গোপেন নাকি তাঁর চ্যালা।

চণ্ডীবাবু বিকৃতমুখে বললেন,—মণি রায়চৌধুরি বংশের কলঙ্ক। আমার ঠাকুরদার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পৌত্র সে। কাজেই রক্তের সম্পর্ক আছে তা বলা যায়ই। কিন্তু তার রাজনৈতিক দল তার

কাজকর্মে খুব অসন্তুষ্ট। তা ছাড়া খুলেই বলি, আমি রাজনীতি করি না, কিন্তু মণি এক-একসময় এমন সব সাংঘাতিক কাজ করে যে তার মা গোপনে এসে আমার সাহায্য চায়। আমার মা বেঁচে নেই, কিন্তু মণির মাকে আমি নিজের মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করি।

এই সময় কার্তিক দরজায় উঁকি মেরে বলল,—ঠাকুরমশাই বাজার থেকে ফিরে বললেন, ভুতো আর গোপেনকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে।

সাত

ভুতু আর গোপেনকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে শুনেই হালদারমশাই খুব খুশি হয়ে বলেছিলেন, —আমি ঠিক দেখসিলাম, ওরা দুইজনে কোনও প্ল্যান আঁটতাসে। পুলিশের সোর্স থাকে। তা তো আপনারা জানেন। এই সোর্সই ওগো ধরাইয়া দিসে।

কিন্তু খবরটা শুনে চণ্ডীবাবু তখনই থানায় ফোন করতে গিয়েছিলেন। কর্নেলকে বলেছিলুম, —এবার থানার ওসি ওদের পেটের কথা সব বের করে নেবেন। মাঝখান থেকে আপনি নিজের কৃতিত্ব দেখানোর সুযোগ হারালেন।

কর্নেল মিটিমিটি হসে বলেছিলেন,—জয়ন্ত, তোমাকে বরাবর বলে আসছি ন্যায়শাস্ত্রের অপভাষ তত্ত্বের কথা। ইংরেজিতে যাকে বলে হোয়াট অ্যাপিয়ার্স ইজ নট রিয়েল।

কিছুক্ষণ পরে চণ্ডীবাবু ফিরে এসে হাসতে-হাসতে বলেছিলেন,—মণির এক আজব কীর্তি। সে-ই পুলিশের কাছে তার দুই বিশ্বস্ত চ্যালার নামে অভিযোগ করেছিল, তারা তার প্রিয় অ্যালসেশিয়ান কুকুরটাকে চুরি করে না কি বেচে দিয়েছে। চুরি করার সাক্ষীও আছে। তবে ওসি আমাকে বললেন, কর্নেল সাহেবকে খবরটা দেবেন। কুকুর চুরির ব্যাপারটা নিশ্চয়ই কর্নেলের একটা মোক্ষম ক্লু হয়ে উঠবে।

কর্নেল সহাস্যে বলেছিলেন—কুকুর চুরির কারণটা আপনাদের বোঝা উচিত।

কথাটা শুনেই চণ্ডীবাবু চমকে উঠে বলেছিলেন,—শচীনদের মন্দিরের সামনে হাড়িকাঠের কাছে পড়ে থাকা রক্ত পরীক্ষা করে কলকাতার ফোরেনসিক এক্সপার্টরা রায় দিয়েছেন ওগুলো মানুষের রক্ত নয়।

হালদারমশাই গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে কথা শুনছিলেন। এবার বলে উঠলেন,—কী কাণ্ড! অ্যালসেশিয়ান কুকুরটাকে তাহলে ওই একচক্ষু ভুতু আর গোপেন মন্দিরের সামনে বলি দিয়েছিল। ঠিক কইসি কি না কন কর্নেলসাহেব।

কর্নেল সায় দিয়ে বলেছিলেন,—আপনি ঠিক ধরেছেন হালদারমশাই। রাত্তিরবেলা পথের কুকুর ধরা কঠিন কাজ। তার চেয়ে পোষা কুকুর কোলে তুলে নিয়ে এসে ইচ্ছেমতো তাকে ব্যবহার করা যায়। বেচারা জানত না তাকে ওরা বলি দেবে।

আমি বলেছিলুম,—কুকুর বলি দিয়ে রক্ত ছড়ানোর উদ্দেশ্য কী? কুকুরের বডিটা নিশ্চয়ই গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। ফরাক্কার ফিডার ক্যানেলের জলে এখন গঙ্গা বারোমাসই কানায়-কানায় ভরা। স্রোতও তীব্র। কাজেই কুকুরের লাশ এতক্ষণ বহুদূরে পৌঁছে গেছে। কোথাও আটকে গেলে আলাদা কথা।

হালদারমশাই বলেছিলেন,—এতক্ষণ লাশের কিস্যু নাই। শকুনের পাল কুত্তাটা বেবাক খাইয়া ফেলসে।

কেন দুই স্যাঙাত মিলে তাদের গার্জেনের পোষা কুকুর ওখানে বলি দিলো, সেই প্রশ্নের উত্তর আমি কর্নেলের মুখ থেকে আদায় করতে পারিনি। চণ্ডীবাবু বা হালদারমশাইও কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। তবে আমার মনে হয়েছিল শচীনবাবুর ছোটকাকা মহীনবাবুকে নিশ্চয়ই ওরা কোথাও আটকে রেখে গুপ্তধনের খোঁজ পেতে চেয়েছিল।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর কর্নেল আমাকে ভাত-ঘুমের সুযোগ দেননি।

ওদিকে হালদারমশাই এবার আরও উত্তেজিত হয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তখন বেলা প্রায় আড়াইটে বাজে। কর্নেল আমাকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে বললেন। তারপর পকেট থেকে সেই অং বং লেখা কাগজটা বের করলেন। তাঁর প্রকাণ্ড ব্যাগটা থেকে একটা প্যাড বের করে বললেন,—এসো, এই সঙ্কেতগুলোর কোনও সমাধান বের করা যায় কি না দেখি। তোমার মাথায় কিছু এলে আমাকে বলবে। জয়ন্ত এটা কোনও হাসির ব্যাপার নয় কিন্তু।

আসলে আমি তাঁর গাম্ভীর্য দেখে হেসে ফেলেছিলুম। প্যাডটা সেন্টার টেবিলে রেখে হাতে একটা ডট পেন নিলেন। তারপর সেই কাগজটা খুলে পাশে রাখলেন।

কর্নেল বললেন,—ধরা যাক মং-টা মন্দির। কারণ অম্লং থেকে শুরু করলে কিছু বোঝা যাবে না। মং-কে যদি মন্দির ধরি, তাহলে পাঁচ হাত এগোতে হবে মন্দিরের উলটো দিকে। সেটা পেছনের দিক হতে পারে, আবার সামনের দিকও হতে পারে। ধরা যাক মন্দিরটা শচীনবাবুদের শিবমন্দির। মন্দিরের পেছনে কিন্তু পাঁচ হাত জায়গা নেই। অতএব পুকুরের দিকে পাঁচ হাত এগিয়ে যাওয়া যাক। তারপর বাঁ-দিকে দশ হাত এগিয়ে গেলুম—কেমন। তারপর পাঁচ হাত পুকুরের দিকে আবার এগুলুম। এরপর সেখান থেকে ডান দিকে দশ হাত এগুনো যাক। সেখানে আমরা পাচ্ছি অম্লং-কে।

বললুম,—আপনি হং মানে হস্ত ধরছেন?

কর্নেল বললেন,—তীরচিহ্ন দেখে তাই মনে হচ্ছে।

বললুম,—বেশ তো, এবার অম্লং-টা কী?

কর্নেল টাকে হাতে বুলিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকার পর বললেন,—অম্লং বলতেই একটা স্বাদের কথা আসে। অর্থাৎ টক। এখন টক তো কোনও বস্তু হতে পারে না। একটু ভেবে বলো তো জয়ন্ত, পাড়াগাঁয়ে টক বলতে মনে কী ভেসে ওঠে?

বললুম,—টমাটো।

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—ধরা যাক দলিলটা পাঁচশো বছরের নয়, ওটা হয়তো বাড়িয়ে বলা হচ্ছে, কিন্তু টমাটো এদেশে এনেছে পর্তুগিজরা। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, টমাটো তো স্থায়ী কিছু নয়। চাটুজ্যে বাড়িতে টমাটো চাষ কল্পনা করা যায় না।

আমি বলে উঠলুম,—তাহলে অম্লটা কোনও তেঁতুলগাছ নয় তো?

কর্নেল হেসে উঠলেন,—তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ, কিন্তু পাঁচশো কেন দুশো-তিনশো বছরও কোনও তেঁতুলগাছের আয়ু হতে পারে না।

বলে কর্নেল প্যাডের কাগজটা টেনে নিলেন, এবং মূল কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ঢোকালেন। প্যাডের কাগজটাও ছিঁড়ে নিলেন। কারণ, ওতে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে। দ্বিতীয় কাগজটা এনে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে অ্যাশট্রেতে ঢোকালেন। তারপর তার ওপর নিভে আসা চুরুটটা ঘষটে অ্যাশট্রেতে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর বললেন,—উঠে পড়ো, বেরুনো যাক।

বললুম,—চণ্ডীবাবুকে সঙ্গে নেবেন না?

কর্নেল বললেন,—না। উনি সম্ভবত তোমার মতো ভাত-ঘুম দিচ্ছেন।

দুজন পোশাক বদলে নিলুম। কর্নেলের নির্দেশে প্যান্টের পকেটে আমার অস্ত্রটা ভরে নিলুম। কর্নেল ওপাশের দরজা খুলে বেল টিপে কার্তিককে ডাকলেন। তখনই কার্তিক এসে হাজির হল। কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—তোমার কর্তামশাই কি ঘুমোচ্ছেন?

কার্তিক বলল,—আজ্ঞে না। উনি আধঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, আপনারা কোথাও যেতে চাইলে আমি যেন ড্রাইভারকে ডেকে দিই।

কর্নেল বললেন,—না, আমরাও তোমার কর্তামশাইয়ের মতো পায়ে হেঁটে বেরুব। তুমি দরজায় তালা লাগিয়ে রাখো।

গেট পেরিয়ে রাস্তায় নেমে কর্নেল দক্ষিণ দিকে হাঁটতে থাকলেন। সেই সময় সামনের দিক থেকে একটা খালি সাইকেলরিকশা আসছিল। রিকশাওয়ালা নিজে থেকেই থেমে গিয়ে বলল, —সাহেবরা যাবেন নাকি?

কর্নেল ঘড়ি দেখে নিয়ে চাপাস্বরে বললেন,—শীতের রোদ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। রিকশা করেই যাওয়া যাক।

রিকশায় চেপে তিনি বললেন,—আমরা যাব চাটুজ্যেমশাইদের বাড়ি।

রিকশাওয়ালা মুখ ঘুরিয়ে সন্দিগ্ধভাবে বলল,—যে বাড়িতে মানুষ খুন হয়েছে—

তার কথার ওপর কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। তবে তোমার ভয় নেই, তুমি খুন হবে না।

রিকশাওয়ালা হাসবার চেষ্টা করে বলল,—আজ্ঞে না স্যার। আমি কারুর সাতে-পাঁচে থাকি না, আমাকে কে খুন করবে?

কর্নেল বললেন,—চাটুজ্যেবাড়ির মহীনবাবুও তো শুনেছি কোনও সাতে-পাঁচে থাকতেন না। সাধু-সন্ন্যাসীর মতো জীবন কাটাতেন। তিনি খুন হলেন কেন?

রিকশাওয়ালা এবার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরে বলল,—সাহেবরা কি ওনাদের আত্মীয়?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। শচীনমাস্টার সম্পর্কে আমার ভাইপো হন।

রিকশাওয়ালা এবার বাঁ-দিকে মোড় নিল। দু-ধারেই ইটের বাড়ি। মাঝে-মাঝে মাটির বাড়ি। এটা গলি রাস্তা। লোক চলাচল খুব কম। রিকশাওলা আপন মনে বলল,—এ-সংসারে মানুষ চেনা বড় কঠিন। ভালোমানুষ কি কখনও খুন হয়?

কর্নেল বললেন,—তাহলে কি তুমি বলতে চাও, মহীনবাবু ভালোমানুষ ছিলেন না?

রিকশাওয়ালা অদ্ভুত শব্দে হাসল। বলল,—ভালোমানুষ হলে কি সে বজ্জাতদের সঙ্গে গাঁজার কলকে টানে?

—কোন বজ্জাতের সঙ্গে উনি গাঁজা খেতেন?

—আপনি চিনবেন না স্যার। দুই বজ্জাতকেই আজ পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। মণি রায়চৌধুরী দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষেছিলেন।

কর্নেল হঠাৎ চুপ করে গেলেন। আমার মনে হল উনি রিকশাওয়ালাকে মনের কথা খুলে বলার সুযোগ দিচ্ছেন। একটু পরে বুঝলুম ঠিক তাই। লোকটা আপনমনে কথা বলতে-বলতে প্যাডেলে চাপ দিচ্ছে।

—অমন একখানা তাগড়াই কালো রঙের বিলিতি কুকুর ছিল মণিবাবুর। তাকে চুরি করে কোথায় বেচে দিয়ে এসেছে। মণিবাবু কি সহজে ছাড়বেন? এদিকে থানার বড়বাবুও দুঁদে দারোগা। কত দাগি ওঁর ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে! কানাভুতু আর গুপে সিংঘিকে কাপড়ে-চোপড়ে করে ছাড়বেন।

অলিগলি ঘুরতে-ঘুরতে রিকশাওয়ালা শর্টকাটেই আমাদের চাটুজ্যেবাড়ির সামনে পৌঁছে দিল।

কর্নেল তার হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিলেন। সে বলল,—আমার কাছে খুচরো তো নেই স্যার।

কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে। তোমাকে পুরো টাকাটাই বকশিশ দিলুম।

সে সেলাম করে চলে গেল। বুঝতে পারলুম বিকেল হয়ে আসছে, আলো কমে গেছে। সম্ভবত পাগলা বিনোদের জ্যান্ত মড়ার ভয়েই লোকটা যেন পালিয়ে গেল।

কর্নেল দরজার কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। দেখলুম শচীনবাবু তাঁর গাবদা ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখে যেন অবাক হলেন। বললেন,—আমি এখনই আপনাদের কাছে যাচ্ছিলুম। ভেতরে আসুন স্যার। আমরা ভেতরে ঢুকলে তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর চাপাস্বরে বললেন,—ভুতু আর গোপেনকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে শুনলুম। তবে আমাদের কেসের ব্যাপারে নয়। ওরা নাকি মণি রায়চৌধুরীর অ্যালসেশিয়ানটাকে চুরি করে বিক্রি করে দিয়েছে।

কর্নেল বললেন,—আপনার পিসিমা কী করছেন?

—পিসিমা বাবার পা টিপে দিচ্ছেন।

—ঠিক আছে। চলুন আমরা একবার মন্দিরের দিকে যাই।

শচীনবাবু খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এগিয়ে গিয়ে মন্দিরের দিকের দরজা খুলে দিলেন। একবার পিছু ফিরে দেখলুম বাসন্তী দেবী বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

মন্দিরের সামনে গিয়ে কর্নেল বললেন,—আচ্ছা শচীনবাবু, আপনাদের এই বাড়ির কোথাও কি কোনও বিশাল গাছ ছিল, এমন কথা শুনেছেন?

আমাদের পেছন দিকে খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে বাসন্তী দেবী বলে উঠলেন,—তেঁতুলগাছ? ছোটবেলায় ঠাকমার কাছে শুনতুম, কোন যুগে নাকি কামরূপ কামাক্ষা থেকে এক ডাকিনি একটা তেঁতুলগাছে চড়ে গঙ্গাদর্শনে যাচ্ছিলেন। এ-বাড়ির সীমানায় যেই সে এসেছে, অমনি নাকি সূর্য উঠেছিল। দিনের বেলায় নাকি ডাকিনিদের বাহন গাছ আর উড়তে পারে না। সূর্যের ছটা দেখলেই সেইখানে শিকড় গেঁথে দাঁড়িয়ে যায়।

শচীনবাবু বললেন,—হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে। সেই তেঁতুল না কি খাওয়া যেত না। ভাঙলেই রক্ত বেরুত। তবে সেসব নেহাতই বাজে গপ্পো।

ততক্ষণে কর্নেল পিঠের কিট ব্যাগ থেকে একটা গোল ফিতের কৌটো বের করে একদিকটা টেনে আমাকে বললেন,—জয়ন্ত, এই ডগাটা ধরো। মন্দিরের ঠিক মাঝামাঝি বারান্দার গায়ে এটা ধরে থাকো। আঠারো ইঞ্চিতে এক হাত, অতএব পাঁচ বা দশ হাতের হিসেব করতে অসুবিধে নেই।

বলে তিনি পকেট থেকে ভাঁজ করা সেই কাগজটা শচীনবাবুকে দিলেন। শচীনবাবু খুলে দেখে বললেন,—এটা সেই পুরোনো দলিল দেখছি।

এরপর কর্নেলের কাণ্ড দেখে শচীনবাবু আর তাঁর পিসিমা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কর্নেল তারপর সামনে এক জায়গায় থামলেন। তারপর বাঁ-দিকে এগিয়ে গেলেন এবং আমাকে বললেন,—এবার ফিতেটা তুমি ওই দাগ দেওয়া জায়গায় ধরে রাখো। তারপর তাঁর যে মাপজোক শুরু হল, তা চণ্ডীবাবুর ঘরে বসে কর্নেল একটা প্যাডের পাতায় লিখে ছিঁড়ে ফেলেছেন। তাঁর মাপজোক শেষ হল যেখানে, সেখানে চাটুজ্যেবাড়ির পাঁচিল। পাঁচিলের নীচে একটা ইটের টুকরো কুড়িয়ে তিনি দাগ দিলেন।

শচীনবাবু বললেন,—কিছুই তো বুঝতে পারছি না কর্নেলসাহেব।

কর্নেল বললেন—চলুন। বাড়ির ভেতরে এই পাঁচিলের নীচের দিকটা একবার পরীক্ষা করব। জয়ন্ত, তুমি ওই চিহ্নের সোজাসুজি দাঁড়িয়ে পাঁচিলের ওপর একটা হাত তুলে রাখবে। তাহলে আমি বুঝতে পারব পাঁচিলের ভেতর দিকে ওপাশের চিহ্নটা কোথায় পড়বে।

আমি হাত তুলে দাঁড়িয়ে রইলুম। কর্নেল ভেতরে গেলেন। তাঁর সঙ্গে শচীনবাবু এবং তাঁর পিসিমাও গেলেন। একটু পরে কর্নেল ডাকলেন,—চলে এসো জয়ন্ত। আমার কাজ শেষ।

ভেতরে গিয়ে দেখলুম, তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে একটা জবাফুলের ঝোপ। রক্তজবায় ঝোপটা লাল হয়ে আছে।

কর্নেল বললেন,—আশ্চর্য! এখানে দেখছি জবা গাছটার গোড়ায় ঘাসের ভেতরে কয়েকটা নুড়ি-পাথর পড়ে আছে। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য, দেওয়ালের নীচে এই অংশে সিঁদুরের ছোপ।

বাসন্তী দেবী বলে উঠলেন,—মহীনের কীর্তি। প্রায়ই দেখতুম, ওখানে বসে সে করজোড়ে যেন ধ্যান করছে।

কর্নেল বললেন,—এই নুড়িগুলো যেমন আছে, তেমনি পড়ে থাক। আর আপনাদের একটা কথা বলতে চাই। মহীনবাবুকে কেউ খুন করেনি। তিনি কোথাও আছেন। হয়তো তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে, অথবা তিনি নিজেই আত্মগোপন করেছেন।

বাসন্তী দেবী এবং শচীনবাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

আট

বাসন্তী দেবী এবং শচীনবাবুকে আর কথা বলার সুযোগ না-দিয়ে কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, —চলো জয়ন্ত, আমাদের এখানকার কাজ শেষ। শচীনবাবু, আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। আশা করি ভূতের উপদ্রব আর হবে না।

রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে কর্নেল চাটুজ্যেবাড়ির উত্তরের পাঁচিলের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেন। তিনি আমার কোনও প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। এই রাস্তাটা সংকীর্ণ এবং ইটের গুঁড়োয় ভরতি। দেখলুম বাঁ-ধারে একটা নতুন বাড়ি উঠছে। সেখানে কেউ নেই। কর্নেল আরও একটু এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড নিমগাছের আড়ালে আমাকে টেনে নিয়ে দাঁড় করালেন। নিমগাছটা চাটুজ্যেবাড়ির দেওয়ালের উত্তর-পূর্ব কোণে। সামনে খানিকটা পোড়ো জমি, তার ওপাশে পুরোনো একটা বাড়ি। সেই বাড়ির দিকে তাকিয়ে কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—একটু লক্ষ রাখো। একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পাবে।

কর্নেলের কথা শুনে ভেবেই পেলুম না কখন উনি অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পেলেন। এবং সেই ব্যাপারটা আবার যে ঘটবে, তাই বা কী করে বুঝলেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন করার সুযোগ নেই। আমি কর্নেলের মতো হাঁটু গেড়ে বসে তাকিয়ে রইলুম। তারপর দেখলুম একটা লোক ওই বাড়িটা থেকে কয়েক পা বেরিয়ে এসে চাটুজ্যেবাড়ির দিকে তাকিয়ে কী দেখল। তারপর আবার সেই বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। দিনের আলো কমে এসেছে, তবু লোকটার চেহারা দেখেই বুঝতে পারলুম সে একজন সাধুবাবা। তার মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা, মুখে একরাশ কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি। গায়ে একটা গেরুয়া হাফ-হাতা ফতুয়া। পরনে খাটো গেরুয়া লুঙ্গি। লোকটার হাবভাব দেখে মনে হল সম্ভবত সে একজন পাগল। তা না-হলে আমরা তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই অন্তত বার তিনেক ওইভাবে বাড়িটা থেকে বেরুল, আবার যেন কিছু দেখে হন্তদন্ত হয়ে সেই বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। তারপর আরও কিছুক্ষণ আমরা বসে রইলুম, কিন্তু সে আর বেরুল না।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে আঙুল রেখে আমাকে চুপ করে থাকার ইঙ্গিত করলেন। তারপর যেদিক থেকে এসেছিলুম, সেদিকেই দুজনে ফিরে চললুম। চাটুজ্যেবাড়ির সামনের রাস্তায় পৌঁছে এবার ডানদিক ঘুরে দুজনে এগিয়ে চললুম। এই পথেই রিকশাওয়ালা আমাদের নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু পাড়াটা একেবারেই নিঝুম এবং রাস্তাঘাটে কোনও লোক নেই। কর্নেল রিকশাওয়ালার মতো শর্টকাট না-করে সোজা এগিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তাটায় কবে পিচ দেওয়া হয়েছিল। এখন এখানে-ওখানে পিচ উঠে গেছে। বললুম,—আমরা এ-পথে গিয়ে কোথায় পৌঁছুব?

কর্নেল বললেন,—যেখানে হোক পৌঁছুব, চিন্তু করো না। এবার আমাকে প্রশ্ন করো।

জিগ্যেস করলুম,—ওই সাধুবাবা সম্পর্কে?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ।

বললুম,—আপনি কী করে জানলেন, ওই বাড়িতে এক সাধুবাবা থাকে?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—আজ সকালের দিকে চাটুজ্যেবাড়ির পাঁচিলে যখন ভূতের মুখোশ পরা লোকটার দিকে ছুটে গিয়েছিলুম। তখনই আমার চোখে পড়েছিল পোড়ো জমিটার ওখানে ওই সাধুবাবা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তখন সঙ্গে চণ্ডীবাবু ছিলেন। তাঁর সামনে ইচ্ছে করেই ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিলুম।

অবাক হয়ে বললুম,—সর্বনাশ, আপনি চণ্ডীবাবুকেও সন্দেহ করেন নাকি?

কর্নেল বললেন,—তুমি তো জানো, খেলতে নেমে কখনও আমি নিজের হাতের তাস কাউকেই দেখাই না। এমনকি তোমাকেও না।

এতক্ষণে চোখে পড়ল কিছুটা দূরে রাস্তার একটা বাঁক থেকে একটা গাড়ি এদিকে আসছে। কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে বললেন,—ওই দ্যাখো চণ্ডীবাবুর নাম করতে-করতেই উনি আমাদের খোঁজে ছুটে আসছেন।

গাড়িটা আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। চণ্ডীবাবু নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। তিনি বললেন,—কর্নেলসাহেবের খোঁজে বেরিয়েছিলুম। একমিনিট, আমি গাড়িটা ঘুরিয়ে নিই।

বাঁদিকে একটা গলিরাস্তা ছিল। তিনি সেখান দিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিলেন। তারপর কর্নেল সামনের সিটে এবং আমি ব্যাক সিটে বসলুম। কর্নেল বললেন,—আপনি ছিলেন না, অগত্যা আমি আর জয়ন্ত বেরিয়ে পড়েছিলুম। আমাদের হালদারমশাই কি ফিরেছেন?

চণ্ডীবাবু বললেন,—না। তাঁর জন্য আমি উদ্বেগ বোধ করছি। কানা ভুতু আর গুপে পুলিশের হাজতে। এতে তাদের বন্ধুরা নিশ্চয়ই রাগে ফুঁসছে। দৈবাৎ তাদের পাল্লায় পড়লে মিস্টার হালদার আক্রান্ত হতে পারেন।

কর্নেল বললেন,—আপনি কি ওসি মিস্টার সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন?

চণ্ডীবাবু বললেন,—হ্যাঁ। ওরা বাধ্য হয়ে স্বীকার করেছে মণির কুকুরটাকে ওরা স্বপ্নে বাবা মহাদেবের আদেশ পেয়ে, তাঁর সামনে বলি দিয়েছে। তারপর ধড় আর মুণ্ডু গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—ওসি কি মণিকে একথা জানিয়েছেন?

চণ্ডীবাবু হাসতে-হাসতে বললেন,—এখনও জানাননি। আমাকেও সতর্ক করে দিয়েছেন। তবে তিনি আপনাকে কথাটা জানাতে বলেছেন।

কিছুক্ষণ পরে ডাইনে-বাঁয়ে সংকীর্ণ রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে অবশেষে আমরা চণ্ডীবাবুর বাড়ি পৌঁছুলুম। তখন দিনের রোদ প্রায় মুছে গেছে। ঠান্ডাটা বাড়তে শুরু করেছে।

কার্তিক আমাদের ঘরের তালা খুলে দিয়ে বলল,—আপনারা বসুন স্যার। আমি ঠাকুরমশাইকে কফি করতে বলি। আজ ঠান্ডাটা যেন কালকের চেয়ে বেড়ে গেছে।

চণ্ডীবাবু গাড়ি গ্যারেজে রেখে এতক্ষণে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। তারপর সোফায় বসে বললেন,—মিস্টার হালদারের খোঁজে আমি কারুকে পাঠাব নাকি?

কর্নেল বললেন,—থাক। উনি একজন অভিজ্ঞ প্রাক্তন পুলিশ অফিসার। ওঁর কথা ভাববেন না। আপনাকে এবার একটা কথা জিগ্যেস করি। চাটুজ্যেবাড়ির উত্তরে যে নতুন বাড়িটা হচ্ছে, সেখান থেকে কিছুটা দূরে একটা খুব পুরোনো বাড়ি আছে দেখেছি। ওই বাড়িটা কার?

চণ্ডীবাবু বললেন,—বুঝেছি। ওই বাড়িটার মালিক ছিলেন নলিনী বাঁড়ুজ্যে নামের এক ভদ্রলোক। তিনি দুর্গাপুরে ছেলের কাছে চলে যান। যাওয়ার আগে বাড়িটা দেখাশোনার জন্য হরিপদ হাজরা নামে একটা লোকের ওপর দায়িত্ব দিয়ে যান। হরিপদর বাড়ি পাশেই। গতবছর মণি রায়চৌধুরী তার দলের অফিস করবে বলে বাড়িটা দখল করেছিল। খবর পেয়ে নলিনীবাবু তাঁর নামে মামলা করেছিলেন। সেই মামলায় তাঁর জয় হয়েছিল। কিন্তু মণি হাইকোর্টে আপিল করেছে। হাইকোর্ট ইনজাংশান দিয়ে বলেছে, যতদিন না মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়, ততদিন ওই বাড়িতে কেউ বাস করতে পারবে না। আসলে নলিনীবাবুর বাড়িটা তাঁর এক জেঠামশাইয়ের তৈরি। তাঁর কাছেই নলিনীবাবু ছোটবেলা থেকে থাকতেন। সমস্যা হল জেঠামশাই উইল করে তাঁকে বাড়িটা দিয়ে যাননি।

এই সময় ঠাকুরমশাই প্রকাণ্ড ট্রে এনে সেন্টার টেবিলে রাখলেন। দেখলুম কফির সঙ্গে দু-প্লেট পকৌড়া আছে। অতএব শীত সন্ধ্যায় আরাম করে কফি পান শুরু হল। চণ্ডীবাবু কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমনসময় কার্তিক এসে খবর দিল, কর্তামশাই আপনার টেলিফোন এসেছে।

চণ্ডীবাবু কফির কাপ-প্লেট হাতে নিয়েই বেরিয়ে গেলেন।

এই সময়েই কর্নেলকে জিগ্যেস করলুম,—চাটুজ্যেবাড়ির পাঁচিলের নীচে জবাগাছের গোড়া খুঁড়লে সত্যিই কি সোনার মোহর ভরতি ঘড়া পাওয়া যাবে?

কর্নেল বললেন,—পাওয়া গেলে অনেক আগেই অন্তত শরদিন্দুবাবু জায়গাটা খুঁড়ে বের করে ফেলতেন। অবশ্য শচীনবাবুরাও তার ভাগ পেতেন।

বললুম,—আপনি ওই সংকেতের জট যেভাবে খুলেছেন, সেই ভাবেই কি অন্য কেউ খুলতে পারেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—একজন অন্তত পেরেছিল। সে হল মহীন চাটুজ্যে। কারণ, তুমি সচক্ষে দেখেছ পাঁচিলের নীচের দিকটা সিঁদুর মাখানো আর নুড়ি পড়ে আছে।

অবাক হয়ে বললুম,—কিন্তু মহীনবাবুর হঠাৎ অন্তর্ধান একটা রহস্যের সৃষ্টি করেছে।

কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত তুমি বোঝো সবই, তবে বড্ড দেরিতে। তুমি এখনও বুঝতে পারছ না, ওই পাহাড়ি নদীর নুড়িগুলো কে নিয়ে এসেছিল, এবং কে তা রাতবিরেতে বাড়িতে ছুঁড়ে বাড়ির লোকেদের ভয় দেখিয়েছে। এমনকী, ছাদে উঠেও দাপাদাপি করেছে।

এবার চমকে উঠে বললুম,—কী কাণ্ড! তাহলে কি মহীনবাবুই তার বাড়ির লোকেদের ভূতের ভয় দেখাতেন?

কর্নেল বললেন,—আবার কে? তবে এ-ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করত কানা ভুতু আর গুপে সিংঘি। তারা শচীনবাবুর কাছে আড্ডা দিতে এসে আসলে মহীনবাবুর সঙ্গেই যোগাযোগ রাখত। অবশ্য এটা আমার অঙ্ক।

—হঠাৎ আমার চমক জাগল। বললুম,—কর্নেল সেই পুরোনো বাড়িতে যে সাধুবাবাকে দেখলুম, তিনিই মহীনবাবু নন তো?

কর্নেল বলেন,—কিছুক্ষণ পরে আবার আমাদের বেরুতে হবে। মনে-মনে তৈরি থাকো। যাওয়ার সময় থানার ওসি মিস্টার সেন এবং পুলিশ ফোর্স আমাদের সঙ্গে থাকবে।

এই সময় কার্তিক এসে বলল,—কর্তামশাই কর্নেলসাহেবকে ডাকছেন। আপনি এখনই আমার সঙ্গে আসুন।

কর্নেল তখনই দ্রুত উঠে গেলেন। আমি চুপচাপ বসে কর্নেলের অঙ্কটাকে নিজের বুদ্ধিমতো কষে দেখার চেষ্টা করলুম। কিন্তু অঙ্কটা বড্ড জটিল। বিশেষ করে মহীনবাবু কেনই বা তাঁদের পূর্বপুরুষের গুপ্তধনের খবর ওই বজ্জাত কানা ভুতু আর গুপে সিংঘিকে দিতে চাইবেন। তা ছাড়া তিনি তো সাধু-সন্ন্যাসীদের মতো মানুষ। সোনার মোহরে তাঁর লোভ থাকার কথা নয়।

অঙ্কটা কষতে গিয়ে হাল ছেড়ে দিলুম। দেখা যাক কর্নেলের রাতের অভিযান কোথায় গিয়ে পৌঁছায়।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল ফিরে এলেন। তারপর বললেন,—ওসি প্রণবেশ সেন চণ্ডীবাবুকে ডেকে আমার খবর জিগ্যেস করছিলেন।

বললুম,—তাহলে আপনার প্ল্যান মিস্টার সেনকে জানিয়ে এলেন?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। আমার অঙ্ক যদি ঠিক হয়, তাহলে সব রহস্য ফাঁস করে দিয়ে রাত দশটার মধ্যেই ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়তে পারব।

জিগ্যেস করলুম,—চণ্ডীবাবু আমাদের সঙ্গী হবেন তো?

কর্নেল বললেন,—হবেন। তবে উনি আমাদের আগেই বেরিয়ে যাবেন। যেখানে আমরা হানা দেব, উনি তার কাছাকাছি জায়গায় উপস্থিত থাকবেন। যাই হোক, এখন ওসব কথা নয়।

বলে কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে ধ্যানস্থ হলেন।

সময় কাটতে চাইছিল না। কিন্তু আটটা বাজতে চলল, তখনও হালদারমশাইয়ের পাত্তা নেই। আমি কর্নেলকে কথাটা বললুম। কিন্তু তিনি কোনও জবাব দিলেন না।

সাড়ে-আটটার সময় কর্নেলের নির্দেশে হালকা জ্যাকেটটা খুলে পুরু জ্যাকেট পরে নিলুম। তারপর চণ্ডীবাবু এলেন। দেখলুম তিনি ওভারকোট পরেছেন এবং মাথায় টুপি, মুখে পাইপ। বললুম,—মিস্টার রায়চৌধুরীকে যেন শার্লক হোমস বলে মনে হচ্ছে।

তিনি একটু হেসে বললেন,—হোমসসাহেব কি আমার মতো হাতে রাইফেল নিয়ে ঘুরতেন?

ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। চণ্ডীবাবু আমাদের থানায় পৌঁছে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন। দেখলুম ওসি প্রণবেশ সেন কয়েকজন অফিসারসহ থানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি কর্নেল এবং আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন,—চলুন বেরোনো যাক।

রাস্তায় বাতিগুলো কুয়াশায় ম্লান হয়ে আছে। নির্জন রাস্তা। আঁকাবাঁকা পথে ঘুরতে-ঘুরতে এক জায়গায় গাড়ি থেমে গেল। মিস্টার সেন চাপাস্বরে বললেন,—আর•দু-মিনিট। তারপরই লোডশেডিং হবে।

বুঝলুম বিদ্যুৎ অফিসকে বলে রেখেছেন মিস্টার সেন।

তারপর ঠিকই লোডশেডিং হল। রাস্তার আলোগুলো নিভে গেল। কুয়াশা-নামা অন্ধকারে বুঝতে পারছিলুম না কোথায় এসেছি। একটু পরেই জায়গাটা চিনতে পারলুম। আমরা চাটুজ্যেবাড়ির মন্দিরের কাছে এসেছি। একদল পুলিশ বাড়িটার চারদিক ঘিরে ফেলল।

এরপর আমরা কয়েকজন মন্দিরের চত্বরে গেলুম। ঠিক তখনই কানে এল দেওয়ালের ওপাশে ঘসঘস করে চাপা শব্দ হচ্ছে। তারপর কানে এল বাড়ির সদর দরজার দিকে কেউ কড়া নাড়ছে।

শচীনবাবুর কণ্ঠস্বর কানে এল এবং টর্চের আলো দেখতে পেলুম। এদিকে কর্নেল আমাকে কাঁধে হাত রেখে দরজার পাশে গুঁড়ি মেরে বসিয়ে দিয়েছেন। অন্যপাশে মিস্টার সেনও বসেছেন।

তারপর হঠাৎ এদিকের দরজাটা খুলে গেল। আবছা দেখলুম একটা লোক বেরিয়ে আসছে। অমনি তার মুখে টর্চের আলো ফেলে ওসি মিস্টার সেন বললেন,—শরদিন্দুবাবু, আপনাকে অ্যারেস্ট করা হল।

তারপর একটা ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। ততক্ষণে আরও টর্চের আলো জ্বলে উঠেছে। দেখলুম চণ্ডীবাবুর মতোই ওভারকোট পরা এবং মাথায় হনুমান টুপি পরা তাগড়াই চেহারার ভদ্রলোকের হাতদুটো পেছন দিকে টেনে একজন অফিসার হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। তিনি চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন, কিন্তু তাঁকে ঠেলতে-ঠেলতে পুলিশ অফিসাররা প্রিজন ভ্যানের দিকে নিয়ে গেলেন।

কর্নেলের পেছনে-পেছনে আমি বাড়িতে ঢুকলুম। তারপর দেখলুম বিকেলে-দেখা সেই সাধুবাবাকে পুলিশ হাতকড়া পরিয়েছে। কর্নেল জবাগাছটার দিকে টর্চের আলো ফেললেন। সেখানে একটা শাবল পড়ে আছে। খানিকটা জায়গায় মাটি খোঁড়া।

শচীনবাবু এগিয়ে এসে বললেন,—কী আশ্চর্য! এই সাধুকেই তো একবার সঙ্গে নিয়ে ছোটকাকা আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন।

আমি অবাক হয়ে কর্নেলকে জিগ্যেস করলুম,—তাহলে আপনি যে বলেছিলেন, ওই সাধুবাবাই মহীনবাবু?

কর্নেল বললেন,—আমার অঙ্কে এই জায়গায় একটু গণ্ডগোল হয়েছিল, কিন্তু—

বলেই তিনি ওসি মিস্টার সেনকে বললেন,—ওই পুরোনো বাড়িটা পুলিশ ঘিরে রেখেছে তো?

মিস্টার সেন বললেন,—হ্যাঁ। চলুন এবার শিগগির সেখানে যাওয়া যাক।

আমরা পাশের গলি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সেই পোড়ো জমিতে পৌঁছুলুম। ভেতরে একটা ধস্তাধস্তির শব্দ হচ্ছিল। একজন অফিসারের কাঁধের ধাক্কায় এদিকের দরজাটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। তারপর ঘরে ঢুকে টর্চের আলোয় দেখলুম হালদারমশাইয়ের সঙ্গে একটা লোকের মল্লযুদ্ধ হচ্ছে।

হালদারমশাই এবার তাকে ছেড়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন,—কর্নেলস্যার এই হইল গিয়া ঘরের শত্রু বিভীষণ।

এতক্ষণে চণ্ডীবাবু উলটো দিক থেকে দৌড়ে এসে বললেন,—এ কী! মণি তুমি এখানে কেন? তোমার চ্যালারা কোথায়? বুঝেছি, তুমি এখানে আড়ি পেতে বসে চ্যালাদের চাটুজ্যেবাড়িতে হানা দিতে পাঠিয়েছিলে।

ওসি প্রণবেশ সেনের নির্দেশে পুরু সোয়েটার আর হনুমান টুপি পরা এক ভদ্রলোককে একজন অফিসার বললেন,—আপনি আমাদের সম্মানিত অতিথি। প্লিজ, রাজনীতির ভয় দেখাবেন না। আমাদের সঙ্গে চলুন।

বলে তাঁর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন।

চণ্ডীবাবু বললেন,—উঠোনের কোণে বেচারা মহীন লুকিয়ে বসেছিল। তাকে কনস্টেবলরা ধরেছে। চলুন সেখানে যাওয়া যাক।

ভেতর দিকের উঠোনে নেমে দেখলুম, দেখতে শচীনবাবুর মতো চেহারার এক ভদ্রলোক বোবার চোখে তাকিয়ে আছেন। এত শীতেও তাঁর গায়ে একটা গেরুয়া ফতুয়া আর পরনে খাটো ধুতি। তিনি চণ্ডীবাবুর দিকে তাকিয়ে কাঁদো-কাঁদো মুখে বললেন,—আমি অতশত কিছু ভাবিনি। শরদিন্দুদা মাঝে-মাঝে আমাকে ডেকে পাঠাতেন, আর বলতেন মণিবাবুর বাড়ি যাবি আর তিনি যা বলবেন, তাই করবি।

কর্নেল বললেন,—তাই আপনি রাতবিরেতে ঢিল ছুঁড়তেন, আর পাগলা বিনোদের মরা সেজে ভয় দেখাতেন।

শচীনবাবুর কাকা মহীনবাবু হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠলেন।

কর্নেল বললেন,—চলো জয়ন্ত, আসুন হালদারমশাই, আশাকরি আপনাকে ঘুসি খেতে হয়নি?

হালদারমশাই হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—না। আমি দরজায় আস্তে কড়া নাড়সি, আর সে টর্চের আলোয় আমারে দেইখ্যা ঝাঁপাইয়া পড়সে।

সে-রাত্রে চণ্ডীবাবুর বাড়িতে গিয়ে কফি খেতে-খেতে কর্নেলকে জিগ্যেস করেছিলুম, —সোনার মোহর ভরতি ঘড়াটা উদ্ধার করবেন না?

কর্নেল কিছু বলার আগেই চণ্ডীবাবু বললেন,—ওই কাজটা পুলিশের। সত্যি ওখানে সোনার মোহর ভরা ঘড়া পোঁতা আছে কি না তা পুলিশ খুঁজে দেখবে। আইন অনুসারে সত্যি সেটা পাওয়া গেলে তার মালিক হবে দেশের সরকার। কারণ ওটা পুরাসম্পদ।

এবার শেষ কথাটা বলে ফেলি। আমরা কলকাতায় ফিরে যাওয়ার পর চণ্ডীবাবু কর্নেলকে টেলিফোনে জানিয়েছিলেন, দশ-বারো ফিট খুঁড়েও ওখানে কিছু পাওয়া যায়নি। তবে গর্তের একপাশে কিছুটা জায়গা দেখে পুলিশের মনে হয়েছে, ওখানে সত্যি গোলাকার কিছু পোঁতা ছিল, কোন যুগে কেউ হাতিয়ে নিয়েছে।

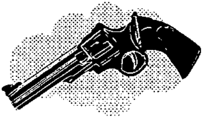

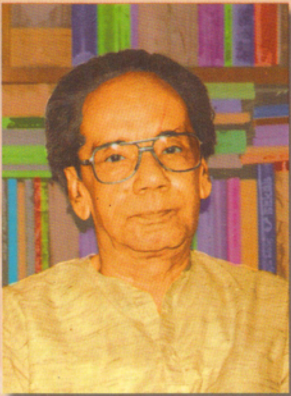

রহস্য কাহিনির নায়ক হিসেবে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বাংলা সাহিত্যে এক অনবদ্য সৃষ্টি। বয়সে তিনি বৃদ্ধ কিন্তু শরীরে যুবকের শক্তি। নেশা প্রজাপতি-পাখি-ক্যাকটাস-অর্কিড। বাতিক অপরাধ রহস্যের পিছনে ছুটে বেড়ানো। গত প্রায় আড়াই দশক ধরে লেখা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটদের জন্য কর্নেলের অজস্র রহস্য গল্প ও উপন্যাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল নানা জায়গায়। এবার সেগুলি এক মলাটের মধ্যে এনে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের এই প্রয়াস।